বইঃ-মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ

মুল-লেখকঃ-ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী (রহঃ)
অনুবাদঃ- আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মদ মুসা।(বি কম এম কম এম)

মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ

প্রকাশনীঃ-আহসান।

ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী (রহঃ)

বইঃ-মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ http://rasikulindia.blogspot.com/ ইসলামিক বইয়ের সমাহার পার্ট-১ ইমাম মুহাম্মদ-

الموطأ للامام محمد

মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ

মূল

ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী (র)

অনুবাদ

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বি. কম. (অনার্স); এম. কম; এম.এম.

আহসান পাবলিকেশন

বাংলাবাজার ◆ মগবাজার ◆ কাটাবন

মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ

الموطأ للامام محمد

মূল : ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী (র)

অনুবাদ : আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

প্রকাশনায়
আহসান পাবলিকেশন
◆ ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন : ০২-৭১২৫৬৬০, ০১৭২৮১১২২০০
◆ ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ০২-৫৮৩১৩১২৭, ০১৯৩৯৬০০৩০০
◆ কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা, ফোন : ০২-৯৬৭০৬৮৬, ০১৬৭৪৯১৬৬২৮

ISBN 984-32-0909-5
Cl. No. 297.1247

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ [১৯৮৮ সাল]

দ্বিতীয় সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৩ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ : যিলকদ ১৪৩৬ হিজরী
আগস্ট ২০১৫ ঈসায়ী
ভাদ্র ১৪২২ বাংলা

প্রচ্ছদ : মুবাশ্বির মজুমদার ও রায়হান জামিল

কম্পোজ
মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
যমুনা কম্পিউটার্স, তেজগাঁও, ঢাকা।

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রেস, ঢাকা।

মূল্য : পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

الموطأ للامام محمد، الكاتب امام محمد الشيباني (رح) مترجم محمد موسى (باللغة البنغالية)

Muatta Imam Muhammad by Imam Muhammad Ash-Shaybani (R)
Translated into Bengali by Alhajj Moulana Muhammad Musa
Published by Ahsan Publication 38/3 BanglaBazar, Dhaka-1100.
Second Edition August-2015. **Price : Tk. 550.00 only ($ 12.00)**

AP.2003/19

অনুবাদকের আরজ

আলহামদু লিল্লাহ। আমাদের মাতৃভাষা দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। প্রায় বিশ কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। তাই বিশ্বের দরবারে এবং ইসলামী দুনিয়ায় এই ভাষা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। মাতৃভাষায় মানুষ যতো সহজে ও স্বল্প আয়াসে কোন কিছু হৃদয়ংগম করতে পারে অন্য কোন ভাষায় তা সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা যে কোন জাতির হেদায়াতের জন্য তাদের মধ্য থেকে তাদের ভাষাভাষী নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাদের ভাষায় কিতাব নাযিল করেছেন। "আমি যে কোন জাতির কাছে তাদের ভাষাভাষী রাসূল পাঠিয়েছি, যেন তিনি তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারেন" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪)।

মাতৃভাষার এসব গুরুত্বপূর্ণ দিক সামনে রেখেই ইসলামী জ্ঞান, বিশেষত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসের বাংলা রূপান্তরে উদ্যোগী হয়েছি। এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ অবশ্য প্রথম পদক্ষেপ নয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থখানির অনুবাদ নির্ভুল ও সহজবোধ্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। পাঠকদের সুবিধার্থে টীকার আকারে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা যোগ করেছি। মরহুম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম সাহেব পাণ্ডুলিপির আদ্যপান্ত পাঠ করে স্থানবিশেষে সংশোধন করে দেন এবং কিছু জরুরী পরামর্শ দেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শ্রদ্ধেয় মাওলানা মু'তাসিম বিল্লাহ সাহেবও পাণ্ডুলিপিখানি রিভিউ করার সময় স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন। যেসব স্থানে হাদীসের মতন (মূল পাঠ) উদ্ধারে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি এবং তরজমার ক্ষেত্রে জটিলতা বা সন্দেহ অনুভব করেছি, সেসব জায়গায় বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ সাহেবের শরণাপন্ন হয়েছি। আল্লাহ পাক তাদের এই নিঃস্বার্থ শ্রম কবুল করুন।

প্রথম সংস্করণের তরজমায় যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়েছে, দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলো দূর করার এবং ভাষাও প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য করার চেষ্টা করেছি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর বিধান ও তাঁর প্রিয় নবীর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার তৌফীক দিন। আমীন।।

মুহাম্মদ মূসা

তারিখ ঃ ২৫ জুন, ২০০৩

গ্রাম ঃ শৌলা, পোষ্ট ঃ কালাইয়া

থানা ঃ বাউফল, জিলা ঃ পটুয়াখালী।

সূচীপত্রঃ-মুয়াত্তা-ইমাম-মোহাম্মদ। অধ্যায়-১:- পবিত্রতা

সূচীপত্র

অধ্যায় ১ ঃ পবিত্রতা

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ২ ঃ নামায

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ৩ ঃ জানাযার বিবরণ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ৪ ঃ যাকাত

অধ্যায় ৫ ঃ রোযার বিবরণ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ৬ ঃ হজ্জের বিবরণ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ৭ ঃ বিবাহ-শাদী

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ৯ ঃ কোরবানী শিকার ও আকীকা

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ১০ ঃ দিয়াত (রক্তপণ)

অধ্যায় ১১ ঃ চুরির দণ্ডবিধি

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ১২ ঃ যেনা-ব্যভিচারের শাস্তি

অধ্যায় ১৩ ঃ ওয়ারিসী সম্পত্তি বণ্টন বা দায়ভাগ

অধ্যায় ১৪ ঃ শপথ ও মানত

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ১৬ ঃ হারানো প্রাপ্তি

অধ্যায় ১৭ ঃ বিবিধ প্রসঙ্গ

যুদ্ধাভিযান সংক্রান্ত বর্ণনা

অনুচ্ছেদ

পোশাক-পরিচ্ছদ

পানাহারের শিষ্টাচার

শিষ্টাচার, চারিত্রিক দোষত্রুটি ও সৌন্দর্য

অনুচ্ছেদ

ইমাম মুহাম্মাদ (র)

ইসলামী জ্ঞানচর্চার জগতে ইমাম মুহাম্মাদ (র) এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তার আবির্ভাব না হলে ইলমে ফিক্‌হের বিরাট অংশ হয়তো অপূর্ণই থেকে যেতো। তার নাম মুহাম্মাদ, কুনিয়াত (উপনাম) আবু আবদুল্লাহ, পিতার নাম হাসান এবং দাদার নাম ফারকাদ আশ-শায়বানী। তার বংশ জাযীরাতুল আরবে বসবাস করতো। তার পিতা পরিবার-পরিজনসহ দেশত্যাগ করে এসে সিরিয়ার সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং দামেশ্‌ক শহরের অদূরে হারিসতা (حرستا) গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর তারা উমাইয়া রাজত্বের শেষদিকে ইরাকে চলে আসেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) ১৩১-৩২ হিজরী সনে (৭৪৮-৯ খৃ.) ইরাকের ওয়াসিত (واسط) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা তাকে নিয়ে কুফা চলে আসেন এবং এখানকার আলো-বাতাসেই তিনি বড়ো হতে থাকেন। ইমাম সাহেব বলেন, আমার পিতা আমার জন্য ৩০ হাজার দিরহাম রেখে যান। আমি এর ১৫ হাজার আরবী ব্যাকরণ ও কবিতা শেখায় এবং অবশিষ্ট ১৫ হাজার হাদীস ও ফিক্‌হের জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করি" (ইমাম যাহাবীর মানাকিবে আবু হানীফা ওয়া সাহিবাইহি)। তিনি সমসাময়িক যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফিক্‌হবিদদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী (র) বলেন, তিনি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সাহচর্য গ্রহণ করেন এবং তার কাছে হাদীস ও ফিক্‌হের জ্ঞান লাভ করেন। অনন্তর তিনি আমর ইবনে দীনার, মালেক ইবনে মিগওয়াল, আওযাঈ, রবীআ ইবনে সালেহ, বুকাইর, আবু ইউসুফ, সুফিয়ান সাওরী, কায়েস ইবনুর রবী, উমার ইবনে যার, মিসআর ইবনে কুদামা প্রমুখ মনীষীদের নিকট থেকেও হাদীসের সনদ লাভ করেন। তিনি সিরিয়ায় ইমাম আওযাঈর কাছে এবং মদীনায় ইমাম মালেকের কাছে (তিন বছর) হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। তার নিকট থেকে ইমাম শাফিঈ, আবু সুলায়মান মূসা ইবনে সুলায়মান, হিশাম ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-রাযী, আবু উবায়েদ কাসেম ইবনে সাল্লাম, আলী ইবনে মুসলিম আল-তাওসী, আবু হাফ্‌স আল-বুকাইর এবং খালাফ ইবনে আইউব হাদীস বর্ণনা করেন (তাজীলুল মুনফিআহ এবং মুওয়াত্তার ভূমিকা)।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ইন্তেকালের পর তিনি ইমাম আবু ইউসুফের সাহচর্যে থেকে ইলমে ফিক্‌হের চর্চা করেন (যাহাবী)। ইবনে হাজারের মতে, তিনি অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন (আল-ইছার বি-মারিফাতি রুয়াতিল আছার)। ইলমে হাদীসেও তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। হানাফী ইমামদের সাথে চরম মতবিরোধ সত্ত্বেও ইমাম দারু কুতনী অকপটে একথা স্বীকার করেন যে, তিনি সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী এবং হাদীসের হাফেজদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (হাফেজ যায়লাঈর 'তাখরীজ আহাদীসিল হিদায়া', ১খ, ৪০৮-৯)। হাফেজ আলী ইবনুল মাদীনী তাকে ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যবাদী (صدوق) বলে মন্তব্য করেন (আল-ইছার)। হাফেজ যাহাবী তার 'মীযানুল ইতিদাল' গ্রন্থে লিখেছেন, وكان من بحور العلم والفقه (তিনি ছিলেন জ্ঞান ও ফিক্‌হের মহাসমুদ্র)। যাহাবী আরো বলেন, ইমাম শাফিঈ তার কাছ থেকে হাদীসের হুজ্জাত গ্রহণ করেন (মানাবিক)। হাফেয ইবনে হাজার বলেন, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল জ্ঞান-গরিমার দিক থেকে তাকে সমীহ করতেন (তাজীল)।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালেহ (র) বলেন, আমাকে ইবনে আকসাম বললো, আপনি ইমাম মালেককে দেখেছেন, তার কাছে শুনেছেন এবং মুহাম্মাদের সাহচর্যেও থেকেছেন। এই দুই মনীষীর মধ্যে কে অধিক জ্ঞানী ছিলেন? আমি বললাম, ইমাম মুহাম্মাদ ইমাম মালেকের তুলনায় অধিক জ্ঞানী ছিলেন। আবু উবায়েদ (র) বলেন, আমি আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর দেখিনি।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আমি যদি বলতাম—কুরআন মজীদ ইমাম মুহাম্মাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে—তবে তার ভাষার অলংকরণের কারণেই তা বলতাম। আমি যখন তাকে কুরআন পড়তে শুনতাম, মনে হতো তা যেন তার ভাষায় নাযিল হচ্ছে। আমি তার চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি আর দেখিনি। তিনি যখন মাসআলা-মাসায়েল বের করতেন—মনে হতো তার উপর যেন কুরআন নাযিল হচ্ছে। একটি শব্দও আগে-পিছে হতো না। ফিক্হের জ্ঞানের ব্যাপারে তিনি আমার উপর অজস্র অনুগ্রহ করেছেন (ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুল আসল-এর ভূমিকা, সামআনীর আল-আনসাব)।

ইবরাহীম হারবী ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এসব কঠিন মাসআলার সমাধান কোথায় পেলেন? তিনি বলেন, ইমাম মুহাম্মাদের গ্রন্থসমূহে (ভূমিকা)।

মুজাশে ইবনে ইউসুফ (مجاشع بن يوسف) বলেন, একদা আমি মদীনায় ইমাম মালেকের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি লোকদের বিভিন্ন বিষয়ে ফতোয়া দিচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে ইমাম আবু হানীফার যুবক সাথী মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান উপস্থিত হয়ে তাকে বলেন, সহবাস জনিত কারণে নাপাক ব্যক্তি বাইরে কোথাও পানি পাচ্ছে না। কিন্তু মসজিদের ভিতরে পানি আছে। এমতাবস্থায় সে কি করবে? ইমাম মালেক (র) বলেন, সহবাস জনিত কারণে নাপাক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে না। মুহাম্মাদ (র) বলেন, এদিকে নামাযের ওয়াক্তও হয়ে গেছে এবং সে পানিও দেখতে পাচ্ছে—এখন সে কি করবে? ইমাম সাহেব বরাবর বলতে থাকলেন, না সে মসজিদে প্রবেশ করবে না। কিন্তু যুবক মুহাম্মাদও বরাবর একই প্রশ্ন করতে থাকলে ইমাম সাহেব বলেন, তাহলে তুমিই বলো, সে কি করবে? যুবক বলেন, সে তাইয়াম্মুম করে মসজিদে প্রবেশ করবে, অতঃপর পানি নিয়ে এসে গোসল করবে। মালেক (র) বলেন, তুমি কোথায় থাকো? মুহাম্মাদ (র) বলেন, এখানে (তিনি জমীনের দিকে ইংগিত করলেন)। তিনি বলেন, না তো! মদীনায় এমন কোন লোক নেই যাকে আমি চিনি না। মুহাম্মাদ (র) বলেন, আপনি যাদের চেনেন তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

লোকেরা ইমাম সাহেবকে বললো, ইনি ইমাম আবু হানীফার সাথী মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান কি করে মিথ্যা কথা বলতে পারে? অথচ সে বলেছে যে, সে মদীনার অধিবাসী। লোকেরা বললো, তিনি তো এখানকার অধিবাসী বলে মাটির দিকে ইংগিত করেছেন। ইমাম সাহেব বলেন, ব্যাপারটি আমার কাছে আগেরটির চেয়ে অত্যন্ত দুরুহ মনে হলো (ভূমিকা)।

উল্লেখিত মন্তব্য ও ঘটনা থেকে ইমাম মুহাম্মাদের জ্ঞান-গরিমা ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক প্রকৃতির লোক। একবার খলীফা হারুনুর রশীদের আগমনে উপস্থিত সকলেই দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করে। কিন্তু ইমাম

মুহাম্মাদ পূর্ববৎ বসেই থাকলেন। পরে হারূনুর রশীদ তাকে ডেকে এনে না দাঁড়ানোর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, প্রশাসকের আগমনে আলেম ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান করলে তা জ্ঞানেরই অমর্যাদা করা হয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। আমি তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করেছি (ভূমিকা)।

হারূনুর রশীদ তাকে রিক্কার (الرقة) প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তার নামকরণ করেন الرقيات (আর-রুকিয়াত)। পরে তাকে এ পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন। হারূনুর রশীদ যখন রায় (الرى) এলাকা যান, তখন তার সাথে ইমাম মুহাম্মাদ (র) এবং ইমাম কিসাঈও (الكسائى) ছিলেন। তারা উভয়ে একই দিন ইন্তেকাল করেন। দাফনের কাজ সম্পন্ন করে হারূনুর রশীদ ইমাম মুহাম্মাদ (র) সম্পর্কে মন্তব্য করেন, আজকে আমরা আরবী ভাষা ও ফিক্হ মাটির নিচে দাফন করলাম। ইমাম সাহেব ১৮৯ হিজরীতে (৮০৪ খৃ.) ৫৭ বা ৫৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার রচিত গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

(১) المبسوط যা كتاب الاصل নামে পরিচিত এবং কয়েক খণ্ডে বিভক্ত; (২) الزيادات; (৩) الجامع الصغير; (৪) الجامع الكبير; (৫) السير الصيغر; (৬) السير الكبير (এই ছ'টি গ্রন্থকে একত্রে الظاهـر الروايـة বলা হয়); (৭) المحيط; (৮) النوادر; (৯) الهارونيات।

কাযী মাহমূদ আল-আইনী বলেন, হিদায়া গ্রন্থ মূলত ইমাম মুহাম্মাদের 'আল-জামে আস-সগীর' এবং আবুল হাসানের 'আল-মুখতাসার ফিল-ফিক্হ' (আল-কুদূরী) গ্রন্থের বিস্তারিত রূপ। কথিত আছে, তিনি দৈনিক দশ পারা কুরআন পাঠ করতেন এবং বিশ বছর বয়স থেকে কুফার জামে মসজিদে নিয়মিত ওয়াজ-নসীহত করতেন। তিনি যখন হাদীসের দরস দিতেন, তার বাড়ি লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো। মুহাদ্দিস হাকেম নায়শাপুরী তাকে তাবাউ তাবিঈন (تبع تابعين) বলে উল্লেখ করেছেন।

মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ (র)

ইমাম মুহাম্মাদের আল-মুওয়াত্তা মূলত ইমাম মালেকের (জন্ম ৯৫ হি.) আল-মুওয়াত্তার প্রতিলিপি। ইমাম মালেকের নিকট অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ফিক্হবিদ হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন এবং তারা নিজস্বভাবে এর সংকলনও তৈরি করেন। কিন্তু ইল্‌মী দুনিয়ায় তাদের কারো সংকলনেরই অনুসন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল তার দুই প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া আন্দালুসীর (মৃ. ১৩৪ হি.) সংকলন দু'টিই আজ পর্যন্ত বর্তমান আছে। ইমাম ইয়াহ্ইয়ার সংকলনটিই "মুওয়াত্তা ইমাম মালেক" নামে এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের সংকলনটি "মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ" নামে পরিচিত। "মুওয়াত্তা ইমাম মালেক" বলতেই আমাদের দৃষ্টি যে কিতাবের দিকে চলে যায় তা হচ্ছে

ইয়াহ্ইয়ার এই সংকলন যা কোন কোন মনীষীর মতে اصح الكتب بعد كتاب الله (আল্লাহ্র কিতাবের পর সর্বাধিক সহীহ কিতাব)। দু'টি মুওয়াত্তাকে একই মায়ের দুই জমজ সন্তান বললে অত্যুক্তি হবে না।

নামকরণ

ইমাম মালেক (র) যেসব হাদীস ও আছার (সাহাবা ও তাবিঈদের বাণী) বর্ণনা করেছেন তা একত্রে সন্নিবেশিত করে মদীনার ৭০ জন ফকীহ আলেমের সামনে পেশ করেন। তারা সকলেই এ ব্যাপারে তার সাথে ঐক্যমত ব্যক্ত করেন। তাই তিনি এর নামকরণ করেন মুওয়াত্তা (موطأ)। অর্থাৎ সেই কিতাব যাকে সমতল করা হয়েছে এবং যার পরিশুদ্ধিকরণ করা হয়েছে। হাদীস বিশারদদের পরিভাষায় মুওয়াত্তাকে كتاب السنن বলা উচিৎ। কিন্তু এর মধ্যে যেহেতু সনদযুক্ত ও সনদবিহীন উভয় প্রকারের রিওয়ায়াত রয়েছে তাই শায়েখ ইবনুস সালাহ্ (ابن الصلاح) মুওয়াত্তাকে كتاب الجوامع-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম মালেকের এই পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতেই ইয়াহ্ইয়া আন্দালুসী ও মুহাম্মাদ শায়বানী নিজ নিজ সংকলন প্রস্তুত করেন।

দু'টি সংকলনের মধ্যে পার্থক্য

ইমাম ইয়াহ্ইয়ার সংকলনে প্রতিটি রিওয়ায়াত عن مالك (মালেকের সূত্রে) বলে শুরু হয়েছে। কিন্তু তিনি গোটা মুওয়াত্তা তার কাছে শুনতে পাননি। কারণ তিনি যে বছর তার সাহচর্যে আসেন সেই বছরই ইমাম সাহেব ইন্তেকাল করেন (১৭৯ হি.)। এজন্য তিনি মুওয়াত্তার কতিপয় অনুচ্ছেদ মালেকের অপর ছাত্র যিয়াদের কাছে শুনেন এবং তার বর্ণনা এভাবে শুরু করেছেন حدثنى زياد عن مالك (যিয়াদ আমাকে মালেকের সূত্রে বলেছেন)। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র) পূর্ণ তিন বছর তার সাহচর্য লাভ করেন এবং ইমাম সাহেব তাকে গোটা মুওয়াত্তা পড়ে শুনান। এটা ছিল ইমাম সাহেবের দরবারের একটা ব্যতিক্রম। কারণ ছাত্ররা তাকেই পাঠ করে শুনাতো, কিন্তু মুহাম্মাদের বেলায় তিনি নিজেই পাঠ করে শুনান। তিনি মালেকের কাছে প্রায় সাত শত হাদীস শুনেন।

ইয়াহ্ইয়ার সংকলনে অনেক অনুচ্ছেদে কোন হাদীসের উল্লেখ নেই, শুধু ইমাম মালেকের ইজতিহাদী মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মুহাম্মাদের সংকলনের প্রতিটি অনুচ্ছেদে হাদীস অথবা আছার বিদ্যমান রয়েছে। অনন্তর ইয়াহ্ইয়ার সংকলনে কেবল মালেকের রিওয়ায়াতই স্থান পেয়েছে। কিন্তু মুহাম্মাদের সংকলনে অন্য শায়েখদের রিওয়ায়াতও অন্তর্ভুক্ত আছে। এতে ইখতিলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দলীল আনা হয়েছে এবং এর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইয়াহ্ইয়ার সংকলনে তা নেই। তবে তার সংকলনের চর্চা ব্যাপক এবং বহুল বিস্তারিত।

ইমাম মুহাম্মাদের মুওয়াত্তার বিন্যাস পদ্ধতি

অনুচ্ছেদে (ترجمة الباب) তিনি সর্বপ্রথম ইমাম মালেকের রিওয়ায়াত এনেছেন, অতঃপর وبهذا ناخذ (আমরা এমত গ্রহণ করেছি) বলে উল্লেখিত রিওয়ায়াতের উপর আমল করার কথা বলে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আবার কখনো অতটুকু কথা বলে

দেয়াই যথেষ্ট মনে করেছেন। আর ভিন্নমত পোষণ করার ক্ষেত্রে অপরাপর রাবীর বর্ণিত হাদীস পেশ করে তিনি ইমাম মালেকের রিওয়ায়াতের উপর আমল না করার কারণ বলে দিয়েছেন।

প্রতিটি মাসআলার ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবু হানীফার অভিমত অপরিহার্যরূপে উল্লেখ করেছেন। প্রয়োজনবোধে তার মত উল্লেখ করার পর এও বলে দিয়েছেন যে, والعامة من فقهائنا (আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণেরও এই মত)। এখানে ফুকাহা বলতে ইরাকের ফিক্‌হবিদ এবং العامة। বলতে তাদের অধিকাংশের মতকে বুঝিয়েছেন, আবার কোথাও তিনি কেবল ইবরাহীম নাখাঈর মত উল্লেখ করেছেন, কোথাও ইমাম আবু হানীফার মত নকল করার সাথে সাথে ইমাম মালেক ও অপরাপর ইমামের মতও উল্লেখ করেছেন। তিনি কোথাও আবু হানীফার রায়ের সাথে একমত না হতে পারলে তার কারণও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) এই কিতাবের কোথাও কোথাও هٰذا حسن এবং هٰذا جميل ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা তিনি মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল বুঝাননি, বরং তা যে ওয়াজিব পর্যায়ের আমল নয় তা বুঝিয়েছেন। তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাও হতে পারে বা অ-মুয়াক্কাদাও হতে পারে। আমরা এর অর্থ নিয়েছি 'উত্তম' 'ভালো' ইত্যাদি। অনুরূপভাবে لا بأس বলতে তিনি কোন কাজ করা যে জায়েয তা বুঝিয়েছেন, মাকরূহ বুঝাননি। আমরা এর অর্থ করেছি 'এতে কোন দোষ নেই'। অনন্তর তিনি ينبغى শব্দটি কোন কাজ ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন। আমরা এর অর্থ করেছি 'উচিৎ'। তিনি اثار। শব্দটি মারফূ, মাওকূফ ও মাকতূ সব ধরনের রিওয়ায়াত বুঝানোর জন্য ব্যবহার করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদের মুওয়াত্তায় মোট ১১৮০টি রিওয়ায়াত রয়েছে। এর মধ্যে মারফূ, মাওকূফ প্রায় সব ধরনের বর্ণনাই আছে। এর মধ্যে ইমাম মালেকের ১,০০৫টি এবং অবশিষ্টদের ১৭৫টি রিওয়ায়াত রয়েছে। তিনি ইমাম আবু হানীফার সূত্রে ১৩টি এবং ইমাম আবু ইউসুফের সূত্রে ৪টি রিওয়ায়াত নিয়েছেন। এতে কোন মাওদূ (জাল) হাদীস নেই। এতে যঈফ হাদীস থাকলেও তা ভিন্ন সূত্রে সহীহ প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদের মুওয়াত্তার কয়েকটি শরাহ (ব্যাখ্যা) গ্রন্থও লেখা হয়েছে। যেমন ঃ

১। মুল্লা আলী আল-কারী (মৃ.১০১৪ হি.)-র 'ফাতহুল মুগতিসা বি-শারহিল মুওয়াত্তা'। এর হস্তলিখিত কপি ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে।

২। আল্লামা ইবরাহীম বীরীযাদা (মৃ. ১০৯৯ হি.)-র শরাহ বিরাট দুই খণ্ডে বিভক্ত। এর কপি ইস্তাম্বুলের পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে।

৩। মাওলানা আবদুল হাই লাখনবী (মৃ. ১৩০৪ হি.)-র শরাহ 'আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ'। এর কয়েক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

৪। হাফেজ কাসিম ইবনে কুতলুবুগা (মৃ. ৮৭৯ হি.) মুওয়াত্তার রাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

অনুবাদক

অধ্যায় ঃ ১

أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ

(পবিত্রতা)

পবিত্রতাঃ–

পবিত্রতাঃ–

১. অনুচ্ছেদ ঃ উযুর প্রারম্ভ।

١- عَنْ يَحْيٰى أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ أَبَا حَسَنٍ يَسْئَلُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُرِيَنِيْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتّٰى ذَهَبَ بِهِمَا إِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ مِنْهُ بَدَأَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১। ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার দাদা আবু হাসানের কাছে শুনেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে উযু করতেন তা কি আপনি আমাকে দেখাতে পারেন? আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, হাঁ। তিনি উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন, অতঃপর তার দুই হাতে পানি ঢেলে তা দুইবার করে (কব্জি পর্যন্ত) ধুইলেন, অতঃপর কুল্লি করলেন, অতঃপর তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন, অতঃপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দুইবার করে ধুইলেন, অতঃপর মাথার সামনের দিক থেকে মাসেহ শুরু করে উভয় হাত মাথার পিছন দিকে নিয়ে গেলেন এবং পুনরায় তা মাসেহ আরম্ভ করার স্থানে ঘুরিয়ে আনেন, অতঃপর উভয় পা (গোছা পর্যন্ত) ধুইলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উযুর অংগগুলো তিনবার করে ধোয়া সর্বোত্তম, দুইবার করে ধোয়াও জায়েয। আর একবার করে উত্তমরূপে ধুয়ে নেযাও যথেষ্ট। ইমাম আবু হানীফা (র)-এরও এই মত।

٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلِ الْمَاءَ فِىْ اَنْفِهِ ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ .

২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমাদের কেউ যখন উযু করে, সে যেন তার নাকে পানি প্রবেশ করিয়ে তা পরিষ্কার করে (নাক ঝেড়ে নেয়)।

٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ .

৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি উযু করে সে যেন নাক পরিষ্কার করে। আর যে ব্যক্তি (পায়খানার পর) ঢিলা দিয়ে শৌচ করে সে যেন বেজোড় সংখ্যায় তা ব্যবহার করে।[১]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস গ্রহণ করেছি। যে ব্যক্তি উযু করে, তার কুলি করা এবং নাকে পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করে নেয়া উচিৎ। 'ইসতিজমার' শব্দের অর্থ 'ইস্তিনজা' (পায়খানা-পেশাবের পর পরিচ্ছন্নতা অর্জন)। ইমাম আবু হানীফা (র) -এর এই মত।

٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الصَّلٰوةِ فَهُوَ فِىْ صَلٰوةٍ مَّا كَانَ يَعْمَدُ وَاَنَّهُ تُكْتَبُ لَهُ بِاِحْدٰى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ وَّتُمْحٰى عَنْهُ بِالْاُخْرٰى سَيِّئَةٌ فَاِنْ سَمِعَ اَحَدُكُمُ الْاِقَامَةَ فَلَا يَسْعٰى فَاِنَّ اَعْظَمَكُمْ اَجْرًا اَبْعَدُكُمْ دَارًا قَالُوْا لِمَا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مِنْ اَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطٰى .

৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়, অতঃপর সে যতোক্ষণ নামাযের সংকল্প রাখে ততোক্ষণ নামাযের মধ্যেই থাকে। তার একটি কদমের পরিবর্তে একটি করে নেকী লেখা হয় এবং অপর কদমের পরিবর্তে একটি করে গুনাহ মাফ করা হয়। অতএব তোমাদের কেউ নামাযের ইকামত শুনে যেন দৌড়ে না যায়, বরং শান্তভাবে হেঁটে যায়। কেননা যার ঘর সবচেয়ে বেশী দূরে তাকে সবচেয়ে বেশী সওয়াব দেয়া হয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কেন, হে আবু হুরায়রা? তিনি বলেন, অধিক সংখ্যক পদক্ষেপের কারণে।

---

১. উযুর মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া সুন্নাত। পায়খানা থেকে পরিষ্কার হওয়ার জন্য ঢিলা এবং পানি উভয়টি ব্যবহার করা সর্বোত্তম। তবে এর যে কোন একটি দিয়ে শৌচ করা যেতে পারে। তিনটি ঢিলা ব্যবহার করাই উত্তম। তবে প্রয়োজনবোধে বেশী সংখ্যকও ব্যবহার করা যেতে পারে (অনুবাদক)।

২. অনুচ্ছেদ ঃ উযুর সময় দুই হাত ধোয়া।

٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُــوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهَا فِىْ وَضُوْئِهِ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে যেন উযুর পানির পাত্রে তার হাত ঢুকানোর পূর্বে তা ধুয়ে নেয়। কেননা তার জানা নাই, ঘুমের ঘোরে তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ঘুম থেকে উঠে পানির পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে তা ধুয়ে নেয়া উত্তম। তবে এটা ওয়াজিব নয় যে, কোন ব্যক্তি তা লংঘন করলে গুনাহগার হবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর এই মত।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ পানি দিয়ে শৌচ (ইসতিনজা) করা।

٦- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءً لِّمَا تَحْتَ اِزَارِهِ .

৬। উছমান ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে অবহিত করেন যে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে শুনেছেন যে, তিনি (পায়খানার পর) পানি দিয়ে শৌচ করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। অন্য কোন জিনিস দিয়ে শৌচ করার তুলনায় পানি দিয়ে শৌচ করা অধিক শ্রেয়। আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

৪. অনুচ্ছেদঃ লজ্জাস্থান (লিংগ) স্পর্শ করলে উযু করা প্রসঙ্গে।

٧- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ اُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلٰى سَعْدٍ فَاحْتَكَكْتُ فَقَالَ لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ قُمْ فَتَوَضَّأْ قَالَ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ .

৭। মুসআব ইবনে সাদ (র) বলেন, আমি (আমার পিতা) সাদ (রা)-র জন্য কুরআন শরীফ তুলছিলাম। আমি আমার দেহ চুলকালাম। পিতা বললেন, খুব সম্ভব তুমি তোমার লিংগ স্পর্শ করেছো। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, উঠো এবং উযু করে এসো। অতএব আমি উঠে গিয়ে উযু করলাম।

٨- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ لَهُ اَمَا يُجْزِئُكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوْءِ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّىْ اَحْيَانًا اَمَسُّ ذَكَرِىْ فَاَتَوَضَّأُ .

৮। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমার) গোসল করার পর উযু করতেন। সালেম (র) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, উযুর জন্য কি আপনার গোসল যথেষ্ট নয়? তিনি বলেন, হাঁ, যথেষ্ট। কিন্তু আমি কখনো কখনো নিজের লিংগ স্পর্শ করি, তাই উযু করে নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, লিংগ স্পর্শ করলে পুনরায় উযু করার প্রয়োজন নেই। ইমাম আবু হানীফা (র)-এরও এই মত। এর সমর্থনে বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে।

٩- عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً سَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ اَيَتَوَضَّأُ قَالَ هَلْ هُوَ اِلاَّ بَضْعَةٌ مِّنْ جَسَدِكَ .

৯। কায়েস ইবনে তলক (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এক লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, সে নিজের লিংগ স্পর্শ করেছে, এতে তাকে (পুনর্বার) উযু করতে হবে কি? তিনি বলেন ঃ এটা তোমার দেহের একটি মাংসপিণ্ড মাত্র।

١٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِيْ مَسِّ الذَّكَرِ وَاَنْتَ فِي الصَّلٰوةِ قَالَ مَا اُبَالِيْ مَسِسْتُهُ اَوْ مَسِسْتُ اَنْفِيْ .

১০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নামাযরত অবস্থায় লিংগ স্পর্শ করলে উযু যাবে কিনা এ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি আমার লিংগে অথবা নাকে হাত লাগানোকে দূষণীয় কিছু মনে করি না।

١١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ فِيْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوْءٌ .

১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লজ্জাস্থান স্পর্শ করাতে উযু করতে হবে না।

١٢- اَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ اَبِيْ ذُبَابٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ لَيْسَ فِيْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوْءٌ .

১২। হারিস ইবনে আবু যুবাব(র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছেন, লজ্জাস্থান স্পর্শ করাতে উযু নেই (উযু নষ্টও হয় না বা পুনরায় উযু করতেও হয় না)।

١٣- اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَوَّامِ الْبَصْرِىُّ قَالَ سَئَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ رَجُلٌ مَسَّ فَرْجَهُ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُوْلُ اِنْ كُنْتَ تَسْتَنْجِسَهُ فَاقْطَعْهُ قَالَ عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ هٰذَا وَاللّٰهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ .

১৩। আবুল আওয়াম আল-বসরী (র) বলেন, এক ব্যক্তি আতা ইবনে আবু রবাহ (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু মুহাম্মাদ! এক ব্যক্তি উযু করার পর নিজের লিংগ স্পর্শ করলো (তার হুকুম কি)? উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, তুমি যদি এটাকে এতোই নাপাক মনে করো তবে তা কেটে ফেলে দাও। আতা ইবনে আবু রবাহ (র) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এটা ইবনে আব্বাসেরই কথা।

١٤-عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فِىْ مَسِّ الذَّكَرِ قَالَ مَا اُبَالِىْ مَسِسْتُهُ اَوْ طَرَفَ اَنْفِىْ.

১৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি লজ্জাস্থান স্পর্শ করা সম্পর্কে বলেন, আমি পুরুষাংগ অথবা নাক স্পর্শ করার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখছি না।

١٥- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ اِنْ كَانَ نَجَسًا فَاقْطَعْهُ .

১৫। ইবরাহীম নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, পুরুষাংগ স্পর্শ করলে উযু নষ্ট হয় কিনা? তিনি বলেন, যদি এটা নাপাক জিনিস হয়ে থাকে তবে তা কেটে ফেলে দাও।

١٦-عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ فِىْ مَسِّ الذَّكَرِ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِّنْكَ.

১৬। ইবরাহীম নাখঈ (র) নামাযরত অবস্থায় লিংগ স্পর্শ করা সম্পর্কে বলেন, এটা তোমার (দেহের) একটা টুকরা মাত্র।

١٧- عَنْ اَرْقَمَ بْنِ شُرَحْبِيْلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِنِّىْ اَحُكُّ جَسَدِىْ وَاَنَا فِى الصَّلٰوةِ فَاَمُسُّ ذَكَرِىْ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِّنْكَ .

১৭। আরকাম ইবনে শুরাহ্বীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বললাম, আমি নামাযরত অবস্থায় শরীর চুলকাতে চুলকাতে লিংগ স্পর্শ করে ফেলি। তিনি বলেন, এটা তোমার দেহের একটি টুকরা মাত্র।

١٨ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَئَلْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ عَنِ الرَّجُلِ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ كَمَسٍّ رَأْسِهِ .

১৮। আল-বারাআ ইবনে কায়েস (র) বলেন, আমি হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-কে কোন ব্যক্তির নিজ লিংগ স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তার লিংগে হাত লাগানো আর তার মাথায় হাত লাগানোর মধ্যে পার্থক্য নেই।

١٩ - عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ النَّخْعِيِّ قَالَ كُنْتُ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَذُكِرَ مَسُّ الذَّكَرِ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِّنْكَ وَاِنَّ لِكَفِّكَ لَمَوْضِعًا غَيْرَهُ .

১৯। উমায়ের ইবনে সাদ (র) বলেন, আমি এক মজলিসে ছিলাম। সেখানে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা সম্পর্কে কথা উঠলো। আম্মার (রা) বলেন, এটা তোমার দেহেরই একটি অংশ আর তোমার হাত তোমার সব জায়গাই স্পর্শ করে থাকে (অর্থাৎ যৌনাংগ স্পর্শ করলে উযু নষ্ট হবে না)।

٢٠ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فِىْ مَسِّ الذَّكَرِ مِثْلُ اَنْفِكَ .

২০। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, লিংগ স্পর্শ করা তোমার নাক স্পর্শ করারই অনুরূপ।

٢١ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ مَا اُبَالِيْ اِيَّاهُ مَسِسْتُ ذَكَرِىْ اَوْ اَنْفِىْ اَوْ اُذُنِىْ .

২১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, আমি আমার যৌনাংগ বা নাক বা কান স্পর্শ করার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখছি না।

٢٢ - عَنْ قَيْسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنِّىْ مَسِسْتُ ذَكَرِىْ وَاَنَا فِى الصَّلٰوةِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَفَلاَ قَطَعْتَهُ ثُمَّ قَالَ وَهَلْ ذَكَرُكَ اِلاَّ كَسَائِرِ جَسَدِكَ .

২২। কায়েস (র) বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, আমি নামাযের মধ্যে আমার লিংগ স্পর্শ করি। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তুমি তা কেটে ফেলে দিচ্ছো না কেন? অতঃপর তিনি বলেন, তোমার লজ্জাস্থান তোমার দেহের অন্যান্য অংশেরই অনুরূপ।

٢٣ - عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ اَيَحِلُّ لِىْ اَنْ اَمُسَّ ذَكَرِىْ وَاَنَا فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ اِنْ عَلِمْتَ اَنَّ مِنْكَ بَضْعَةً نَجِسَةً فَاقْطَعْهَا .

২৩। কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) বলেন, এক ব্যক্তি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, নামাযের মধ্যে আমার পুরুষাংগ স্পর্শ করা কি আমার জন্য

হালাল? তিনি বলেন, তুমি যদি এটাকে নিজের দেহের নাপাক অংগ মনে করো তবে তা কেটে ফেলে দাও।

٢٤- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِّنْكَ .

২৪। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে যৌনাংগ স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, এটা তোমার দেহের একটি অংশমাত্র।[২]

৫. অনুচ্ছেদ ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু নষ্ট হয় কিনা।

٢٥- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-কে গোশত খেতে দেখেছি, অতঃপর তিনি নামায পড়েছেন, কিন্তু উযু করেননি।

٢٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ جَنْبَ شَاةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২৬। ইবনে আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বকরীর পাঁজরের গোশত খেলেন, অতঃপর নামায পড়লেন, কিন্তু (নতুন করে) উযু করেননি।

٢٧-عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ تَعَشّٰى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২৭। রবীআ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার (রা)-র সাথে রাতের আহার করলেন, অতঃপর নামায পড়লেন, কিন্তু (নতুন করে) উযু-করেননি।

٢٨- عَنْ اَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اَكَلَ لَحْمًا وَّخُبْزًا فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَهُمَا بِوَجْهِهِ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২৮। আবান ইবনে উছমান (র) বলেন, উছমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) গোশত এবং রুটি খেলেন, অতঃপর কুল্লি করলেন, উভয় হাত ধুইলেন, অতঃপর উভয় হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন, অতঃপর নামায পড়লেন, কিন্তু (পুনরায়) উযু করেননি।

---

২. ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী ও অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের মতে যৌনাংগ স্পর্শ করলে উযু নষ্ট হয় না। কিন্তু ইমাম শাফিঈ ও আহমাদের মতে যৌনাংগ স্পর্শ করলে উযু নষ্ট হয়। তারা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র হাদীস নিজেদের মতের স্বপক্ষে গ্রহণ করেছেন। হানাফীদের মতে হাদীসটি মানসূখ অথবা মুস্তাহাব পর্যায়ের নির্দেশ জ্ঞাপক (অনুবাদক)।

٢٩ – اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَئَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ الْعَدَوِىَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصِيْبُ الطَّعَامَ قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ اَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ قَدْ رَاَيْتُ اَبِىْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثُمَّ لَمْ يَتَوَضَّأْ .

২৯। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীআ আল-আদাবী (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ব্যক্তি উযু করার পর আগুনে পাকানো খাবার গ্রহণ করলো, তাকে কি পুনর্বার উযু করতে হবে? তিনি বলেন, আমি দেখেছি, আমার পিতা (আমের ইবনে রবীআ) আগুনে পাকানো খাবার খেয়েছেন, কিন্তু অতঃপর উযু করেননি।

٣٠ – عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلٰى بَنِىْ حَارِثَةَ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ نُعْمَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالصَّهْبَاءِ وَهِىَ اَدْنٰى خَيْبَرَ صَلُّوا الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلَّا بِالسَّوِيْقِ فَاَمَرَ بِهٖ فَثُرِّىَ لَهُمْ بِالْمَاءِ فَاَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩০। বনূ হারিছার মুক্তদাস বুশাইর ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। সুয়াইদ ইবনে নুমান (রা) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি খায়বারের যুদ্ধের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে (খায়বার অভিযানে) বের হন। তারা খায়বারের নিকটবর্তী এলাকা আস-সাহবায় পৌছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে আসরের নামায পড়েন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবার চাইলেন। তাঁর সামনে ছাতু (ভাজা ছোলা, যব প্রভৃতির গুঁড়া) পেশ করা হলো। তিনি তা পানিতে গোলানোর নির্দেশ দিলেন এবং তাই করা হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খেলেন এবং আমরাও খেলাম। অতঃপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য উঠে কুল্লি করলেন এবং আমরাও কুল্লি করলাম। অতঃপর তিনি নামায পড়েন কিন্তু উযু করেননি।[৩]

---

৩. একদল আলেমের মতে আগুনে পাকানো খাবার খেলে উযু নষ্ট হয়ে যায় এবং পুনরায় উযু করতে হয়। যেসব হাদীসে এ ধরনের খাবার গ্রহণ করলে উযু করার নির্দেশ রয়েছে, তারা নিজেদের মতের স্বপক্ষে তা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সর্বাধিক সংখ্যক ফিক্হবিদের মতে আগুনে পাকানো খাবার খেলে উযু নষ্ট হয় না বা পুনর্বার উযু করার প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ জীবনের কর্মপন্থা এবং খোলাফায়ে রাশেদুনের কর্মপন্থা তাই প্রমাণ করে। উযুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত হাদীসের জওয়াবে শেষোক্ত মতের ফিক্হবিদগণ বলেন, এগুলোর নির্দেশ মুস্তাহাব পর্যায়ের অথবা এসব হাদীসে 'উযু' শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ হাত-মুখ ধোয়া ও মুখের অভ্যন্তরভাগ

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মতই গ্রহণ করেছি যে, আগুনে পাকানো খাবার খেলে (নতুন করে) উযু করার প্রয়োজন নেই (তাতে উযু নষ্ট হয় না), বরং নাপাকির কারণে উযুর প্রয়োজন হয়। আর যে কোন প্রকারের খাদ্য, তা আগুন স্পর্শ করুক বা না করুক তা গ্রহণ করলে পুনরায় উযু করতে হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-এরও এই মত।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের একই পাত্রের পানি দিয়ে উযু করা।

٣١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُوْنَ جَمِيْعًا فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৩১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে পুরুষলোক ও স্ত্রীলোক সকলে একই পাত্রের পানি দিয়ে উযু করতো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, নারী-পুরুষের একই পাত্রের পানি দিয়ে উযু-গোসল করায় কোন দোষ নেই। পাত্রে পুরুষ আগে হাত ঢুকাক অথবা স্ত্রীলোক, এতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ নাক দিয়ে রক্ত বের হলে উযু করা।

٣٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا رَعُفَ رَجَعَ فَيَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنٰى عَلٰى مَا صَلّٰى .

৩২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নামাযরত অবস্থায় যদি তার নাক দিয়ে রক্ত বের হতো, তবে তিনি উযু করার জন্য চলে যেতেন, কোন কথা বলতেন না, অতঃপর ফিরে এসে অবশিষ্ট নামায শেষ করতেন।[৪]

পরিষ্কার করা। তাদের মতে এখানে শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। যেমন এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধ পান করে কুলি করেছেন এবং বলেছেন ঃ هذا وضوء مما مست النار (এটাই হলো আগুনে পাকানো জিনিস আহার করার পরের উযু)। এ ছাড়াও তাদের মতের সমর্থনে অনেক মারফূ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে (অনুবাদক)।

৪. নামাযের মধ্যে উযু ছুটে গেলে নামায থেকে বের হয়ে গিয়ে উযু করতে হবে। অতঃপর ইচ্ছা করলে গোটা নামাযই পুনরায় পড়া যায় অথবা ইচ্ছা করলে অবশিষ্ট নামাযও পড়া যায়। কিন্তু মাঝখানে কথা বললে গোটা নামাযই পুনর্বার পড়তে হবে। কেননা কথা নামাযকে নষ্ট করে দেয় (অনুবাদক)।

٣٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ اَنَّهُ رَاٰى سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعُفَ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَاَتٰى حُجْرَةَ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ فَاُتِىَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنٰى عَلٰى مَا قَدْ صَلّٰى .

৩৩। ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুসাইত (র) দেখলেন, নামাযরত অবস্থায় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। অতএব তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা)-র ঘরে আসলেন। তাকে উযুর পানি দেয়া হলো। তিনি উযু করলেন, অতঃপর ফিরে গিয়ে অবশিষ্ট নামায সমাপ্ত করলেন।

٣٤- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِىْ يَرْعَفُ فَيَكْثُرُ عَلَيْهِ الدَّمُ كَيْفَ يُصَلِّىْ قَالَ يُوْمِىْ بِرَاْسِهٖ اِيْمَاءً فِى الصَّلٰوةِ .

৩৪। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, যার নাক দিয়ে অধিক পরিমাণে রক্ত ঝরে সে কিভাবে নামায পড়বে? তিনি বলেন, সে মাথার ইশারায় নামায পড়বে।[৫]

৮. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ-সিজদায় মাথা নিচু করলে নাক দিয়ে রক্ত বের হলে ইশারায় রুকূ-সিজদা করবে।

٣٥- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُجَبَّرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ رَاٰى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يُدْخِلُ اِصْبَعَهُ فِىْ اَنْفِهٖ اَوْ اِصْبَعَيْهِ ثُمَّ يُخْرِجُهَا وَفِيْهَا شَيْئٌ مِّنْ دَمٍ فَيَفْتِلُهُ ثُمَّ يُصَلِّىْ وَلَا يَتَوَضَّاُ .

৩৫। আবদুর রহমান ইবনুল মুজাব্বার (র) দেখলেন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) তার নাকের মধ্যে তার একটি বা দু'টি আংগুল ঢুকালেন এবং তা বের করলে তাতে নাকের ভিতরে শুকিয়ে থাকা রক্ত দেখা গেলো। তিনি তা পরিষ্কার করলেন, কিন্তু উযু করলেন না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উপরে উল্লেখিত আছারসমূহের উপরই আমরা আমল করি। কিন্তু ইমাম মালেক (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, নামাযের মধ্যে কারো নাক দিয়ে রক্ত ঝরলে তাকে গোটা নামাযই পুনর্বার পড়তে হবে এবং রক্ত ধুয়ে ফেলতে হবে (অর্থাৎ তার মতে এক্ষেত্রে পুনরায় উযু করার প্রয়োজন নেই)। ইমাম আবু হানীফা (র)

---

৫. রুকূ-সিজদায় মাথা নিচু করাতে নাক দিয়ে রক্ত বের হলে ইশারায় রুকূ-সিজদা করতে হবে (অনুবাদক)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের কর্মপন্থা ও বক্তব্য থেকে দলীল গ্রহণ করে বলেন, যার নাক দিয়ে রক্ত বের হয়েছে, সে যদি কথা না বলে থাকে তবে উযু করে অবশিষ্ট নামায পড়বে। আমাদের (মুহাম্মাদ) বক্তব্যও তাই। কিন্তু নামাযের মধ্যে যার নাক দিয়ে অত্যধিক পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয় এবং তা যদি সিজদায় মাথা নত করার কারণে হয়ে থাকে, তবে সে ইশারায় নামায পড়বে। কিন্তু সব সময়ই যদি নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ হয় তবে সে সিজদা করবে (ইশারায় নামায পড়বে না)। কিন্তু কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় নিজের নাকের মধ্যে আংগুল ঢুকালে এবং তাতে রক্ত লেগে গেলে, এজন্য তাকে পুনরায় উযু করতে হবে না। কেননা এটা প্রবাহিত রক্তও নয় এবং তা ফোঁটায় ফোঁটায়ও ঝরছে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে কেবল রক্ত প্রবাহিত হলে বা ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরলেই উযু করতে হবে।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুর পেশাব ধুয়ে ফেলা প্রয়োজন।

٣٦- عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا جَائَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَوَضَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৩৬। মিহসান-কন্যা উম্মে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার একটি শিশু পুত্রসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলেন। সে তখনো শক্ত খাবার ধরেনি। নবী ﷺ তাকে নিজের কোলে নিলেন। সে তার পরনের কাপড়ে পেশাব করে দিলো। তিনি পানি নিয়ে ডাকলেন, অতঃপর কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দিলেন, কিন্তু তা ধুইলেন না।[৬]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ছেলে শিশু শক্ত খাবার খেতে অভ্যস্ত না হয়ে থাকলে তার পেশাব ধোয়ার ব্যাপারে বিধানের শিথিলতা আছে। আর শিশু কন্যা সন্তান হলে তার পেশাব ধোয়ার নির্দেশ রয়েছে। আমাদের মতে উভয়ের পেশাব ধুয়ে পরিষ্কার করাই উত্তম। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্যও তাই।

---

৬. উল্লেখিত হাদীসে 'নাদাহ' এসেছে, যার অর্থ 'পানি ছিটানো'ও হতে পারে এবং 'ধুয়ে ফেলা'ও হতে পারে। ইমাম শাফিঈ ও অপরাপর ইমামগণ প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ পানি ছিটিয়ে দিলেই কাপড় পাক হয়ে যাবে। কিন্তু আবু হানীফা (র) দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কেবল পানি ছিটিয়ে দিলেই কাপড় পাক হবে না, বরং তা ধুয়ে নিতে হবে। যেমন তিরমিযীর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ 'ফানদাহ' ওয়া তাওয়াদ্দা'-এর অর্থ ধুয়ে ফেলা এবং এ সম্পর্কে ঐক্যমত রয়েছে। আর ওয়ালাম'ইয়াগসিলহু'-এর অর্থ তিনি অত্যধিক পরিমাণে ধৌত করেননি। দুগ্ধপোষ্য শিশুর বেলায়ই এ মতবিরোধ। কিন্তু শিশু যখন শক্ত খাবার ধরবে তখন সব আলেমের মতেই কাপড় ধুয়ে নিতে হবে, শুধু পানি ছিটিয়ে দিলে তা পাক হবে না (অনুবাদক)।

٣٧- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ .

৩৭। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে একটি ছেলে শিশু আনা হলো। সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেয়। তিনি পানি নিয়ে ডাকলেন এবং তা কাপড়ে প্রবাহিত করে দিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। কাপড় ধোয়ার জন্য তাতে পানি ঢেলে দিতে হবে, যাতে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্যও তাই।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ বীর্যরস বের হলে উযু নষ্ট হয়ে যায়।

٣٨- عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْئَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَى مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ مَاذَا عَلَيْهِ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْئَلَهُ فَقَالَ الْمِقْدَادُ فَسَئَلْتُهُ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

৩৮। আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নির্দেশ দিলেন যে তার স্ত্রীর কাছে আসলে তার বীর্যরস নির্গত হয়। এ অবস্থায় তাকে কি করতে হবে? (আলী (রা) বলেন), যেহেতু তাঁর কন্যা (ফাতিমা) আমার স্ত্রী, তাই এ ব্যাপারে তাঁর কাছে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে আমি লজ্জাবোধ করি। মিকদাদ (রা) বলেন, আমি তাঁর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কারো এরূপ হলে সে যেন তার লজ্জাস্থান ধোয় এবং নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে।

٣٩- أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنِّي لَأَجِدُهُ يَتَحَدَّرُ مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ .

৩৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, স্ফটিক বা মুক্তার দানার মতো আমার যৌনাংগ দিয়ে বির্যরস নির্গত হয়। তোমাদের কারো এভাবে বির্যরস নির্গত হলে সে যেন তার লজ্জাস্থান ধোয় এবং নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের এবং ইমাম আবু হানীফার এই মত যে, বীর্যরস লেগে যাওয়া স্থান ধুয়ে নিবে এবং নামাযের উযুর ন্যায় উযু করবে।

٤٠- اَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ زُبَيْدٍ (زَيْدٍ) اَنَّهُ سَئَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْبَلَلِ يَجِدُهُ فَقَالَ انْضَحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ وَالْهَ عَنْهُ .

৪০। আস-সাল্‌ত ইবনে যুবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কাপড়ে ভিজা (বীর্যরস) অনুভব করেন। তিনি বলেন, তোমার কাপড়ের ঐ অংশ পানি দিয়ে ধুয়ে নাও এবং এর প্রতি আর ভ্রুক্ষেপ করো না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। যখন অধিকাংশ সময় মানুষের এই অবস্থা হয় এবং শয়তান বারবার সন্দেহ সৃষ্টি করে তখন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করাই উচিৎ নয়। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতও তাই।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ যে পানিতে হিংস্র জন্তু মুখ দেয় ও পান করে তাতে উযু করা।

٤١- عَنْ يَحْيَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِيْ رَكْبٍ فِيْهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتّٰى وَرَدُوْا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ اِذًا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لاَ تُخْبِرْنَا فَاِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا .

৪১। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হাতিব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একদল সওয়ারীর সাথে ছিলেন। তাদের সাথে আমর ইবনুল আস (রা)-ও ছিলেন। পথিমধ্যে তারা একটি পানির কূপে গিয়ে উপনীত হন। আমর ইবনুল আস (রা) জিজ্ঞেস করেন, হে কূপের মালিক! তোমার কূপে কখনো কি হিংস্র জন্তু পানি পান করতে আসে? উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, হে কূপের মালিক! এ সম্পর্কে তুমি আমাদের অবহিত করো না। কেননা কখনো আমরা হিংস্র জন্তুর আগে পান করতে আসি, আবার কখনো হিংস্র জন্তু আমাদের আগে আসে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, পানির কূপ যদি এতো বড় হয় যে, তার একদিকের পানি নাড়া দিলে অন্য প্রান্তের পানি নড়ে না, তবে তা থেকে হিংস্র জন্তু পানি পান করলে অথবা তাতে নাপাক জিনিস পতিত হলে পানি নষ্ট হয় না। কিন্তু পানির ঘ্রাণ ও স্বাদ বিকৃত হয়ে গেলে তা নষ্ট পানি হিসাবে গণ্য হবে। যদি কূপ এতোটা ছোট হয় যে, তার এক প্রান্তের পানি নাড়া দিলে অপর প্রান্তের পানিও নড়ে উঠে, তবে তাতে হিংস্র জন্তু মুখ ডুবালে বা নাপাক পতিত হলে এর পানি নষ্ট বলে গণ্য হবে এবং তা দিয়ে উযু করবে না। এজন্যই হযরত উমার (রা) পানির মালিকের তথ্য পরিবেশন করা অপছন্দ করেছেন এবং তাকে তা বলতে নিষেধ করেছেন (যেন অযথা সংশয় সৃষ্টি হওয়া থেকে বাঁচা যায়)। ইমাম আবু হানীফা (র)-এরও এই মত।[৭]

---

৭. কোন কোন অবস্থায় পানি নাপাক হয়ে যায় তা নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেকের মতে পানি নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে পরিমাণে কমবেশী ধর্তব্য নয়। পানির পরিমাণ বেশী

১২. অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু করা।

٤٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَاهُ الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الطُّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحَلَالُ مَيْتَتُهُ .

৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলো, আমরা সমুদ্র ভ্রমণে গিয়ে থাকি এবং আমাদের সাথে সামান্য পানি থাকে। যদি আমরা তা দিয়ে উযু করি তবে আমাদের পান করার মতো পানি অবশিষ্ট থাকে না। এ অবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সমুদ্রের পানি পাক এবং এর মৃত জীব হালাল।[৮]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এই হাদীসের উপরই আমাদের আমল। সমুদ্রের পানিও অন্যান্য উৎসের পানির ন্যায় পাক। ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ আমাদের সকল আলেমের এটাই সাধারণত মত।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মোজার উপর মাসেহ করা।

٤٣- عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ وُلْدِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ قَالَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيْقِ كُمَّيْ جُبَّتِهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ قَدْ صَلَّى بِهِمْ سَجْدَةً

হোক অথবা কম হোক, যতোক্ষণ তার বৈশিষ্ট্য (রং, গন্ধ, স্বাদ) পরিবর্তিত না হবে ততোক্ষণ তাতে নাপাক জিনিস পড়লেও পানি নাপাক গণ্য হবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফিঈর মতে অল্প পানিতে নাপাক জিনিস পড়লে তা নাপক গণ্য হবে, কিন্তু বেশী পানি নাপাক হবে না। ইমাম শাফিঈর মতে আড়াই মশক পানি পর্যাপ্ত পানিরূপে গণ্য এবং ইমাম আবু হানীফার মতে এমন পরিমাণ পানি পর্যাপ্ত পানি হিসাবে গণ্য, যার এক প্রান্তে নাড়া দিলে অপর প্রান্তে কম্পন সৃষ্টি হয় না (অনুবাদক)।

৮. প্রশ্নকারী যদিও কেবল সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সমুদ্রের প্রাণী সম্পর্কেও হুকুম বলে দিয়েছেন যে, সামুদ্রিক প্রাণী জীবিত হোক অথবা মৃত তা খাওয়া হালাল। কেননা সমুদ্র ভ্রমণে যেভাবে পানির অভাব দেখা দিতে পারে, অনুরূপভাবে খাদ্যদ্রব্যের‌ও অভাব দেখা দিতে পারে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা "কোরবানী, শিকার ও আকীকা" অধ্যায়ের ৪ নং টীকায় দেখুন (অনুবাদক)।

فَصَلَّى مَعَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِى بَقِيَتْ فَفَزِعَ النَّاسُ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ قَدْ اَحْسَنْتُمْ .

৪৩। আব্বাদ ইবনে যিয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত।[৯] নবী ﷺ তাবুক যুদ্ধের সময় প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইরে গেলেন। আমি পানি নিয়ে তাঁর সাথে গেলাম। নবী ﷺ পায়খানা সেরে ফিরে এলে আমি (তাঁর হাতে) পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন। অতঃপর তিনি জোব্বার হাতার ভিতর থেকে তাঁর হাত বের করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তা সরু হওয়ায় তিনি হাত বের করতে পারলেন না। অতঃপর জোব্বার নিচে দিয়ে হাত বের করে তা ধুইলেন, অতঃপর মাথা মাসেহ করলেন, অতঃপর উভয় পায়ের মোজার উপর মাসেহ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফিরে এলেন তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি এক রাক্‌আত পড়িয়ে শেষ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাদের সাথে নামায পড়লেন, অতঃপর (সালাম ফিরানোর পর উঠে) অবশিষ্ট রাক্‌আত পড়লেন। লোকেরা তাঁকে দেখে ঘাবড়ে গেলো। তিনি বলেন ঃ তোমরা উত্তম কাজ করেছো।

٤٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رُقَيْشٍ اَنَّهُ قَالَ رَاَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَتٰى قُبَاءَ فَبَالَ ثُمَّ اُتِىَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ صَلّٰى .

৪৪। সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে রুকাইশ (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি কুবা পল্লীতে এলেন এবং পেশাব করলেন। তার জন্য পানি নিয়ে আসা হলে তিনি উযু করেন। তিনি নিজের মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুইলেন, মাথা মাসেহ করলেন এবং উভয় পায়ের মোজার উপর মাসেহ করলেন, অতঃপর নামায পড়েন।

٤٥- حَدَّثَنَا نَافِعٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوْفَةَ عَلٰى سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَهُوَ اَمِيْرُهَا فَرَاٰهُ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ سَلْ اَبَاكَ اِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ فَنَسِىَ عَبْدُ اللهِ اَنْ يَّسْئَلَهُ حَتّٰى قَدِمَ سَعْدٌ فَقَالَ اَسْئَلْتَ اَبَاكَ فَقَالَ لاَ فَسْئَلَهُ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ اِذَا دَخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِى الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طٰهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ وَاِنْ جَاءَ اَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ قَالَ وَاِنْ جَاءَ اَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ .

---

৯. এখানে বর্ণনাকারীর ভুল হয়ে গেছে। আব্বাদ ইবনে যিয়াদ মুগীরা ইবনে শোবার মুক্তদাস, সন্তান নন এবং তিনি মুগীরা ইবনে শোবার সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করেছেন, সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নয় (অনুবাদক)।

৪৫। নাফে ও আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) কুফায় সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র কাছে আসলেন। তিনি তখন কুফার গভর্ণর ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করতে দেখলেন এবং তিনি তার এ কাজে আপত্তি করলেন। সাদ (রা) তাকে বলেন, তুমি যখন তোমার পিতার কাছে ফিরে যাবে তখন তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ফিরে এসে তার পিতার কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলেন। ইতিমধ্যে সা'দ (রা) মদীনায় আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলে? তিনি বলেন, না। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) তার পিতাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি উযু অবস্থায় তোমার পদদ্বয় মোজার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে থাকলে তুমি এর উপর মাসেহ করবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যদি আমাদের কেউ পায়খানা-পেশাব করে এসে থাকে? তিনি বলেন, হাঁ, তোমাদের কেউ পায়খানা সেরে এসে থাকলেও (মোজার উপর মাসেহ করতে পারে)।

٤٦- اَخْبَرَنِى نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَالَ بِالسُّوْقِ ثُمَّ تَوَضَّاَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ دُعِىَ لِجَنَازَةٍ حِيْنَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلّٰى .

৪৬। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বাজারের মধ্যে পেশাব করলেন, অতঃপর উযু করলেন। তিনি নিজের মুখমণ্ডল ও উভয় পা ধুইলেন এবং মাথা মাসেহ করলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করলে একটি লাশের জানাযা পড়ানোর জন্য তাকে আহবান করা হলো। অতএব তিনি তার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন, অতঃপর জানাযার নামায পড়লেন।

٤٧- اَخْبَرَنِى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاٰى اَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظُهُوْرِهِمَا لاَ يَمْسَحُ بُطُوْنَهُمَا قَالَ ثُمَّ يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ فَيَمْسَحُ بِرَاْسِهِ .

৪৭। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) বলেন, তিনি তার পিতাকে মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ মাসেহ করতে দেখেছেন, তিনি মোজাদ্বয়ের নিচের দিক মাসেহ করেননি। অতঃপর তিনি মাথার পাগড়ী তুলে মাথা মাসেহ করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা উল্লেখিত সব বর্ণনার উপর আমল করি এবং ইমাম আবু হানীফারও এই মত। মুকীম (নিজ আবাসে উপস্থিত) ব্যক্তির জন্য মোজার উপর মাসেহ করার সর্বোচ্চ সময়সীমা এক দিন এক রাত এবং মুসাফির (সফররত) ব্যক্তির জন্য তিন দিন তিন রাত। ইমাম মালেক (র) বলেন, মুকীম ব্যক্তির মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নয়। অথচ ইমাম মালেকের সূত্রে বর্ণিত সবগুলো হাদীসের মাধ্যমে মুকীম ব্যক্তির জন্য

মোজার উপর মাসেহ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। এতদসত্ত্বেও তিনি মুকীম ব্যক্তির জন্য মোজার উপর মাসেহ করার সমর্থক নন।[১০]

১৪. অনুচ্ছেদ পাগড়ী এবং ওড়নার উপর মাসেহ করা।

٤٨- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ بَلَغَنِى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعِمَامَةِ فَقَالَ لاَ حَتّٰى يُمَسَّ الشَّعْرَ الْمَاءُ .

৪৮। ইমাম মালেক (র) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে পাগড়ীর উপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, পাগড়ীর উপর মাসেহ করা যাবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত পানি দিয়ে মাথার চুল মাসেহ করা না হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

٤٩- حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ رَاَيْتُ صَفِيَّةَ ابْنَةَ اَبِىْ عُبَيْدَةَ تَتَوَضَّأُ وَتَنْزِعُ خِمَارَهَا ثُمَّ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا قَالَ نَافِعٌ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ صَغِيْرٌ .

৪৯। নাফে (র) বলেন, আমি আবু উবায়দা (র)-র কন্যা সফিয়া (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি নিজের ওড়না সরিয়ে তার মাথা মাসেহ করেছেন। নাফে (র) বলেন, আমি তখন অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি যে, পাগড়ী ও দোপাট্টার উপর মাসেহ করা যাবে না। আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রাথমিক পর্যায়ে পাগড়ীর উপর মাসেহ করা হতো, কিন্তু তা পরিত্যক্ত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা এবং সকল ফিক্‌হ্‌বিদের এটাই সাধারণ মত।[১১]

---

১০. ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইমাম মালেক (র)-এর যে মত উল্লেখ করেছেন তা তার প্রথম দিককার মত। কেননা ইমাম মালেকও মুকীম ব্যক্তির মোজার উপর মাসেহ করার প্রবক্তা। তবে তার মতে মোজার উপর মাসেহ করার কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই, যতো দিন ইচ্ছা মোজার উপর মাসেহ করা যেতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, মুকীম ব্যক্তি এক দিন এক রাত এবং মুসাফির ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করতে পারে (অনুবাদক)।

১১. মাথা মাসেহ করা কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিতঃ 'ওয়ামসাহু বি-রুউসিকুম' (তোমরা নিজেদের মাথা মাসেহ করো)। অতএব যেসব হাদীসে ভিন্নরূপ অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে, তার ভিত্তিতে শুধু পাগড়ীর উপর মাসেহ করলে যথেষ্ট হবে না, মাথা মাসেহ করতেই হবে। পাগড়ীর উপর মাসেহ করা সম্পর্কিত হাদীসের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথা মাসেহ করার পর হয়তো পাগড়ীর বাঁদন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু দর্শক মনে করে নিয়েছে যে, তিনি পাগড়ীর উপর মাসেহ করেছেন (অনুবাদক)।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ নাপাকির গোসল।

٥٠- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ اَفْرَغَ عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى فَغَسَلَهَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَنَضَحَ فِيْ عَيْنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى ثُمَّ الْيُسْرٰى ثُمَّ غَسَلَ رَاْسَهُ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَاَفَاضَ الْمَاءَ عَلٰى جِلْدِهِ .

৫০। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) যখন নাপাকির গোসল করতেন, প্রথমে নিজের ডান হাতে পানি ঢেলে তা ধুয়ে নিতেন, অতঃপর লজ্জাস্থান ধুইতেন, কুল্লি করতেন, নাক পরিষ্কার করতেন, মুখ ধুইতেন, চোখ ধুইতেন, অতঃপর ডান হাত ধুইতেন, অতঃপর বাম হাত, অতঃপর মাথায় পানি ঢালতেন, অতঃপর গোটা দেহে পানি ঢেলে গোসল করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। কিন্তু নাপাকির গোসলে চোখে পানি দেয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। ইমাম আবু হানীফা, মালেক এবং সকল আলেমের এটাই সাধারণ মত।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা নাপাক হলে।

٥١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ ذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ تَوَضَّاْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَنَمْ .

৫১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করেন যে, তিনি রাতের বেলা (সহবাস জনিত কারণে) নাপাক হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তুমি উযু করো এবং তোমার লজ্জাস্থান ধুয়ে নাও, অতঃপর ঘুমাও।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি উযু না করে এবং নিজের লজ্জাস্থান না ধুয়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে তাতেও কোন দোষ নেই।

٥٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصِيْبُ مِنْ اَهْلِهِ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً فَاِنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ عَادَ وَاغْتَسَلَ .

৫২। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীর সাথে সংগম করার পর ঘুমিয়ে যেতেন এবং পানি স্পর্শ করতেন না। তিনি যদি ভোর রাতে জাগতেন তবে পুনর্বার সংগম করতেন এবং গোসল করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এই হাদীসে লোকদের জন্য সহজতা বিধান করা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতেও ঐ সময় গোসল করা বাধ্যতামূলক নয়।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন গোসল করা।

٥٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ জুমুআর নামায পড়তে এলে সে যেন গোসল করে।

٥٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

৫৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ জুমুআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর গোসল করা ওয়াজিব।

٥٥- عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ عِيْدًا لِلْمُسْلِمِيْنَ فَاغْتَسِلُوْا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيْبٌ فَلاَ يَضُرُّهُ اَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ .

৫৫। ইবনুস সাব্বাক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে মুসলিম সমাজ! এই (জুমুআর) দিনটিকে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন করেছেন। অতএব তোমরা (এই দিন) গোসল করো। আর যার কাছে সুগন্ধি আছে, সে যেন তা ব্যবহার করে। অবশ্যই তোমরা মেসওয়াক করবে।

٥٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ .

৫৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, জুমুআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর গোসল করা ওয়াজিব নাপাকির গোসলের অনুরূপ।

٥٧- اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرُوْحُ اِلَى الْجُمُعَةِ اِلاَّ اغْتَسَلَ .

৫৭। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) গোসল না করে জুমুআর নামায পড়তে যেতেন না।

٥٨-عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ اَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوْقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ فَمَا زِدْتُ عَلٰى اَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ اَقْبَلْتُ قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوْءَ اَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ بِالْغُسْلِ .

৫৮। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক সাহাবী জুমুআর দিন মসজিদে প্রবেশ করলেন। উমার (রা) তখন লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, এটা কোন সময়? সেই সাহাবী বলেন, আমি বাজার থেকে ফিরে এসেছি, আযান শুনতেই উযু করে মসজিদে এসে গেছি (গোসল করতে পারিনি)। উমার (রা) বলেন, এটা তো অন্যায় যে, তুমি কেবল উযু করে এসেছো। অথচ তুমি জানো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসল করারও নির্দেশ দিয়েছেন।[১২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, জুমুআর দিন গোসল করা উত্তম, তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। এ সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে।

٥٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ كِلاَهُمَا يَرْفَعَانِه اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنَعِمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ .

৫৯। আনাস (রা) এবং হাসান বসরী (র) থেকে মারফূ হাদীসরূপে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন উযু করলো সে ভালো কাজ করলো এবং তাই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি গোসল করলো, তবে গোসলই সর্বোত্তম।

٦٠- عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ قَالَ سَئَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْحَجَامَةِ وَالْغُسْلِ فِى الْعِيْدَيْنِ قَالَ اِنِ اغْتَسَلْتَ فَحَسَنٌ وَاِنْ تَرَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهُ اَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاحَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لَيْسَ مِنَ الْاُمُوْرِ الْوَاجِبَةِ وَاِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِه تَعَالٰى (وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ) فَمَنْ اَشْهَدَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ تَرَكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَقَوْلِه تَعَالٰى (فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ) فَمَنِ انْتَشَرَ فَلاَ بَاْسَ وَمَنْ جَلَسَ فَلاَ بَاْسَ قَالَ حَمَّادٌ وَلَقَدْ رَاَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىَّ يَاْتِى الْعِيْدَيْنِ وَمَا يَغْتَسِلُ .

৬০। হাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবরাহীম নাখঈ (র)-কে জুমুআর দিন, দুই ঈদের দিন এবং শিংগা লাগানোর পর গোসল করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, যদি তুমি

১২. অপর এক রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, এই আগন্তুক ব্যক্তি ছিলেন হযরত উছমান (রা)। জুমুআর দিন যে গোসল ফরজ নয় তা এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়। কেননা যদি তা বাধ্যতামূলক হতো তবে হযরত উছমান (রা) মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে গোসল করতেন এবং হযরত উমার (রা)-ও তাকে গোসল করার নির্দেশ দিতেন। এ হাদীস থেকে আরও জানা যায়, খোতবা চলাকালে স্থানীয় ভাষায় দীনের সাথে সম্পর্কিত কথা বলা ইমামের জন্য জায়েয (অনুবাদক)।

গোসল করো তবে তা উত্তম, আর যদি গোসল না করো তবে তাতেও দোষ নেই। আমি (হাম্মাদ) তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি ঃ "যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের জন্য আসে সে যেন গোসল করে"? তিনি বলেন, হাঁ, কিন্তু তা ওয়াজিব নয়। যেমন আল্লাহ্‌র বাণীঃ "তোমরা যখন ক্রয়-বিক্রয় করো তখন সাক্ষী রাখো" (সূরা বাকারা ঃ ২৮২)। এখন যদি কেউ সাক্ষী রাখে তবে তা উত্তম, কিন্তু যদি কেউ সাক্ষী না রাখে তবে তাতেও দোষ নেই। যেমন আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ "যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা জমীনের বুকে ছড়িয়ে পড়ো" (সূরা জুমুআ ঃ ১০)। এখন কোন ব্যক্তির জমীনের বুকে ছড়িয়ে পড়া বাধ্যতামূলক নয়, আবার কোন ব্যক্তি নামাযের পর জমীনের বুকে ছড়িয়ে না পড়লেও তাতেও তার গুনাহ হবে না। হাম্মাদ (র) বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈকে গোসল না করেই দুই ঈদের নামায পড়তে আসতে দেখেছি।

٦١- عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ اَصْحَابِهِ اَلاَ تَغْتَسِلُ قَالَ اَلْيَوْمَ يَوْمٌ بَارِدٌ فَتَوَضَّأَ .

৬১। আতা ইবনে আবু রবাহ (র) বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত হলো। তিনি উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন, অতঃপর উযু করলেন। তার সাথী বললো, আপনি কি গোসল করবেন না? তিনি বলেন, দিনটি খুব ঠাণ্ডা। অতএব তিনি উযুই করলেন।

٦٢- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ اِذَا سَافَرَ لَمْ يُصَلِّ الضُّحٰى وَلَمْ يَغْتَسِلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

৬২। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, আলকামা ইবনে কায়েস (র) সফররত অবস্থায় ঈদুল আযহার নামায পড়তেন না এবং জুমুআর দিন গোসল করতেন না।[১৩]

٦٣- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اَجْزَاَهُ عَنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .

৬৩। মুজাহিদ (র) বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর গোসল করে তার এই গোসল জুমুআর নামাযের গোসলের জন্য যথেষ্ট।

---

১৩. হানাফী মাযহাবে দুই ঈদের নামায যদিও ওয়াজিব, কিন্তু অন্যান্য মাযহাবে তা সুন্নাত। তাই সফররত অবস্থায় উক্ত দুই নামায পড়া বাধ্যতামূলক নয় (অনুবাদক)।

٦٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ عُمَّالُ اَنْفُسِهِمْ فَكَانُوْا يَرُوْحُوْنَ اِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَكَانَ يُقَالُ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ اَىْ لَكَانَ حَسَنًا .

৬৪। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, লোকেরা ক্ষেত-খামারে কায়িক শ্রমে কাজ করতো এবং ধুলোবালি মাখা অবস্থায় জুমুআর নামায পড়তে চলে আসতো। তাই তাদের বলা হলো, তোমরা যদি গোসল করে আসতে তবে খুবই ভালো হতো।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের দিন গোসল করা।

٦٥- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ اَنْ يَغْدُوَ اِلَى الْعِيْدِ .

৬৫। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) ঈদের নামায পড়তে বের হওয়ার পূর্বে গোসল করতেন।

٦٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ يَّغْدُوَ .

৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ঈদুল ফিতরের নামায পড়তে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ঈদের দিন গোসল করা উত্তম, কিন্তু ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করা।

٦٧- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّهُ اَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَتَيَمَّمَ صَعِيْدًا طَيِّبًا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى .

৬৭। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজে এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আল-জুরুফ নামক স্থান থেকে আল-মিরবাদ নামক স্থানে পৌছলেন।[১৪] আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বাহন থেকে নেমে পাক মাট দিয়ে তাইয়াম্মুম করেন। তিনি নিজের মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন, অতঃপর নামায পড়লেন।

٦٨- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ الْاَسْفَارِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ اِنْقَطَعَ عِقْدِىْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى

---

১৪. আল-জুরুফ মদীনা থেকে তিন মাইল এবং মিরবাদ মদীনা থেকে এক বা দুই মাইল দূরে অবস্থিত (অনুবাদক)।

الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا أَلاَ تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِي وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا فَتَيَمَّمْنَا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ وَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

৬৮। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক সফরে বের হলাম। আমরা বাইদা অথবা যাতুল জায়েশ নামক স্থানে পৌছার পর আমার গলার হার হারিয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সফরসংগীরা হারের খোঁজে যাত্রাবিরতি দিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেখানে পানি ছিলো না এবং লোকদের সাথেও পানি ছিলো না। অতএব লোকেরা আবু বাক্‌র (রা)-র কাছে এসে বললো, আপনি কি দেখছেন না, আয়েশা (রা) কি করেছে? সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সফরসংগীদের এমন জায়গায় থামিয়ে দিয়েছে, যেখানে পানি নাই এবং লোকদের সাথেও পানি নাই। আয়েশা (রা) বলেন, অতএব আবু বাক্‌র (রা) এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর উপর তাঁর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সফরসংগীদের এমন জায়গায় যাত্রাবিরতি করতে বাধ্য করলে, যেখানে পানি নেই এবং লোকদের নিকটও পানি নেই। আয়েশা (রা) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যা বলার তাই বললেন। তিনি আমার পেটের পার্শ্বদেশে আংগুল দিয়ে গুতা দিচ্ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা আমার উরুর উপর থাকায় আমি নড়াচড়া করতে পারলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে থাকলেন এবং পানিবিহীন অবস্থায় ভোর হলো। এই উপলক্ষে আল্লাহ তাআলা তাইয়াম্মুম সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করেন। লোকেরা তাইয়াম্মুম করলো এবং আমরাও তাইয়াম্মুম করলাম। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) বলেন, হে আবু বাক্‌র-পরিবার! এটাই তোমাদের একমাত্র বরকত নয়, (বরং তোমাদের উসীলায় মুসলমানদের অনেক সুযোগ লাভ হয়েছে)। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা যখন চলতে শুরু করলাম তখন আমাদের উটের নিচে হারটি পাওয়া গেলো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের এবং ইমাম আবু হানীফার মত হচ্ছে, তাইয়াম্মুম করার জন্য মাটিতে দুইবার হাত মারতে হবে। একবার হাত মেরে মুখমণ্ডল মাসেহ করবে এবং দ্বিতীয়বার হাত মেরে উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবে।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা।

٦٩- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَرْسَلَ اِلَى عَائِشَةَ يَسْئَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَتْ لِتَشُدُّ اِزَارَهَا عَلَى اَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا اِنْ شَاءَ .

৬৯। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আয়েশা (রা)-র কাছে জানতে পাঠালেন, কোন ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে পারে কি? আয়েশা (রা) বলেন, স্ত্রী তার পাজামা নাভীর নীচে শক্ত করে বাঁধবে। অতঃপর স্বামী ইচ্ছা করলে তার সাথে মেলামেশা করতে পারে।[১৫]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের এবং ইমাম আবু হানীফা ও আমাদের সকল আলেমের এটাই সাধারণ মত।

٧٠- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُمَا سُئِلاَ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا اِذَا رَاَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ اَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالاَ لاَ حَتّٰى تَغْتَسِلَ .

৭০। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ও সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, স্ত্রী হায়েয থেকে পাক হয়ে যাবার কাছাকাছি এসে গেছে, কিন্তু এখনো গোসল করেনি, এমতাবস্থায় স্বামী কি তার সাথে সংগম করতে পারে? তারা উভয়ে বলেন, গোসল করার আগ পর্যন্ত সংগমে রত হতে পারবে না।[১৬]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। স্ত্রীর উপর নামায হালাল না হওয়া পর্যন্ত স্বামী তার সাথে সংগম করতে পারবে না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

---

১৫. এখানে মেলামেশা (মুবাশারাত) বলতে চুম্বন, শৃংগার অর্থাৎ সংগম ছাড়া অন্য সব কিছুকে বুঝানো হয়েছে। মাসিক ঋতু চলাকালে স্ত্রীসংগম হারাম। এছাড়া স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় শোয়া এবং তার শরীরের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করা ইত্যাদি হারাম নয় (অনুবাদক)।

১৬. হানাফী মাযহাবে হায়েযের সর্বোচ্চ সময়সীমা দশ দিন। ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফের মতে এই সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর গোসলের পূর্বেই সংগমে রত হওয়া জায়েয। দশ দিনের পূর্বে হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে গোসলের পূর্বে সংগম করা জায়েয নয়। কিন্তু ইমাম মালেক, শাফিঈ ও জমহূর আলেমদের মতে সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ সময়সীমার শর্ত নেই। তাদের মতে কেবল গোসলের পরই সংগমে লিপ্ত হওয়া জায়েয, গোসলের পূর্বে নয় (অনুবাদ)।

٧١- اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ اَنَّ رَجُلاً سَئَلَ النَّبِىَّ ﷺ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ امْرَاَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ تَشُدُّ عَلَيْهَا اِزَارَهَا ثُمَّ شَانَكَ بِاَعْلاَهَا .

৭১। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলো, আমার জন্য আমার হায়েযগ্রস্ত স্ত্রী কতোটুকু হালাল? তিনি বলেন ঃ তোমার স্ত্রী শক্তভাবে পাজামা পরবে। অতঃপর তার উপরের অংশ তোমার জন্য হালাল।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটাই আমাদের এবং ইমাম আবু হানীফার মত। আয়েশা (রা) এর চেয়েও অধিক অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শুধু রক্ত ক্ষরণের স্থান ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে। এছাড়া তার জন্য সবই হালাল (অর্থাৎ সংগম ব্যতীত আর সব কিছুই জায়েয)।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ দুই লিংগ পরস্পর মিলিত হলেই কি গোসল বাধ্যতামূলক?

٧٢- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَائِشَةَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لَنَا اِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৭২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা), উছমান (রা) ও আয়েশা (রা) আমাদের বলতেন, পুরুষাংগ স্ত্রীঅংগ স্পর্শ করলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

٧٣- عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَئَلَ عَائِشَةَ مَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ فَقَالَتْ اَتَدْرِىْ مَا مَثَلُكَ يَا اَبَا سَلَمَةَ مَثَلُ الْفَرُّوْجِ يَسْمَعُ الدِّيْكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ مَعَهَا اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৭৩। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, কিসে গোসল ওয়াজিব হয়? তিনি বলেন, হে আবু সালামা! তোমাকে তো মোরগের সেই বাচ্চার মতো মনে হচ্ছে যা অন্য মোরগের ডাক শুনে ডাক দিতে থাকে। পুরুষ ও স্ত্রীর লজ্জাস্থান একত্র হলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّ مَحْمُوْدَ بْنَ لَبِيْدٍ سَئَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيْبُ اَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْتَسِلُ فَقَالَ لَهُ مَحْمُوْدُ بْنُ لَبِيْدٍ فَاِنَّ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ لاَ يَرَى الْغُسْلَ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ نَزَعَ قَبْلَ اَنْ يَمُوْتَ .

৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে কাব (র) থেকে বর্ণিত। মাহমূদ ইবনে লাবীদ (র) যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র কাছে জিজ্ঞেস করেন, এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে সংগমে রত হয়ে বীর্যপাত হওয়ার পূর্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো (তার উপর গোসল ওয়াজিব কি)? যায়েদ (রা) বলেন, তার উপর গোসল ওয়াজিব। মাহমূদ তাকে বলেন, কিন্তু উবাই ইবনে কাব (রা) তো গোসল ওয়াজিব মনে করতেন না। যায়েদ (রা) বলেন, উবাই ইবনে কাব (রা) তার মৃত্যুর পূর্বে তার মত প্রত্যাহার করেছেন।[১৭]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। এক লজ্জাস্থান অপর লজ্জাস্থানের সাথে মিলিত হয়ে পুরুষাংগের অগ্রভাগ তাতে অদৃশ্য হয়ে গেলেই গোসল ওয়াজিব (ফরজ) হয়, বীর্যপাত হোক বা না হোক। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ ঘুমালে তাতে কি তার উযু নষ্ট হয়?

٧٥- اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ اِذَا نَامَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৭৫। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, তোমাদের কেউ শুয়ে ঘুমালে তাকে পুনরায় উযু করতে হবে।

٧٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَلاَ يَتَوَضَّأُ .

৭৬। ইবনে উমার (রা) বসে বসে ঘুমাতেন, কিন্তু উযু করতেন না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা উভয় অবস্থায় ইবনে উমারের মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।[১৮]

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকদের স্বপ্নদোষ হলে গোসল করতে হবে কি না?

٧٧- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْمَرْاَةُ تَرٰى فِى الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ اَتَغْتَسِلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ

---

১৭. একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া চার ইমাম এবং জমহুর আলেমদের মতে, উভয়ের লজ্জাস্থান একত্র হলেই গোসল ফরজ হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র) বলেছেন, 'আল-মাউ মিনাল মা' (বীর্যপাত হলেই গোসল ফরয হয়) হাদীস স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ স্বপ্নদোষে বীর্যপাত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়, বীর্যপাত না হলে গোসল ওয়াজিব হয় না (অনুবাদক)।

১৮. ইমাম আবু হানীফা এবং সাধারণ ফিক্‌হবিদদের মতে, শুয়ে অথবা হেলান দিয়ে ঘুমালে উযু নষ্ট হয়। নামাযে সিজদারত অবস্থায় ঘুমালে উযু নষ্ট হয় না। কিন্তু ইমাম মালেকের মতে সিজদারত অবস্থায় ঘুমালে উযু নষ্ট হয়। শোয়াটা মূলত উযু নষ্ট হওয়ার কারণ নয়, বরং ঘুমের ঘোরে অংগ-প্রত্যংগের বাঁধন ঢিলা হয়ে যায়। তাই বায়ু নির্গত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এজন্য ঘুমানোকে উযু নষ্ট হওয়ার স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হয়েছে (অনুবাদক)

فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةَ اُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرٰى ذٰلِكَ الْمَرْاَةُ قَالَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ وَمِنْ اَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبْهُ .

৭৭। উরওয়া ইবনুয্ যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি কোন স্ত্রীলোকের পুরুষের মতো স্বপ্নদোষ হয়, তবে কি তাকে গোসল করতে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হাঁ, তাকে গোসল করতে হবে। আয়েশা (রা) উম্মে সুলাইম (রা)-কে বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়। স্ত্রীলোকদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমার হাত ধুলিমলিন হোক, এ কারণেই তো বাচ্চা (পিতা বা মাতার) সাদৃশ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের ও ইমাম আবু হানীফারও এই মত (স্ত্রীলোকদেরও স্বপ্নদোষ হয় এবং তাতে গোসল করতে হয়)।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ রক্তপ্রদরের রোগিনী।

٧٨- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا اُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِتَنْظُرِ اللَّيَالِىَ وَالْاَيَّامَ الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ اَنْ يُصِيْبَهَا الَّذِىْ اَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ وَاِذَا خَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ فَلْتُصَلِّ .

৭৮। নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক মহিলার মাসিক ঋতু শেষ হওয়ার পরও রক্তস্রাব বন্ধ হতো না। উম্মে সালামা (রা) তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ রক্তপ্রদরের রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে এই মহিলার যতো দিন করে মাসিক ঋতু হতো, প্রতি মাসে সে ততো দিন নামায ত্যাগ করবে। অতঃপর সেই পরিমাণ সময় অতিবাহিত হলে সে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে এবং গোসল করবে, নিজের লজ্জাস্থানে কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নিবে, অতঃপর নামায পড়বে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। রক্তপ্রদরের রোগিনী প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করবে, রক্ত প্রবাহিত হতে থাকলে তা বন্ধ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে এবং ওয়াক্তের শেষ প্রান্তে নামায পড়বে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٧٩- اَخْبَرَنِىْ سُمَىٌّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيْمٍ وَزَيْدَ ابْنَ اَسْلَمَ اَرْسَلَاهُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْئَلُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ

فَقَالَ سَعِيْدٌ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ اِلَى طُهْرٍ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ فَاِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ .

৭৯। সুমাই (র) থেকে বর্ণিত। আল-কা'কা' ইবনে হাকীম এবং যায়েদ ইবনে আসলাম (র) তাকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের কাছে পাঠালেন রক্তপ্রদরের রোগিনী কিভাবে গোসল করবে তা জিজ্ঞেস করার জন্য। সাঈদ (র) বলেন, দুই তুহরের মাঝখানের দিনগুলোতে সে নিয়মিত গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করবে। যদি অধিক পরিমাণে রক্ত বের হয়, তবে লজ্জাস্থানে কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে নিবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মাসিক ঋতুর নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হওয়ার পর রক্তপ্রদরের রোগিনী গোসল করবে। অতঃপর পরবর্তী হায়েযের সময় আসা পর্যন্ত প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করবে, অতঃপর নামায পড়বে। পরবর্তী হায়েয শুরু হয়ে গেলে সে নামায ত্যাগ করবে। হায়েযের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর পূর্বের ন্যায় গোসল করবে এবং প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করবে, অতঃপর নামায পড়বে। রক্তপ্রদরের রোগ যতো দিন ভালো না হবে ততো দিন এই নিয়ম মেনে চলবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সাধারণ ফিক্হবিদদের এই মত।

٨٠- اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ اَنْ تَغْتَسِلَ اِلاَّ غُسْلاً وَّاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذٰلِكَ لِلصَّلٰوةِ .

৮০। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রক্তপ্রদরে আক্রান্ত রোগিনীকে প্রতি তুহরে একবার মাত্র গোসল করতে হবে (প্রতিদিন গোসল করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়), অতঃপর প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য নতুনভাবে উযু করবে।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ নারী তার হায়েযের শেষ প্রান্তে হলুদ বর্ণের রক্ত এবং সাদা পানি দেখলে।

٨١- اَخْبَـرَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِـىْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهِ مَوْلاَةِ عَائِشَـةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ اِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيْهَا الْكُرْسُفُ فِيْهِ الصُّفْرَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَتَقُوْلُ لاَ تَعْجَلْنَ حَتّٰى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيْدُ بِذٰلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ .

৮১। নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-র মুক্তদাসী (মারজানা) বলেন, মহিলারা হায়েযের হলুদ বর্ণের রক্ত মিশ্রিত তুলা কৌটায় করে আয়েশা (রা)-কে দেখানোর জন্য পাঠাতো। আয়েশা

(রা) বলে পাঠাতেন, নামায পড়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। হায়েয বন্ধ হওয়ার পর যে সাদা পানি দেখা যায় তার অপেক্ষা করো। কারণ এটা হায়েযের পর তুহর নির্দেশ করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের এবং ইমাম আবু হানীফার মত এই যে, যতোক্ষণ লাল অথবা হলুদ অথবা মেটে রং-এর সাদা পানি না দেখা যায় ততোক্ষণ নারীরা হায়েয থেকে পাক হয় না।

٨٢- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِى بَكْرٍ عَنْ عَمَّتِه عَنِ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ بَلَغَهَا اَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُوْنَ بِالْمَصَابِيْحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَيَنْظُرْنَ اِلَى الطُّهْرِ فَكَانَتْ تَعِيْبُ ذٰلِكَ عَلَيْهِنَّ وَتَقُوْلُ مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هٰذَا .

৮২। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র কন্যা (উম্মে কুলসুম) জানতে পারলেন যে, নারীরা রাতের অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে দেখতো যে, তারা হায়েয থেকে পাক হয়েছে কিনা। উম্মে কুলসুম এটাকে দূষণীয় মনে করতেন এবং বলতেন, (সাহাবীদের) মহিলারা এরূপ করতেন না।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী নারীকে দিয়ে হাত-পা ধোয়ানো।

٨٣- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ جَوَارِيْهِ رِجْلَيْهِ وَيُعْطِيْنَهُ الْخُمْرَةَ وَهُنَّ حُيَّضٌ .

৮৩। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার ঋতুবতী বাঁদীদের দিয়ে নিজের হাত-পা ধুইয়ে নিতেন এবং নিজের জন্য জায়নামায আনিয়ে নিতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এতে দোষের কিছু নেই। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٨٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ .

৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা আচড়িয়ে দিতাম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এতে দোষের কিছু নেই। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণের এই মত।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দিয়ে যে পুরুষলোক উযু বা গোসল করে।

٨٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِاَنْ يَّغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوْءِ الْمَرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا اَوْ حَائِضًا .

৮৫। ইবনে উমার (রা) বলেন, নারীদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দিয়ে পুরুষলোকদের গোসল করায় কোন দোষ নেই, যদি সে ঋতুবতী বা নাপাক অবস্থায় না থাকে।[১৯]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, নারীদের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষদের গোসল অথবা উযু করায় কোন দোষ নেই, তা সে হায়েযগ্রস্ত অথবা নাপাক অবস্থায় থাক না কেন। আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আয়েশা (রা) একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে গোসল করতেন এবং একে অপরের আগে পানি তুলতে তৎপর হতেন। যখন তাঁরা উভয়ে একত্রে গোসল করেছেন, তখন তাও নাপাক মহিলার ব্যবহারের অতিরিক্ত পানিই হলো। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উযু করা।

٨٦- عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ اَمَرَهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءً فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ فَشَرِبَتْ مِنْهُ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاٰنِىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ اَخِىْ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ .

৮৬। কাব ইবনে মালেক (রা)-র কন্যা কাবশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু কাতাদা (রা)-র পুত্রবধূ ছিলেন। আবু কাতাদা (রা) উযুর পানি চাইলে তিনি পাত্রে করে উযুর পানি রাখলেন। একটি বিড়াল এসে ঐ পানি পান করতে লাগলো। আবু কাতাদা (রা) পাত্রটি কাত করে দিলেন এবং বিড়াল পানি পান করলো। কাবশা (রা) বলেন, আবু কাতাদা (রা) আমাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্রী! তুমি কি বিস্মিত হচ্ছো? কাবশা (রা) বলেন, হাঁ। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "বিড়াল নাপাক জীব নয়। এটা তো অহরহ তোমাদের চারপাশেই বিচরণকারী বা বিচরণকারিণী"।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বিড়াল ইত্যাদির উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উযু করায় কোন দোষ নেই। তবে অতিরিক্ত পানি থাকলে তা দিয়ে উযু করাই আমাদের মতে উত্তম। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

---

১৯. ইবনে উমার (রা) হয়তো অধিক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য হায়েযগ্রস্ত ও নাপাক মহিলার ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি পুরুষদের ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ২

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

(নামায)

১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের ওয়াক্তসমূহ।

٨٧- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَئَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَا اُخْبِرُكَ صَلِّ الظُّهْرَ اِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَالْعَصْرَ اِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ وَالْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَاِنْ نِمْتَ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ فَلاَ نَامَتْ عَيْنَاكَ وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ .

৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে রাফে (রা) তার কাছে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে অবহিত করবো। তোমার ছায়া তোমার সমান হলে পর তুমি যুহরের নামায পড়ো। তোমার ছায়া তোমার দ্বিগুণ হলে তখন আসরের নামায পড়ো। সূর্য ডুবে গেলে মাগরিবের নামায পড়ো। এক-তৃতীয়াংশ রাতের মধ্যে এশার নামায পড়ো। তুমি যদি (নামাযের পূর্বে) অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমাও, তবে হয়তো তোমার চক্ষুদ্বয় ঘুমাতে পারবে না। ভোরের অন্ধকারের মধ্যে ফজরের নামায পড়ো।[১]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী (র) বলেন, আসরের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার অভিমতও তাই (তার মতে, ছায়া দ্বিগুণ হওয়ার পর আসরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়) এবং ফজরের নামায অন্ধকার দূরীভূত করে পড়তে হবে।

কিন্তু আসরের ওয়াক্ত সম্পর্কে আমাদের মত হচ্ছে, ছায়া যখন এক মিছালের অধিক হয়ে যাবে, অর্থাৎ সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কোন জিনিসের ছায়া যতোটুকু থাকে—তা বাদে উক্ত বস্তুর ছায়া তার সম-পরিমাণ হয়ে যাওয়ার পর আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, দ্বিগুণ না হওয়া পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় না (এই শেষোক্ত মতের উপর হানাফী মাযহাবের ফতোয়া)।

---

১. পূর্ব দিগন্তে সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যোদয় শুরু হওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যায়। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার সাথে সাথে যুহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ (মূল ছায়া বাদে) হওয়ার সাথে সাথে তা

শেষ হয়ে যায় এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য মাযহাবমতে কোন বস্তুর ছায়া তার সম-পরিমাণ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে যুহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং শাফাক অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকে। ইমাম শাফিঈ এবং অধিকাংশ আলেমের মতে, সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লাল আভা দেখা যায় তাকে শাফাক বলে। ইমাম আবু হানীফার প্রসিদ্ধ মতে লাল আভা দূরীভূত হওয়ার পর যে শুভ্রতা উদিত হয় তাকে শাফাক বলে। এশার নামাযের ওয়াক্ত শাফাক অন্তর্হিত হওয়ার পর থেকে সঠিক মত অনুযায়ী সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।

মুস্তাহাব ওয়াক্ত

শাফিঈ মাযহাবমতে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযে জলদি করা অর্থাৎ ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। কিন্তু হানাফী মাযহাবে ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে কোন কোন নামায ওয়াক্তের প্রথমভাবে পড়া মুস্তাহাব এবং কোন কোন নামায একটু বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব। যেমন গ্রীষ্মকালে যুহরের নামায বিলম্বে পড়ার নির্দেশ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

"তোমরা যুহরের নামায ঠাণ্ডা করে আদায় করো। কেননা গরমের তীব্রতা দোযখের নিঃশ্বাস বিশেষ"।

কিন্তু শীতকালে এই নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব। আসরের নামায সূর্যালোক ঝলসে যাওয়ার পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। সূর্যালোক ঝলসে যাওয়ার সাথে সাথে আসরের মাকরূহ (অপছন্দীয়) ওয়াক্ত শুরু হয়। সকল ইমামের মতে, যে কোন ঋতুতে মাগরিবের নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব। অতএব সূর্য গোলক ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের নামায আদায় করা উচিৎ। কেননা এই নামাযের ওয়াক্ত খুবই সংকীর্ণ।

রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত এশার নামায বিলম্ব করা মুস্তাহাব। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত এশার নামায বিলম্ব মাকরূহ। বেতের নামাযের ওয়াক্ত এশার নামাযের পরপরই শুরু হয় এবং সুবহে সাদেকের পূর্বে পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু শেষ রাতে বেতের পড়া মুস্তাহাব। তবে যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগতে পারবে না বলে আশংকা করে সে শোয়ার পূর্বেই বেতের পড়বে।

ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইনের মতে রাতের অন্ধকার দূরীভূত করে ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

أَسْفِرُوا فِى الْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الأَجْرِ .

"তোমরা ফজরের নামায আলোকিত করে পড়ো। কেননা এর মধ্যেই অধিক পুরস্কার রয়েছে।"

ইমাম আবু হানীফার দুই সাথী ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফকে ফিক্‌হবিদদের পরিভাষায় 'সাহেবাইন' বলা হয়।

কিন্তু ইমাম শাফিঈ ও অপরাপর ইমামের মতে অন্ধকার বাকি থাকতেই ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব। তারা নিজেদের মতের সমর্থনে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায পড়তেন"।

জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত

হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের মত অনুযায়ী যুহরের নামাযের ওয়াক্তই জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত। মালিকী মাযহাবমতে, যুহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর থেকে মাগরিবের নামাযের এতোটা পূর্ব পর্যন্ত

٨٨- حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِىْ حُجْرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ .

৮৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যের রশ্মি তার (আয়েশার) কোঠার মধ্যে থাকতেই এবং দেয়ালের উপর না পড়তেই আসরের নামায পড়তেন।

٨٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى قُبَا فَيَاْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৮৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমরা এমন ওয়াক্তে আসরের নামায পড়তাম যে, কোন ব্যক্তি নামাযশেষে কুবা পল্লীতে রওয়ানা হতো এবং সেখানে পৌছে যেতো, আর সূর্য তখনো উপরে থাকতো।[২]

٩٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْاِنْسَانُ اِلَى بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُوْهُمْ يُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ .

৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমরা (মহানবীর সাথে) আসরের নামায পড়তাম। অতঃপর কোন ব্যক্তি আমর ইবনে আওফ গোত্রের এলাকায় যেতো এবং তাদেরকে আসরের নামায পাঠরত অবস্থায় দেখতে পেতো।[৩]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে আসরের নামায জলদি পড়ার চেয়ে বিলম্বে পড়াই উত্তম। যখন আসরের নামায পড়া হবে তখন সূর্যালোক যেন উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে

জুমুআর ওয়াক্ত থাকে যাতে সূর্যাস্তের পূর্বেই খোতবা এবং নামায শেষ করা যায়। হাম্বলী মাযহাবমতে, সকালের সূর্য কিছুটা উপরে উঠার পর থেকে আসরের পূর্ব পর্যন্ত জুমুআর ওয়াক্ত বাকি থাকে। তবে পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে তাদের মতে জুমুআর নামায পড়া কেবল জায়েয, কিন্তু পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে পড়ার পর জুমুআর নামায পড়া ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব।

মাকরূহ ও নিষিদ্ধ ওয়াক্ত

ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং আসরের ফরয নামাযের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোন অ-ফরয নামায পড়া মাকরূহ। তবে কারো ফরয নামাযের কাযা থাকলে সে তা এ সময় পড়তে পারে, বরং পড়বে। সূর্য উঠার সময়, ঠিক দ্বিপ্রহরে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় যে কোন নামায পড়া নিষিদ্ধ (অনুবাদক)।

২. কুবা পল্লী মদীনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম ওয়াক্তে এবং সূর্য বেশ উপরে থাকতেই আসরের নামায আদায় করতেন (অনুবাদক)।

৩. আমর ইবনে আওফ গোত্রের আবাসস্থল মদীনা থেকে প্রায় দুই-আড়াই মাইল দূরে অবস্থিত। এই এলাকার লোকদের আসর পড়ার অনেক আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায পড়তেন। কতক বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, এসব লোক ছিল কৃষিজীবী। তাই তারা নিজেদের কাজ থেকে হয়ে আসরের নামায পড়তো (অনুবাদক)।

এবং তার মধ্যে পরিবর্তন (ফ্যাকাসে ভাব) না এসে যায়। বিলম্বে পড়া সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীস আছে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। কতক ফিক্‌হ্‌বিদ বলেছেন, আসর নামকরণের তাৎপর্যও এই যে, তাতে বিলম্ব করা হয়ে থাকে।

২. অনুচ্ছেদ ঃ আযান ও তার জবাবদান এবং পুনঃ সতর্কীকরণ।

٩١- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

৯১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা আযান শোনলে মুআযযিন যা বলে–তোমরাও তাই বলো।[৪]

٩٢- قَالَ مَالِكٌ بَلَغَنَا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُهُ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ فَاَمَرَهُ عُمَرُ اَنْ يَّجْعَلَهَا فِىْ نِدَاءِ الصُّبْحِ .

৯২। ইমাম মালেক (র) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, মুআযযিন উমার (রা)-কে ফজরের নামায সম্পর্কে অবহিত করতে এসে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পান। মুআযযিন সশব্দে বলেন, 'আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' (ঘুম থেকে নামায উত্তম)। তখন উমার (রা) তাকে এই বাক্য ফজরের নামাযের আযানে যোগ করার নির্দেশ দিলেন।[৫]

٩٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِى النِّدَاءِ ثَلٰثًا وَيَتَشَهَّدُ ثَلٰثًا وَكَانَ اَحْيَانًا اِذَا قَالَ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ عَلٰى اَثَرِهَا حَىَّ عَلٰى خَيْرِ الْعَمَلِ .

---

৪. এ হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায়, আযানের শব্দগুলোই শ্রোতা হুবুহু উচ্চারণ করবে। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে, 'হাইয়্যা আলাস-সালাহ' এবং 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বাক্যদ্বয়ের স্থলে শ্রোতাকে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলতে হবে। এভাবে উভয় হাদীসের উপরই আমল হয়ে যাবে। জমহুর আলেমদের মতও তাই। ইমাম আবু হানাফী ও আসহাবে যাওয়াহিরের মতে, আযানের জবাব দেয়া ওয়াজিব, কিন্তু জমহূরের মতে তা সুন্নাত। তবে আযানের জবাব দেয়ার তাত্ত্বিক অর্থ হচ্ছেঃ আযান শুনে নামাযের জন্য জামাআতে উপস্থিত হওয়া। যে ব্যক্তি মুখে মুখে আযানের জবাব দিলো, কিন্তু জামাআতে হাযির হলো না, সে বাস্তবিকপক্ষে আযানের জবাব দেয়নি (অনুবাদক)।

৫. হযরত উমার (রা)-র কথার অর্থ এই নয় যে, তিনিই আযানের মধ্যে এই শব্দের প্রচলন করেছেন। কেননা হযরত বিলাল (মদীনার মুআযযিন) এবং হযরত আবু মাহযূরা (মক্কার মুআযযিন) রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে প্রমাণিত যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আযানের মধ্যে এই বাক্যের প্রবর্তন করেন। আবু মাহযূরা (রা) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপস্থিতিতে ফজরের নামাযের আযান দেই। অতএব আমি যখন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বললাম,

৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আযানের মধ্যে 'আল্লাহু আকবার' তিনবার এবং 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' তিনবার করে বলতেন। তিনি কখনো কখনো 'হাইয়্যা আলাল-ফালাহ' বাক্যের পর 'হাইয়্যা আলা খাইরিল-আমাল' বলতেন।[৬]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, 'আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বাক্যটি ফজর নামাযের আযান থেকে অবসর হয়ে বলতে হবে। আযানের মধ্যে এমন কোন শব্দ উচ্চারণ করা পছন্দনীয় নয়, যা আযানের শব্দগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের জন্য হেঁটে যাওয়া এবং মসজিদের ফযীলাত।

٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ فَلاَ تَاْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا فَاِنَّ اَحَدَكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ اِلَى الصَّلٰوةِ .

৯৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নামাযের তাকবীর শুনেই তাতে শরীক হওয়ার জন্য তোমরা দ্রুত বেগে আসবে না, বরং শান্তশিষ্টভাবে আসবে। তোমরা তার যতোটুকু অংশ (ইমামের সাথে) পাবে তা পড়বে এবং যতোটুকু ছুটে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর) পর পড়বে। কেননা তোমাদের যে ব্যক্তিই নামাযের সংকল্প করে সে (সওয়াবের দিক থেকে) নামাযের মধ্যেই থাকে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, রুকূতে শামিল হওয়ার জন্য এবং তাকবীরে তাহরীমা ধরার জন্য তাড়াহুড়া করা উচিৎ নয়, বরং ধীরেসুস্থে এসে কাতারে শামিল হবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

٩٥- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ الْاِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيْعِ وَاَسْرَعَ الْمَشْىَ .

৯৫। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) আল-বাকী নামক স্থানে থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামত শুনতে পান। তিনি তাড়াতাড়ি হেঁটে আসেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, নিজের দেহ ক্লান্ত হয়ে না পড়ে, এতোটা দ্রুত আসায় কোন দোষ নেই।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তুমি এর সাথে 'আস-সালাতু খাইরুম মিনান-নাওম' যোগ করো। একদল আলেম এই হাদীসের মাধ্যমে তাসবীব (تسبيب) জায়েয বলেছেন। তাসবীব শব্দের অর্থ পুনঃ সতর্কীকরণ। অর্থাৎ আযানের পর নামাযের জন্য পুনর্বার সতর্ক করা। একদল আলেম এটাকে মাকরূহ বলেছেন। আল্লামা ইবনে আবদুল বার বলেন, আমীর মুআবিয়া (রা) এই তাসবীবের প্রচলন করেন। খেলাফতে রাশেদার যুগে এই নিয়ম প্রচলিত ছিলো না (অনুবাদক)।

৬. ফজরের আযানে 'আস-সালাতু খাইরুম মিনাম-নাওম' বলা সমস্ত ফিক্হবিদের মতে সুন্নাত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআযযিনকে তা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শাহাদাতাইন তিনবার বলা এবং 'হাইয়্যা আলা খাইরিল-আমাল' বাক্য আযানের মধ্যে বৃদ্ধি করা সুন্নাতের পরিপন্থী। এটা ইবনে উমার (রা)-এর ব্যক্তিগত আমল মনে হয় (অনুবাদক)।

٩٦- أَخْبَرَنَا سُمَيٌّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيْدُ غَيْرَهُ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ رَجَعَ غَانِمًا .

৯৬। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, কোন ব্যক্তি সকালে বা বিকালে শুধু ইল্‌ম শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, অতঃপর নিজের ঘরে ফিরে আসে, সে আল্লাহ্‌র পথের এমন সৈনিকের সমতুল্য যে গনীমতের মালসহ বাড়ি ফিরে আসে।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুআযযিনের ইকামত দেয়ার সময় যে ব্যক্তি নামায পড়ে।

٩٧- عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعَ قَوْمٌ الْإِقَامَةَ فَقَامُوْا يُصَلُّوْنَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَصَلَاتَانِ مَعًا .

৯৭। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) বলেন, কতক লোক (মসজিদে নববীতে) ইকামত শুনার পর (ফজরের) সুন্নাত নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। নবী ﷺ বেরিয়ে এসে (তাদের নামাযরত অবস্থায় দেখে) বলেন ঃ একই সংগে দুই নামায?[৭]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, তাকবীরে তাহরীমা হয়ে যাওয়ার পর ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায পড়া মাকরূহ। শুধু ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়ায় কোন দোষ নেই, যদিও মুআযযিন ইকামত শুরু করে দিয়ে থাকেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের কাতার সোজা ও সমান করা।

٩٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ رِجَالًا بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ فَإِذَا جَاءُوْهُ وَأَخْبَرُوْهُ بِتَسْوِيَتِهَا كَبَّرَ بَعْدُ .

৯৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কয়েক ব্যক্তিকে নামাযের কাতার ঠিক করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তারা তাকে কাতার সোজা ও সঠিক হওয়ার খবর দেয়ার পরই তিনি তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলতেন।

---

৭. ফজরের নামাযের ইকামত অথবা জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ার পর ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায পড়া যাবে কিনা অথবা জামাআত শেষ হওয়ার পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এই সুন্নাত পড়া যাবে কিনা তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার সংগীগণ বলেন, যদি ফজরের জামাআত শুরু হয়ে থাকে এবং তখন সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়তে গেলে জামাআতের দুই রাক্‌আতই হারিয়ে ফেলার আশংকা হয়, দ্বিতীয় রাক্‌আতের রুকূতেও ইমামের সাথে শরীক হতে পারার সম্ভাবনা না থাকে, তবে তখন সুন্নাত নামায না পড়েই জামাআতে শামিল হবে। আর যদি পূর্ণ এক রাক্‌আত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়বে, অতঃপর জামাআতে শামিল হবে।

ইমাম আওযাঈও এই মত সমর্থন করেন। তবে তিনি বলেন, জামাআতের শেষ রাক্‌আত হারাবার আশংকা না থাকলে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়েই সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়া জায়েয।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, জামাআতের শেষ রাক্‌আতও হারাবার আশংকা থাকলে সুন্নাত পড়া শুরু করবে না, বরং জামাআতে শামিল হবে। অন্যথায় মসজিদে প্রবেশ করে থাকলে সেখানেই সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়বে।

ইবনে হিব্বান (র) বলেন, ইকামত শুরু হয়ে গেলে কোন অ-ফরয নামায শুরু করা যাবে না। তবে ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত এই নিয়মের ব্যতিক্রম।

ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুরূপ মত পোষণকারীদের দলীল এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ফজরের নামায পড়তে এসে দেখেন, ইমাম ফরয নামায পড়ছেন। তিনি জামাআতে শামিল না হয়ে হযরত হাফসা (রা)-র ঘরে গিয়ে সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়েন, অতঃপর ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হন।

ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আওযাঈ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কিত বর্ণনাকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইবনে মাসউদ (রা) মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন, ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেছে। তিনি থামের পাশে দাঁড়িয়ে সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়েন, অতঃপর জামাআতে শামিল হন (ইমাম কুরতুবীর তাফসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭)।

ইমাম মালেক (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে, ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেছে, তখন সে ইমামের সাথে ফরয নামাযে শামিল হবে, সুন্নাত পড়ায় লেগে যাবে না। কিন্তু সে যদি মসজিদে প্রবেশ না করে থাকে এবং এদিকে জামাআতও শুরু হয়ে থাকে, তবে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়বে, যদি জামাআতের অন্তত এক রাক্‌আত হারাবার আশংকা না থাকে। আর যদি শেষ রাক্‌আতও ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে জামাআতে শামিল হবে এবং সুন্নাত পরে পড়বে (ঐ)।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মসজিদে প্রবেশ করে কেউ যদি দেখে যে, ইকামত হয়ে গেছে, তবে সে ইমামের সাথে জামাআতে শামিল হবে। এ সময় সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়াই যাবে না, মসজিদের ভিতরেও নয় এবং মসজিদের বাইরেও নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম তাবারীও এই মত ব্যক্ত করেছেন। এই মতই অধিক যুক্তিসংগত ও সহীহ দলীল ভিত্তিক মনে হয়। তাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "ইকামত হয়ে গেলে বা হতে থাকলে তখন সেই সময়কার নির্দিষ্ট ফরয নামায ছাড়া অন্য নামায পড়া যাবে না"। হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে (ঐ)।

হযরত মালেক ইবনে বুহাইনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন যে, এক ব্যক্তি ইকামত বলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করলে লোকেরা তাকে ঘিরে ধরলো। নবী ﷺ বলেন ঃ সকাল বেলার নামায কি চার রাক্‌আত, ভোরের নামায কি চার রাক্‌আত (বুখারী, মুসলিম)।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইকামত শুরু হয়ে যাওয়ার পর সুন্নাত শুরু করা যাবে না, ইমাম বুখারীরও এই মত। তিনি যে অনুচ্ছেদের অধীনে এই হাদীস সংযোজন করেছেন তার শিরোনাম হচ্ছে, "ফজর নামাযের ইকামত শুরু হয়ে গেলে তখন সেই নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না"।

ইমাম বুখারী (র) তার গ্রন্থে এবং বাযযার ও অপরাপর মুহাদ্দিস আনাস (রা)-এর সূত্রে মারফূ হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন যে, "ফজরের জামাআতের ইকামত শুরু হয়ে গেলে পর তার দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়তে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন"।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইকামতের পর দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়াও কি নিষেধ? তিনি বলেন ঃ "ফজরের সুন্নাত দুই রাকআতও পড়া যাবে না" (বুখারীর শরাহ ফাতহুল বারী)।

মোটকথা, ইকামত শুরু হয়ে গেলে কোনরূপ নফল বা সুন্নাত নামায পড়া যাবে না। তবে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, ইমামদের মধ্যে এই মতবিরোধ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত হারাম পর্যায়ের নয়, বরং মাকরূহ পর্যায়ভুক্ত।

ফজরের না পড়া সুন্নাত

ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে যে সুন্নাত পড়া সম্ভব হয়নি তা কখন পড়তে হবে, এ বিষয়েও ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে তা সূর্যোদয়ের পর পড়তে হবে। তাদের দলীল ঃ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত (ফরযের পূর্বে) পড়ে নাই, সে যেন তা সূর্যোদয়ের পর পড়ে" (তিরমিযী)।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ফজরের ফরয নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য কোন নামায পড়তে নিষেধ করেছেন (বুখারী)।

তিরমিযী উদ্ধৃত হাদীসটি মুহাদ্দিস হাকেম (র) এভাবে উল্লেখ করেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়তে ভুলে গেছে সে যেন তা সূর্যোদয়ের পর পড়ে"।

কিন্তু ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ্ এবং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতে, ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়ার সুযোগ না পেলে তা ফরয নামাযের শেষে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়তে কোন দোষ নেই। তিরমিযীতে ইবনে উমার (রা)-র এইরূপ আমলের উল্লেখ আছে। এই মতের স্বপক্ষে দলীল ঃ

কায়েস ইবনে ফাহ্দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে এলেন এবং নামাযের ইকামত বলা হলো। আমি তাঁর সাথে ফজরের ফরয নামায পড়লাম। তিনি পিছন দিকে ফিরে আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি বলেন ঃ হে কায়েস, থাম! তুমি কি একই সংগে দুই নামায পড়ছো? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ফজরের সুন্নাত দুই রাক্‌আত পড়তে পারিনি, এখন তাই পড়ছি। তিনি বলেন ঃ তাহলে আপত্তি নেই (তিরমিযী, আবু দাউদ)। আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আছে ঃ "জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন"।

"তাহলে আপত্তি নেই (ফালা ইযান)" কথার ব্যাখ্যায় আবু তায়্যিব সিনদী হানাফী লিখেছেন, "আজকের ফজরের সুন্নাতই যদি তুমি এখন পড়ে থাকো, তবে তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, তোমার কোন গুনাহ নেই এবং তুমি তিরস্কৃতও হবে না"। "রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন" কথার ব্যাখ্যায় ইবনে মালেক মুহাদ্দিস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই নীরবতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের সুন্নাত নামায ফরয নামাযের পূর্বে পড়তে না পারলে তা ফরয পড়ার পরপরই পড়া যেতে পারে"।

আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী লিখেছেন, এই হাদীসটি সপ্রমাণিত নয়। তাই এটা ইমাম আবু হানীফার মতের বিপক্ষে দলীল হতে পারে না। প্রতিপক্ষের তরফ থেকে এর জবাবে বলা হয়েছে, তিরমিযী উদ্ধৃত হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল ও অপ্রমাণিত হলেও তাতে কোন দোষ নেই। কারণ এই ঘটনার বিবরণ অন্যান্য কয়েকটি সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মুহাদ্দিস ইরাকী এই হাদীসের সনদকে 'হাসান' বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে আবু শাইবা ও ইবনে হিব্বান প্রমুখ মুহাদ্দিসগণও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর একই হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা যে পরস্পরের পরিপূরক ও ব্যাখ্যা দানকারী তা সর্বজন সমর্থিত।

আল্লামা ইমাম শাওকানী লিখেছেন, 'ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাত দুই রাক্‌আত না পড়তে পারলে সূর্যোদয়ের পূর্বে তা পড়াই যাবে না এবং অবশ্যই সূর্যোদয়ের পর পড়তে হবে একথা হাদীসে বলা হয়নি। এতে শুধু সেই ব্যক্তির জন্যই নির্দেশ রয়েছে, যে এই দুই রাক্‌আত ইতিপূর্বে

٩٩- عَنْ مَالِكِ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَتِهِ اِذَا قَامَتِ الصَّلٰوةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بِالْمَنَاكِبِ فَاِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ حَتّٰى يَاْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ فَيُخْبِرُوْنَهُ اَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ .

৯৯। মালেক ইবনে আবু আমের আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। উছমান ইবনে আফফান (রা) তার খোতবায় বলতেন, "যখন নামায শুরু হয় তখন তোমরা নিজেদের কাতারসমূহ ঠিক করে নাও এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাও। কেননা কাতার ঠিক করা নামাযকে পূর্ণাংগ করার শামিল"। কাতার ঠিক করার কাজে নিযুক্ত লোকেরা তাকে অবহিত না করা পর্যন্ত তিনি তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলতেন না। তারা কাতার ঠিক হয়েছে বলে খবর দিলেই তিনি তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলতেন।[৮]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মুআযযিন 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বললে মুসল্লীগণ দাঁড়িয়ে যাবে, কাতার ঠিক করবে এবং পরস্পরের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর মুআযযিন 'কাদ কামাতিস সালাহ' বলার সাথে ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বাঁধবে অর্থাৎ নামায শুরু করবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শুরু করা (ইফতিতাহুস সালাত)।

١٠٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

পড়তে পারেনি। তাকে বলা হয়েছে, সে যেন তা সূর্যোদয়ের পর পড়ে, যেন তা ভুলে না যায়। কেননা তা যথাসময়ে পড়ে না থাকলে তো যে কোন সময় পড়তেই হবে"। অতঃপর তিনি লিখেছেন,

"সেই দুই রাক্‌আত সুন্নাত ফরয নামাযের পরই পড়তে নিষেধ করা হয়েছে–এমন কথা এ হাদীস থেকে বুঝা যায় না"।

বরং দারু কুতনী, হাকেম ও বায়হাকীতে বলা হয়েছে, "যে লোক সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়তে পারেনি, সে যেন তা পড়ে নেয় অর্থাৎ ফরয নামাযের পরই তা পড়া দোষের নয়" (নাইলুল আওতার, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০)।

ফজর ও আসরের নামাযের পর কোন সুন্নাত বা নফল নামায পড়ার যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা হারাম পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা নয়, বরং মাকরূহ পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা (অনুবাদক)।

৮. কাতার সোজা করা এবং কাতারের মাঝে ফাঁক না রাখার ব্যাপারে অনেক তাকিদ করা হয়েছে। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তোমাদের কাতার সঠিক ও সোজা করো। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবেন (অনুবাদক)।

১০০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন, তখন 'আল্লাহু আকবার' বলে তাঁর উভয় হাত তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন, যখন রুকূতে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলতেন, উভয় হাত (কাঁধ পর্যন্ত) উঠাতেন, আবার যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন, দুই হাত উপরে উঠাতেন,[৯] অতঃপর বলতেনঃ 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, অতঃপর বলতেন ঃ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ' (যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, তিনি তার প্রশংসা শুনেন। আমাদের রব! যাবতীয় প্রশংসা তোমার জন্য)।

١٠١- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا ابْتَدَأَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا دُوْنَ ذٰلِكَ .

১০১। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নামায শুরু করতে তার উভয় হাত তার দুই কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। অনুরূপভাবে তিনি যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও তার দুই হাত পূর্বের চেয়ে একটু কম উপরে উঠাতেন।

١٠٢- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيْرَ فِي الصَّلٰوةِ اَمَرَنَا اَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا .

১০২। ওয়াহ্‌ব ইবনে কাইসান (র) বলেন যে, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) তাদেরকে নামাযের তাকবীর শিক্ষা দিতেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিতেন, আমরা যেন আমাদের প্রতিটি নিচু হওয়ার এবং সোজা হওয়ার সময় তাকবীর বলি।

١٠٣-عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَكُلَّمَا رَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلٰوتُهُ حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ .

১০৩। ইমাম যয়নুল আবেদীন (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি ঝোকা ও উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। মহামহিম আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এরূপ আমল করেছেন।

١٠٤- عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ فَكَبَّرَ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ثُمَّ اِذَا انْصَرَفَ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَشْبَهُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

---

৯. বুখারীর বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র এই কথা উল্লেখ আছে ঃ 'লা ইয়াফআলু যালিকা ফিস-সুজূদ (রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় হাত উত্তোলন করতেন না) (অনুবাদক)।

১০৪। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) যখনই নামাযে ঝুঁকতেন এবং সোজা হতেন, তখন "আল্লাহু আকবার' বলতেন। তিনি নামায থেকে অবসর হয়ে বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের সবার তুলনায় আমার নামায রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

١٠٥- اَخْبَرَنِى نُعَيْمُ الْمُجْمَرُ وَاَبُوْ جَعْفَرٍ الْقَارِىُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ فَكَبَّرَ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ قَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ يُكَبِّرُ وَيَفْتَحُ (يَفْتَتِحُ) الصَّلٰوةَ .

১০৫। নুআইম আল-মুজমার ও আবু জাফর আল-কারী (র) বলেন যে, আবু হুরায়রা (রা) যখন তাদের নামায পড়াতেন, তখন প্রতিবার নিচু হওয়া ও সোজা হওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। আবু জাফর (র) বলেন, তিনি নামায শুরু করার সময় এবং তাকবীর বলার সময় তার উভয় হাত উপরে তুলতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, নামাযে প্রতিটি ঝোঁকা ও সোজা হওয়া এবং উভয় সিজদায় যাবার সময় ও উঠার সময় তাকবীর বলা সুন্নাত। কিন্তু রফউল ইয়াদাইন অর্থাৎ দুই হাত কান পর্যন্ত উঠানো শুধু একবার, নামায শুরু করার সময়, তাকবীরে তাহরীমার সময়। এছাড়া নামযে আর কোথাও রফউল ইয়াদাইন করবে না। এ সবই ইমাম আবু হানীফা (র)-র অভিমত। এর সমর্থনে প্রচুর সংখ্যক হাদীস রয়েছে।

١٠٦-عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ رَفَعَ يَدَيْهِ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ .

১০৬। আসেম ইবনে কুলাইব আল-জারমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে কেবল ফরয নামাযে প্রথম তাকবীরে তার দুই হাত উপরে উঠাতে দেখেছি। এরপর আর কোথাও তিনি রফউল ইয়াদাইন করেননি।

١٠٧- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ قَالَ لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى .

১০৭। ইবরাহীম আন-নাখঈ (র) বলেন, তাকবীরে উলা (তাহ্রীমা) ছাড়া নামাযে আর কোথাও তুমি রফউল ইয়াদাইন করবে না।

١٠٨- اَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنِىْ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ الْحَضْرَمِىُّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاٰهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا كَبَّرَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ مَا

اَدْرِى لَعَلَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ اِلاَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَحَفِظَ هٰذَا مِنْهُ وَلَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَاَصْحَابُهُ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اِنَّمَا كَانُوْا يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِىْ بَدْءِ الصَّلٰوةِ حِيْنَ يُكَبِّرُوْنَ .

১০৮। হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি ও আমর ইবনে মুররা ইবরাহীম নাখঈর কাছে আসলাম। আমর বললেন, আলকামা ইবনে ওয়াইল আল-হাদরামী তার পিতার সূত্রে আমাদের বলেছেন যে, "তিনি (ওয়াইল আল-হাদরামী) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়েছেন। তিনি তাঁকে তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময়, রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় রফউল ইয়াদাইন করতে দেখেছেন।" ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি হয়তো এই এক দিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামায পড়তে ও রফউল ইয়াদাইন করতে দেখেছেন এবং এটাই স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন। অন্যথায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং তার কোন সংগী তাকবীরে উলার পর নামাযে আর কোথাও হাত উপরে তুলেছেন বলে আমি শুনিনি।

١٠٩ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ اُذُنَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةِ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِىْ مَا سِوٰى ذٰلِكَ .

১০৯। আবদুল আযীয ইবনে হাকীম (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে নামায শুরু করার সময় প্রথম তাকবীরে তার দুই কান বরাবর তার দুই হাত উঠাতে দেখেছি। তিনি এছাড়া আর কোথাও রফউল ইয়াদাইন করেননি।[১০]

١١٠ - عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ عَلِىٍّ اَنَّ عَلِىَّ ابْنَ اَبِىْ طَالِبٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى الَّتِىْ يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلٰوةَ ثُمَّ لاَ يَرْفَعُهُمَا فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ .

১১০। আসেম ইবনে কুলাইব আল-জারমী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি আলী (রা)-র সহচর ছিলেন। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) কেবল নামায শুরু করার

---

১০. হাদীসবিশারদগণ আবদুল আযীয ইবনে হাকীমের এই বর্ণনার সমালোচনা করেছেন। কেননা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) রফউল ইয়াদাইনের অনুকূলে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারীতে ইবনে উমার (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি কোন ব্যক্তিকে রুকূতে যাওয়ার ও রুকূ থেকে উঠার সময় রফউল ইয়াদইন করতে না দেখলে তার প্রতি কাঁকড় নিক্ষেপ করতেন। অনন্তর তার সমস্ত নির্ভরযোগ্য শাগরিদ নাফে, সালেম, তাউস (র) প্রমুখ রফউল ইয়াদাইনের পক্ষে হাদীস বর্ণনা করেছেন (অনুবাদক)।

তাকবীর বলার সময় রফউল ইয়াদাইন করতেন। এরপর নামাযে আর কোথাও তিনি হাত উত্তোলন করতেন না।[১১]

١١١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ .

১১১। ইবনে মাসউদ (রা) কেবল নামায শুরু করার সময় রফউল ইয়াদাইন করতেন।[১২]

৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ।

١١٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَءَ مَعِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَقَالَ إِنِّيْ أَقُوْلُ

---

১১. সুনান আবু দাউদে হযরত আলী (রা) থেকে রফউল ইয়াদাইনের স্বপক্ষে হাদীস বর্ণিত আছে (অনুবাদক)।

১২. তাকবীরে তাহ্‌রীমা (অর্থাৎ নামায শুরু করার তাকবীর) ছাড়া নামাযের অন্য কোন জায়গায় রফউল ইয়াদাইন (কান পর্যন্ত দুই হাত উত্তোলন) সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী ও কুফার আলেমদের মতে রুকূতে যাওয়া ও উঠার সময় রফউল ইয়াদাইন করবে না। তারা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র হাদীস নিজেদের মতের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَلاَ أُصَلِّيْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ (ترمذى كتاب الصلوٰة باب رفع اليدين عند الركوع) قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

"আলকামা (র) বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, আমি কি তোমাদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুরূপ নিয়মে নামায পড়বো না? (আলকামা বলেন) অতঃপর তিনি নামায পড়লেন, কিন্তু তাকবীর উলা (তাহ্‌রীমা) ছাড়া আর কোথাও রফউল ইয়াদইন করেননি" (তিরমিযী)।

কিন্তু ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং সকল মুহাদ্দিসের মতে তাকবীরে উলা ছাড়াও রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার সময় রফউল ইয়াদাইন করা সুন্নাত। তারা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা), আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা), ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ নিজেদের মতের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র হাদীসে দুই রাক্‌আত শেষে তৃতীয় রাক্‌আতের জন্য উঠার সময়ও রফউল ইয়াদাইন করার কথা উল্লেখ আছে।

এতে সন্দেহ নেই যে, হাদীসে উভয় মতই স্বপ্রমাণিত। মতবিরোধ কেবল রাফউল ইয়াদাইন করা উত্তম, না না করা উত্তম এই বিষয়ে। ইমাম শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহ্‌লাবী (র) তার "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" নামক গ্রন্থে বলেছেন, "আমার কাছে রফউল ইয়াদাইনকারী ব্যক্তিই রফউল ইয়াদাইন বর্জনকারীর চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। তবে এই সুন্নাতের ব্যাপারটি নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া মোটেই সমীচীন নয়। কেননা ঝগড়া-বিবাদকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। তাই সুন্নাত পালনের ব্যাপার নিয়ে মতভেদ করে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া জায়েয নয়" (অনুবাদক)।

مَا لِىْ أُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا جَهَرَ بِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ .

১১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করা নামায থেকে অবসর হয়ে বলেন ঃ "তোমাদের কেউ আমার সাথে কিরাআত পাঠ করেছে কি? এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি (পড়েছি)। রাবী বলেন, তিনি বললেন ঃ এজন্যই তো আমি মনে বলছিলাম, কিরাআত আমার কাছে জটিল লাগছে কেন? (রাবী বলেন), এই কথা শোনার পর লোকজন 'উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করা নামাযে' রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে কিরাআত পাঠ করা থেকে বিরত থাকে।[১৩]

١١٣-حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ اِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ اَحَدٌ مَعَ الْاِمَامِ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ مَعَ الْاِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْاِمَامِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ مَعَ الْاِمَامِ .

১১৩। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পড়বে কিনা এ সম্পর্কে ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "তোমাদের কেউ যখন ইমামের সাথে নামায পড়ে, তখন তার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট"। ইবনে উমার (রা) ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তেন না।

١١٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلاَّ وَرَاءَ الْاِمَامِ .

১১৪। ওয়াহ্‌ব ইবনে কাইসান (র) বলেন যে, তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি এক রাক্‌আত নামায পড়লো এবং তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করলো না, সে নামাযই পড়লো না। তবে ইমামের সাথে নামায পড়লে স্বতন্ত্র কথা।[১৪]

١١٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ هِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا

---

১৩. একদল মুহাদ্দিস বলেছেন, "ফানতাহান-নাসু আনিল কিরাআতে' কথাটি ইমাম যুহরীর। যুহরীও এ হাদীসের একজন রাবী। কথাটি আবু হুরায়রারই হোক অথবা যুহরীর, এ হাদীস ইমাম মালেক ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতের পোষকতা করে। আর কিরাআত বলতে এখানে সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কোন কিরাআত পড়া নিষেধ (অনুবাদক)।

১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এবং জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র অভিমত ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতের পোষকতা করে (অনুবাদক)।

هُرَيْرَةَ اِنِّىْ اَحْيَانًا اَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِىْ وَقَالَ يَا فَارِسِىُّ اِقْرَأْ بِهَا
فِىْ نَفْسِكَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ
بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِىْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَئَلَ قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَءُوْا يَقُوْلُ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ
حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ
يَقُوْلُ الْعَبْدُ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ فَهٰذِهِ الْاٰيَةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَئَلَ وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّيْنَ فَهٰؤُلَاءِ لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَئَلَ .

১১৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়লো কিন্তু তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলো না তার নামায ব্যর্থ মূল্যহীন, তার নামায ব্যর্থ ও মূল্যহীন এবং অসম্পূর্ণ। আবুস সায়েব (র) বলেন, আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমি কখনো ইমামের পিছনে নামায পড়ি। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমার বাহুতে খোঁচা মেরে বলেন, হে পারস্যবাসী! তুমি তা মনে মনে পাঠ করো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ মহামহিম আল্লাহ বলেন ঃ আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে বিভক্ত করেছি। এর অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দার। আর আমার বান্দা যা চায় তা তার প্রাপ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ অতএব তোমরা (নামাযে সূরা ফাতিহা) পাঠ করো। বান্দা যখন বলে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের মালিক" তখন মহান আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে"। বান্দা যখন বলে, "তিনি করুণাময়, পরম দয়ালু" তখন মহান আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে"। বান্দা বলে, "তিনি বিচার দিনের মালিক", মহান আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা আমার উপযুক্ত সম্মান দান করেছে"। বান্দা বলে, "আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য চাই", তখন আল্লাহ বলেন, "এই আয়াতটি আমার ও আমার বান্দার মাঝে সমভাবে বণ্টিত এবং আমার বান্দা যা প্রার্থনা করে তাকে তাই দেয়া হয়"। বান্দা বলে, "আমাদের সরল পথ দেখাও, সেইসব বান্দাদ পথ যাদের তুমি নিয়ামত দান করেছো, যারা অভিশপ্ত নয় এবং পথভ্রষ্টও নয়", তখন আল্লাহ বলেন, এ সবই আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা প্রার্থনা করে তা তার প্রাপ্য"।[১৫]

---

১৫. জামায়াতে নামায পড়াকালে মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ইমাম শাফিঈর মতে মুক্তাদীগণকে সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে কোন অবস্থায়ই মুক্তাদীগণ ফাতিহা পাঠ করবে না। ইমাম মালেক ও আহমাদের

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করা নামায হোক অথবা অস্পষ্ট স্বরে কিরাআত পাঠ করা নামায, কোন অবস্থায়ই মুক্তাদীগণ ইমামের পিছনে কিরাআত পড়বে না। এর সমর্থনে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

١١٦- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الْاِمَامِ كَفَتْهُ قِرَاءَتُهُ .

১১৬। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ে, তার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট।

١١٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ قَالَ يَكْفِيْكَ قِرَاءَةُ الْاِمَامِ.

১১৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তার কাছে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তোমার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট।

١١٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ .

১১৮। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়ে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।

١١٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ .

১১৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়ে, তার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট।

মতে ইমামের ফাতিহা পাঠের শব্দ মুক্তাদীদের কানে আসলে তারা ফাতিহা পাঠ করবে না, অন্যথায় পাঠ করবে। "বিশিষ্ট হানাফী আলেম আল্লামা মোল্লা আলী আল-কারী, আবুল হাসান সিন্ধী, আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী ও রশীদ আহমাদ গাংগুহী (র) নিঃশব্দে কিরাআত পাঠ করা নামাযে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন" (হক্কানী তাফসীর, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী)।

মাওলানা মওদূদী (র) বলেন, "ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে আমি যতোদূর অনুসন্ধান করেছি, তার আলোকে অধিকতর সঠিক পন্থা এই মনে হয় যে, ইমাম যখন উচ্চস্বরে ফাতিহা পাঠ করেন, তখন মুক্তাদীগণ চুপ থাকবে। আর ইমাম যখন নিঃশব্দে পাঠ করবেন, তখন মুক্তাদীরাও চুপেচুপে ফাতিহা পাঠ করবে। এই পন্থায় কুরআন ও হাদীসের কোন নির্দেশের বিরোধিতা হওয়ার কোন সন্দেহ থাকে না। ফাতিহা পাঠ সম্পর্কিত যাবতীয় দলীল সামনে রেখে এরূপ একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো অবস্থায়ই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না অথবা সর্বাবস্থা ফাতিহা পাঠ করে, আমরা তার সম্পর্কে একথা বলতে পারি না যে, তার নামায হয় না। কেননা উভয় মতের স্বপক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী দলীল রয়েছে এবং এই ব্যক্তি জেনেবুঝে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করছে না। বরং তার কাছে দলীলের ভিত্তিতে যে মতটি প্রমাণিত, সে তার উপর আমল করছে (রাসয়েল-মাসায়েল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯-৮০) (অনুবাদক)।

١٢٠- حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ قَالَ فَسَئَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ فَاِنْ تَرَكْتَ فَقَدْ تَرَكَهُ نَاسٌ يُّقْتَدٰى بِهِمْ وَاِنْ قَرَأْتَ فَقَدْ قَرَأَهُ نَاسٌ يُّقْتَدٰى بِهِمْ وَكَانَ الْقَاسِمُ مِمَّنْ لاَ يَقْرَأُ .

১২০। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তেন না। সালেম (র) বলেন, আমি এ ব্যাপারে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "তুমি যদি ইমামের পিছনে কিরাআত না পড়ো, তবে নবী ﷺ-এর কতক সাহাবীও ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করেননি। অতএব তাদের কর্মনীতি অনুসরণযোগ্য। আর তুমি যদি কিরাআত পাঠ করো, তবে নবী ﷺ-এর কতক সাহাবী ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করেছেন। অতএব তাদের কর্মনীতিও অনুসরণযোগ্য"।[১৬] কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তেন না।

١٢١- عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ سُئِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ قَالَ اَنْصِتْ فَاِنَّ فِى الصَّلٰوةِ شُغْلاً سَيَكْفِيْكَ ذَاكَ الْاِمَامُ .

১২১। আবু ওয়াইল (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তুমি চুপ থাকো। কেননা নামাযের মধ্যে অবশ্যই ব্যস্ততা (গভীর মনোযোগ) রয়েছে। অতএব তোমার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট।

١٢٢- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ لاَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْمَا يُجْهَرُ فِيْهِ وَفِيْمَا يُخَافَتُ فِيْهِ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَلاَ فِى الْاُخْرَيَيْنِ وَاِذَا صَلّٰى وَحْدَهُ قَرَأَ فِى الْاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَلَمْ يَقْرَأْ فِى الْاُخْرَيَيْنِ شَيْئًا .

১২২। আলকামা ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তেন না, তা স্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পাঠ করা নামাযই হোক অথবা অস্পষ্ট আওয়াজে কিরাআত পাঠ করা নামায, প্রথম দুই রাক্‌আতেও নয় এবং শেষের দুই রাক্‌আতেও নয়। কিন্তু তিনি একাকী নামায পড়লে প্রথম দুই রাক্‌আতে সূরা ফাতিহা ও তার সাথে অন্য সূরা পাঠ করতেন এবং শেষের দুই রাক্‌আতে কিছুই পড়তেন না।

---

১৬. এই বক্তব্যের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা ও তার স্বীকৃতি দানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। অতএব যেসব ক্ষেত্রে মতবিরোধের সুযোগ আছে, তাতে নিজের পক্ষের মতকে অভ্রান্ত মনে করে বিরোধী মতকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার অনমনীয় নীতি অবলম্বন করা উচিত নয় (অনুবাদক)।

١٢٣– عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ فَاِنَّ فِي الصَّلٰوةِ شُغْلًا وَسَيَكْفِيْكَ الْاِمَامُ .

১২৩। আবু ওয়াইল (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, কিরাআত শোনার জন্য তুমি চুপ থাকো। কেননা নামাযের মধ্যে বিশেষ ব্যস্ততা (গভীর মনোনিবেশের প্রয়োজন) আছে। ইমাম তোমার জন্য যথেষ্ট।

١٢٤– عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ لَاَنْ اَعَضَّ عَلٰى جَمْرَةٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَقْرَاَ خَلْفَ الْاِمَامِ .

১২৪। আলকামা ইবনে কায়েস (র) বলেন, আমার মতে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করার চেয়ে জ্বলন্ত অংগার চিবানো অনেক ভালো।

١٢٥– عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَنْ قَرَاَ خَلْفَ الْاِمَامِ رَجُلٌ اُتُّهِمَ .

১২৫। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, প্রথম যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করেছিল তাকে তিরস্কার করা হয়েছিল।

١٢٦– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ اَمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلنَّاسِ فِي الْعَصْرِ قَالَ فَقَرَاَ رَجُلٌ خَلْفَهُ فَغَمَزَهُ الَّذِيْ يَلِيْهِ فَلَمَّا اَنْ صَلّٰى قَالَ لِمَ غَمَزْتَنِيْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُدَّامَكَ فَكَرِهْتُ اَنْ تَقْرَاَ خَلْفَهُ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَاِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ .

১২৬। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামাযে লোকদের ইমামতি করলেন। তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি কিরাআত পাঠ করলো। এতে তার পাশের ব্যক্তি তাকে খোঁচা দিলো। নামায শেষ হলে সে বললো, তুমি আমাকে খোঁচা দিলে কেন? সে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে তোমার কিরাআত পাঠ করা আমি পছন্দ করিনি, তাই খোঁচা মেরেছি। তাদের এই কথোপকথন শুনতে পেয়ে নবী ﷺ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ে তার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট"।

١٢٧–اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ الْمَدَنِيُّ اَخْبَرَنِيْ بَعْضُ وُلْدِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ اَنَّ سَعْدًا قَالَ وَدِدْتُّ اَنَّ الَّذِيْ يَقْرَاُ خَلْفَ الْاِمَامِ فِيْ فِيْهِ جَمْرَةٌ.

১২৭। দাউদ ইবনে কায়েস আল-ফাররা আল-মাদানী (র) বলেন, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র এক পুত্র আমাকে অবহিত করেন, সাদ (রা) বলেছেন, আমার মতে কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করার পরিবর্তে তার মুখে জ্বলন্ত অংগার রাখা অনেক ভালো।

١٢٨- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَيْتَ فِىْ فَمِ الَّذِىْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ حَجَرًا .

১২৮। মুহাম্মাদ ইবনে আজলান (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, হায়! ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠকারীর মুখে যদি পাথর দেয়া থাকতো।[১৭]

١٢٩- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْاِمَامِ فَلاَ صَلٰوةَ لَهُ .

১২৯। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করে তার নামায হয় না।[১৮]

৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নামাযের কিছু অংশ পায়।

١٣٠- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اذَا فَاتَهُ شَيْئٌ مِّنَ الصَّلٰوةِ مَعَ الْاِمَامِ الَّتِىْ يُعْلِنُ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَاِذَا سَلَّمَ قَامَ ابْنُ عُمَرَ فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيْمَا يَقْضِىْ .

১৩০। নাফে (র) বলেন, ইমাম যে নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়েন, তার কোন অংশ যদি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র ছুটে যেতো, তবে ইমামের সালাম ফিরানোর পর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করতেন এবং তাতে কিরাআত পড়তেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ ইমামের সাথে নামাযের না পাওয়া প্রথম অংশ তিনি পূর্ণ করতেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

[মুওয়াত্তা ইমাম মালেক-এ হাদীসটি এভাবে উক্ত হয়েছে ঃ

اذَا فَاتَهُ شَيْئٌ مِّنَ الصَّلٰوةِ مَعَ الْاِمَامِ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ الْاِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ اَنَّهُ اذَا سَلَّمَ الْاِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيْمَا يَقْضِىْ وَجَهَرَ (كتاب الصلوٰة باب العمل فى القراءة) .

"ইমাম যে নামাযের কিরাআত সশব্দে পড়েন, সেই নামাযের কোন অংশ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র ছুটে গেলে, ইমামের সালাম ফিরানোর পর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করতেন এবং তাতে সশব্দে কিরাআত পড়তেন"—অনুবাদক]।

---

১৭. একদল মুহাদ্দিস এই ধরনের বক্তব্য সম্বলিত হাদীসের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। যদি এগুলোকে যথার্থ বলে ধরে নেয়া হয় তবে এর দ্বারা সতর্ক, তম্বিহ ও তাকিদ করাই উদ্দেশ্য। অথবা ইমামের প্রকাশ্য কিরাআতের ক্ষেত্রে তা প্রয়োজ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে মুক্তাদী কিরাআত পাঠ করলে ইমামের কিরাআত পাঠে জটিলতটা সৃষ্টি হতে পারে (অনুবাদক)।

১৮. 'নামায হয় না' অর্থ নামায পূর্ণাংগ হয় না (অনুবাদক)।

١٣١- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا جَاءَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ رَفَعُوْا مِنْ رَكْعَتِهِمْ سَجَدَ مَعَهُمْ .

১৩১। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নামায পড়তে এসে যদি দেখতে পেতেন, লোকেরা রুকূ থেকে মাথা তুলে নিয়েছে তবে তিনি সিজদায় তাদের সাথে শরীক হতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নিয়ম অনুযায়ী আমল করি। ইমামকে সিজদারত পেলে এই অবস্থায় তার সাথে নামাযে শরীক হবে। কিন্তু তা নামাযের রাক্‌আত হিসাবে গণ্য হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

١٣٢- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا وَجَدَ الْاِمَامَ قَدْ صَلّٰى بَعْضَ الصَّلٰوةِ مَعَهُ مَا اَدْرَكَ مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ كَانَ قَائِمًا قَامَ وَاِنْ كَانَ قَاعِدًا قَعَدَ حَتّٰى يَقْضِيَ الْاِمَامُ صَلٰوتَهُ لَا يُخَالِفُ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ .

১৩২। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) যখন ইমামকে এমন অবস্থায় পেতেন যে, নামাযের কিছু অংশ পড়া হয়ে গেছে, তখন তিনি তার সাথে ঐ অবস্থায় নামাযে শামিল হতেন। তিনি ইমামকে দাঁড়ানো বা বসা যে অবস্থায় পেতেন সেই অবস্থায় নামাযে শরীক হতেন এবং নামাযের কোন ব্যাপারেই ইমামের বিপরীত করতেন না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা ও ইমাম আবু হানীফা (র) এই নীতি গ্রহণ করেছি।

١٣٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِّنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ .

১৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি নামাযের এক রাক্‌আত পেলে সে নামায পেয়ে গেলো (অথবা যে ব্যক্তি রুকূ পেয়ে গেলো সে নামায পেয়ে গেলো)।[১৯]

---

১৯. এ হাদীসের "রাক্‌আত পাওয়ার" অর্থ নির্দ্ধারণে হাদীস বিশারদদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। তাদের কতকের মতে, রাক্‌আত পাওয়ার অর্থ ওয়াক্ত পাওয়া। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক্‌আত ধরতে পারে, তবে সে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্তের নামায তার ওয়াক্তের মধ্যেই পেয়ে গেলো বলে গণ্য হবে, তার নামায কাযা গণ্য হবে না। অথবা এর দ্বারা নামাযের ফযীলাত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাক্‌আত পড়তে পারলে তাকে জামাআতে পূর্ণ নামায পড়ার সমান সওয়াব দেয়া হবে। অথবা এর দ্বারা রুকূ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকূর মধ্যে নামাযে শামিল হতে পারবে, সে ঐ রাক্‌আতটি পেয়েছে বলে গণ্য হবে। এই শোষাক্ত অর্থই অন্যান্য হাদীসের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করি। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

١٣٤-أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةَ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ .

১৩৪। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলতেন, তোমাদের মধ্যে কারো রুকূ ছুটে গেলে তার সিজদাও ছুটে গেছে বলে গণ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে দু'টি সিজদা পেলেও রুকূ না পাওয়ার কারণে তা (রাক্আত) গণনায় ধরা হবে না। ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকে দুই সিজদা সহকারে গোটা রাক্আত আদায় করতে হবে। ইমাম আবু হানীফার এই মত।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ফরয নামাযের রাক্আতগুলোতে সূরাসমূহ পাঠ করে।

١٣٥- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ اِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِى الْأَرْبَعِ جَمِيْعًا مِّنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَكَانَ اَحْيَانًا يَقْرَأُ بِالسُّوْرَتَيْنِ اَوِ الثَّلاَثِ فِىْ صَلٰوةِ الْفَرِيْضَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ وَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ كَذٰلِكَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَسُوْرَةٍ سُوْرَةٍ .

১৩৫। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) যখন একাকী নামায পড়তেন তখন যুহর এবং আসরের নামাযের প্রতি রাক্আতে সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের অন্য সূরা পাঠ করতেন। তিনি কখনো কখনো ফরয নামাযের একই রাক্আতে দু'টি অথবা তিনটি সূরা পাঠ করতেন। তিনি মাগরিবের নামাযের প্রথম দুই রাক্আতে সূরা ফাতিহা এবং আরো একটি করে সূরা পাঠ করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ফরয নামাযের প্রথম দুই রাক্আতে সূরা ফাতিহা ও তার সাথে আরো দু'টি সূরা পাঠ করা সুন্নাত (ওয়াজিব)। আর শেষের দুই রাক্আতে কেবল সূরা ফাহিতা পাঠ করবে। যদি শেষের দুই রাক্আতে কিছু না পড়ে অথবা "সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ" বলে তবে তাও জায়েয। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ সশব্দে কিরাআত পাঠ করা এবং তা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে।

١٣٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِىْ عَمِّىْ أَبُوْ سُهَيْلٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِى الصَّلٰوةِ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ أَبِىْ جَهْمٍ .

১৩৬। ইমাম মালেক (র) থেকে তার চাচা আবু সুহাইলের সূত্রে বর্ণিত। তার পিতা (মালেক ইবনে আবু আমের আল-আসবাহী) বলেছেন যে, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব

(রা) এতোটা শব্দ করে নামাযের কিরাআত পড়তেন যে, তা তিনি আবু জাহম (রা)-র ঘরের নিকট থেকে শুনতে পেতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যেসব নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়ার নিয়ম আছে, তাতে সশব্দে কিরাআত পড়াই উত্তম, যদি সেভাবে পড়তে কষ্ট না হয়।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে 'আমীন' বলা।

١٣٧- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا أَمَّنَ الْاِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ .

১৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "ইমাম যখন আমীন বলেন, তোমরাও আমীন বলো। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে সাথে হবে তার পূর্বেকার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে"। ইমাম মালেক (র) বলেন, ইবনে শিহাব (র) বলেছেন, নবী ﷺ-ও 'আমীন' বলতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। ইমাম সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বলবে এবং মুক্তাদীরাও তার অনুসরণ করবে, তবে তা উচ্চস্বরে বলবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, মুক্তাদীরা আমীন বলবে, কিন্তু ইমাম আমীন বলবে না।[২০]

১২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ভুল হয়ে গেলে।

١٣٨- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِى الصَّلٰوةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৩৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন শয়তান এসে তাকে ভুলিয়ে দেয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত তার মনে থাকে না যে, সে কতো রাক্‌আত পড়েছে। অতএব তোমাদের কারো এইরূপ অবস্থা হলে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা দেয়।

---

২০. ইমাম-মুক্তাদী উভয়ের জন্য আমীন বলা সুন্নাত। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং মুহাদ্দিস সাধারণ সশব্দে কিরাআত পড়া নামাযে সশব্দে আমীন বলার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা কোন কোন বর্ণনায় 'রাফাআ বিহা সাওতাহু (রাসূলুল্লাহ ﷺ সশব্দে আমীন বলেছেন) বাক্য এসেছে। আবার কোন কোন বর্ণনায় 'খাফাদা বিহা সাওতাহু' (তিনি নীরবে আমীন বলেছেন) বাক্য এসেছে। এ কারণে ইমাম সাহেব ও সাহেবাইন নীরবে আমীন বলার পক্ষপাতী (অনুবাদক)।

١٣٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِىْ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيْتَ فَقَالَ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ فَاَتَمَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ .

১৩৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামায পড়ালেন। তিনি দুই রাক্‌আত পড়ে সালাম ফিরালেন। তৎক্ষণাৎ যুল-ইয়াদাইন (রা)[২১] উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে না আপনি ভুল করেছেন? তিনি বলেন ঃ এর কোনটিই নয়। যুল-ইয়াদাইন (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই দু'টির কোন একটি অবশ্যই ঘটেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন, অতঃপর বসা অবস্থায়ই এবং সালাম ফিরানোর পর দুইটি সিজদা দিলেন।

١٤٠- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى ثَلٰثًا اَمْ اَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَّلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَاِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِىْ صَلّٰى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَاِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيْمٌ لِّلشَّيْطَانِ .

১৪০। আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার নামাযে সন্দেহে পড়ে যায় এবং সে জানে না কতো রাক্‌আত পড়েছে, চার রাক্‌আত পড়েছে না তিন রাক্‌আত, তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে আর এক রাক্‌আত পড়বে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা দিবে। যদি তার রাক্‌আতটি পঞ্চম রাক্‌আত হয়ে থাকে, তবে এই দু'টি সিজদা মিলিয়ে তা দুই রাক্‌আত হবে। আর যদি তা চতুর্থ রাক্‌আত হয়ে থাকে, তবে এই দু'টি সিজদা শয়তানের জন্য অপমানের কারণ হবে।

١٤١- عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهٗ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهٗ كَبَّرَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ثُمَّ سَلَّمَ .

---

২১. যুল-ইয়াদাইন (রা)-র নাম কুরবান ইবনে আমর আস-সুলামী। কেউ বলেছেন, তাঁর হাত দু'টি লম্বা হওয়ার কারণে তাকে যুল-ইয়াদাইন নামে ডাকা হতো। আবার কেউ বলেছেন, তিনি অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন, তাই তাকে এ নামে ডাকা হতো। তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হন (অনুবাদক)।

১৪১। ইবনে বুহাইনা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাদের দুই রাক্‌আত নামায পড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং (তাশাহ্‌হুদ পড়ার জন্য) বসেননি। লোকেরাও দাঁড়িয়ে গেলো। তিনি যখন নামায পূর্ণ করলেন এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন।

١٤٢– عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَئَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبًا عَنِ الَّذِىْ يَشُكُّ كَمْ صَلّٰى ثَلٰثًا اَوْ اَرْبَعًا قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالاَ فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَةً اُخْرٰى قَائِمًا ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ اِذَا صَلّٰى .

১৪২। আতা ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এবং কাব আল-আহবার (র)-র কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি সন্দেহে পড়ে গেছে যে, সে তিন রাক্‌আত পড়েছে না চার রাক্‌আত? তারা উভয়ে বলেন, সে দাঁড়িয়ে গিয়ে আরো এক রাক্‌আত নামায পড়ার পর দু'টি সাহু সিজদা করবে।[২২]

١٤٣– حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ قَالَ يَتَوَخّٰى اَحَدُكُمُ الَّذِىْ يَظُنُّ اَنَّهُ نَسِىَ مِنْ صَلٰوتِهِ .

১৪৩। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা)-কে নামাযে ভুলকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ তার নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হলে চিন্তা করে ঠিক করবে সে কতো রাক্‌আত পড়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি। যখন কোন ব্যক্তি কিয়ামের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং বসার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন দু'টি সাহু সিজদা করা তার

---

২২. সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহু সিজদা করা অথবা সালামের পরে করা-উভটিই হাদীস থেকে প্রমাণিত। ইমাম শাফিঈর মতে যে কোন অবস্থায় সালামের পূর্বে সাহু সিজদা করতে হবে। ইমাম মালেক উভয় প্রকারের হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বলেন, ভুল বশত নামায কম হয়ে গেলে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহু সিজদা করবে। আর যদি ভুল বশত নামায অতিরিক্ত হয়ে যায়, তবে সালাম ফিরানোর পর সাহু সিজদা করবে। ইমাম আবু হানীফার মতে যে কোন প্রকার ভুলের জন্য শেষ রাক্‌আতে তাশাহ্‌হুদ পড়ার পর একদিকে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা করবে। অতঃপর পুনরায় তাশাহ্‌হুদ ও দরূদ পাঠ করার পর সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। হানাফী আলেমগণ আবু দাউদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীস নিজেদের মতের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তুমি নামাযে থাকা অবস্থায় যদি সন্দেহে পড়ে যাও যে, তুমি তিন রাক্‌আত পড়েছো না চার রাক্‌আত এবং তোমার প্রবল ধারণা হচ্ছে যে, তুমি চার রাক্‌আত পড়েছো তবে তুমি তাশাহ্‌হুদ পড়ো এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করো। অতঃপর পুনরায় তাশাহ্‌হুদ পড়ে সালাম ফিরাও। (তবে আবু দাউদের মতে এটা সনদসূত্র কর্তিক হাদীস এবং আবু উবাইদা এ হাদীস ইবনে মাসউদ (রা)-র কাছে শুনেননি)। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-র হাদীসে বলা হয়েছে "রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়ালেন। তিনি নামাযে ভুল করলেন। অতএব তিনি দু'টি সিজদা করলেন, অতঃপর তাশাহ্‌হুদ পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন" (অনুবাদক)।

উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। প্রতিটি ভুলের জন্য (তাশাহ্হুদের পর একদিকে) সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাহ্ সিজদা করতে হবে, চাই নামায বেশী অথবা কম হোক অথবা শয়তান সন্দেহে লিপ্ত করে দিয়ে থাকুক যে, নামায তিন রাক্আত পড়া হয়েছে না চার রাক্আত। যদি কোন ব্যক্তি প্রথমবারের মতো এই সন্দেহে পতিত হয়, তবে সে গোটা নামাযই পুনর্বার পড়বে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রায়ই এ ধরনের সন্দেহে পতিত হয়, সে নিজের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে কাজ করবে-যদি সে নিশ্চিত না থাকে। তবে তার অধিক চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত হওয়া ঠিক হবে না। কেননা শয়তান তাকে যে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয়, তা থেকে সে কখনো নিস্তার পেতে পারে না। এ সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীস রয়েছে।

١٤٤- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى بِهِمْ فِيْ سَفَرٍ كَانَ مَعَهُ فِيْهِ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ نَاءَ لِلْقِيَامِ فَسَبَّحَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ فَرَجَعَ ثُمَّ لَمَّا قَضَى صَلٰوتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ لاَ اَدْرِىْ اَقَبْلَ التَّسْلِيْمِ اَوْ بَعْدَهُ .

১৪৪। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, এক সফরে আনাস ইবনে মালেক (রা) লোকদের নামাযে ইমামতি করেন। তিনিও আনাস (রা)-র সাথে এই সফরে শরীক ছিলেন। আনাস (রা) দুই রাক্আত পড়ার পর (ভুলবশত) দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় লোকেরা 'সুবহানাল্লাহ' বললে তিনি বসে পড়েন। অতঃপর তিনি নামায শেষ করে দু'টি সাহ্ সিজদা করেন। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, কিন্তু তিনি সালামের পূর্বে সিজদা করেছেন না সালামের পর তা আমার স্মরণ নেই।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় কাঁকর সরিয়ে স্থান সমতল করা অবাঞ্ছিত কাজ এবং তা মাকরূহ।

١٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الْقَارِىُّ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَسْجُدَ سَوَّى الْحَصٰى تَسْوِيَةً خَفِيْفَةً وَقَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ كُنْتُ يَوْمًا اُصَلِّىْ وَابْنُ عُمَرَ وَرَائِىْ فَالْتَفَتُّ فَوَضَعَ يَدَهُ فِىْ قَفَاىَ فَغَمَزَنِىْ .

১৪৫। আবু জাফর আল-কারী (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি যখন সিজদা দেয়ার ইচ্ছা করতেন তখন আস্তে কাঁকর সরিয়ে (সিজদার স্থান) সমতল করতেন। আবু জাফর (র) আরো বলেন, একদিন আমি নামায পড়ছিলাম, ইবনে উমার (রা) আমার পিছনে ছিলেন। আমি দৃষ্টিপাত করলে তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে খোঁচা দেন।[২৩]

---

২৩. নামাযের মধ্যে অযথা নড়াচড়া করা এবং এদিক-সেদিক তাকানো যে মাকরূহ, ইবনে উমার (রা)-র খোঁচা দেয়া থেকে তাই প্রমাণিত হয়। আবু দাউদে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে মারফূ বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "বান্দা যতোক্ষণ পর্যন্ত নামাযে এদিক সেদিক না তাকায় আল্লাহ তাআলা ততোক্ষণ তার দিকে মনোনিবেশ করে থাকেন। কেননা বান্দা নামাযের মধ্যে তাঁর প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে থাকে" (অনুবাদক)।

١٤٦- عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ اَنَّهُ قَالَ رَاٰنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَعْبَثُ بِالْحَصٰى فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِىْ وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى .

১৪৬। আলী ইবনে আবদুর রহমান আল-মুআবী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমাকে নামাযের মধ্যে অযথা কাঁকড় নাড়াচাড়া করতে দেখলেন। আমি নামায থেকে অবসর হলে তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে যেরূপ করেছেন, তুমিও তদ্রূপ করো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিরূপ করতেন? তিনি বলেন, নামাযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বসতেন, তখন তাঁর ডান হাতের তালু তাঁর ডান উরুর উপর রাখতেন এবং তিনি আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করে রেখে বৃদ্ধাংগুলির নিকটতম (শাহাদাত) আংগুল দিয়ে (তাশাহ্হুদ পড়ার সময়) ইশারা করতেন, আর বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখতেন।[২৪]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এবং ইমাম আবু হানীফা (র) রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই কর্মপন্থা গ্রহণ করেছি। অবশ্য নামাযে একবার কাঁকর সরানোতে কোন দোষ নেই, তবে তা না করাই উত্তম। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে তাশাহ্হুদ পাঠ।

١٤٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَتَشَهَّدُ فَتَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ وَلَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

১৪৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নামযে নিম্নোক্ত তাশাহ্হুদ পড়তেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ وَلَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

---

২৪. তাশাহ্হুদ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান হাতের শাহাদাত আংগুল উঠিয়ে আল্লাহ্র একত্বের প্রতি ইংগিত করতেন (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, বায়হাকী, দারিমী; রাবী ঃ ইবনে উমার, ইবনে যুবায়ের, ওয়াইল ইবনে হুজর এবং আবু হুরায়রা (রা)। আরও দ্র. বিবিধ প্রসংগ অধ্যায়, ১৪ নম্বর টীকা) (অনুবাদক)।

"যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদা, উপাসনা ও পবিত্র বিষয় আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে নবী! আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও প্রাচুর্য বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক"।

١٤٨ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ يَقُوْلُ قُوْلُوا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১৪৮। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে মিম্বারের উপর বসে লোকদের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতে শুনেছেন। তিনি বলেন, তোমরা বলো ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

(অনুবাদ ঃ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ)।

١٤٩ - اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ وَالزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ شَهِدْتُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَشَهِدْتُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَقُوْلُ هٰذَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَيَدْعُوْ بِمَا بَدَا لَهُ اِذَا قَضٰى تَشَهُّدَهُ فَاِذَا جَلَسَ فِىْ اٰخِرِ صَلٰوتِهِ تَشَهَّدَ كَذَالِكَ اِلاَّ اَنَّهُ يُقَدِّمُ ثُمَّ يَدْعُوْ بِمَا بَدَا لَهُ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُسَلِّمَ قَالَ اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَّمِيْنِهِ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْاِمَامِ فَاِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ اَحَدٌ عَنْ يَّسَارِهِ رَدَّ عَلَيْهِ .

১৪৯। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নিম্নোক্ত তাশাহ্হুদ পড়তেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ وَالزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ شَهِدْتُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَشَهِدْتُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ .

তিনি প্রথম দুই রাক্‌আতের পর প্রথম বৈঠকে উপরোক্ত তাশাহ্হুদ পড়তেন এবং ইচ্ছামত যে কোন দোয়া পড়তেন। অতঃপর তিনি যখন দ্বিতীয় বৈঠকে বসতেন, তখনও উপরোক্ত তাশাহ্হুদ পড়তেন, কিন্তু প্রথমে তাশাহ্হুদ পড়তেন ও পরে দোয়া পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর সময় বলতেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِىِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

তিনি ডানদিকের সালামে উপরোক্ত দোয়া পড়তেন, অতঃপর ইমামের সালামের জবাব দিতেন। অতঃপর বামদিকের কেউ যদি তাঁকে সালাম দিতো, তাহলে তিনি তার জবাব দিতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উল্লেখিত সব তাশাহ্হুদই উত্তম বটে, কিন্তু তা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র তাশাহ্হুদের সমকক্ষ হতে পারে না। আমাদের কাছে তার তাশাহ্হুদই সর্বোত্তম এবং আমরা তাই গ্রহণ করেছি। কেননা তিনি নবী ﷺ-এর কাছ থেকে তা বর্ণনা করেছেন এবং অধিকাংশ লোক এই তাশাহ্হুই পাঠ করেন।

١٥٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوتَهُ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَا تَقُوْلُوْا اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

১৫০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়তাম তখন বলতাম, 'আস-সালামু আলাল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযশেষে আমাদের দিকে ফিরে বলেন ঃ তোমরা 'আস-সালামু আলাল্লাহ্' বলো না। আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন শান্তিদাতা (তাঁর এক নাম সালাম)। বরং তোমরা বলো ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিখানো তাশাহ্হুদের মধ্যে শব্দে কম-বেশী বা বাড়ানো-কমানো অপছন্দ করতেন।[২৫]

---

২৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন ঠিক সেভাবে আমাদের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের যেভাবে সূরা শিখাতেন ঠিক সেভাবে আমাদের তাশাহ্হুদ শিখাতেন। তিনি বলতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ (النسائى).

সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বিভিন্ন সাহাবী থেকে এসব তাশাহ্হুদ বর্ণিত হয়েছে (যদিও এগুলোর মধ্যে অর্থগত দিক থেকে খুব একটা পার্থক্য নেই)। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শব্দে তাশাহ্হুদ পড়েছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং উল্লেখিত তাশাহ্হুদের যে কোন একটি পড়া জায়েয। ইমাম মালেক (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র তাশাহ্হুদ গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) ও অধিকাংশ হাদীস বিশারদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র তাশাহ্হুদ গ্রহণ করেছেন। তার এই তাশাহ্হুদ বুখারী-মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। হাদীস বিশারদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত তাশাহ্হুদ অন্যান্য সব তাশাহ্হুদের তুলনায় অধিকতর সহীহ এবং বিভিন্ন রাবী কর্তৃক বর্ণিত এই তাশহ্হুদের মূল পাঠে (মতন) কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। অনন্তর সনদের দিক থেকেও এই তাশাহ্হুদ অধিক শক্তিশালী এবং মারফূ। ইমামদের মতভেদ শুধু তুলনামূলকভাবে কোনটি উত্তম তা নিয়ে।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সুন্নাত অনুমোদিত পদ্ধতি।

١٥١- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِيْ يَضَعُ جَبْهَتَهُ عَلَيْهِ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَرْدٍ شَدِيْدٍ وَاِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ بُرْنُسِهِ حَتّٰى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصٰى .

১৫১। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) যখন সিজদা করতেন, তখন যে জিনিসের উপর সিজদা করতেন তার উপর নিজের হাত রাখতেন। নাফে (র) আরো বলেন, আমি তীব্র শীতের দিনে তাকে দেখেছি যে, তিনি নিজের জুব্বার ভেতর থেকে হাত বের করে তা কাঁকরময় জমীনের উপর রাখতেন।

١٥٢- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ فِي الْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ ثُمَّ اِذَا رَفَعَ جَبْهَتَهُ فَلْيَرْفَعْ كَفَّيْهِ فَاِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ .

১৫২। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি নিজের কপাল জমীনের উপর রাখে সে যেন তার হাতও জমীনের উপর রাখে। অতঃপর সে যখন তার কপাল তুলবে তখন তার দুই হাতও তুলবে। কেননা কপাল যেরূপ সিজদা করে উভয় হাতও তদ্রূপ সিজদা করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি। সিজদার জন্য কপাল যখন মাটিতে রাখবে, তখন উভয় হাতও কান বরাবর মাটিতে রাখবে এবং হাতের আংগুলগুলোকে মিলিতভাবে কিবলামুখী করে রাখবে। আবার সিজদা থেকে মাথা তোলার সাথে সাথে হাতও তুলবে। যার তীব্র শীত অনুভূত হয়, সে যদি চাদর সমেত হাত জমিনে রাখে তবে তাতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

ইমাম বুখারী ও অপরাপর মুহাদ্দিসগণ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জীবিত ছিলেন তখন আমরা তাশাহ্হুদে "আস-সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু পড়তাম"। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর আমরা এর পরিবর্তে "আস-সালামু আলান নাবিয়্যি" পড়তে থাকলাম। বায়হাকী ও অন্যান্য গ্রন্থে এই কথা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র তাশাহ্হুদেও "আস-সালামু আলান নাবিয়্যি" এসেছে। তাবিঈ আতা (র) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জীবিত ছিলেন, সাহাবীগণ তাশাহ্হুদে "আস-সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু" পড়তেন। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর "আস-সালামু আলান নাবিয়্যি পড়তেন" (মুসনাদে আবদুর রায্যাক)। তবে একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরও তাঁর শিখানো তাশাহ্হুদই পড়েছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ আছে (অনুবাদক)।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে বসা।

١٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ صَلّٰى اِلٰى جَنْبِهِ رَجُلٌ فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ تَرَبَّعَ وَيَثْنِى رِجْلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ابْنُ عُمَرَ عَابَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ قَالَ الرَّجُلُ فَاِنَّكَ تَفْعَلُهُ قَالَ اِنِّىْ اَشْتَكِىْ .

১৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লো । সে চার রাক্‌আত পড়ে চার উরু হয়ে দুই পা লেপটিয়ে বসলো। ইবনে উমার (রা) নামায থেকে অবসর হয়ে তার ত্রুটি নির্দেশ করেন। সে বললো, আপনিও তো এরূপ করেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি তো অসুবিধার কারণে তা করেছি।

١٥٤-عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَرٰى اَبَاهُ يَتَرَبَّعُ فِى الصَّلٰوةِ اِذَا جَلَسَ قَالَ فَفَعَلْتُهُ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ فَنَهَانِىْ اَبِىْ فَقَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةِ الصَّلٰوةِ وَاِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِىْ رِجْلَكَ الْيُسْرٰى .

১৫৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) তার পিতা আবদুল্লাহ (রা)-কে নামাযে চার উরু হয়ে বসতে দেখলেন। আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমিও তদ্রূপ করলাম এবং তখন আমি তরুণ। পিতা আমাকে এভাবে বসতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, এটা নামাযের সুন্নাত নিয়ম নয়। সুন্নাত নিয়ম এই যে, তুমি তোমার ডান পায়ের পাতা দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে বাঁ পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের এবং ইমাম আবু হানীফারও এই মত। ইমাম মালেক প্রথম বৈঠকে এভাবে বসতে বলেন, কিন্তু শেষ বৈঠক সম্পর্কে বলেন, পাছা মাটিতে ঠেকিয়ে বসবে এবং উভয় পা ডান কাতে বের করে দিবে।[২৬]

١٥٥- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ رَاَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ يَجْلِسُ عَلٰى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا فَعَلْتُهُ مُنْذُ اشْتَكَيْتُ .

---

২৬. ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদ ইবনে হাম্বলেরও এই মত। বুখারীতে আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ বৈঠকে তাঁর ডান পা খাড়া রেখে বাম পা উরুর নীচে থেকে বের করে পাছা মাটিতে রাখতেন।" হানাফী মাযহাব মতে উভয় বৈঠকে ডান পা খাড়া রাখতে হবে এবং বাম পায়ের উপর বসেত হবে (অনুবাদক)।

১৫৫। মুগীরা ইবনে হাকীম (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে দুই সিজদার মাঝখানে তার উভয় পায়ের গোড়ালির উপর বসতে দেখেছি। আমি এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, অসুখ হওয়ার সময় থেকে এরূপ করে আসছি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের নীতিও তাই। অর্থাৎ দুই সিজদার মাঝখানে পায়ের গোড়ালির উপর বসা ঠিক নয়; বরং তাশাহ্হুদের কায়দায় বসবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ বসে নামায পড়া।

١٥٦- عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّيْ فِيْ سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّوْرَةِ وَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُوْنَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا .

১৫৬। নবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে কখনও বসে নফল নামায পড়তে দেখিনি। তবে মৃত্যুর এক বছর পূর্ব থেকে তিনি বসে নফল নামায পড়তেন এবং সূরা সুন্দরভাবে এতোটা থেমে থেমে পড়তেন যে, তা বড়ো থেকে বৃহত্তর সূরা মনে হতো।

١٥٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ مِثْلُ نِصْفِ صَلٰوتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ .

১৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কারো বসে পড়া নামাযের সওয়াব তার দাঁড়িয়ে পড়া নামাযের সওয়াবের অর্ধেক।

١٥٨- حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ نَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وَعْكِهَا شَدِيْدٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فِيْ سُبْحَتِهِمْ قُعُوْدًا فَقَالَ صَلٰوةُ الْقَاعِدِ عَلٰى نِصْفِ صَلٰوةِ الْقَائِمِ .

১৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমরা মদীনায় ফিরে এসে কঠিন মহামারীতে আক্রান্ত হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের কাছে এলেন। তখন তারা বসে বসে নফল নামায পড়ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বসে পড়া নামাযে দাঁড়িয়ে পড়া নামাযের অর্ধেক সওয়াব।[২৭]

---

২৭. রোগগ্রস্ত অবস্থায় বসে নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে নামায পড়ার তুলনায় অর্ধেক সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বসে নামায পড়লেও রোগমুক্ত ব্যক্তির দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সমান সওয়াব পায় (অনুবাদক)।

١٥٩-عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَصَلّٰى صَلٰوةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ جَالِسٌ فَصَلَّيْنَا جُلُوْسًا فَلَمَّا انْصَرَفَ فَقَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ اِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعِيْنَ .

১৫৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলেন। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন এবং ফলে তাঁর ডান পাঁজর থেতলিয়ে গেলো। তাই তিনি কোন এক ওয়াক্তের নামায বসে পড়লেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে বসে নামায পড়লাম। নামায থেকে অবসর হয়ে তিনি বলেন ঃ "ইমাম এজন্য নিযুক্ত করা হয় যে, তাকে অনুসরণ করা হবে। সে যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়ো। সে যখন রুকূতে যায়, তোমরাও রুকূতে যাও এবং সে যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে তোমরা তখন 'রব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলো। সে যদি বসে নামায পড়ে, তবে তোমরা সবাইও বসে নামায পড়ো"।[২৮]

١٦٠- عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ اَحَدٌ بَعْدِىْ جَالِسًا فَاَخَذَ النَّاسُ بِهٰذَا .

১৬০। আমের আশ-শারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আমার পরে আর কেউ যেন বসে বসে লোকদের ইমামতি না করে"। অতএব লোকেরা তাঁর এই নির্দেশ গ্রহণ করেছে।[২৯]

---

২৮. জমহুরের মতে কোন ওজর বশত ইমাম বসে নামায পড়লেও মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। অপর হাদীস থেকে জানা যায়, "রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুকালীন রোগে আক্রান্ত হন, তখন তিনি বসে ইমামতি করেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা) তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েন।" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই সর্বশেষ আমল পূর্ববর্তী আমলকে রহিত করে দিয়েছে (অনুবাদক)।

২৯. সনদের দিক থেকে হাদীসটি দুর্বল। অতএব এ হাদীস থেকে দলীল নেয়া ঠিক হবে না। এই হাদীসের এক রাবী জাবের ইবনে ইয়াযীদ আল-জুফী হাদীস বিশারদদের মতে মিথ্যাবাদী (কাযযাব)। বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, "আমি জাবের আল-জুফীর সমতুল্য মিথ্যাবাদী আর দেখিনি" (অনুবাদক)।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ এক কাপড়ে নামায পড়া।

١٦١- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىِّ قَالَ كَانَتْ مَيْمُوْنَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ تُصَلِّىْ فِى الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا اِزَارٌ .

১৬১। উবায়দুল্লাহ আল-খাওলানী (র) বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মুনা (রা) একটি জামা ও একটি ওড়না পরিধান করে নামায পড়তেন এবং তার পরনে পাজামা থাকতো না।

١٦٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَائِلاً سَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ قَالَ اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ .

১৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে নামায পড়ার বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন ঃ "তোমাদের সকলের কি দু'টি করে কাপড় আছে"?

١٦٣- عَنْ عَقِيْلِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا بِثَوْبٍ (بِثَوْبِهِ) .

১৬৩। আবু তালিব-কন্যা উম্মু হানী (রা) তার ভাই আকীল (রা)-কে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর সর্বশরীরে একটিমাত্র কাপড় জড়িয়ে আট রাক্আত নামায পড়েন।

١٦٤- عَنْ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهَا ذَهَبَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ وَذٰلِكَ ضُحًى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلّٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِىْ ثَوْبٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ اُمِّىْ اَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً اَجَرْتُهُ فُلاَنَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَا اُمَّ هَانِئٍ .

১৬৪। আবু তালিব-কন্যা উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। তিনি তাঁকে গোসলরত অবস্থায় পেলেন এবং তার কন্যা ফাতিমা (রা) একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখেন। রাবী বলেন, আমি সালাম জানালাম,

সময়টা ছিল উঠন্ত বেলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন ঃ কে? (রাবী বলেন), আমি বললাম, আমি আবু তালিব-কন্যা উম্মু হানী। তিনি বলেন ঃ "উম্মু হানীকে স্বাগতম"। তিনি গোসল সেরে সর্বশরীরে একটি কাপড় জড়িয়ে আট রাক্‌আত নামায পড়লেন। তিনি নামায থেকে অবসর হলে পর আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হুবায়রার অমুক পুত্রকে (জাদ) আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু আমার মায়ের ছেলে (আলী) তাকে হত্যা করার সুযোগ খোঁজছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "হে উম্মু হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছো, আমরাও তাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলাম"।

١٦٥- اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ التَّيْمِىُّ عَنْ اُمِّهِ اَنَّهَا سَئَلَتْ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ مَاذَا تُصَلِّىْ فِيْهِ الْمَرْاَةُ قَالَتْ فِى الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِىْ يُغَيِّبُ ظُهُوْرَ (ظَهْرَ) قَدَمَيْهَا .

১৬৫। মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ আত-তাইমী (র) থেকে তার মা হিন্দ্ বিনতে আবু উমাইয়্যার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-র কাছে জানতে চাইলেন, মহিলারা কয়টি কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে পারে? তিনি বলেন, ওড়না ও জামা পরিধান করে নামায পড়তে পারে, যদি জামা পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা হয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা উপরোল্লেখিত নীতি গ্রহণ করেছি। যদি একটিমাত্র কাপড় দিয়ে ভালোভাবে সতর ঢাকা সম্ভব হয় তবে সেই পোশাকে নামায পড়া জায়েয। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায (সালাতুত তাহাজ্জুদ)।

١٦٦-عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ الصَّلٰوةُ بِاللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُّصْبِحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَّاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ قَدْ صَلّٰى.

১৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলো, রাতের (নফল) নামায কিভাবে পড়তে হবে? তিনি বলেন ঃ "দুই রাক্‌আত দুই রাক্‌আত করে। যখন তোমাদের কারো ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তখন সে যেন আরো এক রাক্‌আত পড়ে। তা তার আদায়কৃত নামাযকে বেজোড় (বেতের) করবে"।

١٦٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ اَحَدَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهُنَّ بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ .

১৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে এগারো রাক্‌আত নামায পড়তেন। এর মধ্যে এক রাক্‌আত বেতের করতেন, অতঃপর নামায শেষ করে ডান কাতে শুয়ে (কিছুক্ষণ) আরাম করতেন।

١٦٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قُلْتُ لَأَرْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ اَوْ فُسْطَاطَهُ قَالَ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ .

১৬৮। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে কি নিয়মে নামায পড়েন আমি অবশ্যই তা দেখবো। অতএব আমি তাঁর ঘরের চৌকাঠ অথবা তাঁবুর খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে বসে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত, লম্বা কিরাআতে দুই রাক্‌আত, দুই রাক্‌আত এর চেয়ে কম দীর্ঘ এবং আরো দুই রাক্‌আত তার চেয়েও কম দীর্ঘ সময়ে পড়লেন। অতঃপর এক রাক্‌আত বেতের পড়লেন।[৩০]

---

৩০. মুওয়াত্তার বিভিন্ন সংকলনে হাদীসটি বিভিন্নভাবে উক্ত হয়েছে। এখানে বেতের বাদে আট রাক্‌আত, অপর সংকলনে দশ রাক্‌আত এবং ইয়াহ্‌ইয়া আন্দালুসীর সংকলনে অর্থাৎ মুওয়াত্তা ইমাম মালেক-এ (বেতের অনুচ্ছেদ) বারো রাক্‌আত উল্লেখ।

মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য, তার স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র সাথে সুগভীর সম্পর্ক স্থাপন এবং আল্লাহ্‌র দীনের পথে অবিচল থেকে ব্যাপকভাবে তার প্রচার-প্রসারের মানসিক শক্তি অর্জন এবং এ পথের প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করার শক্তি অর্জনের জন্য দৈনন্দিন বিধিবদ্ধ ইবাদতের সাথে সাথে ঐচ্ছিক নৈশ ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন মজীদে বাধ্যতামূলক ইবাদতের পাশাপাশি ঐচ্ছিক ইবাদতে মগ্ন হওয়ার জন্যও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তার ফযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ -কে সম্বোধন করে বলেন ঃ "এবং রাতের কিছু অংশে তুমি তাহাজ্জুদ কায়েম করো, তা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯)। "হে বস্ত্রাবৃত! রাতে জাগ্রত হও, কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধ রাত বা তদপেক্ষা কিছু বেশি" (সূরা মুয্‌যাম্মিল ঃ ১-৪)। "রাতে উত্থান (প্রবৃত্তিকে) দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল। দিনের বেলা তোমার রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম যিকির করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও" (সূরা মুয্‌যাম্মিল ঃ ৬-৮)। "নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ জাগরণ করো, তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও" (মুয্‌যাম্মিল ঃ ২০)। "তারা রাতের সামান্য অংশই ঘুমিয়ে কাটাতো। রাতের শেষভাগে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো" (সূরা যারিয়াত ঃ ১৭-১৮)।

তাই নবী ﷺ -এর জীবনধারায় আমরা লক্ষ্য করি রাতের ইবাদতের কঠোর অনুশীলন, সাথে সাথে তাঁর সাহাবীগণের জীবনেও। তবে তাঁকে প্রতিটি অনুশীলনেই ভারসাম্য বজায় রাখতে লক্ষ্য করা যায়। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, "তুমি তাঁকে নামাযরত অবস্থায় দেখতে

চাইলে তাই দেখতে পেতে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে" (বুখারী ঃ ১০৭০ নং হাদীস)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে কখনো বেতেরসহ ১৩ রাক্‌আত, কখনো ১১ রাক্‌আত, কখনো ৯ রাক্‌আত, আবার কখনো ৭ রাক্‌আত নফল নামায পড়তেন, তার মধ্যে বেতের হতো কখনো এক রাক্‌আত, কখনো তিন রাক্‌আত আবার কখনো পাঁচ রাক্‌আত। তবে অধিকাংশই তিনি বেতের এক অথবা তিন রাক্‌আত পড়তেন। এ সম্পর্কে বেশির ভাগ হাদীস উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে ১১ রাক্‌আত নামায পড়তেন। তিনি এক একটি সিজদা এতো দীর্ঘ করতেন যে, তোমাদের যে কেউ ততোক্ষণে পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতে পারতো" (বুখারী ঃ ১০৫১, মুসলিম ঃ ১৫৮৭, ১৫৮৮, ১৫৯৬; আবু দাউদ ঃ ১৩৩৪, ১৩৩৫, ১৩৩৬, ১৩৪১; তিরমিযী ঃ ১১৪, নাসাঈ, ইবনে মাজা ১৩৫৮)। মুসলিমের বর্ণনায় আছে, তিনি দুই রাক্‌আত করে পড়তেন এবং বেতের এক রাক্‌আত। ইমাম মালেক (র)-র আল-মুওয়াত্তায়ও তদ্রূপ উল্লেখ আছে (বেতের নামায অধ্যায়)। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাতে দশ রাক্‌আত নফল নামায পড়েছেন। আয়শা (রা) বলেন, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাতে এই নামায পড়তে সক্ষম না হলে তিনি দিনের বেলা বারো রাক্‌আত নামায পড়ে নিতেন (মুসলিম ঃ ১৬০৯, ১৬১৩, ১৬১৪; তিরমিযী ঃ ৪১৮; আবু দাউদ ঃ ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫১)।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রাতের (নফল) নামায ছিল সাত রাক্‌আত অথবা নয় রাক্‌আত অথবা এগারো রাক্‌আত, বেতের ও ফজরের সুন্নাতও তার অন্তর্ভুক্ত (বুখারী ঃ ১০৬৮)। তাঁর অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতের ও ফজরের সুন্নাতসহ মোট ১৩ রাক্‌আত নামায পড়তেন (বুখারী ঃ ১০৬৯; আবু দাউদ ঃ ১৩৫৯, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০; মুসলিমঃ ১৫৯০, ১৫৯২)। আবু দাউদের ১৩৫৯ নং হাদীস অনুযায়ী ছয় রাক্‌আত নফল, পাঁচ রাক্‌আত বেতের এবং দুই রাক্‌আত ফজরের সুন্নাত। মুসলিমের ১৫৯০ এবং আবু দাউদের ১৩৩৮ নং হাদীস অনুযায়ী ১৩ রাক্‌আতের মধ্যে পাঁচ রাক্‌আত বেতের। মুসলিম ১৫৯২ নং হাদীস অনুসারে উক্ত তেরো রাক্‌আতের মধ্যে ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাতও অন্তর্ভুক্ত। আবু দাউদের ১৩৪০ নং হাদীস অনুযায়ী আট রাক্‌আত নফল, এক রাক্‌আত বেতের এবং দুই রাক্‌আত বসে পড়া নফল এবং দুই রাক্‌আত ফজরের সুন্নাত। আয়েশা (রা) কর্তৃক বিভিন্ন সনদে বর্ণিত এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নফল নামায ছিল দশ রাক্‌আত, আট রাক্‌আত অথবা ছয় রাক্‌আত।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাস বা অন্য সময়ে (রাতে) এগারো রাক্‌আতের অধিক (নফল) নামায পড়তেন না। তুমি তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি চার রাক্‌আত নামায পড়তেন, তাঁর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তুমি আমাকে আর জিজ্ঞেস করো না, অতঃপর তিন রাক্‌আত (বিতর) পড়তেন (বুখারী ঃ ১০৭৬, মুসলিম ঃ ১৫৯৩, তিরমিযী ঃ ৪২৫; মুওয়াত্তা, বেতের অনুচ্ছেদ)। তিরমিযীর বর্ণনায় এক রাক্‌আত বেতের উল্লেখিত হয়েছে। এ হাদীস অনুসারে বেতের তিন রাক্‌আত হলে নফল আট রাক্‌আত এবং বেতের এক রাক্‌আত হলে নফল হবে দশ রাক্‌আত।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেরো রাক্‌আত নামায পড়তেন, আট রাক্‌আত পড়ার পর বেতের পড়তেন, অতঃপর বসে দুই রাক্‌আত পড়তেন, অতঃপর ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাক্‌আত পড়তেন (মুসলিম ঃ ১৫৯৪, আবু দাউদ ঃ ১৩৫২)। এ হাদীস অনুযায়ী হাল্কা নফলসহ রাতের নফল নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা হয় দশ।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে জাগ্রত হয়ে উযু করে নয় রাক্‌আত নামায পড়তেন, অষ্টম রাক্‌আতে বসে দোয়া পড়তেন, তারপর সালাম না ফিরিয়েই উঠে দাঁড়িয়ে নবম রাক্‌আত পড়তেন, অতঃপর দোয়া করে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর বসে দুই রাক্‌আত নামায

পড়তেন (মুসলিম ঃ ১৬০৯, আবু দাউদ ঃ ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫১)। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহানবী ﷺ এক সালামে নয় রাক্‌আত নামায পড়তেন, যার মধ্যে এক রাক্‌আত ছিলো বেতের এবং তিনি অষ্টম ও নবম রাক্‌আতে বৈঠক করতেন, অতঃপর বসে দুই রাক্‌আত (হাল্কী) নফল নামায পড়তেন। অর্থাৎ তিনি দশ রাক্‌আত নফল নামায পড়তেন।

আয়েশা (রা) বলেন, রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায ছিল দশ রাক্‌আত, এক রাক্‌আত বেতের পড়তেন এবং ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাতও পড়তেন। এই হলো তেরো রাক্‌আত (মুসলিম ঃ ১৫৯৭)। ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তা গ্রন্থেও ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাতসহ তেরো রাক্‌আতের উল্লেখ আছে (বেতেরের নামায অনুচ্ছেদ)।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে চার রাক্‌আত ও তিন রাক্‌আত বেতের পড়তেন, কখনো ছয় রাক্‌আত ও তিন রাক্‌আত বেতের পড়তেন, কখনো আট রাক্‌আতও পড়তেন এবং (কখনো) তিনি মোট তেরো রাক্‌আত নামায পড়তেন। তিনি কখনো সাত রাকআতের কম এবং তেরো রাকআতের অধিক নামায পড়তেন না। তিনি কখনো ফজরের সুন্নাত ত্যাগ করতেন না (আবু দাউদ ঃ ১৩৬২)। এই হাদীসে আয়েশা (রা)-র মুখেই তৎকর্তৃক বর্ণিত সবগুলো হাদীসের সারাংশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তাহাজ্জুদের নামায রীতিমত আট রাক্‌আতই পড়তেন না, বরং বারো থেকে ছয় রাকআতের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিলো। এখন দেখা যাক, অপরাপর সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতের নামায কিরূপ? তিনি বলেন, দুই রাক্‌আত করে। তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাক্‌আত বেতের পড়ে নিও (বুখারী ঃ ১০৬৬; মুসলিম ঃ ১৬১৮, ১৬১৯, ১৬২০, ১৬২১, ১৬৩০, ১৬৩১, ১৬৩৩; আবু দাউদ ঃ ১৩২৬; তিরমিযী ঃ ৪১২)। এ হাদীসে রাতের তাহাজ্জুদ নামাযের রাক্‌আত সংখ্যার উল্লেখ নাই, তবে তা দুই রাক্‌আত করে পড়তে হবে এবং এক রাক্‌আত বেতেরের কথা উল্লেখ আছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর রাতের নামায ছিলো তেরো রাক্‌আত (বুখারী ঃ ১০৬৭)। উম্মুল মুমিনীন মাইমূনা (রা)-র ঘরে ঘুমানোর রাতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করান। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায তেরো রাক্‌আত পূর্ণ হলো (মুসলিম ঃ ১৬৫৮)। মুসলিমের ১৬৬১ ও ১৬৬৪ নং হাদীসেও তেরো রাক্‌আতের উল্লেখ আছে (তিরমিযী ৪১৬, ইবনে মাজা ১৩৬৩)। মুসলিমের ১৬৫৯ নং হাদীসে আছে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই দুই রাক্‌আত করে মোট বারো রাক্‌আত নামায পড়েন, তারপর বেতের পড়েন। অতঃপর মুআয্‌যিন এলে তিনি ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়েন। ইমাম মালেকের মুওয়াত্তা গ্রন্থের বেতের অনুচ্ছেদেও উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুনান আবু দাউদে ১৩৬৭ নং হাদীসের বক্তব্যও তাই, তবে এখানে এক রাক্‌আত বিতরের উল্লেখ আছে। মুসলিমের ১৬৬২ এবং আবু দাউদের ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ নম্বর হাদীসে এগারো রাক্‌আত উল্লেখ আছে এবং আবু দাউদের বর্ণনায় তার মধ্যে এক রাক্‌আত বিতরের উল্লেখ আছে। সহীহ মুসলিমের ১৬৬৯ নম্বর হাদীসে ছয় রাক্‌আতের উল্লেখ আছে। আবু দাউদের ১৩৫৩ নং হাদীসেও ছয় রাক্‌আত এবং বেতের তিন রাক্‌আত উল্লেখ আছে। একই গ্রন্থের ১৩৫৫ নং হাদীসে (ফাদল ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত) এক রাক্‌আত বেতেরসহ এগারো রাক্‌আত উল্লেখ আছে।

অতএব আমরা আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ন্যায় ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে বারো রাক্‌আত থেকে ছয় রাক্‌আতের মধ্যে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তিনি সর্বদা আট রাক্‌আতই পড়তেন, এরূপ দাবি যথার্থ নয়।

যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, (আমি স্থির করলাম) আজ রাতে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখবো। তিনি প্রথমে সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত পড়েন,

তারপর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর দুই রাক্‌আত পড়েন, তারপর দুই রাক্‌আত পড়েন যা তৎপূর্ববর্তী দুই রাকআতের চেয়ে কম দীর্ঘ, তারপর তৎপূর্ববর্তী দুই রাক্‌আতের চেয়ে কম দীর্ঘ দুই রাক্‌আত পড়েন, তারপর তৎপূর্ববর্তী দুই রাক্‌আতের চেয়ে কম দীর্ঘ দুই রাক্‌আত পড়েন, তারপর তৎপূর্ববর্তী দুই রাক্‌আতের চেয়ে কম দীর্ঘ দুই রাক্‌আত পড়েন, তারপর বেতের পড়েন। এই হলো মোট তেরো রাক্‌আত (মুসলিম ঃ ১৬৭৪, আবু দাউদ ঃ ১৩৬৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, বেতের অনুচ্ছেদ; ইবনে মাজা ঃ ১৩৬২)। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল (তাহাজ্জুদ) নামায বারো রাক্‌আত পড়তেন এবং সবগুলো হাদীস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি অধিকাংশ সময় বারো রাক্‌আতই পড়তেন, আট রাক্‌আত নয়।

এই স্থানে কয়েকটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য। (এক) রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের অধিকাংশ সময় নামাযে কাটাতেন, তারপরও তাঁর নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা এতো কম কেন? তার কারণ এই যে, তিনি এসব নামাযে সূরা বাকারা, আল ইমরান, নিসা, মাইদা ও আনআমের মতো দীর্ঘ সূরা পড়তেন, রুকূ-সিজদায়ও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন এবং দীর্ঘ দোয়া পড়তেন, আমাদের মতো ফাতিহা ও আলাম তারা দ্বারা নামায শেষ করতেন না। তাছাড়া তিনি কিছুক্ষণ নামায পড়ে আবার কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। এভাবে তাঁর রাত শেষ হয়ে যেতো। (দুই) এখন প্রশ্ন হলো, রাতে বারো রাক্‌আতের অধিক নামায পড়া কি জায়েয আছে? আমরা নিশ্চিত জানি যে, পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাযের রাক্‌আত সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু নফল নামাযের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা নেই। নফল নামায যেমন ঐচ্ছিক নামায, তেমনি ইচ্ছা করলে তা বারো রাকআতের অধিকও পড়া যায়। দীর্ঘ সূরা, দীর্ঘ দোয়া খুব কম লোকেরই জানা আছে। অতএব তারা যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরাগুলো দ্বারা অধিক সংখ্যক রাক্‌আত নামায পড়ে, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই।

তৃতীয় প্রশ্ন হলো, রমযান মাসেও কি রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বোচ্চ বারো রাক্‌আত নামায পড়তেন? এখানে মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ মাসগুলোর রাতের নফল নামায সালাতুল লাইল (রাতের নামায) বা সালাতুত তাতাব্বু (ঐচ্ছিক নামায) নামে অভিহিত এবং রমযান মাসের রাতের নামায কিয়ামুল লাইল (রাতের দাঁড়ানো) নামে অভিহিত। এই মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দুই নামাযই পড়তেন। যেমন বাইতুল্লাহ শরীফে (কাবার চত্বরে) ও মদীনার মসজিদে নববীতে বর্তমান কালেও রমযান মাসের রাতের প্রথমাংশে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ নামায (দুইজন ইমাম দশ রাক্‌আত করে পড়ান) এবং শেষাংশে সাহ্‌রীর পূর্বে বারো রাক্‌আত নামায পড়া হয়। উক্ত দুই নামাযের পরও লোকেরা ঐ দুই মসজিদে রমযান মাসে সারা রাত নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া-দুরূদ পাঠে মশগুল থাকেন।

অবশ্য সিহাহ সিত্তায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তারাবীহ নামাযের বিষয় উল্লেখ আছে, কিন্তু তাতে তার রাক্‌আত সংখ্যা উল্লেখ নাই। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নামায পড়ছিলেন। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর সাথে নামাযে যোগদান করেন। পরবর্তী রাতেও তিনি নামায পড়েন এবং লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। তৃতীয় বা চতুর্থ রাতেও তারা সমবেত হন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট যাননি। ভোরবেলা তিনি বলেন, তোমরা যা করেছো আমি তা দেখেছি। তোমাদের নিকট বের হয়ে আসতে এ আশংকাই আমার প্রতিবন্ধক ছিলো যে, এটা তোমাদের জন্য ফরয করা হয় কিনা। এটি রমযান মাসের ঘটনা (বুখারী ঃ ১০৫৭, মুসলিম ঃ ১৬৫৩, ১৬৫৪; আবু দাউদ, ১২৭৩, ১৩৭৪)। হাদীসটি আবু যার (রা) কর্তৃকও বর্ণিত আছে (আবু দাউদ ঃ ১৩৭৫, তিরমিযী ঃ ৭৫৩; ইবনে মাজা ঃ ১৩২৭) (অনুবাদক)।

١٦٩- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ امْرِءٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلٰوةٌ بِاللَّيْلِ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَجْرَ صَلٰوتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً .

১৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ রাতের বেলা (নফল) নামায পড়াকালে কোন ব্যক্তির উপর প্রবলভাবে ঘুম চেপে বসলে, আল্লাহ তাআলা তাকে নামাযের অনুরূপ সওয়াব দান করেন এবং তার ঘুম তার জন্য সদ্‌কা হিসাবে গণ্য হয়।

١٧٠-عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ فَاتَهُ مِنْ حِزْبِهِ شَيْئٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَقَرَاَهُ مِنْ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ اِلٰى صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَكَاَنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ شَيْئٌ .

১৭০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, কোন ব্যক্তির রাতের ওযীফা (ঐচ্ছিক কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া কালাম পাঠ) ছুটে গেলে, সে যদি তা দুপুরের মধ্যেই পড়ে নেয়, তবে তার ওযীফা ছুটে যায়নি বলে গণ্য হয়।

١٧١- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُصَلِّىْ كُلَّ لَيْلَةٍ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يُصَلِّىَ حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اَيْقَظَ اَهْلَهُ لِلصَّلٰوةِ وَيَتْلُوْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى .

১৭১। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার (রা) রাতের বেলা নামায পড়তেন আল্লাহ যতোখানি তৌফিক দিতেন। এভাবে তিনি যখন শেষ রাতে পৌছে যেতেন, তখন নিজের পরিবারের সদস্যদের নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠাতেন এবং সাথে সাথে নিম্নোক্ত আয়াত পড়তেন ঃ "তোমার পরিবার-পরিজনকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং তুমি নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাকো। আমরা তোমার নিকট রিযিক চাই না, আমরাই তোমাকে রিযিক দান করি। আর পরিণামে তাকওয়ারই কল্যাণ হয়ে থাকে" (সূরা তহা ঃ ১৩২)।

١٧٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا قَالَ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَاَ بِالْعَشْرِ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمِ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهُ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ

ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ قَالَ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِىْ وَاَخَذَ بِاُذُنِىَ الْيُمْنٰى بِيَدِهِ الْيُمْنٰى فَفَتَلَهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى الصُّبْحَ .

১৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক রাতে তার খালা এবং নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-র কাছে রাত কাটান। তিনি বলেন, আমি বিছানায় প্রস্থের দিকে শুইলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্ত্রী বিছানায় লম্বা দিকে শুয়ে ঘুমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমালেন। অতঃপর অর্ধরাত বা তার কিছু কম-বেশী অতিবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে জাগলেন এবং দুই হাতে মুখমণ্ডল মলে ঘুম দূর করেন। অতঃপর তিনি সূরা আল ইমরানের শেষ দশ আয়াত (اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ....لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) পাঠ করলেন, অতঃপর নিকটেই ঝুলন্ত একটি পানির মশকের কাছে গেলেন। তিনি উত্তমরূপে উযু করলেন, অতঃপর নামায পড়লেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমিও ঘুম থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুরূপ করলাম। অতঃপর আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার মাথার উপর তাঁর ডান হাত রাখলেন, অতঃপর তাঁর ডান হাত দিয়ে আমার ডান কান ধরে মললেন। তিনি দাঁড়িয়ে দুই দুই রাক্‌আত করে মোট বারো রাক্‌আত নামায পড়লেন, অতঃপর (বেতের পড়ে) শুয়ে গেলেন। শেষে মুয়াযযিন আসলে তিনি সংক্ষেপে ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়লেন, অতঃপর মসজিদে গিয়ে ফজরের ফরয নামায পড়লেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে রাতের (নফল) নামায দুই রাক্‌আত দুই রাক্‌আত করে পড়তে হয়। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, রাতের (নফল) নামায ইচ্ছা করলে একই তাকবীরে তাহরীমায় দুই রাক্‌আত করেও পড়া যায়, চার রাক্‌আত করেও পড়া যায়, ছয় রাক্‌আত করেও পড়া যায়, আট রাক্‌আত করেও পড়া যায় অথবা যতো রাক্‌আত ইচ্ছা পড়া যায়। এতে কোন আপত্তি নেই। তবে চার রাক্‌আত করে পড়াই উত্তম। কিন্তু বেতের নামায সম্পর্কে আমাদের এবং ইমাম আবু হানীফার একই মত। অর্থাৎ বেতেরের রাক্‌আত সংখ্যা তিন এবং তা এক সালামেই পড়তে হবে।[৩১]

---

৩১. বেতের নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্নরূপ বর্ণনা এসেছে। কোন হাদীসে সাত রাক্‌আত, কোন হাদীসে পাঁচ রাক্‌আত, কোন হাদীসে তিন রাক্‌আত এবং কোন হাদীসে এক রাক্‌আত উল্লেখ আছে। যেমন উম্মু সালামা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ তেরো রাক্‌আত বেতের পড়তেন। কিন্তু তিনি যখন বৃদ্ধ হয়ে যান তখন থেকে সাত রাক্‌আত বেতের পড়তেন" (তিরমিযী)।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে উযু ছুটে গেলে।

١٧٣- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ فِىْ صَلٰوةٍ مِّنَ الصَّلَوٰتِ ثُمَّ اَشَارَ اِلَيْهِمْ بِيَدِهِ اَنِ امْكُثُوْا فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ وَعَلٰى جِلْدِهِ اَثَرُ الْمَاءِ فَصَلّٰى .

১৭৩। আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক ওয়াক্তের নামাযের তাকবীর তাহ্‌রীমা বললেন। অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লোকদের বললেন ঃ "অপেক্ষা করো"। রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলেন, অতঃপর দেহে পানির চিহ্নসহ ফিরে এলেন, অতঃপর নামায পড়লেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীস অনুসারে আমল করি। নামাযরত অবস্থায় কারো উযু ছুটে যাওয়া কোন দোষের ব্যাপার নয়। সে কাতার ভেদ করে বেরিয়ে গিয়ে উযু করে আসবে এবং অবশিষ্ট নামায পড়বে, কিন্তু মাঝখানে কথা বলবে না। তবে উযু করে পুনরায় গোটা নামায পড়াই উত্তম। ইমাম হানীফা (র)-রও এই মত।

২১. অনুচ্ছেদঃ আল-কুরআনের ফযীলাত এবং আল্লাহ্‌র যিকির করা মুস্তাহাব।

١٧٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِّنَ اللَّيْلِ يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِىَّ ﷺ كَاَنَّ الرَّجُلَ يُقَلِّلُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ .

ইমাম তিরমিযী (র) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বেতেরের নামায ১৩, ১১, ৯, ৭, ৫, ৩ অথবা ১ রাক্‌আত উল্লেখ আছে। উপরোল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ১২ রাক্‌আত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন এবং এক রাক্‌আত বেতের পড়তেন।

আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে মোট ১৩ রাক্‌আত নামায পড়তেন। এর মধ্যে পাঁচ রাক্‌আত হতো বেতের" (তিরমিযী)।

আলী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাক্‌আত বেতের পড়তেন" (তিরমিযী)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের (নফল) নামায (এক সালামে) দুই রাক্‌আত করে পড়তেন, অতঃপর এক রাক্‌আত বেতের পড়তেন" (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

আবু আইউব আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "বেতেরের নামায প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। অতএব যে চায় তা পাঁচ রাক্‌আতও পড়তে পারে, যে চায় তিন রাক্‌আতও পড়তে পারে, আর যে চায় তা এক রাক্‌আতও পড়তে পারে" (আবু দাউদ)।

ইমাম শাফিঈ (র)-র মতে বেতেরের নামায এক রাক্‌আত। তিনি এক রাক্‌আত সম্বলিত হাদীসের উপর আমল করেছেন। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ তিন রাক্‌আত সম্বলিত হাদীসের উপর আমল করেন (অনুবাদক)।

১৭৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে (কাতাদা ইবনে নুমানকে) রাতে বারবার সূরা ইখলাস পড়তে শুনলেন। ভোর হলে তিনি তা নবী ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি যেন সূরাটিকে যৎসামান্য মনে করলেন। নবী ﷺ বললেনঃ "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই সূরা এক-তৃতীয়াংশ কুরআনের সমতুল্য"।

١٧٥- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لَاَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ مِنْ بُكْرَةٍ اِلَى اللَّيْلِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَحْمِلَ عَلٰى جِيَادِ الْخَيْلِ مِنْ بُكْرَةٍ حَتّٰى اللَّيْلِ .

১৭৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেছেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল থাকা আমার কাছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে জিহাদে মশগুল থাকার চেয়ে অধিক প্রিয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির উত্তম।

١٧٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَلَّقَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَ .

১৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কুরআনের অধিকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে রশি দিয়ে বাঁধা উটের ন্যায়। যদি তা বাঁধা থাকে তবে বসে থাকে, আর ছেড়ে দিলে পলায়ন করে।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হলে।

١٧٧- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ يُصَلِّىْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَرَجَعَ اِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ اِذَا سُلِّمَ عَلٰى اَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ .

১৭৭। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) নামাযরত এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে সালাম দিলেন। নামাযরত ব্যক্তি তার সালামের জওয়াব দিলো। তিনি তার কাছে ফিরে এসে বলেন, তোমাদের নামাযরত কোন ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হলে সে কথা বলবে না, বরং তার হাত দিয়ে ইশারা করবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি। নামাযরত ব্যক্তিকে সালাম দিলে সে তার জওয়াব দিবে না। যদি সে সালামের জওয়াব দেয়, তবে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর নামাযরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়াও ঠিক নয়। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুই ব্যক্তির একত্রে জামাআতে নামায পড়া।

١٧٨- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ فَوَجَدْتُّهُ يُسَبِّحُ فَقُمْتُ وَرَاءَهُ فَقَرَّبَنِىْ فَجَعَلَنِىْ بِحِذَائِهِ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَاءُ تَاَخَّرْتُ فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ .

১৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (র) বলেন, আমি দুপুরের সময় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে গেলাম। তিনি তখন নফল নামায পড়ছিলেন। আমি তার পিছনে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে টান দিয়ে তার ডান পাশে দাঁড় করালেন। তার দ্বাররক্ষী ইয়ারফা আসলে আমি পিছনে সরে গেলাম এবং উমার (রা)-র পিছনে দু'জনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম।

١٧٩-اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّهُ قَامَ عَنْ يَّسَارِ ابْنِ عُمَرَ فِىْ صَلٰوتِهِ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ .

১৭৯। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার (রা)-র বাম পাশে দাঁড়ালেন। (নাফে বলেন) তিনি আমাকে টেনে নিয়ে তার ডানপাশে দাঁড় করালেন।

١٨٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ فَاَكَلَ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَّنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ وَرَاءَنَا فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

১৮০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তার নানী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আহারের দাওয়াত দিলেন। তিনি আহারশেষে বলেন ঃ "উঠো, তোমাদের সাথে নিয়ে আমি নামায পড়বো"। আনাস (রা) বলেন, আমি আমাদের একটি পাটি তুলে নিলাম। পুরাতন হয়ে যাওয়ার কারণে তাতে কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তা (নরম করার জন্য) পানিতে ভিজিয়ে নিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর নামায পড়লেন। আমি এবং এক ইয়াতীম বালক (দুমাইরা ইবনে আবু দামরাহ) তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম এবং বৃদ্ধ নানী আমাদের পিছনে দাঁড়ান। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন, অতঃপর বিদায় নেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি। ইমামের সাথে একজন মাত্র মুক্তাদী হলে সে ইমামের ডানপাশে দাঁড়াবে। আর মুক্তাদীর সংখ্যা দুইজন হলে তারা ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

২৪. বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়া।

١٨١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اَحْسِنْ اِلَى غَنَمِكَ وَاَطِبْ مُرَاحَهَا وَصَلِّ فِى نَاحِيَتِهَا فَاِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ .

১৮১। আবু হুরায়রা (রা) বলন, তোমার মেষ ও বকরীগুলোকে আদর করো, এগুলোর খোঁয়াড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো এবং তুমি ইচ্ছা করলে এর এক কোণে নামায পড়তে পারো। কেননা এগুলো জান্নাতের পশুদের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। মেষ-বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়া যেতে পারে। এতে কোন দোষ নেই, যদিও সেখানে তা পেশাব-পায়খানা করে থাকে। কেননা যেসব পশুর গোশত খাওয়া হালাল, তার পেশাবে কোন দোষ নেই।[৩২]

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় নামায পড়া।

١٨٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَحَرّٰى اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّىْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوْبِهَا .

১৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন সূর্য উদিত হওয়ার সময় এবং অস্ত যাওয়ার সময় নামায পড়ার সংকল্প না করে।

١٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَاِذَا ارْتَفَعَتْ زَائَلَهَا ثُمَّ اِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ثُمَّ اِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ اِذَا دَانَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا فَاِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا قَالَ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ تِلْكَ السَّاعَاتِ .

১৮৩। আবদুল্লাহ আস-সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সূর্য যখন উদিত হয় তখন এর সাথে শয়তানের একটি শিং থাকে। যখন সূর্য ক্রমান্বয়ে উপরে উঠতে থাকে তখন তা দূর হয়ে যায়। আবার সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর আসে তখন তা এসে সূর্যের সাথে মিলিত হয়। যখন তা পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ে তখন তা দূর হয়ে যায়।

---

৩২. ইমাম মুহাম্মাদের মতে যেসব পশুর গোশত হালাল, তার পেশাব নাপাক নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফের মতে হালাল জন্তুর পেশাব-পায়খানাও হারাম জন্তুর পেশাব-পায়খানার মতই নাপাক। সুতরাং এর পেশাব-পায়খানার উপর নামায পড়া জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রা)-র বক্তব্যে খোঁয়াড়ের এক কোণে নামায পড়ার কথা উল্লেখ আছে। অতএব, এর দ্বারা খোঁয়াড়ের যে কোন স্থানে নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণ করা যেতে পারে না। তবে খোঁয়াড়ের পাক জায়গায় নামায পড়া যেতে পারে (অনুবাদক)।

অনুরূপভাবে সূর্য যখন ডুবে যাওয়ার কাছাকাছি আসে তখন শয়তানের শিং এসে এর সাথে মিলিত হয়। যখন তা ডুবে যায় তখন ঐ শিং দূর হয়ে যায়। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই তিন সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

١٨٤- اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لاَ تَحَرَّوْا بِصَلٰوتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبَهَا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوْعِهَا وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوْبِهَا وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَنْ تِلْكَ الصَّلٰوةِ.

১৮৪। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলতেন, সূর্য উঠার সময় ও অস্ত যাওয়ার সময় তোমরা নামায পড়ার সংকল্প করো না। কেননা সূর্য উঠার সময় শয়তান তার দুই শিং উত্তোলন করে এবং সূর্যাস্তের সময় তা নামিয়ে নেয়। এই সময় কেউ নামায পড়লে উমার (রা) তাকে শাস্তি দিতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। এক্ষেত্রে জুমুআ বা অন্য কোন বিশেষ দিন আমাদের কাছে সমান। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ প্রচণ্ড গরমের সময় নামায পড়া।

١٨٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ اَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ اِلٰى رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ فَاَذِنَ لَهَا فِىْ كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ .

১৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ গরমের প্রচণ্ডতা যখন বেশী হয়, তখন তোমরা ঠাণ্ডা করে (বিলম্বে) নামায পড়ো। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো উল্লেখ করেন যে, জাহান্নাম তার মহামহিম প্রভুর কাছে অভিযোগ করলে তিনি তাকে বছরে দুইবার নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেন ঃ একটি শীতকালে ও অপরটি গরমকালে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। যুহরের নামায গরমকালে বিলম্বে পড়তে হবে এবং শীতকালে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরপরই পড়তে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে গেলে অথবা তার নামাযের ওয়াক্ত চলে গেলে।

١٨٦- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ اَسْرٰى حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلاَلٍ اِكْلَاْ لَنَا الصُّبْحَ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

وَاَصْحَابُهُ وَكَلَاَ بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ اسْتَنَدَ اِلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقَابِلُ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَلَا اَحَدٌ مِّنَ الرَّكْبِ حَتّٰى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا بِلَالُ فَقَالَ بِلَالٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخَذَ بِنَفْسِى الَّذِىْ اَخَذَ بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوْا فَبَعَثُوْا رَوَاحِلَهُمْ فَاقْتَادُوْهَا شَيْئًا ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلَالًا فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى بِهِمُ الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ حِيْنَ قَضَى الصَّلٰوةَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ .

১৮৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বার অভিযান শেষে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন রাতের বেলা সফর করেন। শেষ রাতে তিনি যাত্রা বিরতি করলেন এবং বিলাল (রা)-কে বললেন ঃ আমাদের "ফজরের নামাযের দিকে খেয়াল রেখো"। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে গেলেন এবং তাঁর সাথীরাও ঘুমিয়ে পড়লেন। বিলাল (রা) জেগে থাকলেন যতোক্ষণ আল্লাহ চাইলেন। কিন্তু তিনি যেমনি তার উটের হাওদার সাথে হেলান দিয়ে নিজের মুখ সুবহে সাদেকের দিকে করে রাখলেন, হঠাৎ তার চোখে ঘুম এসে গেলো। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও জাগতে পারলেন না, বিলালও নয় এবং কাফেলার একজনও নয়। এমনকি সকালে রোদের প্রখরতা বেড়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে উঠলেন। তিনি ডাক দিলেন ঃ "হে বিলাল!" বিলাল (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জান যেই সত্তা নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই মহান সত্তা আমার জানও নিয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "এখান থেকে প্রস্থান করো"। অতএব লোকেরা নিজ নিজ হাওদা প্রস্তুত করে রওয়ানা দিলো। কিছু দূর যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে তাকবীর বলার নির্দেশ দিলেন। অতএব তিনি ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন ঃ "যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে যায় সে যেন তা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ "আমার স্মরণের জন্য নামায পড়ো" (সূরা তহা ঃ ১৪)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীস অনুসারে আমল করি। তবে যেসব ওয়াক্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তে নিষেধ করেছেন সেই ওয়াক্ত বাদ দিয়ে . অর্থাৎ তিনি সূর্য উঠার সময়, সূর্য ঠিক মাথার উপর আসলে এবং সূর্যাস্তের সময় নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দিনের আসরের নামায সূর্যাস্তের সময় পড়া যাবে, যদিও সূর্য লাল হয়ে যায় এবং অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি এসে যায়। ইমাম আবু হানীফা (ব)-রও এই মত।

١٨٧ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا وَمَنْ اَدْرَكَهَا مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا .

১৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক্আত পেলো, সে ফজরের নামায পেয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক্আত পেলো সে আসরের নামায পেয়ে গেলো।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির রাতে নামায পড়া।

١٨٨– عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادٰى بِالصَّلٰوةِ فِىْ سَفَرٍ فِىْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَّرِيْحٍ ثُمَّ قَالَ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ .

১৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সফররত অবস্থায় ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্দ শীতের রাতে আযান দিলেন, অতঃপর বলেন, "তোমরা নিজেদের অবস্থানেই নামায পড়ো"। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও শীত ও বৃষ্টিমুখর রাতে মুআযযিনকে নিম্নোক্ত কথার ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিতেন ঃ "তোমরা নিজেদের অবস্থানেই নামায পড়ো"।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটা ভালো এবং রুখসাতের (অনুমতি) পর্যায়ভুক্ত। তবে আবহাওয়ার প্রতিকূলতার মধ্যেও জামাআতে নামায পড়াই সর্বোত্তম।

١٨٩–عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اِنَّ اَفْضَلَ صَلٰوتِكُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِلاَّ صَلٰوةَ الْجَمَاعَةِ.

১৮৯। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) বলেন, তোমাদের ঘরে পড়া নামাযই হচ্ছে সর্বোত্তম জামাআতে পড়া নামায ব্যতীত।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। (ফরয নামায মসজিদে গিয়ে জামাআতে পড়তে হবে এবং অন্যান্য নামায নির্জনে পড়াই উত্তম)।

١٩٠– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ صَلٰوةِ الْجَمَاعَةِ عَلٰى صَلٰوةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

১৯০। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একাকী পড়া নামাযের তুলনায় জামাআতে পড়া নামায সওয়াব ও মর্যাদার দিক থেকে সাতাশ গুণ শ্রেষ্ঠ।[৩৩]

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে কসর নামায পড়া।

١٩١– عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فَزِيْدَ فِىْ صَلٰوةِ الْحَضَرِ وَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ .

৩৩. কোন কোন হাদীসে এর চেয়েও অধিক অথবা কম মর্যাদার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু তার সবগুলোই মাওকূফ রিওয়ায়াত (অনুবাদক)।

১৯১। আয়েশা (রা) বলেন, (প্রাথমিক পর্যায়ে) সফরে ও আবাসে (মুকীম অবস্থায়) নামায দুই রাক্‌আত করে ফরয করা হয়। অতঃপর আবাসের নামায আরো দুই রাক্‌আত বৃদ্ধি করা হয় এবং সফরের নামায পূর্ববৎ ঠিক রাখা হয়।

١٩٢- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلٰى خَيْبَرَ قَصَرَ الصَّلٰوةَ .

১৯২। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) খায়বার এলাকার উদ্দেশে যাত্রা করলে নামায কসর করতেন (চার রাক্‌আক ফরযের স্থলে দুই রাক্‌আত পড়তেন)।

١٩٣- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اِذَا خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلٰوةَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ .

১৯৩। নাফে (র) আরো বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) যখন হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশে রওয়ানা হতেন, তখন যুল-হুলায়াফা নামক স্থানে নামায কসর করতেন।

١٩٤- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ اِلٰى رِيْمٍ فَقَصَرَ الصَّلٰوةَ فِىْ مَسِيْرَةِ ذٰلِكَ .

১৯৪। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) যখন রীম নামক এলাকায় যাওয়ার জন্য বের হলেন, তখন এই সফরে নামায কসর করলেন।

١٩٥- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيْدَ فَلَا يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ .

১৯৫। নাফে (র) বলেন যে, তিনি ইবনে উমার (রা)-র সাথে বুরীদ পর্যন্ত সফর করতেন, কিন্তু তিনি (আবদুল্লাহ) নামায কসর করতেন না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন তিন দিনের দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য বের হয়, তখনই নামায কসর করা যেতে পারে। অর্থাৎ (কমপক্ষে) এতোটা দূরত্ব যা উটে সওয়ার হয়ে অথবা পদব্রজে তিন দিনে স্বাভাবিকভাবে অতিক্রম করা যায়। নিজ বাসস্থান থেকে বের হওয়ার পরই কসরের নামায পড়তে হয়। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।[৩৪]

---

৩৪. সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হিজরতের পূর্বে নামায দুই রাক্‌আত করে ফরয ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন মুকীম অবস্থায় আরো দুই রাক্‌আত করে বাড়িয়ে দেয়া হয়। মুসনাদে আহ্‌মাদের বর্ণনায় আছে, মাগরিবের নামাযকে কসর থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ মুকীম ও সফর উভয় অবস্থায় মাগরিবের নামায তিন রাক্‌আত পড়তে হবে ('কসর' অর্থ 'হ্রাস করা' 'কম করা')। আল-কুরআনের আয়াতে কসরের নির্দেশ রয়েছে ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .

"তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে কোন দোষ নেই; (বিশেষত) কাফেররা তোমাদের বিপদগ্রস্ত করতে পারে বলে যখন তোমাদের আশংকা হবে" (সূরা নিসা ঃ ১০১)।

সফরে কেবল ফরয নামায পড়তে হবে, না সুন্নাতও পড়তে হবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। মহানবী (স)-এর কর্মপন্থা থেকে শুধু এতোটুকু জানা যায় যে, তিনি সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নাত এবং বেতেরের নামায পড়তেন, কিন্তু অন্যান্য ওয়াক্তে কেবল ফরয নামাযই পড়তেন, নিয়মিত সুন্নাত পড়ার কথা প্রমাণিত নয়। অবশ্য সময়-সুযোগ হলে তিনি নফল নামায পড়তেন। আরোহী অবস্থায়ও চলতে চলতেও কখনো নফল নামায পড়তেন। এজন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সফররত অবস্থায় ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাত পড়তে লোকদের নিষেধ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম সুন্নাত পড়া বা না পড়া উভয়টিই সংগত মনে করেন। তারা ব্যাপারটি লোকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের বাছাই করা মত হচ্ছে, পথ অতিক্রম করাকালে সুন্নাত না পড়াই উত্তম। আর কোন মঞ্জিলে উপস্থিত হয়ে স্বস্তি লাভ করার পর সুন্নাত পড়াই উত্তম।

ইমাম শাফিঈ (র) কসর করাকে বাধ্যতামূলক মনে করেন না। তবে তার মতে কসর করা উত্তম এবং না করাটা উত্তম কাজ পরিত্যাগ করার শামিল। ইমাম আহমাদের মতে কসর যদিও ওয়াজিব নয়, কিন্তু কসর না করা মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফার মতে কসর করা ওয়াজিব। এরূপ একটি মত ইমাম মালেক থেকেও বর্ণিত আছে। হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে সব সময়ই নামায কসর করেছেন। তিনি সফরে কখনো চার রাক্আত নামায পড়েছেন বলে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স), আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উছমান (রা)-র সফর সংগী হয়েছি। কিন্তু তাদের কখনো কসর না করতে দেখিনি। ইবনে আব্বাস (রা)-সহ যথেষ্ট সংখ্যক সাহাবী বর্ণিত হাদীস এই মতেরই সমর্থন করে। তবে আয়েশা (রা) বর্ণিত দু'টি হাদীস থেকে জানা যায়, সফরে কসর করা বা পূর্ণ নামায পড়া দুটিই ঠিক। কিন্তু সনদ সূত্রের দিক থেকে হাদীস দু'টি দুর্বল। তবুও কেউ যদি পূর্ণ নামায পড়ে তবে তার নামায হয়ে যাবে।

কমপক্ষে কতো দূর পথ বা কতো সময়ের পথ অতিক্রম করার সংকল্প করলে কসর করা যায় সে সম্পর্কেও মতভেদ আছে। যাহেরী মাযহাবের ফিক্হে এ সম্পর্কে কোন কিছু নির্দিষ্ট নেই। এই মাযহাবের মত অনুযায়ী যে কোন সফরে কসর করা যায়, তা স্বল্প সময়ের জন্য হোক অথবা দীর্ঘ সময়ের জন্য। ইমাম মালেকের মতে আটচল্লিশ মাইলের কম অথবা একদিন এক রাতের কম সফরে কসর করা যায় না। ইমাম আহমাদেরও এই মত। ইবনে আব্বাস (রা)-ও এই মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফিঈ থেকেও এরূপ একটি মত বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রা) পনের মাইল দীর্ঘ সফরেও কসর জায়েয মনে করেন। "এক দিনের সফর কসরের জন্য যথেষ্ট" হযরত উমার (রা)-র এই কথাকে ইমাম যুহরী ও ইমাম আওযাঈ ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। হাসান বসরী দুই দিন এবং ইমাম আবু ইউসুফ দুই দিনের অধিক দীর্ঘ সফরে কসর করা জায়েয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে যে সফরে পায়ে হেঁটে অথবা উটযোগে গেলে তিন দিন অতিবাহিত হয় (প্রায় চুয়ান্ন মাইল) তাতে কসর করা যায়। ইবনে উমার (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও উছমান (রা) এই মত প্রকাশ করেছেন।

সফর ব্যপদেশে কোথাও যাত্রাবিরতি করলে কতো দিন পর্যন্ত কসর করা যাবে, এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমাদের মতে মুসাফির ব্যক্তি যদি একাধারে চার

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ গন্তব্যস্থানে পৌছে কসর করা সম্পর্কে।

١٩٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ اُصَلِّىْ صَلٰوةَ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ اَجْمَعْ مَكْثًا فَاِنْ حَبَسَنِىْ ذٰلِكَ اثْنَتَىْ عَشَرَةَ لَيْلَةً .

১৯৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি যতোক্ষণ কোথাও অবস্থান করার নিয়াত না করবো, ততোক্ষণ কসর করতে থাকবো, অনিশ্চয়তায় বারো দিন চলে গেলেও।

١٩٧- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ كَانَ اِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ اَتِمُّوْا صَلٰوتَكُمْ فَاِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ .

১৯৭। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার (রা) যখন মক্কায় যেতেন, তখন মুসাফির অবস্থায় লোকদের নামাযে ইমামতি করতেন। দুই রাক্‌আত নামায পড়ার পর তিনি লোকেদের বলতেন, হে মক্কার অধিবাসীগণ! তোমরা তোমাদের অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করো, কেননা আমরা মুসাফির।

١٩٨- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُقِيْمُ بِمَكَّةَ عَشْرًا فَيَقْصُرُ الصَّلٰوةَ اِلاَّ اَنْ يَّشْهَدَ الصَّلٰوةَ مَعَ النَّاسِ فَيُصَلِّىْ بِصَلٰوتِهِمْ .

১৯৮। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) ১০ দিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করতেন এবং নামায কসর করতেন। কিন্তু তিনি যদি (স্থানীয় ইমামের সাথে) জামাআতে নামায পড়তেন তবে পূর্ণ নামাযই পড়তেন।

١٩٩-اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ اَنَّهُ سَئَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُسَافِرِ اِذَا كَانَ لاَ يَدْرِىْ مَتٰى يَخْرُجُ يَقُوْلُ اَخْرُجُ الْيَوْمَ بَلْ اَخْرُجُ غَدًا بَلِ السَّاعَةَ فَكَانَ كَذٰلِكَ حَتّٰى يَاتِىَ عَلَيْهِ لَيَالٌ كَثِيْرَةٌ اَيَقْصُرُ اَمْ مَا يَصْنَعُ قَالَ يَقْصُرُ وَاِنْ تَمَادٰى بِهِ ذٰلِكَ شَهْرًا ·

দিন কোথাও অবস্থান করার সংকল্প করে, তবে তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈর মতে চার দিনের অধিক সময় অবস্থান করার সংকল্প করলে সেখানে কসর করা জায়েয নয়। ইমাম আওযাঈর মতে ১৩ দিন এবং আবু হানীফার মতে ১৫ দিন কিংবা তদুর্ধ্ব সময় অবস্থান করার নিয়াত করলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না।

সফরকারী যদি কোন কারণে কোথাও ঠেকায় পড়ে অবস্থান করতে থাকে এবং প্রতিটি মুহূর্তে অসুবিধা দূর হওয়ার ও বাড়ির উদ্দেশে প্রত্যাবর্তন করার সম্ভাবনা থাকে, তবে এমন স্থানে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কসর করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সকল আলেমই একমত। এরূপ অবস্থায় সাহাবাগণ একাধারে দু'বছর কসর করেছেন বলে প্রমাণ আছে। ইমাম আহমাদ এই ঘটনার উপর কিয়াস করে বন্দীদের জন্য সমস্ত মেয়াদ ব্যাপী কসর করার অনুমতি দিয়েছেন (অনুবাদক)।

১৯৯। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সালেম ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন মুসাফির নিশ্চিত জানে না যে, সে কবে প্রস্থান করবে, এই আজ যাই, কাল যাই, বরং এই মুহূর্তে যাচ্ছি, এভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। সে কি কসর করবে, না পূর্ণ নামায পড়বে? তিনি বলেন, সে কসর করতে থাকবে, অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে একমাস কেটে গেলেও।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে মুসাফির ব্যক্তি শহরে প্রবেশ করে কসর করতে থাকবে, যদি সে ১৫ দিনের কম সময় অবস্থান করার নিয়াত করে। কিন্তু ১৫ দিনের বা তার অধিক সময় অবস্থান করার সংকল্প করলে সে পুরা নামায পড়বে (কসর করবে না)।

٢٠٠-عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَنْ اَجْمَعَ عَلٰى اِقَامَةِ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ فَلْيُتِمَّ الصَّلٰوةَ ـ

২০০। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, যে ব্যক্তি (কমপক্ষে) চার দিন অবস্থান করার সংকল্প করে, সে পূর্ণ নামায পড়বে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করিনি। বরং মুসাফির যতোক্ষণ (কমপক্ষে) ১৫ দিনের অবস্থান করার নিয়াত না করবে, কসর করতে থাকবে। ইবনে উমার (রা) ও সাঈদ ইবনে যুবায়ের প্রমুখের এই মত।

٢٠١- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اِذَا كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ الْاِمَامِ بِمِنًى يُصَلِّىْ اَرْبَعًا وَاِذَا صَلّٰى لِنَفْسِهٖ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

২০১। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) যখন মিনায় স্থানীয় লোকদের সাথে জামাআতে নামায পড়তেন, তখন চার রাকআত পড়তেন। কিন্তু তিনি একাকী নামায পড়লে দুই রাক্আত পড়তেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম যদি মুকীম হয় এবং মুক্তাদী মুসাফির হয় তবে সে কসর করবে না, বরং ইমামের সাথে পূর্ণ নামায পড়বে। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সফররত অবস্থায় নামাযের কিরাআত।

٢٠٢- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ قَرَاَ فِى السَّفَرِ فِى الصُّبْحِ بِالْعَشْرِ السُّوَرِ مِنْ اَوَّلِ الْمُفَصَّلِ يُرَدِّدُهُنَّ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ سُوْرَةً .

২০২। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) সফররত অবস্থায় ফজরের নামাযে মুফাসসাল সূরাসমূহের প্রথম দশটির মধ্য থেকে প্রতি রাক্আত একটি করে সূরা পড়তেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সফররত অবস্থায় ফজরের নামাযে সূরা বুরূয, সূরা তারেক ইত্যাদি পড়া উচিৎ।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে এবং বৃষ্টির সময় দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করা।

٢٠٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا عَجَلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

২০৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাড়াতাড়ি করার প্রয়োজন হলে তিনি মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন।

٢٠٤- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حِيْنَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى السَّفَرِ سَارَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ .

২০৪। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) সফরে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তে চাইলে "শাফাক" অন্তর্হিত না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকতেন।[৩৫]

٢٠٥- اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ هُرْمُزَ اَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْعَصْرِ وَالظُّهْرِ فِى السَّفَرِ اِلٰى تَبُوْكَ .

২০৫। আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক যুদ্ধের সফরে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়তেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে দুই নামায একত্র করার পন্থা এই যে, এক ওয়াক্তের নামাযে বিলম্ব করতে হবে এবং অপর ওয়াক্ত জলদি করতে হবে। অর্থাৎ প্রথম নামাযের শেষ ওয়াক্ত এবং দ্বিতীয় নামাযের প্রথম ওয়াক্তে দুই নামায একত্রে পড়তে হবে। আমরা ইবনে উমার (রা) সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, তিনি মাগরিবের নামায শাফাক অন্তর্হিত হওয়ার পূর্বে পড়তেন। এটা ইমাম মালেকের রিওয়ায়াতের বিপরীত।

٢٠٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا جَمَعَ الْاُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمَعَ مَعَهُمْ فِى الْمَطَرِ .

২০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। যখন খুলাফায়ে রাশেদূন এবং আমীর-ওমরাগণ বৃষ্টির কারণে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন, তখন তিনিও তাদের অনুসরণ করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-র এই মত গ্রহণ করিনি। আমাদের মতে দুই নামায একই ওয়াক্তে জমা করা জায়েয নয়। কেবল আরাফাতের

---

৩৫. ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র)-র মতে সূর্যাস্তের সময় পশ্চিম আকাশে যে লালিমা দৃষ্ট হয় তাকে 'শাফাক' বলে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে লালিমা অন্তর্হিত হওয়ার পর যে সাদা বর্ণ দেখা যায় তাকে 'শাফাক' বলে। এটা অদৃশ্য হলে এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় (অনুবাদক)।

ময়দানে যুহর ও আসর এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা (হজ্জের সময়) একত্রে পড়তে হবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٢٠٧- قَالَ مُحَمَّدٌ بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ كَتَبَ فِى الْاَفَاقِ يَنْهَاهُمْ اَنْ يَّجْمَعُوْا بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ وَيُخْبِرُهُمْ اَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ فِىْ وَقْتٍ وَّاحِدٍ كَبِيْرَةٌ مِّنَ الْكَبَائِرِ اَخْبَرَنَا بِذٰلِكَ الثِّقَاتُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ .

২০৭। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা হযরত উমার (রা) সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই মর্মে লিখিত আদেশ পাঠান যে, "একই ওয়াক্তে একত্রে দুই নামায পড়া যাবে না। এটা বড়ো ধরনের অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে"। এই কথা নির্ভরযোগ্য রাবীগণ আলা ইবনে হারিসের সূত্রে, তিনি মাকহুলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[৩৬]

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সফররত অবস্থায় যান-বাহনের উপর নামায পড়া।

٢٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ فِى السَّفَرِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهٖ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ .

২০৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফররত অবস্থায় বাহনের উপর নামায পড়তেন এবং বাহনের মুখ যেদিকে থাকতো তাঁর মুখও সেদিকে থাকতো। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-ও অনুরূপভাবে নামায পড়তেন।

٢٠٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِىْ سَفَرٍ فَكُنْتُ اَسِيْرُ مَعَهُ وَاَتَحَدَّثُ مَعَهُ حَتّٰى اِذَا خَشِيْتُ اَنْ يَّطْلَعَ الْفَجْرُ تَخَلَّفْتُ فَنَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَلَحِقْتُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ

---

৩৬. হানাফী মাযহার মতে হজ্জের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে জমা করে পড়া জায়েয নয়। হজ্জের সময় আরাফাতে যুহর ও আসরের নামায এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়ার ব্যাপারে সকল ইমামই একমত। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং জুমহুর আলেমদের মতে সফর এবং বৃষ্টির সময় দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ার অনুমতি আছে। একদল আলেম বিশেষ ওজর বশত দুই নামাযে একত্রে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। হযরত উমার (রা) কর্তৃক দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়াকে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করাটা ওজরহীন অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা বৃষ্টি, সফর ইত্যাদি সময় দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করে পড়ার বৈধতা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাবাহাবাদের কর্মনীতি থেকেই প্রমাণিত (অনুবাদক)।

وَخَشِيْتُ اَنْ اَصْبَحَ فَقَالَ اَلَيْسَ لَكَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلٰى وَاللّٰهِ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ .

২০৯। সাঈদ ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এক সফরে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সফরসংগী ছিলেন। (রাবী বলেন) আমি তার সাথে কথা বলছিলাম আর পথ চলছিলাম। আমি ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে তার পিছনে সরে এসে বাহন থেকে নিচে নেমে বেতের নামায পড়লাম। অতঃপর বাহনে উঠে তার সাথে মিলিত হলাম। ইবনে উমার (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! আমি বাহন থেকে নিচে নেমে বেতের নামায পড়েছি। কেননা আমি ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি। তিনি বলেন, তোমার জন্য কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ নেই? আমি বলাম, আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয় আছে। তিনি বলেন, তাহলে শুনো, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের পিঠে বেতের নামায পড়তেন।[৩৭]

---

৩৭. এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম মালেক, শাফিঈ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ (র) প্রমুখ ফিক্হবিদগণ বলেছেন, বেতের নামায সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। যদি তাই না হতো, তবে বিশেষ কোন ওজর ছাড়া এই নামায বাহনের উপর পড়া জায়েয হতো না। তাছাড়া একটি হাদীসে বেতের সুন্নাত নামায হিসাবে উল্লেখ আছে। যেমন হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلٰوتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَاَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ .

"বেতের নামায তোমাদের ফরজ নামাযগুলোর মতো বাধ্যতামূলক নয়, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে সুন্নাত হিসাবে ধার্য করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বেজোড়, তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। অতএব হে কুরআনের অধিকারীগণ! তোমরা বেতের নামায পড়ো" (তিরমিযী)।

আবু মুহাইরীয (র) থেকে বর্ণিত। কিনানা গোত্রের মাখদাজী নামের এক ব্যক্তি সিরিয়ায় আবু মুহাম্মাদ নামে এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, বেতের নামায ওয়াজিব (اِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ)। মাখদাজী বলেন, আমি উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র কাছে এসে তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করলাম। উবাদা (রা) বলেন, আবু মুহাম্মাদ মিথ্যা বলেছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ পাঁচটি নামায রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উপর ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা হালকা মনে না করে বরং গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি তা আদায় করবে না, তার জন্য আল্লাহ্র কাছে এ ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে বেহেশতেও প্রবেশ করাতে পারেন (আবু দাউদ)।

অপরদিকে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, বেতের নামায ওয়াজিব। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ صَلٰوةً اَلاَ وَهِىَ الْوِتْرُ .

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর একটি নামায বর্ধিত করেছেন। জেনে রাখো, তা হচ্ছে বেতের" (তিরমিযী, আবু দাউদ, তাবারানী, মুসনাদে আহমাদ, দারু কুতনী)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন ঃ

اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَّاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ .

"বেতের প্রত্যেক মুসলমানের উপর বাধ্যতামূলক এবং ওয়াজিব" (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আবু আইউব আনসারী (রা)-র সূত্রে মারফূ রিওয়ায়াতরূপে সংকলিত)।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا .

"আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ "বেতের পড়া বাধ্যতামূলক। যে ব্যক্তি বেতের পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বেতের পড়া বাধ্যতামূলক। যে ব্যক্তি বেতের পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বেতের বাধ্যতামূলক। যে ব্যক্তি বেতের পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়" (আবু দাউদ, হাকেম)।

সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র সূত্রে উল্লেখ আছে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোর হওয়ার পূর্বেই বেতের নামায পড়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন"।

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে, মুআয ইবনে জাবাল (রা) সিরিয়ায় গিয়ে দেখলেন, সেখানকার লোকজন বেতের নামায পড়ে না। তিনি আমীর মুআবিয়া (রা)-র দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, কি ব্যাপার! আমি যে সিরিয়ার লোকজনকে বেতের নামায পড়তে দেখছি না? মুআবিয়া (রা) বলেন, وَوَاجِبٌ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ (তা কি তাদের উপর ওয়াজিব)? তিনি বলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ

زَادَنِىْ رَبِّىْ صَلٰوةً وَهِىَ الْوِتْرُ وَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ .

"আল্লাহ তাআলা আমার উপর আরো একটি নামায বর্ধিত করেছেন। তা হচ্ছে বেতের। এর ওয়াক্ত হচ্ছে এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়" (মুসনাদে আহমাদ)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلٰوةٍ وَهِىَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِىَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ .

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা একটি নামাযের দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছেন। তা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও অধিক কল্যাণকর। তা হচ্ছে বেতের নামায। তিনি তোমাদের জন্য এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়কে এর ওয়াক্ত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন"(আবু দাউদ, তিরমিযী)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন ঃ

مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَ وَاسْتَيْقَظَ .

"যে ব্যক্তি বেতের না পড়ে ঘুমিয়ে গেছে অথবা তা পড়তে ভুলে গেছে সে যেন তা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বা ঘুম ভাংগার পরপরই পড়ে নেয়" (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

এসব হাদীসের ভাষা ও বক্তব্য থেকে বেতের নামায ওয়াজিব প্রমাণিত হয় (অনুবাদক)।

٢١٠- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِىْ سَفَرٍ يُصَلِّىْ عَلٰى حِمَارِهٖ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ اِلٰى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ اِيْمَاءً بِرَاْسِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّضَعَ وَجْهَهٗ عَلٰى شَيْئٍ .

২১০। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে সফররত অবস্থায় তার গাধার পিঠে কিবলার বিপরীত দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি তার মুখমণ্ডল কোন কিছুর উপর রাখার পরিবর্তে মাথার ইশারায় রুকূ-সিজদা করেছেন। (বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আরো আছে, আনাস (রা) বলেন, "আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ করতে না দেখতাম তবে আমি কখনো তা করতাম না")।

٢١١- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يُصَلِّ مَعَ صَلٰوةِ الْفَرِيْضَةِ فِى السَّفَرِ التَّطَوُّعَ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا اِلاَّ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَاِنَّهٗ كَانَ يُصَلِّىْ نَازِلاً عَلَى الْاَرْضِ وَعَلٰى بَعِيْرِهٖ اَيْنَمَا تَوَجَّهَ بِهٖ .

২১১। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (র) সফরকালে ফরয নামাযের পূর্বে অথবা পরে কোন নফল নামায পড়তেন না, তবে মধ্যরাতে নফল নামায পড়তেন। তিনি কখনো তার উটের পিঠে,আবার কখনো নিচে নেমে এসে নামায পড়তেন, যেদিকে বাহনের মুখ থাকতো সেদিকে মুখ করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মুসাফির ব্যক্তি তার বাহনের উপর নফল নামায যে কোন দিকে মুখ করে পড়তে পারে এবং রুকূ-সিজদা ইশারায় করতে পারে। তবে রুকূর তুলনায় সিজদায় মাথা অধিক ঝুঁকাবে। কিন্তু ফরয নামায এবং বেতের নামায বাহন থেকে নিচে নেমে এসে পড়বে। এর সমর্থনে বহু সংখ্যক হাদীস বিদ্যমানে আছে।

٢١٢- عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّى التَّطَوُّعَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ اَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ فَاِذَا كَانَتِ الْفَرِيْضَةُ اَوِ الْوِتْرُ نَزَلَ فَصَلّٰى .

২১২ হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান আল-কূফী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সওয়ারীর উপর নফল নামায পড়তেন তাকে নিয়ে বাহন যেদিকে মুখ করে থাকতো সেদিকে মুখ করে। কিন্তু ফরয অথবা বেতের নামায তিনি বাহন থেকে নিচে নেমে এসে পড়তেন।

٢١٣- عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَزِيْدُ عَلَى الْمَكْتُوْبَةِ فِى السَّفَرِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ لاَ يُصَلِّىْ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَيُحْىِ اللَّيْلَ عَلٰى ظَهْرِ الْبَعِيْرِ اَيْنَمَا كَانَ وَجْهُهٗ وَيَنْزِلُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ وَيُوْتِرُ فِى الْاَرْضِ فَاِذَا قَامَ لَيْلَةً فِىْ مَنْزِلٍ اَحْىَ اللَّيْلَ .

২১৩। মুজাহিদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সফরকালে দুই রাক্‌আত ফরয নামাযের সাথে এর আগে বা পরে কোন (নফল বা সুন্নাত) নামায পড়তেন না। তিনি সফরে রাতে তার উটের পিঠে নফল নামায পড়তেন যেদিকে বাহন মুখ করে থাকতো সেদিকে ফিরে। ফজরের সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি উটের পিঠ থেকে নিচে নেমে এসে বেতের নামায পড়তেন। অনুরূপভাবে তিনি কোন মনযিলে যাত্রাবিরতি করলে রাতে ইবাদতে কাটাতেন।

٢١٤- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يُصَلِّى الصَّلٰوةَ كُلَّهَا عَلٰى بَعِيْرِهِ نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ وَيُوْمِىْ بِرَاْسِهِ اِيْمَاءً وَيَجْعَلُ السُّجُوْدَ اَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ وَالْوِتْرَ فَاِنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ لَهُمَا فَسَئَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُوْمِىْ بِرَاْسِهِ وَيَجْعَلُ السُّجُوْدَ اَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ .

২১৪। মুজাহিদ (র) বলেন, আমি মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সফরসংগী ছিলাম। তিনি গোটা নামাযই তার উটের পিঠে মদীনামুখী হয়ে আদায় করতেন এবং মাথার ইশারায় রুকূ-সিজদা করতেন। তবে তিনি রুকূর তুলনায় সিজদায় মাথা অধিক নত করতেন, কিন্তু ফরয নামায এবং বেতের নামায উটের পিঠ থেকে নিচে নেমে এসে পড়তেন। এ সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন। অর্থাৎ তিনি যেদিকে ইচ্ছা মুখ করে মাথার ইশারায় নামায পড়তেন এবং রুকূর তুলনায় সিজদায় মাথা অধিক বেশি নত করতেন।[৩৮]

٢١٥- حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ عَلٰى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ وَلاَ يَضَعُ جَبْهَتَهُ وَلٰكِنْ يُشِيْرُ لِلرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ بِرَاْسِهِ فَاِذَا نَزَلَ اَوْتَرَ .

২১৫। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। বাহন যেদিকে মুখ করে থাকতো সেদিকে ফিরে তার পিতা তার বাহনের উপর নামায পড়তেন। তিনি তার কপাল কোন কিছুর উপর রাখতেন না, বরং মাথার ইশারায় রুকূ-সিজদা করতেন। অতঃপর তিনি নিচে নেমে এসে বেতের পড়তেন।

---

৩৮. ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহনে যেদিকে ইচ্ছা মুখ করে নফল নামায পড়তেন। অতঃপর ইবনে উমার (রা) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ .

"যেদিকেই তোমার মুখ ফিরাবে, সেদিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা বিরাজমান" (সূরা বাকারা ঃ ১১৫)। তিনি বলেন, আয়াতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই কর্মনীতি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, বায়হাকী)। সফররত অবস্থায় বাহনের উপর যে কোন দিকে ফিরে নফল নামায পড়া যায় (অনুবাদক)।

٢١٦- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِه حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ تَطَوُّعًا يُؤْمِيْ اِيْمَاءً وَّيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيُوْمِيْ وَيَنْزِلُ لِلْمَكْتُوْبَةِ وَالْوِتْرِ .

২১৬। ইবরাহীম নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার বাহনের উপর যেদিকে ইচ্ছা মুখ করে ইশারায় নফল নামায পড়তেন এবং সিজদার আয়াত পাঠ করলে ইশারায় সিজদা করতেন। তিনি ফরয নামায ও বেতের নামায পড়ার জন্য বাহন থেকে নিচে নামতেন।

٢١٧- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ صَلَّى التَّطَوُّعَ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُّوْتِرَ نَزَلَ فَاَوْتَرَ .

২১৭। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা)-র বাহানের মুখ যেদিকে থাকতো, তিনি সেদিকে ফিরে নামায পড়তেন। অতঃপর যখন তিনি বেতের পড়ার ইচ্ছা করতেন, নিচে নামতেন এবং বেতের পড়তেন।[৩৯]

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় কারো কাযা নামাযের কথা স্মরণ হলে।

٢١٨- حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً مِّنْ صَلٰوتِه فَلَمْ يَذْكُرْهَا اِلاَّ وَهُوَ مَعَ الْاِمَامِ فَاِذَا سَلَّمَ الْاِمَامُ فَلْيُصَلِّ صَلٰوتَهُ الَّتِيْ نَسِيَ ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الصَّلٰوةَ الْاُخْرٰى .

২১৮। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, কোন ব্যক্তির ইমামের সাথে নামাযরত অবস্থায় তার ভুলে যাওয়া নামাযের কথা স্মরণ হলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর সে উঠে দাঁড়িয়ে তার ভুলে যাওয়া নামায পড়বে। এরপর অন্য নামায পড়বে (অর্থাৎ ইমামের সাথে যে নামায পড়েছিল তা পুনরায় পড়বে)।[৪০]

---

৩৯. ৭৫ নং হাদীসে দেখা যায়, ইবনে উমার (রা) বাহনের উপর বেতের নামায পড়ার পক্ষপাতী, আর এখানে তার ভিন্নরূপ কর্মপন্থা লক্ষ্য করা যায়। ইমাম তাহাবী (র) এই দুই মতের উল্লেখ করার পর লিখেছেন, বেতের নামায যখন বাধ্যতামূলক ছিলো না তখন ইবনে উমার (রা) বাহনের উপর বেতের পড়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নামাযকে যখন বাধ্যতামূলক করলেন, তখন থেকে তিনি বাহন থেকে নিচে নেমে বেতের পড়তেন। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল হাই লাখনাবী তাহাবীর এই মতের সমালোচনা করে বলেছেন, তার এই মত প্রমাণিত নয় (অনুবাদক)।

৪০. ইমাম যুহরী, ইবরাহীম নাখঈ, মালেক, আহমাদ, আবু হানীফা, ইবনে উমার (রা) প্রমুখের মতে তরবীব ওয়াজিব। হেদায়া গ্রন্থের রচয়িতা শায়খুল ইসলাম আলী ইবনে আবু বাক্‌র আল-মারগীনানী (মৃ. ৫৯৩ হি.) ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا اِلاَّ وَهُوَ مَعَ الْاِمَامِ فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهُ فَاِذَا فَرَغَ فَلْيُعِدِ الَّذِيْ نَسِيَ ثُمَّ لِيُعِدِ الَّتِيْ صَلاَّهَا مَعَ الْاِمَامِ .

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করছি। শুধু একটি অবস্থায়ই এর ব্যক্তিক্রম আছে। এমন সংকীর্ণ সময় ছুটে যাওয়া নামাযের কথা স্মরণ হলো যে, তখন তা আদায় করতে গেলে ওয়াক্তিয়া নামায কাযা হওয়ার আশংকা আছে, এই অবস্থায় ওয়াক্তিয়া নামায আগে পড়তে হবে। অতঃপর ছুটে যাওয়া নামায পড়বে। ইমাম আবু হানীফা এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবেরও এই মত।

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি ঘরে ফরয নামায পড়ার পর মসজিদে গিয়ে যদি জামাআতে নামায পায়।

٢١٩- عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاُذِنَ بِالصَّلٰوةِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَالرَّجُلُ فِىْ مَجْلِسِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ مَعَ النَّاسِ اَلَسْتَ رَجُلاً مُسْلِمًا قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّىْ قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ فِىْ اَهْلِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ .

২১৯। বুসর ইবনে মিহজান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলেন। নামাযের আযান হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে নামায পড়তে গেলেন। কিন্তু লোকটি (রাবী নিজে) নিজ স্থানে বসে থাকলো। (নামায শেষে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ লোকদের সাথে নামায পড়তে কিসে তোমাকে বাধা দিলো? তুমি কি মুসলিম ব্যক্তি নও? সে বললো, হাঁ, কিন্তু আমি বাড়িতে নামায পড়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি মসজিদে এলে লোকদের সাথে নামায পড়ো বাড়িতে নামায পড়ে থাকলেও।[৪১]

"কোন ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে গেছে। ইমামের সাথে নামাযরত অবস্থায় তা তার স্মরণ হলো। এ অবস্থায় সে ইমামের সাথে তার নামায সমাপ্ত করবে। অতঃপর যখন অবসর হবে, সে তার ভুলে যাওয়া নামায পড়বে, অতঃপর ইমামের সাথে পড়া নামায পুনরায় পড়বে" (দারু কুতনী, বায়হাকী)।

অপরদিকে তাউস (র) বলেছেন, তরতীব ওয়াজিব নয়। শাফিঈ এবং যাহেরী মাযহাবের ইমামদেরও এই মত (অনুবাদক)।

৪১. হাদীসটি মুওয়াত্তা ইমাম মালেক এবং নাসাঈতেও উল্লেখ আছে। নাসাঈ এবং হাকেম গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اِذَا صَلّٰى اَحَدُ فِىْ بَيْتِهٖ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ يُصَلُّوْنَ فَلْيُصَلِّ مَعَهُمْ وَتَكُوْنَ لَهُ نَافِلَةٌ .

"কোন ব্যক্তি বাড়িতে নামায পড়ার পর মসজিদে এসে যদি দেখে, লোকেরা জামাআতে নামায পড়ছে, তবে সে যেন তাদের সাথে নামাযে শরীক হয়। জামাআতের এই নামায তার জন্য নফল গণ্য হবে"।

হানাফী মাযহাবমতে, একাকী ফরয নামায আদায় করার পর তা পুনর্বার জামাআতে পড়া যেতে পারে, যদি তা যুহর বা এশার নামায হয় এবং এটা তার জন্য নফল হবে। কেননা ফজর ও আসরের পর নফল নামায পড়া মাকরূহ।আর মাগরিবের নামায পুনর্বার এজন্য পড়া যাবে না যে, নফল নামায কখনো তিন রাকআত হয় না। কিন্তু শাফিঈ মাযহাবমতে, যে কোন ওয়াক্তের নামায পুনর্বার জামাআতে পড়া যেতে পারে, এমনকি তা পূর্বে জামাআতে পড়ে থাকলেও (অনুবাদক)।

٢٢٠- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ اَوِ الصُّبْحِ ثُمَّ اَدْرَكَهُمَا فَلاَ يُعِيْدُ لَهُمَا غَيْرَ مَا قَدْ صَلاَّهُمَا .

২২০। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, কোন ব্যক্তি একাকী মাগরিব অথবা ফজরের নামায পড়ার পর জামাআত পেলে সে তা পুনর্বার পড়বে না।

٢٢١- عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ اَنَّهُ سَئَلَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ فَقَالَ اِنِّىْ اُصَلِّىْ ثُمَّ اٰتِى الْمَسْجِدَ فَاَجِدُ الْاِمَامَ يُصَلِّىْ اَفَاُصَلِّىْ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ صَلِّ مَعَهُ وَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَلَهُ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ اَوْ سَهْمُ جَمْعٍ .

২২১। আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-র কাছে বলেন, আমি বাড়িতে নামায পড়ার পর মসজিদে এসে ইমামকে নামাযরত দেখতে পাই। আমি কি পুনরায় তার সাথে নামায পড়বো? তিনি বলেন, হাঁ, তার সাথে নামায পড়ো। যে ব্যক্তি তা করবে তাকে দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা উল্লেখিত কর্মনীতি গ্রহণ করেছি। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র মতের উপর আমরা আমল করি। তবে ফজর এবং মাগরিবের নামায পুনর্বার পড়বে না। কেননা মাগরিবের নামায বেজোড় এবং নফল নামায বেজোড় পড়া যায় না। আর ফজরের নামাযের পর নফল নামায পড়া নিষেধ। অনুরূপভাবে আসরের নামাযের পরও নফল নামায পড়া নিষেধ। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির নামায এবং আহার একই সময়ে উপস্থিত হলে সে কোনটি প্রথমে করবে?

٢٢٢- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُقَرَّبُ اِلَيْهِ الطَّعَامُ فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهِ فَلاَ يُعَجِّلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتّٰى يَقْضِىَ مِنْهُ .

২২২। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সামনে আহার পরিবেশন করার পর তিনি মসজিদে ইমামের কিরাআতের শব্দ শুনতে পেলে তাড়াহুড়া করে আহার করতেন না, বরং ধীরে সুস্থে আহার শেষ করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এতে আপত্তির কিছু নেই। তবে নামাযের সময় খাবার শুরু করা আমাদের কাছে পছন্দনীয় নয়, বরং নামায শুরু হওয়ার পূর্বেই আহার সেরে নিবে।

৩৭. অনুচ্ছেদঃ আসর নামাযের ফযীলাত এবং আসরের পর নফল নামায পড়া।

٢٢٣- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ رَاٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ مُنْكَدِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

২২৩। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি দেখেন যে, মুনকাদির ইবনে আবদুল্লাহকে আসরের পর দুই রাক্আত নফল পড়ার অপরাধে উমার (রা) প্রহার করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত যে, আসরের পর নফল নামায পড়ার বিধান নেই। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর এই মত।

٢٢٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الَّذِىْ يَفُوْتُهُ الْعَصْرُ كَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ .

২২৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, যার আসরের নামায ছুটে গেলো, তার ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদ যেন ধ্বংস হয়ে গেলো।

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত এবং এই দিন সুগন্ধি লাগানো।

٢٢٥- اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سُهَيْلِ بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ اَرٰى طِنْفِسَةً لِّعَقِيْلِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُطْرَحُ اِلٰى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِىِّ فَاِذَا غَشِىَ الطِّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِلَى الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيْلُ قَائِلَةَ الضُّحٰى .

২২৫। আবু সুহাইল ইবনে মালেক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লক্ষ্য করেছি, জুমুআর দিন আকীল ইবনে আবু তালিব (রা)-র একটি চাটাই মসজিদে নববীর পশ্চিম দিকে দেওয়ালের পাশে বিছানো হতো। অতএব গোটা চাটাইয়ের উপর যখন দেয়ালের ছায়া ছাড়িয়ে যেতো, তখন উমার (রা) জুমুআর নামায পড়ার জন্য বেরিয়ে আসতেন। অতঃপর আমরা বাড়িতে ফিরে এসে দুপুরের বিশ্রাম নিতাম।

٢٢٦- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرُوْحُ اِلَى الْجُمُعَةِ اِلاَّ وَهُوَ مُدَّهِنٌ مُتَطَيِّبٌ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ مُحْرِمًا .

২২৬। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) সুগন্ধি মেখে জুমুআর নামাযে আসতেন। তবে তিনি ইহরাম অবস্থায় থাকলে স্বতন্ত্র কথা।

٢٢٧-عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

২২৭। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, উছমান ইবনে আফফান (রা) জুমুআর দিন তৃতীয় আযানের প্রবর্তন করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা উল্লেখিত সব কর্মপন্থা গ্রহণ করেছি। তৃতীয় যে আযানের প্রবর্তন করা হয়েছে, তা হচ্ছে প্রথম আযান। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের কিরাআত এবং খোতবা চলাকালে নীরব থাকা উত্তম।

٢٢٨- عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ سَئَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَثَرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.

২২৮। দাহহাক ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নুমান ইবনে বাশীর (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিন সূরা জুমুআর পর কোন সূরা পড়তেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা আল-গাশিয়া পড়তেন।

٢٢٩- عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِىْ مَالِكٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَخْرُجَ عُمَرُ فَاِذَا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ ثَعْلَبَةُ جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ مِنَّا .

২২৯। সালাবা ইবনে আবু মালেক (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা)-র যুগে তিনি বের হয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত লোকজন জুমুআর দিন নামায পড়তে থাকতো। তিনি বের হয়ে এসে মিম্বারে বসতেন এবং মুআয্যিন আযান দিতো। আমরা আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত কথাবার্তা বলতাম। মুয়ায্জিন যখন চুপ হতো এবং উমার (রা) খোতবা শুরু করতেন, তখন আমরা কথাবার্তা বন্ধ করতাম। এরপর আমাদের কেউই আর কথা বলতো না।

٢٣٠- حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ خُرُوْجُهُ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ .

২৩০। ইমাম যুহরী (র) বলেন, ইমামের খোতবার জন্য বের হয়ে আসা নামাযকে স্থগিত করে দেয় এবং তার কথা (খোতবা) অন্যদের কথা বলাকে বন্ধ করে দেয়।

٢٣١- عَنْ مَالِكِ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ خُطْبَتِهِ قَلَّ مَا يَدَعُ ذٰلِكَ اِذَا خَطَبَ اِذَا قَامَ الْاِمَامُ فَاسْتَمِعُوْا وَاَنْصِتُوْا فَاِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِىْ لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ .

২৩১। মালেক ইবনে আবু আমের (র) বলেন, উছমান ইবনে আফফান (রা) খোতবা দানকালে প্রায়ই খোতবায় বলতেন ঃ ইমাম খোতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ালে তোমরা নীরবে খোতবা শোনো। কেননা যে ব্যক্তি নীরব থাকবে, খোতবার শব্দ তার কানে আসুক আর নাই আসুক তাকে নীরবে খোতবা শ্রবণকারীর সমানই সওয়াব দেয়া হবে।

٢٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ .

২৩২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইমামের খোতবা দানকালে তুমি যদি তোমার পাশের লোককে বলো, 'চুপ থাকো', তবে তুমিও একটি অযথা কথা বললে।

٢٣٣- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَاٰى فِىْ قَمِيْصِهِ دَمًا وَالْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَنَزَعَ قَمِيْصَهُ فَوَضَعَهُ .

২৩৩। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জুমুআর দিন ইমামের খোতবা দানকালে নিজের জামায় রক্ত দেখতে পেলেন। তিনি সেটি খুলে রেখে দিলেন।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামায এবং খোতবা প্রসঙ্গ ।

٢٣٤- عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَوْلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْاٰخَرُ يَوْمٌ تَاْكُلُوْنَ مِنْ لُحُوْمِ نُسُكِكُمْ قَالَ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ فَقَالَ اِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِىْ يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيْدَانِ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْ اَهْلِ الْعَالِيَةِ اَنْ يَّنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ فَقَدْ اَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عَلِىٍّ وَّعُثْمَانُ مَحْصُوْرٌ فَصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ .

২৩৪। আবু উবায়েদ (র) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি নামায পড়লেন, অতঃপর অসবর হয়ে (সালাম ফিরিয়ে) খোতবা দিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'দিন রোযা রাখতে তোমাদের নিষেধ করেছেন। ঈদুল ফিতরের দিন, যে দিন তোমরা রো[illegible] রাখো না এবং দ্বিতীয়টি যেদিন তোমরা কোরবানীর গোশত খাও। রাবী আরো বলেন, আমি উছমান ইবনে আফফান (রা)-র সাথে ঈদের নামায পড়েছি। তিনি নামায পড়লেন, অতঃপর অবসর হয়ে খোতবা দিলেন। তিনি বলেন, "আজকের দিন তোমাদের জন্য দু'টি ঈদ একত্র হয়েছে। অতএব পল্লী থেকে আগত লোকদের মধ্যে যার ইচ্ছা জুমুআর নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে, আর যার ইচ্ছা চলে যেতে পারে। আমি তাকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দিলাম"। রাবী বলেন, আমি আলী (রা)-র সাথেও ঈদের নামায পড়েছি। তখন হযরত উছমান (রা) (বিদ্রোহীদের দ্বারা) অবরুদ্ধ ছিলেন। তিনি প্রথমে নামায পড়লেন, অতঃপর অবসর হয়ে খোতবা দিলেন।

٢٣٥- اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْاَضْحٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَذَكَرَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ كَانَ يَصْنَعَانِ ذٰلِكَ .

২৩৫। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন খোতবা দেয়ার পূর্বে নামায পড়তেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা) উভয়ে তাই করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উল্লেখিত সব মতই আমরা গ্রহণ করেছি। হযরত উছমান (রা) পল্লী এলাকার মুসল্লীদের জুমুআর নামায পড়া বা না পড়ার অবকাশ এজন্য দিয়েছিলেন যে, তারা শহরের অধিবাসী ছিলো না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের নামাযের পূর্বে অথবা পরে নফল নামায পড়া।

٢٣٦- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُصَلِّىْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلوٰةِ وَلاَ بَعْدَهَا .

২৩৬। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে অথবা পরে নফল নামায পড়তেন না।[৪২]

٢٣٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ اَنْ يَغْدُوَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ .

২৩৭। আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (কাসিম) ঈদের নামায পড়তে যাওয়ার পূর্বে চার রাক্আত নামায পড়তেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ঈদের নামাযের পূর্বে কোনরূপ নফল নামায নেই। তবে ঈদের নামাযের পর ইচ্ছা করলে নফল নামায পড়াও যায়, নাও পড়া যায়। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের নামাযের কিরাআত।

٢٣٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَئَلَ اَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِىَّ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِقَافْ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ .

২৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবু ওয়াকিদ আল-লাইছী (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে কোন সূরা পড়তেন? তিনি বলেন, সূরা কাফ ও সূরা আল-কামার।

---

৪২. সহীহ সনদ সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ঈদের নামাযের পূর্বে অথবা পরে কোন নফল নামায আছে বলে প্রমাণিত নেই। সাহাবাদের কর্মনীতিও তাই ছিল। তবে ইবনে মাজার একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের নামাযের পূর্বে কোন নফল নামায পড়তেন না, কিন্তু নামাযশেষে বাড়িতে পৌঁছে দুই রাক্আত নফল পড়তেন (অনুবাদক)।

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের তাকবীর।

٢٣٩-اَخْبَرَنَا نَافِعٌ قَالَ شَهِدْتُ الْاَضْحٰى وَالْفِطْرَ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِى الْاُوْلٰى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى الْاٰخِرَةِ (الْاَخِيْرَةِ) بِخَمْسِ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ •

২৩৯। নাফে (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথম রাক্‌আতে কিরাআত (ফাতিহা) পড়ার পূর্বে সাতবার তাকবীর দিলেন এবং দ্বিতীয় রাক্‌আতে কিরাআত পড়ার পূর্বে পাঁচবার তাক্‌বীর দিলেন।[৪৩]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। যে কোন মত অনুসারে আমল করা উত্তম। তবে আমাদের মতে ইবনে মাসঊদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাকবীর সংখ্যার উপর আমল করা অপেক্ষাকৃত উত্তম। তিনি প্রত্যেক ঈদের নামাযে মোট নয় তাকবীর দিতেন, প্রথম রাক্‌আতে পাঁচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক্‌আতে চার তাকবীর। তাকবীর তাহরীমা এবং দুই রুকূর তাকবীরও এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি প্রথম রাক্‌আতে তাকবীর বলার পর কিরাআত পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাক্‌আতে কিরাআত পড়ার পর তাকবীর বলতেন। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে রাতের ইবাদত (তারাবীহ নামায) ও তার ফযীলাত।

٢٤٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى بِصَلٰوتِهِ نَاسٌ ثُمَّ كَثُرُوْا مِنَ الْقَابِلَةِ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا فِى اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ فَكَثُرُوْا فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَاَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمُ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ اِلاَّ اَنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يُّفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ .

২৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (এক রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নববীতে নফল নামায পড়লেন। লোকজনও তাঁর সাথে নামায পড়লো। পরবর্তী রাতে নামাযীদের সংখ্যা আরো বেড়ে গেলো। তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাতেও লোকজন অধিক সংখ্যায় জড়ো হলো।

---

৪৩. ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা নিয়ে সাহাবাদের সূত্রে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। এজন্য বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যেও এনিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের হানাফী মাযহাবমতে ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর রয়েছে। প্রথম রাক্‌আতের তিন তাকবীর সূরা ফাতিহা শুরু করার আগে ও সানা পড়ার পরে দিতে হবে। আর দ্বিতীয় রাক্‌আতের তিন তাকবীর সূরা ফাতিহা ও তার সাথে আর একটি সূরা পড়ার পর এবং রুকূতে যাওয়ার পূর্বে দিতে হবে। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আয়েশা (রা)-র মতে রুকূর তাকবীর ছাড়া অতিরিক্ত আরো বারোটি তাকবীর রয়েছে। প্রথম রাক্‌আতে সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক্‌আতেও সূরা ফাহিতা শুরু করার পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, মালেক ও যাহেরী মাযহাব এই মত গ্রহণ করেছেন (অনুবাদক)।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আর তাদের কাছে বেরিয়ে আসেননি। ভোরবেলা তিনি বলেন ঃ "গত রাতে তোমরা যা করেছো তা আমি অবশ্যই দেখেছি। তোমাদের নিকট আসতে কোন কিছুই আমাকে বাধা দেয়নি, কিন্তু আমি আশংকা করছিলাম, এই নামায তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয় কিনা?" রাবী বলেন, এটা রমযান মাসের ঘটনা।

٢٤١ - عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَئَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلٰثًا قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ عَيْنَاىَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِىْ .

২৪১। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযান মাসের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রমযান অথবা অন্য কোন মাসে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এগারো রাক্‌আতের অধিক নামায পড়তেন না। তিনি চার রাক্‌আত নামায পড়তেন। তুমি এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করো না। পুনরায় তিনি চার রাক্‌আত নামায পড়তেন। তুমি এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করো না, এরপর তিন রাক্‌আত পড়তেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি বেতের নামায পড়ার পূর্বে ঘুমান? তিনি বলেন ঃ "হে আয়েশা! আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না"।

٢٤٢ - عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَاْمُرَ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الْاَمْرُ فِىْ خِلَافَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَّصَدْرٍ مِّنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلٰى ذٰلِكَ .

২৪২। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের রাতে ইবাদত করার জন্য লোকদের উৎসাহিত করতেন, কিন্তু কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন না। তিনি বলতেন ঃ "যে ব্যক্তি দৃঢ় ঈমান নিয়ে সওয়াব লাভের আশায় রমযান মাসের (রাতে) ইবাদত করে, তার পিছনের যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়"। ইবনে শিহাব (র) বলেন, অতঃপর নবী ﷺ ইন্তেকাল করেন এবং এই নিয়ম পূর্ববৎ বহাল থাকে। অতঃপর আবু বাক্‌র (রা)-র খেলাফত কাল এবং উমার (রা)-র খেলাফতের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকে।

٢٤٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِىْ رَمَضَانَ فَاِذَا النَّاسُ اَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّىْ بِصَلٰوتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ لَاَظُنُّنِىْ لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلَاءِ عَلٰى قَارِئٍ وَّاحِدٍ لَكَانَ اَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً اُخْرٰى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوةِ قَارِئِهِمْ فَقَالَ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ وَالَّتِىْ يَنَامُوْنَ عَنْهَا اَفْضَلُ مِنَ الَّتِىْ يَقُوْمُوْنَ يُرِيْدُ اٰخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ اَوَّلَهُ .

২৪৩। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রমযানের এক রাতে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সাথে বের হলেন। তখন কতক লোক একত্রে এবং কতক লোক একাকী বিচ্ছিন্নভাবে নামায পড়ছিল। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি ভাবছি যে, আমি এই লোকদের একজন ইমামের পিছনে একত্র করে দেই, তবে তা খুবই ভালো হতো। অতঃপর তিনি তাই করার সংকল্প করলেন এবং সবাইকে উবাই ইবনে কাব (রা)-র পিছনে একত্র করেন। রাবী আরো বলেন, আমি আরেক রাতে তার সাথে বের হলাম। তখন সব লোক একজন ইমামের পিছনে নামায পড়ছিল। উমার (রা) বলেন, 'এটা উত্তম বিদআত।[88] লোকজন প্রথম রাতে যে নামায পড়ে, তার তুলনায় সেই নামায উত্তম যা থেকে তারা ঘুমিয়ে পড়ে।' অর্থাৎ লোকেরা রাতের প্রথমাংশে নামায পড়তো। কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল, তারা যদি এই নামায শেষরাতে পড়তো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই কর্মপন্থা গ্রহণ করেছি। রমযান মাসে জামাআতে নফল নামায পড়ায় কোন দোষ নেই।[8৫] কেননা এর উপর মুসলমানদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা এটাকে উত্তম মনে করেছেন। নবী ﷺ বলেন ঃ

---

88. আভিধানিক অর্থে প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত জিনিসকে বিদআত বলা হয়। কিন্তু শরীআতের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, "নিজের পক্ষ থেকে দীনের মধ্যে এমন কিছু প্রবর্তন করা যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়"। অর্থাৎ যার সমর্থনে শরীআতের কোন দলীল নাই। সুতরাং এখানে বিদআত শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ এই অর্থে সব বিদআতই নিকৃষ্ট, পাপ প্রসূত এবং তা গোমরাহীর নামান্তর। এখানে শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) (অনুবাদক)।

8৫. মহামহিম আল্লাহ তাআলা বছরের বারোটি মাসের মধ্যে রমযানুল মোবারক মাসের মর্যাদা স্বয়ং কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন। এ মাসেই মানবজাতির মুক্তির সনদ কুরআন মজীদ নাযিল হয়। ইসলামের অন্যতম রুকন রোযা এ মাসেই ফরয করা হয়। তাই এ মাসে যে কোন সৎকাজের ফযীলাত অতুলনীয়ভাবে অত্যধিক। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না। এজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৫)।

অর্থাৎ উক্ত আয়াতে আল্লাহ পূর্ণ এক মাস রোযা রাখার জন্য এবং তাঁর মহিমা ও গুণগান তথা ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "এ মাসের একটি ফরয ইবাদতের মর্যাদা অন্য মাসের সত্তরটি ফরয ইবাদতের সমান এবং এ মাসের একটি নফল (ঐচ্ছিক) ইবাদতের মর্যাদা অন্য মাসের একটি ফরয ইবাদতের সমান" (বায়হাকীর সুনানুল কুবরা)। হাদীস শরীফে অনুরূপ বহুতর ফযীলাতের কথা বলা হয়েছে।

এ মাসের অতিরিক্ত ও ঐচ্ছিক ইবাদতগুলোর মধ্যে তারাবীহ নামাযও অন্তর্ভুক্ত। মহানবী ﷺ যদিও মাত্র তিন দিন এ নামায জামাআত সহকারে পড়েছেন, কিন্তু নিজ ঘরে তিনি এ নামায নিয়মিত পড়েছেন, বরং রমযান মাসে তিনি অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক ইবাদত-বন্দেগী করেছেন। কেবল ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে এবং উম্মাতের জন্য কষ্টকর হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি তারাবীহ নামায নিয়মিত জামাআতে পড়েননি।

হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবমতে তারাবীহ নামায নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদা, অবশ্য মালিকী মাযহাবমতে কেবল সুন্নাত। হানাফী মাযহাবমতে এই নামাযের জামাআত কায়েম করা সুন্নাতে কিফায়া। অর্থাৎ যে কোন মহল্লার একদল লোক জামাআত সহকারে এই নামায পড়লে উক্ত মহল্লার পক্ষ থেকে জামাআত কায়েম করার সুন্নাত আদায় হয়ে যায়, কিন্তু জামাআত কায়েম না করলে মহল্লার সকলেই গুনাহগার হয়। জামাআত কায়েম হলে মহল্লার অবশিষ্টরা একাকী এ নামায আদায় করতে পারে বটে, কিন্তু জামাআতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকে।

এই নামাযের ওয়াক্ত এশার ফরয ও সুন্নাত পড়ার পর থেকে শুরু হয় এবং সাহরীর পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায়। কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে এসে দেখে যে, তারাবীহ্‌র জামাআত শুরু হয়ে গেছে, তাহলে সে প্রথমে একাকী এশার ফরয ও সুন্নাত পড়ার পর তারাবীহ্‌র জামাআতে শামিল হবে। জামাআত শেষে সে ইচ্ছা করলে ছুটে যাওয়া বাকী রাক্‌আতগুলো আদায় করতে পারে, নাও করতে পারে। এ নামায এক সালামে দুই রাক্‌আত করে পড়া হয়, তবে চার রাক্‌আত করেও পড়া যায় এবং প্রতি চার রাক্‌আত অন্তর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হয় (তারাবীহ অর্থ বিশ্রাম)। এ সময় বসে বসে দোয়া-দুরূদ পড়তে হয়। কোন কোন মসজিদে খুব তাড়াহুড়া করে এ নামায শেষ করতে দেখা যায়। এই প্রবণতা চরম আপত্তিকর। তাড়াহুড়া বর্জন করতে হবে এবং ইমাম সাহেব এমনভাবে কিরাআত পড়বেন যাতে আয়াতের প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে শুনা যায়। রুকূ-সিজদাও ধীরেসুস্থে করতে হবে, দোয়া-দুরূদ ও তাসবীহ-তাহলীলও ধীরেসুস্থে পড়তে হবে। মহানবী ﷺ বলেন ঃ "তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ হতে এবং ধীর-স্থিরতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে" (তিরমিযী, কিতাবুল বিররু, নং ১৯৬১)।

তারাবীহ নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা

তারাবীহ নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা নিয়ে উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতভেদ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে তিন দিন জামাআত সহকারে এ নামায পড়েছেন তার বর্ণনা সম্বলিত হাদীসে রাক্‌আত সংখ্যার উল্লেখ নাই। হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বিশ রাকআতের পক্ষে রায় দিয়েছেন এবং তাই এ মাযহাবের অনুসারীগণ বিশ রাক্‌আত তারাবীহ পড়ে থাকেন।

ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর জামে আত-তিরমিযী শীর্ষক হাদীস গ্রন্থে "কিয়ামে রামাদান" শীর্ষক অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হাদীসের (নং ৭৫৩, বি. আই. সি সংস্করণ) নিচে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য রেখেছেন ঃ "রমযান মাসের রাতসমূহে (নামাযে) দণ্ডায়মান হওয়া সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ আছে। কোন কোন আলেম বলেন, বেতেরসহ (রাতের এই নামাযের) রাক্‌আত সংখ্যা একচল্লিশ (৪১)। এ হলো মদীনাবাসীদের অভিমত এবং এখানকার লোকজন এরূপ আমল করেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের অভিমতে হযরত আলী (রা) ও উমার ফারূক (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী এর রাক্‌আত সংখ্যা বিশ (২০)। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও

শাফিঈ (র)-এর এই অভিমত। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আমাদের নগর মক্কায়ও লোকদেরকে বিশ (২০) রাক্‌আত পড়তে দেখেছি। আহমাদ (র) বলেন, এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। তিনি এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেননি। ইসহাক (র) বলেন, উবাই ইবনে কাব (র)-র বর্ণনা অনুযায়ী আমরা একচল্লিশ রাক্‌আত পড়াই পছন্দ করি। ইবনুল মুবারক, আহমাদ ও ইসহাক (র) রমযান মাসে ইমামের সাথে তারাবীহ্‌র নামায আদায় করা পছন্দ করেছেন" (জামে আত-তিরমিযী, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ১১১-১১২)।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ বুখারীতে লিখেছেন (২খ, পৃ. ২৭৮, হাদীস নং ১৮৬৮-এর অধীন, আধুনিক প্রকাশনী সংস্করণ), আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) বলেন, "আমি রমযানের এক রাতে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে মসজিদের উদ্দেশে বের হলাম। পৌঁছে দেখলাম, বিভিন্ন অবস্থায় বহু লোক। কেউ একা একা নামায পড়ছে, কোথাও এক ব্যক্তি নামায পড়ছে, আর কিছু লোক তার সাথে নামায পড়ছে। তখন উমার (রা) বলেন, আমার মতে, এদের সকলকে একজন কারীর সাথে জামাআতবদ্ধ করে দিলে সবচাইতে ভালো হয়। অতঃপর তিনি (তা করার) মনস্থ করলেন এবং তাদেরকে উবাই ইবনে কাব (রা)-র পেছনে জামাআতবদ্ধ করে দিলেন। অতঃপর আমি পরবর্তী রাতে আবার তার সাথে বের হলাম। দেখলাম, লোকজন তাদের ইমামের সাথে নামায পড়ছে। উমার (রা) বলেছেন, এটি একটি উত্তম বিদআত (সুন্দর ব্যবস্থা)। রাতের যে অংশে লোকেরা ঘুমায় সেই অংশের তুলনায় রাতের যে অংশে তারা ইবাদত করে সেই অংশ অপেক্ষাকৃত উত্তম।" ইমাম বুখারীর এই বর্ণনায় বা তার অপর কোন বর্ণনায় তারাবীহ নামাযের রাক্‌আত সংখ্যার উল্লেখ নাই।

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, উমার (রা) বিচ্ছিন্নভাবে তারাবীহ পড়ুয়াদেরকে উবাই ইবনে কাব (রা)-র ইমামতিতে একত্র করেন। তিনি বিশ রাক্‌আত তারাবীহ পড়ান। হযরত আলী (রা)-ও এক ব্যক্তিকে রমযান মাসে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ পড়ানোর জন্য ইমাম নিয়োগ করেন। সুতরাং বিশ রাকআতের অনুসরণ করাই উত্তম" (আল-মুগনী, ১ম খণ্ড)।

ইমাম মালেক (র)-এর "আল-মুওয়াত্তা" শীর্ষক হাদীস গ্রন্থে সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, "উমার (রা) আট রাক্‌আত তারাবীহ্‌র প্রচলন করেন" এবং ইয়াযীদ ইবনে রূমান (রা) বর্ণিত হাদীসে তৎকর্তৃক বিশ রাকআতের প্রচলন করার উল্লেখ আছে (নামায অধ্যায়, রমযান মাসে নামায পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান অনুচ্ছেদ)।

মহানবী ﷺ ও আবু বাক্‌র (রা)-র খেলাফতকালে এবং উমার (রা)-র খেলাফতের প্রথম পর্যায়ে তারাবীহ নামায জামাআতে পড়া হতো না এবং সেকালে বিচ্ছিন্নভাবে আট রাক্‌আত বা ততোধিক রাক্‌আত নামায পড়ার পক্ষে হাদীস বিদ্যমান থাকলেও তার বিপরীতে বিশ রাকআতের পক্ষেও হাদীস বিদ্যমান আছে। যারা রাতের অতিরিক্ত নামায আট রাক্‌আত বলেন, তাদের মধ্যে কতিপয় উগ্র ব্যক্তি এ পর্যন্তও বলেন যে, বিশ রাকআতের পক্ষপাতীগণ একটি মওযূ (মনগড়া, বানোয়াট) হাদীসও পেশ করতে পারবে না। এ দাবি সম্পূর্ণ অসার। মুওয়াত্তা ইমাম মালেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসটির অতিরিক্ত খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের একটি হাদীস এখানে পেশ করা হলো ঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ .

"ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ রমযান মাসে জামাআত ব্যতিরেকে বিশ রাক্‌আত ও এক রাক্‌আত বেতের পড়তেন" (ইমাম বায়হাকীর আস-সুনানুল কুবরা, বাব মা রুবিয়া ফী আদাদি

রাকআতিল কিয়াম ফী শাহরি রামাদান, ২খ, পৃ. ৪৯৭; ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ, ২খ, পৃ. ৩৯৪; নাসাবুর রায়া, ২খ, পৃ. ১৫৩; তাবারানীর আল-মুজামুল কবীর গ্রন্থেও এটি উক্ত হয়েছে)।

ইবনে আবু শায়বার আল-মুসান্নাফ গ্রন্থে আরো বর্ণিত আছে যে, আবুল খাত্তাব (র) বলেন, সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রা) রমযান মাসে আমাদের ইমামতি করতেন এবং পাঁচ সালামে বিশ রাক্আত তারাবীহ পড়াতেন (আল-মুসান্নাফ, ২খ, ৩৯৩)। আলী (রা)-র সহচর শুতাইর ইবনে শাক্ল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রমযান মাসে লোকদের ইমামতি করতেন এবং বিশ রাক্আত তারাবীহ ও তিন রাক্আত বেতের পড়াতেন (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ২৯২-৩)। আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী (র) বলেন, আলী (রা) রমযান মাসে কারীগণকে ডেকে আনেন এবং তাদের মধ্যকার একজনকে লোকদের সাথে নিয়ে বিশ রাক্আত নামায পড়ার নির্দেশ দেন। রাবী বলেন, আলী (রা) তাদের সাথে বেতের পড়তেন (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ৩৯৩)। আবুল হাসনা (র) বলেন, আলী (রা) এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে পাঁচ সালামে বিশ রাক্আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দেন (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ৩৯৩)। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তিকে লোকদের বিশ রাক্আত তারাবীহ পড়ানোর নির্দেশ দেন (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ৩৯৩)। নাফে ইবনে উমার (র) বলেন, ইবনে আবু মুলাইকা (র) রমযান মাসে আমাদের নিয়ে বিশ রাক্আত নামায পড়তেন (ঐ, ৩৯৩)। উবাই ইবনে কাব (রা) মদীনায় লোকদের নিয়ে বিশ রাক্আত নামায পড়তেন এবং বেতের পড়তেন তিন রাক্আত (ঐ, পৃ. ৩৯৩)। আল-হারিস (র) রমযানের রাতে লোকদের নিয়ে বিশ রাক্আত তারাবীহ ও তিন রাক্আত বেতের পড়তেন এবং রুকূতে যাওয়ার পূর্বে দোয়া কুনূত পড়তেন (ঐ, পৃ. ৩৯৩)। আবুল বাখতারী (র) রমযান মাসে পাঁচ সালামে বিশ রাক্আত তারাবীহ এবং তিন রাক্আত বেতের পড়তেন (ঐ, ৩৯৩)। আতা (র) বলেন, আমি লোকদেরকে বেতেরসহ তেইশ রাক্আত তারাবীহ আদায়রত পেয়েছি (ঐ, পৃ. ৩৯৩)। সাঈদ ইবনে উবাইদ (র) বলেন, আলী ইবনে রবীআ (র) রমযান মাসে আমাদেরকে নিয়ে পাঁচ সালামে বিশ রাক্আত তারাবীহ ও তিন রাক্আত বেতের পড়তেন (ঐ, পৃ. ৩৯৩)। দাউদ ইবনে কায়েস (র) বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) ও আবান ইবনে উসমান (র)-এর যমানায় আমি মদীনায় লোকদেরকে ছত্রিশ রাক্আত (তারাবীহ) ও তিন রাক্আত বেতের পাঠরত পেয়েছি (ঐ, পৃ. ৩৯৩)।

একদল লোক বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান ও তার বাইরে রাতে আট রাক্আত সালাতুত তাতাব্বু (ঐচ্ছিক নামায) পড়তেন। যেমন আয়েশা (রা)-র রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)। কিন্তু অপরাপর হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি নিয়মিতই আট রাক্আত পড়তেন না, বরং ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩ রাক্আতও পড়তেন। এমনকি আয়েশা (রা)-র অন্য রিওয়ায়াত থেকেও তা প্রমাণিত (এজন্য সিহাহ সিত্তার নামায অধ্যায় দেখা যেতে পারে)। বিভিন্ন সাহাবীর বর্ণনায়ও তাঁর রাতের নামাযের রাক্আত সংখ্যায় এই পার্থক্য বিদ্যমান। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), খালিদ ইবনে যায়েদ আল-জুহানী (রা) প্রমুখ সাহাবীর বর্ণনা থেকে বারো রাকআতের কথা জানা যায়।

অতএব মহানবী ﷺ-এর রাতের নামায কেবল আট রাকআতে সীমাবদ্ধ করার জেদ ধরা উচিত নয়। চিন্তার বিষয় এই যে, মহানবী ﷺ রাতের বেশির ভাগ সময়ই ইবাদতে কাটাতেন। অথচ তাঁর নামাযের রাক্আত সংখ্যা এত কম কেন? বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত ধীরেসুস্থে নামায পড়তেন। তিনি এক এক রাকআতে সূরা আল-বাকারা, আল ইমরান, আন-নিসা ও আল-মাইদার মত দীর্ঘ সূরা তিলাওয়াত করতেন এবং রুকূ-সিজদায়ও দীর্ঘক্ষণ কাটাতেন।

পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন, প্রতি রাকআতে এত বড়ো বড়ো সূরা পাঠ করলে এক রাতে আট থেকে বারো রাকআতের অধিক নামায পড়া কি সম্ভব? বহু হাদীসে তাঁর এই দীর্ঘ নামাযের বর্ণনা

পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এক রাতে আমি নবী ﷺ -এর সাথে নামাযে দাঁড়ালাম। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ নামাযে দণ্ডায়মান থাকলেন যে, (ক্লান্ত হয়ে) আমার মনে একটা অশুভ ধারণার উদ্ভব হয়। ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার মনে কি ধারণা এসেছিলো? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একা নামাযে রেখে বসে পড়ার মনস্থ করেছিলাম (শামায়েলে তিরমিযী)।

ঐচ্ছিক নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা কি বাড়ানো-কমানো জায়েয?

আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাত নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা নির্ধারিত আছে, তার হ্রাস-বৃদ্ধি করা জায়েয নাই। অবশ্য যে সুন্নাত সম্পর্কে দ্বিবিধ হাদীস আছে সেখানে তদনুযায়ী আমল করা যায়। যেমন যোহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাক্‌আত বা দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়ার হাদীস আছে। আমরা হানাফী মাযহাব অনুসারীরা চার রাক্‌আত সুন্নাত পড়ে থাকি এবং অন্যরা দুই রাক্‌আত পড়েন। কিন্তু সালাতুত তাতাব্বু (ঐচ্ছিক নামায)-এর রাক্‌আত সংখ্যা বাড়ানো-কমানো জায়েয। যেমন কেউ যোহরের ফরয ও দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়ার পর আসরের পূর্ব পর্যন্ত ঐচ্ছিক নামায পড়তে থাকলো। আমরা তাকে একথা বলতে পারি না যে, তোমার এ নামায জায়েয নয়, কারণ মহানবী ﷺ এ সময় এভাবে নামায পড়েননি। বস্তুত ঐচ্ছিক নামাযের ব্যাপারে প্রচুর স্বাধীনতা আছে। তারাবীহ নামাযও ঐচ্ছিক (তাতাব্বু) নামাযের অন্তর্ভুক্ত। এখন কেউ যদি এ নামায না পড়ে বা চার, আট, বারো, বিশ, ছাব্বিশ, ছত্রিশ বা ততোধিক রাক্‌আত পড়ে তবে আমরা তাকে ভর্ৎসনা করতে পারি না, কেবল তাকে নামায পড়তে বলতে পারি। এজন্যই তারাবীহ নামাযের রাক্‌আত সংখ্যায় পার্থক্য আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ যে তিন দিন সাহাবীদের নিয়ে তারাবীহ পড়েছেন তা যেমন অত্যন্ত সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তদ্রূপ তাতে যে তাঁর নামাযের রাক্‌আত সংখ্যার উল্লেখ নাই তাও সত্য।

খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস কি গ্রহণযোগ্য?

খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস কি গ্রহণযোগ্য বা এর ভিত্তিতে কোন আমল করা যায় কি? এটি একটি চিন্তার বিষয়। হাদীস বিশারদগণ (মুহাদ্দিসগণ) হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণের জীবনচরিত আলোচনা করে তাদের স্মৃতিশক্তি, সত্যবাদিতা, আচার-ব্যবহার ও প্রসিদ্ধি ইত্যাদির ভিত্তিতে হাদীসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে সহীহ (সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ) এবং যঈফ (সনদের দিক থেকে দুর্বল) দুইটি শ্রেণী উল্লেখযোগ্য। মুহাদ্দিসগণ ও ফকীহগণ (ইসলামী আইনবেত্তাগণ) একটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। তা হলো ঃ ফরয, হারাম, মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস, স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও কঠোর শাস্তি ইত্যাদি প্রমাণের ক্ষেত্রে তারা কখনো যঈফ হাদীস গ্রহণ করেননি, সর্বদা কুরআনের পরেই সর্বাধিক সহীহ হাদীস গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে, ফরয নামাযের ওয়াক্ত, ওয়াক্ত সংখ্যা ও রাক্‌আত সংখ্যা নিয়ে গোটা মুসলিম জাতির মধ্যে কোন মতভেদ নাই (যদিও কোন কোন ওয়াক্তের সীমা নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে, যা মোটেই মারাত্মক নয়)। তদ্রূপ হালাল মৃতজীব ভক্ষণ হারাম, কিন্তু যবেহ ব্যতীতই মৃত মাছ ভক্ষণ হালাল হওয়ার বিষয়েও উম্মাতের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। কারণ এ বিষয়গুলো অত্যন্ত মজবুত দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট নয়, বরং সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল, মাকরূহ, ভীতিপ্রদর্শন, উৎসাহ প্রদান, ফযীলাত, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট, সেসব ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ ও ফকীহগণ খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের ও যঈফ হাদীস গ্রহণ করেছেন। তারা এসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহকে ততো কঠোরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি, যতটা কঠোরভাবে যাচাই করেছেন পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ।

অতএব তারাবীহ নামায হলো তাতাব্বু (ঐচ্ছিক) নামাযের অন্তর্ভুক্ত এবং রমযান মাসে তা পড়ার ব্যবস্থা রাখার কারণে ফযীলাতপূর্ণ নামায। এ নামাযের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি খবরে

مَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ وَمَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ قَبِيْحًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ قَبِيْحٌ .

"যে জিনিসকে মুসলমানরা উত্তম মনে করে, আল্লাহ্‌র নিকটও তা উত্তম। আর যে জিনিসকে মুসলমানরা খারাপ মনে করে, তা আল্লাহ্‌র নিকটও খারাপ।"[৪৬]

ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীসও প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য। আরো একটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য যে, কোন ব্যাপারের প্রমাণে অনেকগুলো যঈফ হাদীস পাওয়া গেলে দলীলটি তখন আর যঈফের পর্যায়ে থাকে না, তা শক্তিশালীর পর্যায়ে এসে যায়। আমি ইতোপূর্বে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ্‌র পক্ষে একটি সহীহ হাদীসসহ অনেকগুলো খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস উদ্ধৃত করেছি। অনন্তর এই হিজরী পঞ্চদশ (খৃষ্টীয় বিংশ) শতকে এসে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ্‌র প্রচলন হয়নি, বরং রাসূলুল্লাহ্ -এর যুগ থেকেই (মতভেদসহ) তার প্রচলন হয়েছে, যদিও কোন কারণে তাঁর যুগের বিশ রাকআতের বর্ণনাটি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। অনন্তর শুধু ভারতবর্ষের লোকেরাই বিশ রাক্‌আত পড়ছেন তাও নয়, বরং আবহমান কাল ধরে গোটা বিশ্বের শতকরা আটানব্বই ভাগ মুসলমান বিশ রাক্‌আত তারাবীহ নামায পড়ে আসছেন।

মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে তারাবীহ নামায

যারা আট রাকআতের পক্ষে তারা বিশ রাক্‌আত পড়ুয়াদেরকে কটাক্ষ করেন, অথচ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ঃ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ দুইটি মসজিদ (মক্কার বাইতুল্লাহ শরীফ ও মদীনার মসজিদে নববী অর্থাৎ হারামাইন শরীফাইন) তাদেরই প্রতিনিধিত্বকারীদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে। তারাই এই দুই মহান মসজিদের ইমাম নিয়োগসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন। সেই দুই মসজিদে রমযান মাসে এশার নামাযের পরে পর্যায়ক্রমে দুইজন ইমামের নেতৃত্বে দশ রাক্‌আত করে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ নামায অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অতঃপর তিন রাক্‌আত বেতের পড়ে এই নামায শেষ করা হয়। প্রথম ইমাম দশ রাক্‌আত পড়িয়ে চলে যান না, বরং দ্বিতীয় ইমামের পিছনে বাকি দশ রাক্‌আতও আদায় করেন এবং দ্বিতীয় ইমামও প্রথম থেকেই তারাবীহ নামাযে উপস্থিত থাকেন।

অতঃপর শুরু হয় সালাতুল লাইল-এর আট রাক্‌আত নামাযের জামাআত। বলতে কি সারা রাত ধরে এই দুই মহান মসজিদে চলতে থাকে নামাযের মত মহান ইবাদত। রমযানের শেষ দশ দিনের রাতের অবস্থা এমন হয় যে, এই দুই মসজিদে তিল ধরার ঠাঁই থাকে না।

তাই আসুন আমরা সকলে নিজ নিজ এলাকায় জনগণকে নিয়ে নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ্‌র জামাআত কায়েম করে বিশ রাক্‌আত ফরযের সমান মর্যাদা লাভে সচেষ্ট হই। সাথে সাথে কেউ যদি আট, চব্বিশ, ছত্রিশ বা চল্লিশ রাক্‌আত তারাবীহ পড়েন তবে তাদের কটাক্ষ করা থেকেও বিরত থাকি (অনুবাদক)।

৪৬. হানাফী মাযহাবের ফিক্‌হবিদ ও উসূলবিদগণ এই হাদীসটিকে মারফূ (অর্থাৎ রাসূলের বক্তব্য) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীস বিশারদদের বক্তব্য এটাকে মাওকূফ (অর্থাৎ ইবনে মাসউদের কথা) হাদীস প্রমাণ করে। হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ নং ৩৬০০০, বাযযার, তাইয়ালিসী, তাবারানী ও আবু নুআইম ইবনে মাসউদ (রা)-র সূত্রে সংকলন করেছেন (অনুবাদক)।

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত।

٢٤٤- عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَقْنُتُ فِى الصُّبْحِ .

২৪৪। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তেন না।[৪৭]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। অর্থাৎ ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়বে না।

৪৬. অনুচ্ছেদঃ ফজরের ফরয নামায ও দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামাযের ফযীলাত।

٢٤٥- عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ اَبِى حَثْمَةَ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وَاَنَّ عُمَرَ غَدَا اِلَى السُّوْقِ وَكَانَ مَنْزِلُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوْقِ وَالْمَسْجِدِ فَمَرَّ عُمَرُ عَلٰى اُمِّ سُلَيْمَانَ الشِّفَاءِ فَقَالَ لَمْ لَمْ اَرَ سُلَيْمَانَ فِى الصُّبْحِ فَقَالَتْ بَاتَ يُصَلِّىْ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لَاَنْ اَشْهَدَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَقُوْمَ لَيْلَةً .

২৪৫। আবু বাক্‌র ইবনে সুলায়মান ইবনে আবু হাসমা (র) থেকে বর্ণিত। একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সুলায়মান ইবনে আবু হাসমাকে ফজরের নামাযে দেখতে পাননি। তিনি নামাযশেষে সকালের দিকে বাজারে গেলেন। সুলায়মানের ঘর বাজার ও মসজিদের সমান দূরত্বে বা মাঝপথে অবস্থিত ছিল। হযরত উমার (রা) সুলায়মানের মা শিফা (রা)-র কাছ দিয়ে যেতে তাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি সুলায়মানকে ফজরের জামাআতে কেন দেখতে পাইনি? তিনি বলেন, সে সারা রাত নফল নামায পড়েছে। ফলে ঘুম তাকে কাবু করে ফেলেছে। উমার (রা) বলেন, ফজরের নামায জামাআতে পড়া আমার কাছে সাড়া রাত নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

---

৪৭. একদল সাহাবী ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তেন এবং আরেক দল পড়তেন না। এ কারণে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যেও মতভেদ হয়েছে। অধিকাংশ সাহাবা, তাবিঈ, ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের মতে ফরয নামাযের মধ্যে সব সময় দোয়া কুনূত পড়বে না। বরং কঠিন বিপদ এবং যুদ্ধ চলাকালে ফরয নামাযে কুনূত পাঠ করবে। আর এই কুনূতকে বলা হয় কুনূতে নাযিলা। তবে বেতের নামাযে সব সময় কুনূত পাঠ করবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল এক মাস কুনূতে নাযিলা পাঠ করেছিলেন, এরপর আর কখনো তা পাঠ করেননি। কিন্তু ইমাম শাফিঈ ফযরের নামাযে কুনূত পড়ার পক্ষপাতী। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন, কাতাদা, তাউস, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা, মালেক ইবনে আনাস প্রমুখ মনীষীদেরও এই মত (অনুবাদক)।

٢٤٦- عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلٰوةُ .

২৪৬। নবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। মুআযযিন যখন ফজরের নামাযের আযান শেষ করতো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয নামাযের পূর্বে সংক্ষিপ্ত দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায পড়তেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করি। ফজরের নামাযের পূর্বে সংক্ষিপ্ত দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়তে হবে।

٢٤٧- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً رَكَعَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا شَاْنُهُ فَقَالَ نَافِعٌ فَقُلْتُ يَفْصِلُ بَيْنَ صَلٰوتِه قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاَىُّ فَصْلٍ اَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ .

২৪৭। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এক ব্যক্তিকে ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়ার পর কাত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখলেন।[৪৮] তিনি বলেন, সে এরূপ করছে কেন? নাফে বলেন, আমি বললাম, সে নিজের সুন্নাত নামায ও ফজরের নামাযের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করছে। ইবনে উমার (রা) বলেন, সালাম ফিরানোর চেয়ে উত্তম ব্যবধান আর কি হতে পারে?

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আমরা এবং ইমাম আবু হানীফা ইবনে উমারের মত গ্রহণ করেছি।

৪৭. অনুচ্ছেদঃ নামাযে দীর্ঘ কিরাআত পড়া এবং সংক্ষিপ্ত কিরাআত পছন্দনীয়।

٢٤٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّه اُمِّ الْفَضْلِ اَنَّهَا سَمِعَتْهُ يَقْرَاُ وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَىَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِىْ بِقِرَاءَتِكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ اِنَّهَا لَاٰخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ .

---

৪৮. সহীহ বুখারীতে আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নাত নামায পড়ার পর কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম নিতেন। আবু দাউদ ও তিরমিযীতে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তোমাদের কেউ ফজরের দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়ে যখন অবসর হয়, তখন সে যেন তার ডান কাতে শুয়ে কিছুক্ষণ আরাম করে"। এ কারণে ইমাম শাফিঈ এই শোয়াকে সুন্নাত বলেছেন। তবে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশ্রাম না নেয়ার কথাও উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এই বিশ্রাম গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক (অনুবাদক)।

২৪৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তার মা উম্মুল ফাদল (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি পুত্র ইবনে আব্বাস (রা)-কে সূরা আল-মুরসালাত পড়তে শুনে বলেন, হে বৎস! তোমার এই সূরা পাঠ আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাঠ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এটাই সর্বশেষ সূরা যা আমি তাঁকে মাগরিবের নামাযে পড়তে শুনেছি।

٢٤٩-عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ فِى الْمَغْرِبِ ٠

২৪৯। জুবায়ের ইবনে মুতইম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিবের নামাযে সূরা আত-তূর পড়তে শুনেছি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ফিক্‌হবিদ সাধারণের মতে মাগরিবের নামাযে ছোট ছোট সূরা পাঠ করবে। অর্থাৎ কিসারে মুফাসসালের (সূরা বুরূয থেকে সূরা নাস পর্যন্ত) মতো ছোট সূরা পাঠ করবে। আমাদের ধারণা হচ্ছে, বড়ো বড়ো সূরা প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ করা হতো, অতঃপর তা পরিত্যাগ করা হয় অথবা বড়ো সূরার অংশবিশেষ পড়া হতো।

٢٥٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ السَّقِيْمَ وَالضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَا صَلّٰى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ ٠

২৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ লোকজনের নামাযে ইমামতি করলে, সে যেন কিরাআত সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে রুগ্ন, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোক আছে। তবে যখন সে একাকী নামায পড়ে, তখন ইচ্ছামত কিরাআত লম্বা করতে পারে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এবং ইমাম আবু হানীফা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করি।

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামায যেন দিনের বেতের নামায।

٢٥١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلٰوةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلٰوةِ النَّهَارِ ٠

২৫১। ইবনে উমার (রা) বলেন, মাগরিবের নামায দিনের বেতের (বেজোড়) নামায।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরাও এই মত গ্রহণ করেছি। যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযকে দিনের বেতের মনে করে, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেছেন, সে যেন রাতের বেতেরও মাগরিবের নামাযের মত পড়ে। এর মাঝখানে সালাম ফিরাবে না, যেমন মাগরিবের নামাযের মাঝখানে সালাম ফিরানো হয় না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামায।

٢٥٢- عَنْ اَبِىْ مُرَّةَ اَنَّهُ سَئَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ قَالَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَئَلَهُ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ اَخْبَرْتُكَ كَيْفَ اَصْنَعُ اَنَا قَالَ اَخْبِرْنِىْ قَالَ اِذَا

صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَنَامُ فَإِنْ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى فَإِنْ أَصْبَحْتُ أَصْبَحْتُ عَلَى وِتْرٍ .

২৫২। আবু মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি নিয়মে বেতের নামায পড়তেন? রাবী বলেন, তিনি নীরব থাকলেন। তিনি পুনরায় তাকে এ প্রসংগে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি যদি চাও আমি কিভাবে পড়ি তা তোমাকে অবহিত করতে পারি। রাবী বলেন, আমাকে অবহিত করুন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যখন এশার নামায পড়ি, তখন এরপর পাঁচ রাক্আত নামায পড়ি, অতঃপর ঘুম যাই। আবার রাতে যদি জাগতে পারি তবে দুই রাক্আত করে নামায (এক সালামে) পড়তে থাকি। যদি ভোর হয়ে যায়, তবে ভোর হতেই বেতের পড়ে নেই।

٢٥٣- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةٌ فَخَشِيَ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً فَشَفَعَ بِسَجْدَةٍ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ سَجْدَتَيْنِ فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ .

২৫৩। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) এক রাতে মক্কায় অবস্থারত ছিলেন। রাতের আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। তিনি ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে এক রাক্আত বেতের পড়েন। অতঃপর মেঘ কেটে গেলো এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, রাত এখনো বাকী আছে। তখন আরো এক রাক্আত পড়ে তা দুই রাক্আত করলেন। অতঃপর তিনি দুই দুই রাক্আত করে নামায পড়লেন। অতঃপর যখন ভোর হওয়ার আশংকা করলেন, তখন তিনি এক রাক্আত বেতের পড়লেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (র)-র মত গ্রহণ করেছি। বেতের নামায পড়ার পর পুনরায় এক রাক্আত পড়ে তাকে জোড়ায় পরিণত করাকে আমরা ঠিক মনে করি না। বরং কোন ব্যক্তি বেতের পড়ার পর তা ভংগ করবে না, বরং বেতের পড়ার পর যতো খুশি নফল নামায পড়তে পারে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ বাহনের উপর বেতের নামায পড়া।

٢٥٤- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

২৫৪। সাঈদ ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর বাহনের উপর বেতের নামায পড়েছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বেতের নামায সম্পর্কে এ হাদীসও আছে এবং এছাড়া আরো হাদীস আছে, যাতে সওয়ারী থেকে নিচে নেমে বেতের পড়ার কথা উল্লেখ আছে। এই

হাদীসগুলোই আমাদের কাছে অধিক পছন্দীয়। সওয়ার অবস্থায় যতো খুশী নফল নামায পড়া যায়। বেতের নামাযে পৌছলে তখন বাহন থেকে নিচে নেমে বেতের পড়বে। উমার (রা) ও ইবনে উমার (রা)-র এই মত। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের মাযহাবের সমস্ত আলেমেরও এই মত।

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ বেতের নামায বিলম্বে পড়া।

٢٥٥- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ يَقُوْلُ اِنِّى لَاُوْتِرُ وَاَنَا اَسْمَعُ الْاِقَامَةَ اَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ يَشُكُّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَىَّ ذٰلِكَ قَالَ.

২৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীআ (র) বলেন, আমি এমন সময় বেতের পড়ি যখন (ফযরের নামাযের) ইকামত আমার কানে আসে, অথবা ফযরের পরে (কাযা) পড়ি। রাবী আবদুর রহমান সংশয়ে পড়েছেন যে, আবদুল্লাহ এর কোন কথাটি বলেছেন।

٢٥٦- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَاُوْتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ .

২৫৬। আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন, আমি অবশ্যই ফজরের নামাযের পর বেতের পড়ি।

٢٥٧- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَا اُبَالِىْ لَوْ اُقِيْمَتِ الصُّبْحُ (الصَّلٰوةُ) وَاَنَا اُوْتِرُ .

২৫৭। ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন, আমি এটা মোটেই দূষণীয় মনে করি না যে, ফজরের নামাযের ইকামত হচ্ছে আর আমি তখন বেতের নামাযে রত আছি।

٢٥٨-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ لِخَادِمِهٖ اُنْظُرْ مَاذَا صَنَعَ النَّاسُ وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصُّبْحِ فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ .

২৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ঘুম থেকে সজাগ হয়ে নিজের খাদেমকে বলেন, দেখো লোকেরা (মসজিদে) কি করছে? এ সময় তার (বার্ধক্য জনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। খাদেম গিয়ে দেখে এসে বললো, লোকেরা ফজরের নামায থেকে অবসর হয়েছে। অতএব আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বেতের নামায পড়লেন, অতঃপর ফজরের নামায পড়লেন।

٢٥٩- اَخْبَرَنَا يَحْى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ كَانَ يَؤُمُّ يَوْمًا فَخَرَجَ يَوْمًا لِلصُّبْحِ فَاَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةَ فَاَسْكَتَهُ حَتّٰى اَوْتَرَ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمْ .

২৫৯। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, উবাদা ইবনুস সামিত (রা) লোকদের নামাযে ইমামতি করতেন। একদিন তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন। মুআযযিন নামাযের ইকামত দিলো। তিনি তাকে থামিয়ে বেতের নামায পড়লেন, অতঃপর ফজরের নামাযে ইমামতি করলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে সুবহে সাদেক হওয়ার পূর্বে বেতের নামায পড়ে নেয়া পছন্দনীয় কাজ। তা সুবহে সাদেক উদয় হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করবে না। যদি ঘটনাক্রমে বেতের পড়ার পূর্বে ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যায়, তবে ফজরের নামাযের পূর্বে বেতের পড়ে নিবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٢٦٠- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ فِى الْوِتْرِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ حَتّٰى يَاْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ .

২৬০। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বেতের নামাযের দুই রাক্‌আত ও এক রাক্‌আতের মাঝখানে সালাম ফিরাতেন এবং নিজের কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য নির্দেশ দিতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই পন্থা গ্রহণ করিনি। আমরা ইবনে মাসউদ (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা)-র মত গ্রহণ করেছি। আমাদের মতে দুই রাক্‌আতের মাঝখানে সালাম ফিরানো ঠিক নয়।

٢٦١- عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى صَلٰوةِ الصُّبْحِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا وَثَلٰثَ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ وَرَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ .

২৬১। আবু জাফর (ইমাম বাকের) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এশা ও ফজরের নামাযের মাঝখানে তেরো রাক্‌আত নামায পড়তেন। এর মধ্যে আট রাক্‌আত নফল, তিন রাক্‌আত বেতের এবং দুই রাক্‌আত ফজরের সুন্নাত।

٢٦٢- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ مَا اُحِبُّ اَنِّىْ تَرَكْتُ الْوِتْرَ بِثَلٰثٍ وَاَنَّ لِىْ حُمْرَ النَّعَمِ .

২৬২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি বেতেরের তিন রাক্‌আত নামায পরিত্যাগ করা পছন্দ করি না, যদিও এর বিনিময়ে লাল উটের মালিক হওয়াও আমার জন্য সম্ভব হয়।

٢٦٣-عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَلْوِتْرُ ثَلٰثٌ كَثَلٰثِ الْمَغْرِبِ.

২৬৩। আবু উবায়দা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, বেতের নামায তিন রাক্আত, যেমন মাগরিবের নামায তিন রাক্আত।

٢٦٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ الْوِتْرُ ثَلٰثٌ كَصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ .

২৬৪। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, বেতের নামায মাগরিবের নামাযের মতই তিন রাক্আত।

٢٦٥- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلْوِتْرُ كَصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ .

২৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বেতের নামায মাগরিবের নামাযের অনুরূপ।

٢٦٦-حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا اَجْزَاَتْ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ قَطُّ.

২৬৬। হুসাইন ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এক রাক্আত বেতের নামায কখনো যথেষ্ট (জায়েয) হতে পারে না।

٢٦٧- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَهْوَنُ مَا يَكُوْنُ الْوِتْرُ ثَلٰثُ رَكْعَاتٍ .

২৬৭। আলকামা ইবনে কায়েস (র) বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, বেতেরের তিন রাক্আত নামাযই সবচেয়ে সহজ।

٢٦٨- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْوِتْرِ .

২৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বেতেরের দুই রাক্আতে সালাম ফিরাতেন না।

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআনের সিজদাসমূহ।

٢٦٩- عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَرَاَ بِهِمْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَجَدَ فِيْهَا .

২৬৯। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) তাদের (নামায পড়াতে) সূরা ইনশিকাক পাঠ করলেন এবং সিজদা করলেন। নামাযশেষে তিনি মুসল্লীদের দিকে ফিরে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সূরায় সিজদা করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি এবং ইমাম আবু হানীফারও এই মত। ইমাম মালেকের মতে এই সূরায় সিজদা নেই।

٢٧٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَرَاَ بِهِمْ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيْهَا ثُمَّ قَامَ فَقَرَاَ سُوْرَةً اُخْرٰى .

২৭০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাদের নামায পড়াতে সূরা আন-নাজম পাঠ করলেন এবং তাতে সিজদা করলেন, অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে অন্য একটি সূরা পাঠ করলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের এবং ইমাম আবু হানীফারও এই মত। কিন্তু ইমাম মালেকের মতে এ সূরায়ও সিজদা নেই।

٢٧١- حَدَّثَنَا نَافِعُ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ مِصْرَ اَنَّ عُمَرَ قَرَاَ سُوْرَةَ الْحَجِّ فَسَجَدَ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ .

২৭১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সূরা হজ্জ তিলাওয়াত করলেন এবং তাতে দু'টি সিজদা করলেন। তিনি বলেন, এই সূরাকে দু'টি সিজদার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়েছে।

٢٧٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَاٰهُ سَجَدَ فِىْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ .

২৭২। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে সূরা হজ্জে দু'টি সিজদা করতে দেখেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উমার (রা) ও তার পুত্র আবদুল্লাহ (রা) থেকে দু'টি সিজদা বর্ণিত আছে। অপরদিকে ইবনে আব্বাস (রা)-র মতে, সূরা হজ্জের প্রথমদিকে একটিমাত্র সিজদা আছে। আমরা ও ইমাম আবু হানীফা এই শেষোক্ত মত গ্রহণ করেছি।[৪৯]

---

৪৯. কুরআন মজীদের কতিপয় সূরায় এমন কতগুলো আয়াত রয়েছে যা তিলাওয়াত করলে বা যার তিলাওয়াত শুনলে সিজদা দিতে হয়। এগুলো হচ্ছে ঃ সূরা আরাফের সর্বশেষ আয়াত, রাদ ১৫ নং আয়াত, নাহ্‌ল ৪৯ নং আয়াত, ইসরা ১০৭-১০৯ আয়াত, আলিফ-লাম-মীম সাজদা ১৫ নং আয়াত, সাদ ২০ নং আয়াত, হা-মীম সাজদা ৩৭-৩৮ নং আয়াত, নাজ্‌ম শেষ আয়াত, ইনশিকাক ২৯ নং আয়াত এবং আলাক শেষ আয়াত।

ইমাম আহমাদ ও শাফিঈর মতে সিজদার সংখ্যা ১৫। তাদের মতে সূরা হজ্জে দুইটি সিজদা রয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে সিজদার সংখ্যা ১৪। তার মতে সূরা হজ্জে সিজদা মাত্র একটি (১৮ নং আয়াত)। ইমাম মালেকের মতে এর সংখ্যা ১১। তার মতে সূরা নাজ্‌ম, ইনশিকাক ও আলাক-এ কোন সিজদা নেই। আবু হানীফা ও মালেকের মতে সূরা সাদ-এর সিজদা বাধ্যতামূলক। কিন্তু শাফিঈ ও আহমাদের মতে এটা কৃতজ্ঞতার সিজদা, তিলাওয়াতের সিজদা নয়।

তিলাওয়াতের সিজদা করা ওয়াজিব কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। হযরত উমার (রা)-র মতে তিলাওয়াতের সিজদা বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক। বর্ণিত আছে যে, তিনি মিম্বারে জুমুআর খোতবায়

সিজদার আয়াত পাঠ করলেন, অতঃপর নিচে নেমে এসে সিজদা করলেন। পরবর্তী জুমুআর খোতবায়ও তিনি একই আয়াত পাঠ করলেন। লোকজন সিজদার জন্য উদ্যোগী হলে তিনি বলেন, এটা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি। আমরা ইচ্ছা করলে সিজদা নাও করতে পারি। অতএব তিনিও সিজদা করেননি এবং উপস্থিত লোকেরাও করেনি। ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ এই মত পোষণ করেন (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫; বুখারী, ১০১১ নং হাদীস)।

ইমাম মালেক ও জমহূরের মতে তিলাওয়াতের সিজাদ করা সুন্নাত। ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফের মতে এই সিজদা ওয়াজিব। ইমামদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফার মতে, তিলাওয়াতের সিজদা করা পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের উপরই ওয়াজিব, শ্রোতা চাই ইচ্ছা করে শুনুক অথবা অনিচ্ছায় তার কানে গিয়ে আয়াতের শব্দ পৌঁছুক। অপরাপর ইমামের মতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তিলাওয়াত শুনে কেবল তার উপর সিজদা করা সুন্নাত হিসাবে ধার্য হয়। কিন্তু ইমাম শাফিঈর মতে, শ্রোতার সিজদা করা বাধ্যতামূলক নয়, তবে সে যদি সিজদা করে তা উত্তম।

তিলাওয়াতের সিজদার জন্য উযুর প্রয়োজনীয়তা

তিলাওয়াতের সিজদা আদায়ের ক্ষেত্রে জমহূর (Majority) আলেমগণ নামায আদায় করার শর্তের অনুরূপ শর্ত আরোপ করেছেন। অর্থাৎ তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করার জন্য নামাযের সিজদার ন্যায় কিবলামুখী হতে হবে, উযু থাকতে হবে, মাথা জমীনে রাখতে হবে ইত্যাদি। তাদের মতে বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয নয়। কিন্তু তিলাওয়াতের সিজদার অধ্যায়ে যতোগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে তাতে জমহূরের এ মতের অর্থাৎ উযু ছাড়া তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয নয়, এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই, প্রকাশ্যেও নেই, ইশারা-ইংগিতেও নেই। তাছাড়া পূর্ববর্তী যুগের বিশেষজ্ঞদের (উলামায়ে সালাফ) মধ্যে এমন ব্যক্তিত্বও রয়েছেন যারা বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করেছেন এবং এর বৈধতার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আমরা এই শেষোক্ত মত নিয়েই আলোচনা করবো।

এই সিজদা সম্পর্কে যতো হাদীস এসেছে তা থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদার আয়াত পাঠ করে নিজে সিজদা করেছেন, তাঁর সাহাবীগণও সিজদা করেছেন এবং তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একথা বলেননি যে, তিলাওয়াতের সিজদার জন্য অবশ্যই উযু করতে হবে বা উযু ছাড়া এই সিজদা আদায় করা জায়েয নয়। অপরদিকে এই অধ্যায়ের বিভিন্ন হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এই সিজদা বিনা উযুতেও করা হয়েছিল এবং মহানবী ﷺ এর বিরুদ্ধে অসম্মতি জ্ঞাপন করেননি।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ "কোন ব্যক্তি যখন সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদায় অবনত হয় তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে তার থেকে পৃথক হয়ে যায়। সে বলে, হায় আফসোস! আদম সন্তানকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হলে সে সিজদা করে বেহেশতের অধিকারী হয়েছে। আর আমাকে সিজদা করার হুকুম দেয়া হলে আমি তা প্রত্যাখ্যান করে দোযখী হয়েছি" (ইবনে মাজা)। এ হাদীসে তিলাওয়াতের সিজদা করার জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর সূরা 'সাদ' পাঠ করলেন। যখন সিজদার আয়াতে পৌঁছলেন তখন মিম্বার থেকে নেমে এসে সিজদা করলেন এবং লোকজনও তাঁর সাথে সিজদা করলো (আবু দাউদ)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। তিনি সিজদার আয়াতে পৌঁছে 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদায় যেতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সিজদায় যেতাম (আবু দাউদ)। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবাগণ তিলাওয়াতের সিজদা করেছেন। কিন্তু এর কোন বর্ণনা থেকেই প্রমাণিত হয় না যে, মহানবী ﷺ তিলাওয়াতের সিজদার জন্য উযুর নির্দেশ দিয়েছেন।

বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদার হাদীস

ইবনে উমার (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ সিজদার আয়াত পাঠ করলেন। সব লোক সিজদা করলো। এদের মধ্যে আরোহীও ছিলো এবং পদাতিকও ছিলো। আরোহীরা নিজ নিজ হাতের উপর সিজদা করলো (আবু দাউদ)।

ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে নামাযের বাইরে সূরা পাঠ করে সিজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম। এমনকি ভীড়ের কারণে আমাদের অনেক লোক জমীনে মাথা রাখার জায়গা পেতো না (আবু দাউদ)।

এ হাদীস দু'টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে লোকেরা বিনা উযুতেও তিলাওয়াতের সিজদা করেছে। প্রথম হাদীস থেকে জানা যায়, মহানবী ﷺ-এর মক্কা বিজয়ের সময় এ সিজদার ঘটনা ঘটেছে। তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলো হাজার হাজার লোক। এ থেকে আরো জানা যায়, এই সিজদা ছিল নামাযের বাইরে, নামাযের মধ্যে নয়। কেননা হাদীস থেকে জানা যায়, আরোহী লোকেরা বাহনে বসেই সিজদা করেছে। অথচ ভয়ানক পরিস্থিতি ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায় বাহনের উপর ফরয নামায পড়া জায়েয নয়। এই হাজার হাজার লোকের সবাই নামাযের বাইরে উযুর অবস্থায় ছিলো দাবি করা যায় না। অতএব বলা যায়, এ সময় কতিপয় লোক বিনা উযুতে সিজদা করে থাকবে। এদিক থেকে চিন্তা করলে বলা যায়, বিনা উযুতেও তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয।

দ্বিতীয় হাদীস থেকে জানা যায়, এই সিজদাও নামাযের বাইরে ছিল এবং লোকের ভিড় এতো অধিক ছিলো যে, মাটিতে কপাল রাখার মতো জায়গাও পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রেও উপস্থিত সব লোক প্রথম থেকেই উযুর অবস্থায় ছিলো তা দাবি করা যায় না। এ হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ থেকে এটা অনুমান করা মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, এক্ষেত্রেও কতিপয় লোক বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করে থাকবে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ সূরা নাজমে সিজদা করেছেন এবং তার সাথে মুসলমান, মুশরিক এবং জিন-ইনসান সবাই সিজদা করেছে (বুখারী)।

ইমাম বুখারী এ হাদীসের অনুচ্ছেদে লিখেছেন, মুশরিকরা নাপাক, এদের উযুর কোন অর্থ নেই। ইবনে উমার (রা) বিনা উযুতে সিজদা করতেন (ওয়া কানাবনু উমারা ইয়াসজুদু আলা গাইরি উদূ)। উল্লেখিত হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, এক্ষেত্রেও কতিপয় লোক বিনা উযুতে সিজদা করেছে। অর্থাৎ এ হাদীস থেকেও জানা যায় যে, বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয।

পূর্ববর্তী যুগের আলেমদের (উলামায়ে সালাফ) মতে বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয। পূর্ববর্তীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা), ইমাম শাবী এবং পরবর্তী যুগের আলেমদের মধ্যে ইমাম বুখারী সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, তাদের মতে বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয। অনেক প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও হাদীসব্যাখ্যাতা তাদের এই মতের উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতামত আমরা উল্লেখ করছি।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ও হাফেজ ইবনে হাজারের পর্যালোচনা

ইতিপূর্বে আমরা ইবনে উমার (রা) সম্পর্কে ইমাম বুখারীর বক্তব্য উল্লেখ করেছি যে, 'তিনি বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করতেন।' এই মতের পর্যালোচনা করতে গিয়ে আল্লামা আইনী ও ইবনে হাজার বলেছেন ঃ

অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও উসাইলীর বর্ণনায় গাইর (غير) শব্দটি নেই। ইবনে উমারের মর্যাদার সাথে এই বর্ণনা সামঞ্জস্যশীল। কেননা ইমাম শাবী ব্যতীত আর কেউই তার এ মতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেননি। কিন্তু 'গাইর' শব্দসহ যে বর্ণনাটি এসেছে তাই সহীহ। কেননা ইবনে আবু শায়বা বর্ণনা করেছেন, 'ইবনে উমার (রা) পেশাব করার জন্য সওয়ারী থেকে নামতেন।

অতঃপর পেশাব সেরে পুনরায় বাহনে আরোহণ করে সিজদার আয়াত পাঠ করতেন এবং বিনা উযুতেই সিজদা করতেন।' অপরদিকে বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে, ইবনে উমার (রা) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যেন পবিত্র অবস্থা ব্যতীত সিজদা না করে।' এ দু'টি বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বায়হাকীব বর্ণনা বড়ো ধরনের পবিত্রতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অথবা সুবিধাজনক অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং অপর বর্ণনাটি জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (ফাতহুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩)।

এ আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি ঃ (এক) ইবনে উমারের মাযহাব অনুযায়ী বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয। (দুই) তার কাছ থেকে যে বিপরীতমুখী বর্ণনা এসেছে তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলা যায় (ক) বায়হাকীর বর্ণনা বড়ো ধরনের পবিত্রতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ জানাবাতের অবস্থায় (যেক্ষেত্রে গোসল করা ফরয) তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয নয়। আর ইবনে আবু শায়বার বর্ণনা ছোট ধরনের পবিত্রতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ হাদাসে আসগার (যেক্ষেত্রে উযু করা আবশ্যক) অবস্থায় বিনা উযুতে এই সিজদা করা জায়েয। (খ) ইবনে উমারের মতে সুবিধাজনক অবস্থায় এই সিজদা করার জন্য তাহারাত এবং উযু শর্ত (বায়হাকীর বর্ণনা অনুযায়ী)। কিন্তু জরুরী অবস্থায় তার মতে উযু ও পবিত্রতার প্রয়োজন নেই (ইবনে আবু শায়বার বর্ণনা অনুযায়ী)।

ইবনে উমারের সাথে একমত হয়ে ইমাম শাবী বলেন, বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করা যায়। এতে কোন দোষ নেই। শাফিঈ মাহযাবের কতিপয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞের ভাষ্য থেকে জানা যায়, তাবিঈ ইবনুল মুসাইয়্যাবের মতে তিলাওয়াতের সিজদার জন্য উযু ও তাহারাত (পবিত্রতা) শর্ত নয়। কেননা তিনি বলেছেন, ঋতুবতী মহিলা যদি সিজদার আয়াত শোনে তবে সে মাথার ইশারায় সিজদা করবে এবং বলবে, আমার মাথা সেই সত্তাকে সিজদা করলো যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি দান করেছেন" (ইমাম শারানী, মীযানুল কুবরা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৭; রহমাতুল উম্মাহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৩)। অথচ ঋতুবতী স্ত্রীলোকের উযু ও তাহারাতের অবকাশ নেই।

হাদীস ব্যাখ্যাকারদের মতে ইমাম বুখারীর মাযহাব

ইমাম বুখারীর মতে বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয় কি নাজায়েয তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, ইবনে বাত্তাল ইমাম বুখারীর তরজমাতুল বাব সম্পর্কে আপত্তি তুলে বলেন, ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য যদি ইবনে উমারের মতের স্বপক্ষে মুশরিকদের সিজদাকে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়ে থাকে তাহলে এটা সম্ভব নয়। কেননা মুশরিকদের এই সিজদা ইবাদত হিসাবে ছিলো না, বরং ছিলো শয়তানী নির্দেশনারই ফল। আর যদি তিনি এর দ্বারা ইবনে উমারের মত প্রত্যাখ্যান করতে চেয়ে থাকেন তাহলে এটাই সত্যের বেশী কাছাকাছি।

ইবনে বাত্তালের মতে ইমাম বুখারীর মাযহাব সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু ইবনে রশীদ একদিকে তার এ মতের জবাব দিয়ে ইমাম বুখারীর মাযহাবকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন এবং অপরদিকে তরজমাতুল বাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করেছেন। ইবনে হাজার তার বক্তব্য এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

ইবনে রশীদ ইবনে বাত্তালের আপত্তির জবাবে বলেছেন, ইমাম বুখারী এখানে সিজদার বিধিবদ্ধ মর্যাদা দেওয়ার জন্য এবং তা শক্তিশালী করার জন্য মুশরিকদের সিজদার উল্লেখ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, মুশরিকরা সিজদার জন্য আদিষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও সিজদা করেছে এবং সাহাবীও (ইবনে আব্বাস) এটাকে সিজদা বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব সিজদা দেয়ার অধিকারী মুসলমানদের জন্য উত্তমরূপেই এটা জায়েয হওয়া উচিত যে, তারা যে কোন অবস্থায় সিজদা

করবে। বুখারীর তর্জমাতুল বাব এবং ইবনে উমারের আছারের মধ্যে এভাবেও সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, তিলাওয়াত শুনার সময় উপস্থিত সব লোকই যে উযু অবস্থায় থাকবে এটা স্বাভাবিক নয়। কেননা তারা এজন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি। অতএব উপস্থিত লোকদের মধ্যে অনেকে সিজদা পরিত্যক্ত হওয়ার আশংকায় বিনা উযুতে সিজদা করে থাকবে এবং নবী ﷺ-ও একাজের অনুমোদন দিয়ে থাকবেন। আর এটাকে অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয হওয়ার পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায়। হাদীসের মতনে (মূল পাঠে) আছে যে, মহানবী ﷺ-এর সাথে মুসলিম-মুশরিক, জিন, ইনসান সবাই সিজদা করেছে—এই বক্তব্য উল্লেখিত মতকে আরো শক্তিশালী করে। ইবনে আব্বাস (রা) সবার জন্য সিজদা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অথচ তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যাদের উযু ঠিক ছিলো না। অতএব একথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, যার উযু নেই সেও এই সিজদা করতে পারে" (ফাতহুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩)।

ইবনে রশীদের এই জবাব থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ইমাম বুখারী তরজমাতুল বাব সংযোজন করে এবং ইবনে উমারের 'আছার' সংকলন করে এ কথাই প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, বিনা উযুতেও তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয এবং এটাই তার মাযহাব। ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসও তিনি তার এই মতের সমর্থনে নিয়ে এসেছেন।

আনোয়ার শাহ্ কাশমিরীর অভিমত

দেওবন্দ মাদ্রাসার অন্যতম শিক্ষক এবং ভারত উপমহাদেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ মওলানা সাইয়েদ আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র) বলেন, "তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করার জন্য ইমাম শাবী ও ইমাম বুখারীর মতে উযু শর্ত নয়। ইমাম বুখারী এ মতের সমর্থনে ইবনে উমার (রা)-র এই আছার নকল করেছেন যে, তিনি বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করতেন" (শাহ সাহেবের বক্তৃতামালার সংকলন 'উরফুশ শাযী', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮)। তিনি তার দরসে তিরমিযীতেও একথা বলেছেন যে, ইমাম শাবী ও ইমাম বুখারী উভয়ে ইবনে উমার (রা)-র মতো বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

তিনি তার (বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ) ফায়দুল বারী কিতাবের ২য় খণ্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠায় বলেন, ইবনে উমার (রা) হয়তো বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করার নীতি অবলম্বন করেছেন। সালাফদের মধ্যে ইমাম শাবীও এই মত গ্রহণ করেছেন।.... ইবনে উমারের আছারের বিভিন্ন জবাব দেয়া যেতে পারে। (এক) তার এ মাযহাব অন্য সাহাবীরা অনুসরণ করেননি। (দুই) টীকায় গাইর (ব্যতীত) শব্দটির উল্লেখ নাই। সুতরাং আর কোন সমস্যাই থাকে না। (তিন) যদি তিনি বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করার পন্থা বেছে নিয়ে থাকেন তাহলে বলা যায়, এটা হলো মৌখিক ইবাদত, দৈহিক ইবাদত নয় (ইন্নাহা ইবাদাতুন আলাল লিসান লা আলাল জাসাদ)। মৌখিক ইবাদত যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। এর জন্য উযুর প্রয়োজন নেই। তাৎপর্যের দিক থেকে নামাযের সিজদার তুলনায় এটা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ।

শাহ সাহেবের আলোচনায়ও দেখা যায়, ইমাম শাবী ও ইমাম বুখারীর মত হচ্ছে বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয। এই সিজদার জন্য উযু শর্ত নয়। ইমাম বুখারী তার মতকে শক্তিশালী করার জন্যই ইবনে উমারের কর্মনীতি তরজমাতুল বাবে সংযোজন করেছেন।

সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদীর অভিমত

মওলানা সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী (র)-এর মতে বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয। এই সিজদা সম্পর্কে তিনি বলেন, "কুরআন মজীদে চৌদ্দটি স্থান রয়েছে যেখানে সিজদার

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা।

٢٧٣- عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ اَرْسَلَهُ اِلَى اَبِىْ جُهَيْمٍ الْاَنْصَارِىِّ يَسْئَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ فِىْ ذٰلِكَ لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لاَ اَدْرِىْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ شَهْرًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً .

আয়াত এসেছে। এই আয়াতগুলোতে সিজদা বিধিবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব বলেছেন। অপরাপর বিশেষজ্ঞগণ এটাকে সুন্নাত বলেছেন। অনেক সময় নবী ﷺ বড়ো বড়ো জনসামাবেশে কুরআন পাঠ করতেন। এতে যখন সিজদার আয়াত এসে যেতো তখন তিনি নিজেও সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন, আর যে ব্যক্তি যেখানে থাকতো সে সেখানেই সিজদায় পড়ে যেতো। এমনকি যদি কেউ সিজদা করার জন্য জায়গা না পেতো তাহলে সে তার সামনের ব্যক্তির পিঠের উপর মাথা রেখে দিতো। হাদীসে এও এসেছে যে, তিনি মক্কা বিজয়ের সময় কুরআন পাঠ করলেন এবং তাতে সিজদার আয়াত এলে যে ব্যক্তি জমিনের উপর দাঁড়িয়েছিল সে জমিনে সিজদা করলো, আর যারা ঘোড়া ও উটের পিঠে সওয়ার ছিল তারা নিজেদের সওয়ারীর উপরই সিজদায় ঝুঁকে পড়লো। কখনো কখনো তিনি খুতবায় সিজদার আয়াত পাঠ করেছেন, অতঃপর মিম্বার থেকে নেমে এসে সিজদা করেছেন এবং পুনরায় মিম্বারে উঠে খুতবা দিয়েছেন।"

"এই সিজদা আদায়ের জন্য জমহূর আলেমগণ নামাযে আরোপিত শর্তসমূহ আরোপ করেছেন। অর্থাৎ উযু থাকতে হবে, কিবলামুখী হতে হবে, নামাযের অনুরূপ সিজদা দেয়ার জন্য জমিনে মাথা রাখতে হবে। কিন্তু তিলাওয়াতের সিজদার অধ্যায়ে আমরা যতো হাদীস পেয়েছি তাতে এসব শর্তের স্বপক্ষে কোন দলীল মওজুদ নেই। এসব হাদীস থেকে এটা জানা যায়, যে ব্যক্তি যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক সে সিজদার আয়াত শুনামাত্র সিজদায় ঝুঁকে যাবে, চাই উযু থাক বা না থাক, কিবলামুখী হওয়া সম্ভব হোক বা না হোক, জমিনে মাথা রাখার সুযোগ থাক বা না থাক। সালাফে সালেহীনের মধ্যেও আমরা এমন ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাই যাদের কর্মপন্থা এরূপ ছিল। ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করতেন। আবদুর রহমান ইবনুস সুলামী (রা) সম্পর্কে ফাতহুল বারী গ্রন্থে লেখা আছে, তিনি রাস্তায় চলতে চলতে কুরআন মজীদ পাঠ করতেন। আর যদি কোথাও সিজদার আয়াত এসে যেতো অমনি সাথে সাথে মাথা নত করে দিতেন,চাই উযু থাক বা না থাক,কিবলামুখী হোক বা না হোক। এসব কারণে আমরা মনে করি, যদিও জমহূরের অভিমতের মধ্যেই অধিক সতর্কতা রয়েছে, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি জমহূরের মতের পরিপন্থী কাজ করে তবে তাকে তিরস্কার করা যায় না। কেননা জমহূরের মতের সমর্থনে কোন প্রমাণিত সুন্নাহ (হাদীস) বিদ্যমান নেই। আর সালাফে সালেহীনের মধ্যেও এমন লোক পাওয়া যাচ্ছে যাদের কর্মনীতি জমহূরের মতের পরিপন্থী ছিল" (তাফহীমুল কুরআন, ১১শ সংস্করণ, ২য় খণ্ড, সূরা আরাফ, টীকা নম্বর ১৫৭) (অনুবাদক)।

২৭৩। বুস্‌র ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) তাকে আবু জুহাইম আল-আনসারী (রা)-র কাছে এই কথা জিজ্ঞেস করতে পাঠান যে, নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনি কি বলতে শুনেছেন? আবু জুহাইম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী যদি জানতো যে, এতে তার কি গুনাহ্ হয়, তবে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার পরিবর্তে সে চল্লিশ পর্যন্ত অপেক্ষা করা নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করতো।[৫০] (রাবী) আবু নাদর বলেন, বুস্‌র ইবনে সাঈদ চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস না চল্লিশ বছর বলেছেন তা আমি মনে রাখতে পারিনি।

٢٧٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَلاَ يَدَعُ اَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

২৭৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন সে যেন নিজের সামনে দিয়ে কাউকে যাতায়াত করতে না দেয়। যাতায়াতকারী যদি বিরত হতে অস্বীকার করে তবে সে যেন তার সাথে যুদ্ধ করে। কেননা সে একটা শয়তান।

٢٧٥- عَنْ كَعْبٍ اَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ فِىْ ذٰلِكَ كَانَ اَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْراً لَهُ .

২৭৫। কাব আল-আহ্‌বার (র) বলেন, নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানতো যে, এতে তার কতো মারাত্মক গুনাহ্ হয়, তবে সে নিজের জন্য নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে জমীনের অভ্যন্তরে ধ্বসে যাওয়াকে কল্যাণকর মনে করতো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা মাকরূহ। যদি কোন ব্যক্তি নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে সংকল্প করে, তবে যতোদূর সম্ভব তাকে বাধা দেয়া উচিৎ। কিন্তু তার সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হওয়া যতোটা ক্ষতিকর, নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা ততোটা ক্ষতিকর নয়। আমাদের জানামতে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) ছাড়া আর কেউই 'কিতাল' (দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যুদ্ধ) শব্দটি বর্ণনা করেননি। সাধারণ ফিক্‌হ্‌বিদগণ শব্দটির প্রত্যক্ষ অর্থের উপর আমল করেননি। বরং শব্দটির পরোক্ষ অর্থ তাই যা আমরা গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ যতোদূর সম্ভব বাধা দিবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

---

৫০. ইমাম তাহাবী (র) তার 'মুশকিলুল আছার' গ্রন্থে চল্লিশের অর্থ করেছেন 'চল্লিশ বছর'। আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে তিরমিযীতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপর এক হাদীসে এক শত বছরের কথা উল্লেখ আছে (অনুবাদক)।

٢٧٦– عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْئٌ .

২৭৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, নামাযকে কোন কিছুই কর্তন করতে পারে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ নামাযীর সামনে দিয়ে কোন কিছু যাতায়াত করলে তাতে নামায নষ্ট হয় না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে প্রবেশ করে নফল নামায পড়া মুস্তাহাব।

٢٧٧– عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ .

২৭৭। আবু কাতাদা আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দুই রাক্‌আত নামায পড়ে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বসার পূর্বে নফল নামায পড়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামায থেকে অবসর হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসা।

٢٧٨– عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدُ ظَهْرَهُ اِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلٰوتِىْ انْصَرَفْتُ اِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّى الْاَيْسَرِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَنْصَرِفَ عَلٰى يَمِيْنِكَ قُلْتُ رَاَيْتُكَ وَانْصَرَفْتُ اِلَيْكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاِنَّكَ قَدْ اَصَبْتَ فَاِنَّ قَائِلاً يَّقُوْلُ انْصَرِفْ عَلٰى يَمِيْنِكَ فَاِذَا كُنْتَ تُصَلِّىْ انْصَرِفْ حَيْثُ اَحْبَبْتَ عَلٰى يَمِيْنِكَ اَوْ يَسَارِكَ وَيَقُوْلُ نَاسٌ اِذَا قَعَدْتَ عَلٰى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَقَدْ رَقِيْتُ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ لَّنَا فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ .

২৭৮। ওয়াসে ইবনে হাব্বান (র) বলেন, আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) কিবলার বিপরীতমুখী হয়ে বসা ছিলেন। আমি নামায শেষ করে বাঁদিক থেকে ঘুরে তার দিকে তাকালাম। ইবনে উমার (রা) বলেন, ডানদিক থেকে ঘুরতে তোমাকে কিসে বাধা দিলো? তিনি বলেন, আপনাকে এদিকে বসা দেখে বাঁয়ে ঘুরলাম। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তুমি ঠিকই করেছো। কোন কোন লোকের ধারণা, ডানদিক থেকে মুখ ঘুরাতে হবে (এই ধারণা ভুল)। তুমি নামায থেকে অবসর হয়ে যেদিক থেকে ইচ্ছা মুখ ঘুরাতে পারো, ডানদিক থেকেও, বাঁদিক থেকেও। কোন কোন লোক বলে, তুমি যখন

পায়খানা-পেশাবে বসো তখন কা'বা ঘর ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে সামনে করে বসো না। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি একদিন আমাদের ঘরের (বুখারী-মসুলিমের বর্ণনা অনুযায়ী আমার বোন হাফসার ঘরের) ছাদে উঠি। আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাইতুল মুকাদ্দাস সামনের দিকে রেখে পায়খানায় বসা দেখতে পাই।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র বক্তব্যের উপর আমরা আমল করি। অর্থাৎ নামাযের সালাম ফিরিয়ে নামাযী যেদিকে ইচ্ছা মুখ ঘুরিয়ে বসতে পারে। আর বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পায়খানা-পেশাবে বসাতে কোন দোষ নেই। তবে কিবলামুখী হয়ে বসা মাকরূহ।[৫১] ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির নামায।

٢٧٩- حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَلَمْ يَقْضِ الصَّلٰوةَ .

২৭৯। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তার যখন হুঁশ ফিরে আসলো, তখন তিনি নামাযের কাযা পড়েননি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি। একদিন ও এক রাতের অধিক সময় সংজ্ঞাহীন থাকলে নামাযের কাযা করতে হবে না। কিন্তু যদি একদিন ও এক রাত বা তার কম সময় সংজ্ঞাহীন থাকে তবে নামাযের কাযা করতে হবে। বর্ণিত আছে যে, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) চার ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত সংজ্ঞাহীন ছিলেন। অতঃপর চেতনা ফিরে আসলে তিনি এই নামাযের কাযা আদায় করেন।[৫২] আবু মাশার আল-মাদানী (র) আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-র সহচরদের সূত্রে আমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থ বা রুগ্ন ব্যক্তির নামায।

٢٨٠-حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيْضُ السُّجُوْدَ اَوْمٰى بِرَاْسِهٖ.

২৮০। ইবনে উমার (রা) বলেন, রুগ্ন ব্যক্তি সিজদা করতে সক্ষম না হলে সে ইশারায় সিজদা করবে।

---

৫১ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে আবু আইউব আনসারী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "পায়খানা-পেশাবের সময় তোমরা কিবলাকে সামনে অথবা পিছনে রেখে বসো না"। হানাফী মাযহাবমতে, কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে পায়খানা-পেশাবে বসা নিষেধ। তা খোলা মাঠেই হোক বা ঘেরা জায়গায় হোক। ইমাম শাফিঈর মতে, ঘেরা জায়গায় কিবলাকে সামনে রেখে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বসা অপছন্দীয় হলেও হারাম নয় (অনুবাদক)।

৫২. ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ ইমামদের মতে, সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যে নামায ছুটে যায় তার কাযা পড়ার প্রয়োজন নাই, তা এক-দুই ওয়াক্তের নামায হোক বা তার বেশী। কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকতেই জ্ঞান ফিরে আসলে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্তের নামায পড়তে হবে (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। কাঠ অথবা অন্য কিছু দিয়ে উঁচু করে তার উপর সিজদা করা এই ধরনের লোকদের জন্য জায়েয নয়। সিজদায় রুকূর চেয়ে অধিক বেশী ঝুঁকতে হবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।[৫৩]

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের মধ্যে থুথু ফেলা মাকরূহ।

٢٨١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَاٰى بُصَاقًا فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى قِبَلَ وَجْهِهِ اِذَا صَلّٰى .

২৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে কিবলার দিকে থুথু নিক্ষিপ্ত দেখতে পান। তিনি তা খুঁটে তুলে ফেলেন, অতঃপর লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে তখন সে যেন নিজের সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা সে যখন নামায পড়ে, তখন আল্লাহ তার সামনের দিকে থাকেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, (নামাযরত অবস্থায়) সামনে এবং ডানে অথবা বাঁয়ে থুথু ফেলা উচিৎ নয়। যদি তা একান্তই ফেলতে হয়, তবে বাঁ পায়ের নিচে ফেলবে।[৫৪]

---

৫৩. অসুস্থতা বা অন্য কোন ওজর বশত নিচু হয়ে জমীনে সিজদা করতে না পারলে মাথার ইশারায় সিজদা করবে। কোন বস্তুর সাহায্যে উচ্চতা সৃষ্টি করে তার উপর সিজদা করা ঠিক নয়। হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। তিনি তাকে নামাযরত অবস্থায় বালিশের উপর সিজদা করতে দেখলেন। নবী ﷺ বালিশটি টেনে নিয়ে তা ছুড়ে ফেলে দিলেন। অতঃপর সে একটি কাঠের টুকরা নিলো তার উপর সিজদা করার জন্য। নবী ﷺ তাও টেনে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে বলেন ঃ সক্ষম হলে তুমি মাটির উপর সিজদা করো, অন্যথায় ইশারায় সিজদা করো এবং রুকূর তুলনায় সিজদায় অধিক বেশি ঝুঁকো" (বায়হাকী, বাযযার, আবু ইয়ালা)।

ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সিজদা করতে সক্ষম সে যেন সিজদা করে। আর যে ব্যক্তি সিজদা করতে অক্ষম সে যেন সিজদা করার জন্য কোন জিনিস নিজের কপালের দিকে উঁচু না করে, বরং সে মাথার ইশারায় রুকূ-সিজদা করবে" (তিরমিযী)।

হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফিক্‌হ গ্রন্থ হিদায়ার ভাষ্যকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, কোন জিনিস উঁচু করে তার উপর সিজদা করাকে নবী ﷺ অপছন্দ করতেন। তবে কেউ এভাবে সিজদা করলে তা একবারে নাজায়েয হবে না। কেননা হাসান তার মায়ের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে চামড়ার উপর সিজদা করতে দেখেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বালিশের উপর সিজদা করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন (বায়হাকী)। আনাস ইবনে মালেক (রা) তার নিজের কনুই-এর উপর সিজদা করতেন (বায়হাকী)।

৫৪. পায়ের নিচে কাপড় ইত্যাদি থাকলে কেবল পায়ের নিচে থুথু ফেলা যাবে। অথবা মসজিদের বাইরে কোথাও নামায পড়লে পায়ের নিচে থুথু ফেলা যায়। অন্যথায় মসজিদের আংগিনা, অভ্যন্তর ভাগ এবং চাটাই ইত্যাদির উপর থুথু ফেলা মাকরূহ (অনুবাদক)।

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক ও হায়েয অবস্থায় দেহের ঘাম কাপড়ে লাগলে।

٢٨٢- حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَعْرَقُ فِى الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّىْ فِيْهِ .

২৮২। নাফে (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাপাক অবস্থায় ইবনে উমার (রা)-র দেহের ঘাম তার নিজের পরনের কাপড়ে লেগে যেতো। তিনি (গোসলের পর) সেই কাপড় পরিধান করেই নামায পড়তেন।[৫৫]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। কাপড়ে বীর্য না লেগে থাকলে ঘাম লাগাতে তা নাপাক হয় না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কিবলা পরিবর্তন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস-এর কিবলা রহিত করা হয়েছে।

٢٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ اِذْ اَتَاهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبَلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ .

২৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, একদা কিছু সংখ্যক লোক ফজরের নামায পড়ছিলো। এমন সময় তাদের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, গত রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। তাতে কিবলার দিকে মুখ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব লোকজন কিবলার দিকে মুখ করলো। তাদের মুখমণ্ডল ছিল সিরিয়ার দিকে এবং তারা কাবার দিকে ঘুরে গেলো।[৫৬]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এই হাদীস অনুযায়ী আমরা আমল করি। কোন ব্যক্তি ভুল বশত কিবলা ছাড়া অন্য দিকে এক বা দুই রাক্‌আত নামায পড়ে ফেললো। অতঃপর সে জানতে পারলো যে, সে কিবলার বিপরীত দিকে মুখ করে নামায পড়ছে। তখন সে সাথে সাথে কিবলার দিকে ফিরে যাবে এবং অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে। আর পূর্বে কিবলার বিপরীত দিকে মুখ করে যে নামায পড়া হয়েছে, তা হিসাবে ধরা হবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

---

৫৫. হায়েযগ্রস্ত ও নাপাক ব্যক্তির দেহের ঘাম নাপাক নয় (অনুবাদক)।

৫৬. হিজরী দ্বিতীয় সনের রজব অথবা শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ নাযিল হয়। ইবনে সাদ বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বিশ্‌র ইবনুল বারাআ ইবনে মারূর (রা)-এর বাড়িতে দাওয়াত খেতে যান। সেখানে যুহরের নামাযের সময় হলে তিনি নামায পড়তে দাঁড়ান। দুই রাক্‌আত পড়ার পর তৃতীয় রাক্‌আতে কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সকল মুক্তাদী বাইতুল মাকদিস থেকে ঘুরে গিয়ে কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়ান। অতঃপর কিবলা পরিবর্তনের এই সংবাদ মদীনা ও তার পাশের এলাকায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ভুলবশত নাপাক বা উযুহীন অবস্থায় নামায পড়লে।

٢٨٤- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْجُرُفِ ثُمَّ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ رَأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَمًا فَقَالَ لَقَدْ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ وَلَقَدْ سُلِّطَ عَلَيَّ الْاِحْتِلاَمُ مُنْذُ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ ثُمَّ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ أَوْ نَضَحَهُ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ .

২৮৪। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ফজরের নামায পড়ান, অতঃপর আল-জুরুফ নামাক স্থানের দিকে রওনা হলেন। সূর্য উঠার পর তিনি তার কাপড়ে স্বপ্নদোষের চিহ্ন আবিষ্কার করলেন। তিনি বলেন, আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল, কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। জনগণের কার্যভার গ্রহণের পর থেকে আমার এই অবস্থা হচ্ছে। অতঃপর তিনি কাপড়ের বীর্য লাগা স্থান ধুয়ে ফেলেন বা কাপড়ে পানি গড়িয়ে দিলেন। অতঃপর গোসল করে সূর্য উঠার পর পুনরায় ফজরের নামায পড়লেন।[৫৭]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। নাপাকীর কথা অবগত হওয়ার পর মুক্তাদী পুনর্বার নামায পড়বে, যেমন হযরত উমার (রা) পুনর্বার ফজরের নামায পড়েছিলেন। কেননা ইমামের নামায নষ্ট হলে মুক্তাদীদের নামাযও নষ্ট গণ্য হয়। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, এক স্থানে নামাযীগণ রুকূ অবস্থায় এই ঘোষণা শুনতে পায় এবং সাথে সাথে তারা কাবার দিকে ঘুরে যায়।

আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, বনু সালেমার লোকদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে পরের দিন ভোরবেলা। নামাযীগণ তখন এক রাক্‌আত পড়েছিল। এমন সময় তাদের কানে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা পৌঁছে। সংগে সংগে তার কা'বার দিকে ঘুরে যায়। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, বাইতুল মুকাদ্দাস মদীনার উত্তরদিকে এবং কাবাঘর মদীনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত (অনুবাদক)।

৫৭. ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু দাউদ, হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখঈর মতে, মুক্তাদীদের নামায পুনর্বার পড়ার প্রয়োজন নেই। যেমন হযরত উমার (রা) নিজে পুনর্বার নামায পড়েছেন, কিন্তু লোকজনকে তা পুনর্বার পড়ার নির্দেশ দেননি। ইবনে আবু শায়বা হারিসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রা) একবার ভুলবশত নাপাক অবস্থায় নামায পড়েন। পরে তা মনে হলে তিনি পুনর্বার নামায পড়েন, কিন্তু মুক্তাদীদের পুনর্বার পড়ার নির্দেশ দেননি। ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উছমান (রা) নাপাক অবস্থায় ফজরের নামাযের ইমামতি করেন। বেলা বেশ উপরে উঠার পর তিনি নিজের কাপড়ে নাপাকীর চিহ্ন দেখতে পান। অতঃপর তিনি পুনর্বার নামায পড়েন, কিন্তু মুক্তাদীদের পুনর্বার পড়ার নির্দেশ দেননি। অপরদিকে ইমাম আবু হানীফা, শা'বী এবং হাম্মাদ ইবনে সুলায়মানের মতে, মুক্তাদীগণকেও পুনর্বার নামায পড়তে হবে। কেননা ইমাম গোটা জামাআতের নামাযের জন্য দায়িত্বশীল। অতএব ইমামের নামায নষ্ট হলে, মুক্তাদীদের নামাযও নষ্ট হয়ে যায়। কেননা তাদের নামায ইমামের নামাযের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে। অতএব ইমামের নামায সহীহ হলে মুক্তাদীদের নামাযও সহীহ হবে এবং তার নামায নষ্ট হলে তাদের নামাযও নষ্ট হবে (অনুবাদক)।

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কাতার থেকে দূরে রুকূতে শামিল হলে এবং রুকূতে কিরাআত পাঠ করলে।

٢٨٥- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّهُ قَالَ دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوْعًا فَرَكَعَ ثُمَّ دَبَّ حَتّٰى وَصَلَ الصَّفَّ .

২৮৫। আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি লোকদের রুকূ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনিও রুকূতে চলে গেলেন, অতঃপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে কাতারে শামিল হলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এভাবে রুকূতে শামিল হওয়া জায়েয। আমাদের ও ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে উত্তম পন্থা এই যে, প্রথমে কাতারে গিয়ে শামিল হবে, অতঃপর রুকূতে যাবে।

٢٨٦- عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِىِّ اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشٰى حَتّٰى وَصَلَ الصَّفَّ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ .

২৮৬। হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাকরা (রা) কাতার থেকে দূরে রুকূতে শামিল হলেন, অতঃপর হেঁটে অগ্রসর হয়ে কাতারে শামিল হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায থেকে অবসর হলে তাঁর সামনে এটা উল্লেখ করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ "আল্লাহ যেন তোমার এই আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করেন, কিন্তু ভবিষ্যতে আর এরূপ করো না"।[৫৮]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরাও তাই বলি। অর্থাৎ এরূপ করলে নামায তো হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু এরূপ না করাটা আমাদের কাছে অধিক পছন্দনীয় (বরং প্রথমে কাতারে গিয়ে শামিল হবে, অতঃপর রুকূতে যাবে)।

٢٨٧- عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّىِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِى الرُّكُوْعِ .

---

৫৮. ইমাম মালেক বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-ও রুকূ অবস্থায় অগ্রসর হতেন। তবে আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "তুমি রুকূ করো না যতোক্ষণ কাতারে গিয়ে শামিল না হও"। তিনি আরো বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একথা বলেছেন'। ইমাম শাফিঈর মতে কাতারে শামিল হয়ে রুকূতে যাওয়া মুস্তাহাব। তবে কেউ কাতারে শামিল না হয়েই রুকূতে গেলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। ইমাম মালেক একক ব্যক্তির জন্য রুকূ অবস্থায় হেঁটে গিয়ে কাতারে শামিল হওয়া জায়েয রেখেছেন, যদি সে কাতারের কাছাকাছি থেকে থাকে। ইমাম আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী একক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এটা করা মাকরূহ বলেছেন (অনুবাদক)।

২৮৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাচ্ছি ও মুআসফার (রেশমী কাপড় বিশেষ) এবং সোনার আংটি পরিধান করতে এবং রুকূতে কুরআনের আয়াত পড়তে নিষেধ করেছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি। রুকূ ও সিজদারত অবস্থায় কুরআনের আয়াত পাঠ করা মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ নামাযরত অবস্থায় কিছু বহন করলে।

٢٨٨- عَنْ أَبِى قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ ابْنَةَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلِاَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَاذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَاِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

২৮৮। আবু কাতাদা আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নাতনী এবং যয়নব ও আবুল আস-কন্যা উমামাকে বহন করে নামায পড়তেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন, তখন তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং সিজদা থেকে উঠে আবার তাকে তুলে নিতেন।

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত ব্যক্তি ও কিবলার মাঝখানে কোন মহিলার ঘুমিয়ে বা দাঁড়িয়ে থাকা।

٢٨٩- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلَاىَ فِى الْقِبْلَةِ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ وَاِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ .

২৮৯। নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ঘুমিয়ে থাকতাম এবং আমার পা দু'টি থাকতো কিবলার দিকে (তাঁর সিজদার স্থানে)। তিনি সিজদায় যেতে আমাকে খোঁচা দিতেন এবং আমি আমার পা দু'টি গুটিয়ে নিতাম। তিনি সিজদা থেকে উঠে গেলে আমি আমার পদদ্বয় পুনরায় ছড়িয়ে দিতাম। তৎকালে ঘরে আলো জ্বালানো থাকতো না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তির নামাযরত অবস্থায় যদি তার সামনে অথবা পাশে কোন মহিলা ঘুমানো, দাঁড়ানো অথবা বসা অবস্থায় থাকে, তবে তাতে কোন দোষ নেই, যদি উভয়ের নামায পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। কিন্তু উভয়ে একই নামায পড়লে পুরুষের সামনে অথবা পাশে স্ত্রীলোকের দাঁড়ানো মাকরূহ। অথবা একই ইমামের পিছনে যদি উভয়ে নামায পড়ে থাকে, তবে এরূপ ক্ষেত্রে পুরুষের সামনে অথবা পাশে মহিলাদের দাঁড়ানো মাকরূহ। কেননা এভাবে দাঁড়ালে পুরুষের নামায ফাসেদ হয়ে যায়। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ শংকাকালীন নামায (সালাতুল খাওফ)।

٢٩٠- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الْاِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ سَجْدَةً وَّتَكُوْنُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوْا فَاِذَا صَلَّى الَّذِيْنَ مَعَهُ سَجْدَةً اِسْتَاْخَرُوْا مَكَانَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا وَلاَ يُسَلِّمُوْنَ وَيَتَقَدَّمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا فَيُصَلُّوْنَ مَعَهُ سَجْدَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْاِمَامُ وَقَدْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْمُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ سَجْدَةً بَعْدَ اِنْصِرَافِ الْاِمَامِ فَيَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلُّوْا سَجْدَتَيْنِ فَاِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ اَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ صَلُّوْا رِجَالاً قِيَامًا عَلٰى اَقْدَامِهِمْ اَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِى الْقِبْلَةِ اَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيْهَا قَالَ نَافِعٌ وَلاَ رَاٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اِلاَّ حَدَّثَهُ (يُحَدِّثُهُ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৯০। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে শংকাকালীন নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, লোকের একাংশ ইমামের সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে এবং অপর দল শত্রুর প্রতিরোধে থাকবে। প্রথম দল ইমামের সাথে এক রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম না ফিরিয়ে শত্রুর প্রতিরোধকারীদের স্থানে অবস্থান নিবে এবং তারা এসে ইমামের সাথে এক রাক্‌আত নামায পড়বে। ইমাম দুই রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর উভয় দল পৃথক পৃথকভাবে এক রাক্‌আত করে নামায পড়ে নিবে। এভাবে সকলেরই দুই রাক্‌আত নামায পূর্ণ হবে। কিন্তু শত্রুর ভয় যদি তীব্রতর হয়, তবে দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা হাঁটা অবস্থায় অথবা সওয়ার অবস্থায় যেভাবে সম্ভব নামায পড়বে। এতে কিবলার দিকে মুখ করা সম্ভব হোক বা না হোক। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) একথা নিজের পক্ষ থেকে বলেননি; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাই বর্ণনা করেছেন।[৫৯]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা শংকাকালীন বা যুদ্ধ চলাকালীন নামায পড়ার এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। কিন্তু ইমাম মালেক এই পদ্ধতি অনুসরণ করেননি।

---

৫৯. এ হাদীস জামে আত-তিরমিযীতে ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে। শংকাকালীন নামাযও কুরআনের নির্দেশ দ্বারা বিধিবদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "হে নবী! তুমি যখন মুসলমানদের মধ্যে উপস্থিত থাকবে এবং (যুদ্ধাবস্থায়) নামাযে তাদের ইমামতি করার জন্য দাঁড়াবে, তখন তাদের (সৈনিকদের) মধ্য থেকে একদল তোমার সাথে দাঁড়াবে এবং অস্ত্র

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ডান হাত বাঁহাতের উপর রাখা।

২৯১- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَّضَعَ اَحَدُهُمْ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اَبُوْ حَازِمٍ وَلَا اَعْلَمُ اِلَّا اَنَّهُ يَنْمِيْ ذٰلِكَ .

নিয়ে থাকবে। তারা যখন সিজদা সম্পন্ন করবে, তখন তারা পিছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল, যারা এখনো নামায পড়েনি, এসে তোমার সাথে নামায পড়বে এবং তারাও সতর্ক থাকবে ও নিজেদের অস্ত্র সাথে রাখবে। কেননা কাফেররা সুযোগ সন্ধান করছে। তোমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম থেকে একটু অসতর্ক হলেই তারা আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। কিন্তু তোমরা যদি বৃষ্টির কারণে কষ্ট পাও অথবা অসুস্থ থাকো, তবে অস্ত্র সংবরণ করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা সতর্ক থাকবে" (সূরা নিসা ঃ ১০২)।

শংকাকালীন নামাযের বিধান সেই সময়ের জন্য যখন শত্রুপক্ষের আক্রমণের আশংকা দেখা দিলেও কার্যত যুদ্ধ তখনো শুরু হয়নি। যুদ্ধ চলাকালে হানাফী মাহযাবমতে, নাযাম পরে পড়া যাবে। ইমাম মালেকের মতে, রুকূ-সিজদা করা সম্ভব না হলে ইশারায় তা করবে। ইমাম শাফিঈর মতে, নামাযরত অবস্থায়ও কিছু যুদ্ধ করা যেতে পারে। মহানবী (সা)-এর কর্মনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খন্দকের যুদ্ধের পূর্বেই শংকাকালীন নামাযের নির্দেশ নাযিল হয়।

শংকাকালীন নামায কোন্ পদ্ধতিতে পড়তে হবে তা অনেকটা যুদ্ধাবস্থার উপর নির্ভরশীল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ও পদ্ধতিতে এই নামায পড়েছেন। কাজেই যুদ্ধাবস্থায় যে পদ্ধতিতেই নামায পড়া সম্ভব বলে সমর্সাময়িক রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধান সেনাপতি মনে করবেন, তা সে পদ্ধতিতেই পড়তে হবে। হাদীস শরীফ থেকে এর চারটি নিয়ম জানা যায় ঃ

(এক) সেনাবাহিনীর একটি অংশ ইমামের সাথে মিলিত হয়ে নামায পড়বে, অপর অংশ শত্রুর প্রতিরোধে নিয়োজিত থাকবে। প্রথম অংশের এক রাক্আত পড়া হলে তারা সালাম ফিরিয়ে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় অংশ এসে ইমামের সাথে মিলিত হবে। এতে ইমামের হবে দুই রাক্আত, আর ফৌজের হবে এক রাক্আত। ইবনে আব্বাস (রা), জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ও মুজাহিদ (র) এই নিয়ম বর্ণনা করেছেন।

(দুই) দ্বিতীয় নিয়ম অত্র হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে এবং তা হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেছে।

(তিন) তৃতীয় নিয়মে প্রথম দল ইমামের সাথে দুই রাক্আত পড়ে চলে যাবে। দ্বিতীয় দল এসে ইমামের সাথে দুই রাক্আত পড়বে। এতে ফৌজের নামায হবে দুই রাক্আত, কিন্তু ইমামের নামায হবে চার রাক্আত। এই নিয়ম হাসান বসরী আবু বাকরা (র)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

(চার) সেনাবাহিনীর একাংশ ইমামের সাথে এক রাক্আত পড়বে। ইমাম যখন দ্বিতীয় রাক্আতের জন্য উঠে দাঁড়াবে, তখন মুক্তাদীরা স্বতন্ত্রভাবে এক রাক্আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দল এসে দ্বিতীয় রাক্আতে ইমামের সাথে মিলিত হবে। ইমাম সালাম ফিরানোর পর তারা উঠে গিয়ে আর এক রাক্আত পড়ে সালাম ফিরাবে। এক্ষেত্রে ইমাককে দ্বিতীয় রাক্আতে পদ্ধতিগত কারণে দীর্ঘ কিরাআত পড়তে হবে। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালেক সামান্য পার্থক্য সহকারে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। সাহ্ল ইবনে আবু হাসমা (র)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীস এর উৎস (তিরমিযী, ইবনে মাজা) (অনুবাদক)।

২৯১। সাহ্ল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) বলেন, লোকজনকে নামাযের মধ্যে ডান হাত বাঁ (হাতের) বাহুর উপর রাখার নির্দেশ দেয়া হতো। অধস্তন রাবী আবু হাযেম বলেন, আমার ধারণামতে এটি মারফূ হাদীস।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, নামাযীর উচিৎ, সে যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন ডান হাতের তালু বাঁ হাতের পাঞ্জার উপর এবং নাভীর নিচে রাখবে।[৬০] আর চোখের দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখবে। ইমাম আবু হানীফার এই মত।

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে নবী ﷺ -এর উপর দুরূপ পাঠ করা।

٢٩٢- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىِّ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

২৯২। আবু হুমায়েদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার উপর কিভাবে সালাত (দুরূদ) পাঠ করবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো, "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিন.....ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ, তার স্ত্রীগণ ও তাঁর সন্তানদের প্রতি রহমাত বর্ষণ করো, যেভাবে তুমি রহমাত বর্ষণ করেছো ইবরাহীমের প্রতি এবং তুমি বরকত নাযিল করো মুহাম্মদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর সন্তানদের প্রতি, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছো ইবরাহীমের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান"।

٢٩٣- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ مَعَنَا فِىْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ اَبُو النُّعْمَانِ اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ فَصَمَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّا لَمْ نَسْئَلْهُ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

---

৬০. হযরত আলী (রা) বলেন, নামাযরত অবস্থায় ডান হাতের তালু বাঁ হাতের পিঠের উপর নাভীর নিচে রাখা সুন্নাত (আবু দাউদ)। হযরত আলী (রা) এবং আবু হুরায়রা (রা) এই নিয়মে হাত বাঁধতেন (আবু দাউদ)। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা)-র সূত্রে বুকের উপর হাত বাঁধার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইবনে খুযাইমা ও অন্যদের কাছে এটা প্রমাণিত হাদীস। ইমাম শাফিঈ প্রমুখ মনীষী এই মত গ্রহণ করেছেন (অনুবাদক)।

كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ .

২৯৩। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদ ইবনে উবাদা (রা)-র বৈঠকখানায় আমাদের কাছে আসলেন এবং আমাদের সাথে বসলেন। আবু নুমান বাশীর ইবনে সাদ (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনার উপর দুরূদ পাঠ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আমরা কিভাবে আপনার উপর দুরূদ পাঠ করবো? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন (কোন জওয়াব দিলেন না)। আমরা মনে মনে আক্ষেপ করতে লাগলাম, আমরা যদি তাঁকে জিজ্ঞেস না করতাম! অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো, "আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিন..... ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"। অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমাত বর্ষণ করো, যেভাবে তুমি ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমাত বর্ষণ করেছো। তুমি বরকতও নাযিল করো মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছো সমস্ত জগতে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত"।[৬১] আর সালাম সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত আছো।

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুল ইসতিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনার নামায)।

٢٩٤ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِىِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

২৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল-মাযিনী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের মাঠে গেলেন এবং দুই রাক্আত ইসতিসকার নামায পড়লেন। তিনি কিবলামুখী হয়ে নিজের পরিহিত চাদর উল্টিয়ে পরেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফার মতে বৃষ্টি প্রার্থনা করার জন্য কোন নামায নেই, শুধু দোয়া করতে হবে। কিন্তু আমাদের মতে ইমাম লোকদের নিয়ে দুই রাক্আত নামায পড়বে, অতঃপর দোয়া করবে এবং নিজের পরিধানের চাদর এমনভাবে উল্টাবে যেন তার ডান দিকের অংশ বাঁদিকে এবং বাঁদিকের অংশ ডান দিকে এসে যায়। কিন্তু ইমাম ছাড়া আর কেউ নিজ চাদর উল্টাবে না।

---

৬১. সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বিভিন্ন হাদীসে এই দুরূদ বর্ণিত হয়েছে। তবে এর অর্থ প্রায় এক। হানাফী মাযহাবের পঠিত দুরূদ বুখারী ও মুসলিমে হযরত কাব ইবনে উজরা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে। তবে এই দুরূদে সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় "আলা ইবরাহীম" কথাটি নেই। তাতে শুধু "কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীম" বাক্য উল্লেখ আছে (অনুবাদক)।

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষ করে নামাযীর কিছুক্ষণ জায়নামাযে বসে থাকা।

٢٩٥- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اذا صَلّٰى اَحَدُكُمْ ثُمَّ جَلَسَ فِىْ مُصَلاَّهُ لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ فَانْ قَامَ مِنْ مُصَلاَّهُ فَجَلَسَ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ لَمْ يَزَلْ فِىْ صَلٰوةٍ حَتّٰى يُصَلِّى .

২৯৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি নামায শেষ করে জায়নামাযে বসে থাকলে ফেরেশতাগণ তার জন্য অনবরত দোয়া করতে থাকেন ঃ “হে আল্লাহ! তার উপর রহমাত নাযিল করো। হে আল্লাহ! তার গুনাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তার প্রতি অনুগ্রহ করো”। সে যদি নামাযের স্থান থেকে উঠে মসজিদের কোন জায়গায় বসে থেকে পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, তবে সে পরবর্তী ওয়াক্তের নামায শেষ করা পর্যন্ত নামাযরত অবস্থায় আছে বলে গণ্য হয়।

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযের পর নফল নামায পড়া।

٢٩٦-عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِه وَبَعْدَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

২৯৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাক্‌আত ও পরে দুই রাক্‌আত, মাগরিবের (ফরয) নামাযের পরে বাসায় ফিরে গিয়ে দুই রাক্‌আত এবং এশার (ফরয) নামাযের পর দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন। তিনি জুমুআর (ফরয) নামায পড়ার পর মসজিদে কোন নামায পড়তেন না, বাসায় পৌছার পর দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।[৬২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এগুলো হচ্ছে নফল (সুন্নাত) নামায এবং এটা মুস্তাহাব। আমরা জানতে পেরেছি যে, নবী ﷺ সূর্য হেলে যাওয়ার পর এবং যুহরের ফরয নামাযের

---

৬২. ফরয নামাযের আগে বা পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব নামায পড়েছেন এবং আমাদের পড়তে বলেছেন, সেগুলো ফিক্‌হের পরিভাষায় সুন্নাত নামায এবং হাদীসের পরিভাষায় নফল নামায। তিনি যেসব সুন্নাত নামায বরাবর পড়েছেন এবং উম্মাতকে নিয়মিত পড়তে বলেছেন তাকে বলা হয় সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাক্‌আত, যুহরের পূর্বে চার রাক্‌আত ও পরে দুই রাক্‌আত, মাগরিবের পরে দুই রাক্‌আত এবং এশার পরে দুই রাক্‌আত সুন্নাত নামায (তিরমিযী ও মুসলিমে হযরত উম্মু হাবীবা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত এবং আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (তাবিঈ) কর্তৃক

পূর্বে চার রাক্‌আত নামায পড়তেন। এ সম্পর্কে আবু আইউব আল-আনসারী (রা) তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন ঃ "এই সময় আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। তাই আমার পছন্দনীয় যে, এই সময় আমার একটি ভালো আমল তথায় পৌছে যাক"। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তা কি দুই রাক্‌আত করে দুই সালামে পড়তে হবে? তিনি বলেন ঃ "না"। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ হাদীস সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন বুকাইর ইবনে আমের আল-বাজালী, তিনি ইবরাহীম নাখাঈর সূত্রে, তিনি শা'বীর সূত্রে এবং তিনি আবু আইউব আনসারী (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক অথবা উযুহীন অবস্থায় কুরআন মজীদ স্পর্শ করা।

২৯৭- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ اِنَّ فِى الْكِتَابِ الَّذِىْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لاَ يَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِلاَّ طَاهِرٌ .

আয়েশা (রা)-র সূত্রে মুসলিম ও আবু দাউদে বর্ণিত)। আর যেসব সুন্নাতের প্রতি এতোটা জোর দেয়া হয়নি তাকে সুন্নাতে যায়েদা বলা হয়। যেমন আসরের নামাযের পূর্বে চার রাক্‌আত সুন্নাত নামায (ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে আবু দাউদ, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত)। তিরমিযীতে হযরত আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি দুই সালামে এই নামায পড়তেন। কিন্তু আবু দাউদে হযরত আলী (রা)-র সূত্রে বুখারী-মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা)-র বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে দুই রাক্‌আতের কথা উল্লেখ আছে)।

আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় আবু আইউব আনসারী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত, তিরমিযীতে আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা)-র সূত্রে এবং তিরমিযী ও বায়হাকীতে হযরত উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহে যুহরের পূর্বে চার রাক্‌আত সুন্নাতের কথা উল্লেখ আছে। আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা ও মুসনাদে আহমাদে উম্মু হাবীবা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীসে যুহরের পূর্বে চার রাক্‌আত এবং পরে চার রাক্‌আত সুন্নাতের কথা উল্লেখ আছে। বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীসে যুহরের পূর্বে দুই রাক্‌আত সুন্নাতের কথা উল্লেখ আছে। এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ যুহরের পূর্বে দুই রাক্‌আত সুন্নাত পড়ার পক্ষপাতী। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো দুই রাক্‌আত, আবার কখনো চার রাক্‌আত পড়েছেন।

আবু দাউদ ও তিরমিযীতে ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীসেও মাগরিবের পর দুই রাক্‌আত সুন্নাতের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে ইবনে মুগাফফাল (রা)-র সূত্রে, মুসলিমে আনাস (রা)-র সূত্রে, বুখারীতে তাবিঈ মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহে মাগরিবের পূর্বে দুই রাক্‌আত সুন্নাতের কথা উল্লেখ আছে। অন্যান্য মাযহাবে এই সুন্নাত পড়ার প্রচলন আছে। হানাফী মাযহাব ভিন্নতর কারণে এই নামায না পড়াকে উত্তম মনে করে।

জুমুআর ফরয নামাযের পর দুই, চার এবং ছয় রাক্‌আত সুন্নাত প্রমাণিত। ইমাম শাফিঈর মতে চার রাক্‌আত পড়তে হবে; ইমাম আহমাদের মতে দুই রাক্‌আতও পড়া যায়, চার রাক্‌আতও পড়া যায়, ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে ছয় রাক্‌আত পড়তে হবে (প্রথমে চার রাক্‌আত ও পরে দুই রাক্‌আত) এবং ইমাম আবু হানীফার মতে চার রাক্‌আত পড়তে হবে। তার মতে জুমুআর পূর্বেও চার রাক্‌আত সুন্নাত পড়তে হবে। ইবনে মাসউদ (রা) জুমুআর পূর্বে চার রাক্‌আত এবং পরে চার রাক্‌আত সুন্নাত পড়তেন। এ সবই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত (অনুবাদক)।

২৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হায্‌ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবনে হায্‌ম (রা)-র কাছে যে ফরমান পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে এই নির্দেশও ছিল যে, "পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে"।[৬৩]

২৯৮– أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لاَ يَسْجُدُ الرَّجُلُ وَلاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ اِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ .

---

৬৩. কুরআন মজীদের নির্দেশ হচ্ছে ঃ

لاَ يَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ .

"পবিত্রগণ ছাড়া তা কেউ স্পর্শ করতে পারে না" (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৭৯)।

হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরআন তিলাওয়াত থেকে জানাবাত (সহবাস জনিত অপবিত্রতা) ছাড়া আর কিছুই বিরত রাখতো না" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "হায়েযগ্রস্ত মহিলা ও সংগমের ফলে অপবিত্র লোক কুরআনের কিছুই পাঠ করবে না" (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

এ বিষয়ে সাহাবা ও তাবিঈদের যেসব মত ফিক্‌হের কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ আছে তা নিম্নরূপ ঃ হযরত সালমান ফারিসী (রা) বিনা উযুতে কুরআন পড়াতে কোনরূপ দোষ মনে করতেন না। কিন্তু তার মতে, এরূপ অবস্থায় কুরআনে হাত লাগানো জায়েয নয়। হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র মতও তাই। হাসান বসরী এবং ইবরাহীম নাখাঈও বিনা উযুতে কুরআন গ্রন্থে হাত লাগানো মাকরূহ মনে করতেন (আবু বাক্‌র আল-জাসসাস, আহ্‌কামুল কুরআন)। আতা, শাবী এবং কাসিম ইবনে মুহাম্মাদও এই মত পোষণ করেন (ইবনে কুদামা, আল-মুগনী)।

তবে বিনা উযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে তা দেখে দেখে পড়া কিংবা মুখস্ত পড়া সকলের মতেই জায়েয। জানাবাত (সহবাস জনিত নাপাকি) ও হায়েয-নিফাস অবস্থায় কুরআন পড়া হযরত উমার (রা), হযরত আলী (রা), হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখাঈ ও যুহরীর মতে মাকরূহ (আল-মুগনী ও ইবনে হাযমের আল-মুহাল্লা)। এ বিষয়ে ফিক্‌হবিদদের অভিমত নিম্নরূপ ঃ

ইমাম আলাউদ্দীন আল-কাশানী তার "বাদায়ে ওয়াস-সানায়ে" গ্রন্থে হানাফী মাযহারের মত এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ বিনা উযুতে নামায পড়া যেভাবে জায়েয নয়, ঠিক সেভাবে কুরআন শরীফ স্পর্শ করাও জায়েয নয়। তবে তা আবরণের মধ্যে থাকলে তাতে হাত লাগানো যেতে পারে। আবরণের অর্থ কেউ করেছেন বাঁধাই, আর কেউ করেছেন জুযদান। তাফসীর গ্রন্থও বিনা উযুতে স্পর্শ করা উচিৎ নয়। তবে বিনা উযুতে কুরআন পড়া জায়েয। ফতোয়া আলমগিরীতে বলা হয়েছে, বালক-বালিকাদের প্রতি এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য নয়। শিক্ষা লাভের উদ্দেশে ছোটদের হাতে কুরআন দেয়া যেতে পারে, তাদের উযু থাক বা না থাক।

ইমাম নববী (র) তাঁর 'আল-মিনহাজ' গ্রন্থে শাফিঈ মাযহাবের মত এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ নামায ও তাওয়াফের ন্যায় কুরআন মজীদ বা তার কোন একটি পৃষ্ঠাও বিনা উযুতে স্পর্শ করা হারাম। কুরআনের উপরের বাঁধাই ধরাও নিষিদ্ধ। যদি তা গেলাফে অথবা বাক্‌সে রক্ষিত থাকে বা শিক্ষাদানের উদ্দেশে তার কোন অংশ কোন কিছুর উপর লিখিত থাকে, তবে তাও বিনা উযুতে স্পর্শ

২৯৮। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, কোন ব্যক্তি যেন পবিত্র অবস্থা ছাড়া সিজদা না দেয় এবং কুরআন না পড়ে।[৬৪]

করা জায়েয নয়। তবে অন্য কোন জিনিসের সাহায্যে এর পাতা উল্টানো যেতে পারে। বালক উযুবিহীন অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করতে পারে।

'কিতাবুল-ফিক্‌হ আলাল-মাযাহিবিল আরবাআ' গ্রন্থে মালেকী মাযহাবের অভিমত এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ জমহুর ফিক্‌হবিদদের সাথে মালেকী মাযহাব এ ব্যাপারে একমত যে, হাত দিয়ে কুরআন স্পর্শ করার জন্য উযু একান্তই জরুরী শর্ত। কিন্তু কুরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে এই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত। বরং হায়েযগ্রস্ত মহিলার পক্ষেও শিক্ষার উদ্দেশে কুরআন স্পর্শ করা জায়েয। আল্লামা ইবনে কুদামা তার আল-মুগনী গ্রন্থে ইমাম মালেকের এই মত বর্ণনা করেছেন যে, জানাবাত অবস্থায় কুরআন পড়া নিষিদ্ধ , কিন্তু হায়েযগ্রস্ত মহিলার জন্য কুরআন পড়ার অনুমতি আছে। কেননা একটা দীর্ঘ সময় ধরে যদি আমরা তাকে কুরআন পড়া থেকে বিরত রাখি, তবে সে কুরআন ভুলে যাবে।

ইবনে কুদামা হাম্বলী মাযহাবের মত এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ জানাবাত অবস্থায় এবং হায়েয-নিফাস অবস্থায় কুরআন বা তার একটি পূর্ণ আয়াত পাঠ করা জায়েয নয়। তবে বিসমিল্লাহ্‌, আলহামদু লিল্লাহ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করা জায়েয। বিনা উযুতে হাত দিয়ে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা কোনক্রমেই জায়েয নয়। কোন জিনিসের মধ্যে কুরআন রক্ষিত থাকলে তা বিনা উযুতে ধরে উঠানো জায়েয। তাফসীরের গ্রন্থাবলী স্পর্শ করার ব্যাপারে উযুর কোন শর্ত নেই। কিতাবুল-ফিকহ আলাল-মাযাহিবিল আরবাআ গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে আরো লিখিত আছে যে, শিক্ষার উদ্দেশে বিনা উযুতে কুরআনে হাত লাগানো ছোটদের জন্যও জায়েয নয়। তাদের হাতে কুরআন তুলে দেয়ার পূর্বে তাদেরকে উযু করানো তাদের মুরব্বীদের কর্তব্য।

যাহিরী মাযহাবমতে, কুরআন পড়া ও তা স্পর্শ করা সর্বাবস্থায় জায়েয, বিনা উযুতে ও জানাবাত ও হায়েয অবস্থায়ও। আল্লামা ইবনে হায্‌ম তার আল-মুহাল্লা গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এই মতের সত্যতা ও যথার্থতার স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ফিক্‌হবিদগণ কুরআন পড়া ও তা হাত দিয়ে স্পর্শ করার ব্যাপারে যে শর্ত আরোপ করেছেন, তার একটিও কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত নয় (১ম খণ্ড, পৃ. ৭৭-৮৪)।

ছাত্রগণ তাদের মাসিক ঋতু চলাকালে মূল কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে তার তাফসীর, নোট বই, গাইড বই ইত্যাদি স্পর্শ করতে এবং পড়তে পারেন (অনুবাদক)।

৬৪. মূল পাঠে ইবনে উমার (রা)-র বক্তব্য হচ্ছে ঃ

لاَ يَسْجُدُ الرَّجُلُ وَلاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ اِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ .

ইবনে উমার (রা) এখানে পবিত্রতা বলতে জানাবাত (সহবাস জনিত নাপাকি) ও হায়েয-নিফাস থেকে পবিত্র হওয়াকে বুঝিয়েছেন। কেননা তার মতে বিনা উযুতে কুরআন পাঠ করা ও তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয। ইবনে আবু শাইবা (র) সাঈদ ইবনে জুবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমার (রা) পেশাব করার জন্য সওয়ারী থেকে নামলেন। পেশাব সেরে পুনরায় সওয়ারীতে আরোহণ করে তিনি সিজদার আয়াত পাঠ করেন এবং বিনা উযুতেই সিজদা করেন (ফাতহুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩)। সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে, ইবনে উমার (রা) বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করতেন। কিন্তু গরিষ্ঠ সংখ্যক আলেমের মতে বিনা উযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করা জায়েয নয় (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের এবং ইমাম আবু হানীফারও এই মত। তবে একটি ব্যাপারে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। আমাদের মতে, বিনা উযুতে কুরআন পড়ায় কোন দোষ নেই, তবে নাপাক অবস্থায় তা জায়েয নয়।

৭৩. অনুচ্ছেদঃ চলার পথে নারী বা পুরুষের কাপড়ে আবর্জনা বা ময়লা লাগলে।

২৯৯- عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لاِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَئَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ امْرَاَةٌ أُطِيْلُ ذَيْلِيْ وَاَمْشِيْ فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ .

২৯৯। ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফের উম্মে ওয়ালাদ (বাঁদী-কন্যা হামীদা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-র কাছে মাসআলা জানতে চেয়ে বলেন, আমি আমার পরিধেয় বস্ত্রের ঝুল লম্বা করি এবং আবর্জনার স্থান দিয়ে যাতায়াত করি (এর হুকুম কি)। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "অতঃপর পাক জায়গা হেঁচড়ানোতে এই নাপাক দূর হয়ে যায়।"[৬৫]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সামান্য পরিমাণ ময়লা লাগলে কোন দোষ নেই। কিন্তু আবর্জনা বেশী লাগলে কাপড় পরিষ্কার করে না নেয়া পর্যন্ত নামায হবে না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ফযীলাত।

৩০০- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَانِتِ الَّذِيْ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلٰوةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ .

৩০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধরত সৈনিক এমন রোযাদার ও নামাযী ব্যক্তির সমতুল্য যে কখনো নামায-রোযা করতে অবসন্ন হয় না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে এই মর্যাদার অধিকারী থাকে।

৩০১- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنْ اُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اُحْيٰ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اُحْيٰ فَاُقْتَلَ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلٰثًا اَشْهَدُ لِلّٰهِ .

৬৫. এখানে ময়লা-আবর্জনা বলতে পায়খানা-পেশাব নয়, বরং শুকনা ময়লা বা ধুলাবালি বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় পায়খানা-পেশাব ইত্যাদি লাগলে পরিধেয় বস্ত্র না ধোয়া পর্যন্ত তা পাক হয় না (অনুবাদক)।

৩০১। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার একান্ত অভিলাস, আমি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করি, অতঃপর নিহত হই, অতঃপর জীবন ফিরিয়ে পাই, আবার নিহত হই, আবার জীবন ফিরিয়ে পাই, আবার নিহত হই"। আবু হুরায়রা (রা) তিনবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন।

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ শহীদি মৃত্যু।

٣٠٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ فَاسْتَرْجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا اَبَا الرَّبِيْعِ فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيْكٍ يُسْكِتُهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُنَّ فَاِذَا وَجَبَ فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ قَالُوْا وَمَا الْوُجُوْبُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا مَاتَ قَالَتِ ابْنَتُهُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ شَهِيْدًا فَاِنَّكَ قَدْ كُنْتَ قَضَيْتَ جِهَازَكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَوْقَعَ اَجْرَهُ عَلٰى قَدْرِ نِيَّتِهِ وَمَا تَعُوْدُّوْنَ الشَّهَادَةَ قَالُوا الْقَتْلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدٌ وَالَّذِىْ يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيْدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجَمْعٍ شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ .

৩০২। জাবের ইবনে আতীক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে ছাবিত (রা)-কে দেখতে এলেন। তিনি তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় পেলেন। তিনি তাকে জোরে ডাকলেন, কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পারলেন না। তিনি ইন্না লিল্লাহ পড়লেন এবং বললেন ঃ "হে আবুর-রবী! আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্তে বিজয়ী। তার সামনে সকলেই অসহায়"। একথা শুনে মহিলারা চিৎকার দিয়ে উঠলো এবং কাঁদতে লাগলো। ইবনে আতীক (রা) তাদের থামাতে চেষ্টা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "এদের ছেড়ে দাও। যখন ওয়াজিব হবে তখন কোন রোদনকারিণীই আর কাঁদবে না"। লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'ওয়াজিব' কি? তিনি বলেন ঃ "তার মৃত্যু"। তার কন্যা বললেন, আমার তো আশা ছিলো তুমি শহীদ হবে। কেননা তুমি জিহাদের সমস্ত আয়োজন করে রেখেছিলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "আল্লাহ তাআলা তার নিয়াত অনুযায়ী তার জন্য সওয়াব নির্ধারণ করে রেখেছেন। তোমরা কাকে শহীদ গণ্য করো?" লোকজন বললো, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে নিহত ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে নিহত হওয়া ছাড়া আরো সাত প্রকারের শহীদ আছে। মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ, পানিতে ডুবে মরা ব্যক্তি শহীদ, নিউমোনিয়া রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি শহীদ, আগুনে পুড়ে মরা ব্যক্তি শহীদ, চাপা পড়ে নিহত ব্যক্তি শহীদ, অন্তঃসত্তা অবস্থায় মারা যাওয়া স্ত্রীলোক শহীদ এবং পেটের পীড়ায় মারা যাওয়া ব্যক্তি শহীদ।

٣٠٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ وَقَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ وَصَاحِبُ الْهَدَمِ شَهِيْدٌ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَّسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاَسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لاَ اسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا .

৩০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি পথ চলার সময় একটি কাটাযুক্ত ডাল দেখতে পেলো। সে তা সরিয়ে ফেললো। আল্লাহ তাআলা তার এ কাজ পছন্দ করলেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ শহীদ পাঁচ শ্রেণীর। পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণকারী শহীদ, মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ, পানিতে ডুবে মরা ব্যক্তি শহীদ, কোন কিছুর নিচে চাপা পড়ে নিহত ব্যক্তি শহীদ এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত ব্যক্তি শহীদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ লোকজন যদি জানতো আযান ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোতে কি (সওয়াব) রয়েছে, অতঃপর আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর জন্য লটারীর আশ্রয় নিতে হলে তারা অবশ্যই লটারী করতো। তারা যদি জানতো মসজিদে সর্বাগ্রে আসার জন্য কি পরিমাণ সওয়াব রয়েছে, তবে তারা আগে আসার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। তারা যদি জানতো, এশা ও ফজরের জামাআতে কি পরিমাণ সওয়াব রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই দুই নামাযের জামাআতে এসে শরীক হতো।

অধ্যায় ঃ ৩

اَبْـوَابُ الْجَـنَـائِـزِ

(জানাযার বিবরণ)

১. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল করাতে পারে।

٣٠٤-اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ اِمْرَاَةَ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ غَسَلَتْ اَبَا بَكْرٍ حِيْنَ تُوُفِّىَ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَئَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ اِنِّىْ صَائِمَةٌ وَاِنَّ هٰذَا يَوْمٌ شَدِيْدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عَلَىَّ مِنْ غُسْلٍ قَالُوْا لاَ .

৩০৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (র) বলেন, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রা) তার স্বামীকে গোসল করিয়েছিলেন, যখন তিনি ইন্তেকাল করেন। তার গোসল সেরে তিনি বের হয়ে এসে উপস্থিত মুহাজিরদের জিজ্ঞেস করেন, আমি রোযা রেখেছি এবং আজ খুবই ঠাণ্ডার দিন, এ অবস্থায় (মৃতের গোসল দেয়ার কারণে) আমার গোসল করা কি বাধ্যতামূলক? তারা বলেন, না।[১]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরাও এই মত গ্রহণ করেছি। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তাকে গোসল দিতে পারে, এতে দোষ নেই। যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল করাবে পরে তার গোসল এবং উযু করার প্রয়োজন নেই। তবে শরীরের যে স্থানে গোসলের পানি লেগেছে তা ধুয়ে ফেলবে।

২. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির কাফন।

٣٠٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ قَالَ الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُوْزَرُ وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيْهِ .

---

১. ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখের মতে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে গোসল করাতে পারে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী ও আওযাঈর মতে স্বামী স্ত্রীকে গোসল করাতে পারবে না (উমদাতুল কারী)। হযরত আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে গোসল করিয়েছিলেন। ইমাম শাফিঈ ও অন্যরা এই হাদীসকে নিজেদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন (অনুবাদক)।

৩০৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, মৃত ব্যক্তির কাফনে জামা ও লুংগি পরাবে এবং তৃতীয় কাপড়টি চাদর হিসাবে ব্যবহার করবে। যদি তিনখানা কাপড় সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় তবে একটি কাপড়ই যথেষ্ট।[২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নিয়ম গ্রহণ করেছি। লুংগিকে চাদরের মতোই দ্বিতীয় কাপড় হিসাবে ব্যবহার করা (লুংগি হিসাবে নয়) আমাদের কাছে পছন্দনীয়। মৃতের কাফনে দু'টি কাপড়ের কম দেয়া আমাদের কাছে পছন্দনীয় নয়। তবে প্রয়োজন বশত এক কাপড়ে কাফন দেয়া যেতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা (লাশ) বহন করা এবং জানাযার সাথে সাথে যাওয়া।

٣٠٦- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَانَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهُ اِلَيْهِ اَوْ شَرٌّ تُلْقُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

৩০৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা জানাযা ও দাফন-কাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করো। কেননা যদি সে নেককার লোক হয়ে থাকে তবে তোমরা তাকে দ্রুত কল্যাণের স্থানে পৌছে দিলে। আর যদি সে খারাপ লোক হয়ে থাকে তবে খারাপকে তোমরা নিজেদের ঘাড় থেকে দ্রুত নামিয়ে রাখলে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরাও এই মত গ্রহণ করেছি। দাফন-কাফনের ব্যাপারে বিলম্ব করার চেয়ে জলদি করাই উত্তম। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

---

২. শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবমতে মৃত ব্যক্তিকে তিনটি চাদরে কাফন দিতে হবে। এর মধ্যে জামাও থাকবে না, লুংগিও থাকবে না। কেননা হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে ইয়ামনের তৈরী তিন খণ্ড সাদা সূতী কাপড়ের কাফন দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে লুংগি ও পাগরী ছিলো না (সিহাহ সিত্তা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ)। হানাফী ও মালেকী মাযহাবমতে জামাও কাফনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ-কে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল ঃ জামা (قميص), লুংগি (ازار) ও চাদর (لفافة) (ইবনে আদীর আল-কামেল গ্রন্থ)। কিন্তু এ হাদীসের অধস্তন রাবী নাসিহ্ ইবনে আবদুল্লাহ আল-কূফী একজন সমালোচিত ব্যক্তি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়ঃ যে জামা পরিহিত অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন এবং আরো দু'টি কাপড় (একটি লুংগি, অপরটি চাদর) (আবু দাউদ)। কিন্তু এ হাদীসের অধস্তন রাবী ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদও সমালোচনায় আহত।

অভাবের কারণে দুই কাপড়ে কাফন দেয়া যেতে পারে, এমনকি এক কাপড়েও। হযরত আবু বাক্‌র (রা) মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে বলেন, "আমার পরিধানের এই কাপড় দু'টি ধুয়ে তা দিয়েই আমাকে কাফন দিবে" (মুসনাদে আহমাদ, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আবদুর রায্যাক, ইবনে সাদ)।

অধিকাংশ হানাফী আলেম এবং শাফিঈ মাযহাবমতে তিনের অধিক কাপড়ে কাফন দেয়া মাকরূহ নয়, তবে শর্ত হচ্ছে বেজোড় সংখ্যক হতে হবে। ইবনে উমার (রা) তার এক ছেলেকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দিয়েছেন ঃ জামা, পাগড়ী এবং তিনটি চাদর (বায়হাকী)। কিন্তু তিন কাপড়ে কাফন দেয়াই সর্বোত্তম (অনুবাদক)।

٣٠٧- عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ اَمَامَ الْجَنَازَةِ وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا وَابْنُ عُمَرَ .

৩০৭। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার (লাশের) আগে আগে চলতেন। খোলাফায়ে রাশেদূন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন।[৩]

٣٠٨- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هُدَيْرٍ اَنَّهُ رَاٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَدِّمُ النَّاسَ اَمَامَ جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ .

৩০৮। রবীআ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুদাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দেখলেন যে, তিনি লোকদেরকে যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা)-র লাশের আগে আগে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, লাশের আগে আগে যাওয়া উত্তম, তবে পিছনে পিছনে যাওয়া অধিক উত্তম। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ লাশের সাথে সাথে আগুন নিয়ে যাওয়া এবং ধূপকাঠি জ্বালানো নিষেধ।

٣٠٩- اَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ نَهٰى اَنْ يُّتْبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ اَوْ بِمِجْمَرَةٍ فِىْ جَنَازَتِهِ .

৩০৯। সাদ ইবনে আবু সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) তার লাশের সাথে সাথে আগুন নিয়ে যেতে এবং তার জানাযায় ধূপকাঠি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মতের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফারও এই কথা।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ লাশ নিয়ে যেতে দেখে দাঁড়ানো।

٣١٠- عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ فِى الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ .

---

৩. লাশের আগে, পিছনে, ডানে, বামে যে কোন দিক দিয়ে লাশের সাথে সাথে যাওয়া সব ইমামের মতেই জায়েয। তবে ইমাম আবু হানীফা ও আওযাঈর মতে লাশের পিছনে পিছনে যাওয়াই উত্তম। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ও জমহুরের মতে আগে আগে চলা উত্তম। সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম বুখারীর মতে সামনে পিছনে যে কোন দিক দিয়ে চলা সমান কথা (অনুবাদক)।

৩১০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লাশ নিয়ে যেতে দেখে দাঁড়িয়ে যেতেন। পরে তিনি এরূপ করা ত্যাগ করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। লাশ নিয়ে যেতে দেখে দাঁড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে দাঁড়ানোর নিয়ম ছিল, পরে তা পরিত্যক্ত হয়। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য জানাযার নামায পড়া এবং দোয়া করা।

٣١١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَئَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يُصَلّٰى عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ اَنَا لَعَمْرُ اللّٰهِ اُخْبِرُكَ اَتَّبِعُهَا مِنْ اَهْلِهَا فَاذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ فَحَمِدْتُ اللّٰهَ وَصَلَّيْتُ عَلٰى نَبِيِّهِ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِىْ اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ .

৩১১। সাঈদ আল-মাকবূরী (র) থেকে তার পিতার (কায়সান) সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মৃতের জানাযা কিভাবে পড়তে হবে? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে এ সম্পর্কে অবহিত করবো। আমি কোন ব্যক্তির ঘর থেকে তার লাশের সাথে যাই। লাশ যখন নামিয়ে রাখা হয় তখন আমি 'আল্লাহু আকবার' বলে জানাযা শুরু করি, অতঃপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি এবং তার নবীর উপর দুরূদ পাঠ করি, অতঃপর (তৃতীয় তাকবীর বলার পর) নিম্নোক্ত দোয়া পড়ি ঃ

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِىْ اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ .

"হে আল্লাহ! তোমার এই বান্দা, তোমার বান্দার পুত্র এবং তোমার বাঁদীর পুত্র। সে এই সাক্ষ্য দিতো যে, 'তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তোমার বান্দা ও তোমার রাসূল'। তুমি তার সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। যদি সে ভালো লোক হয়ে থাকে, তবে তুমি তার ভালো কাজের সওয়াব বৃদ্ধি করে দাও। আর যদি সে অপরাধী হয়ে থাকে, তবে তুমি

তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হও। হে আল্লাহ! তার মৃত্যুতে আমাদের যে কষ্ট হয়েছে তার সওয়াব থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না এবং তার (মৃত্যুর পর) আমাদের বিপদে ফেলো না"।[৪]

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আমাদের মতে এবং ইমাম আবু হানীফার মতে এটাই উত্তম যে, জানাযার নামাযে ফাতিহা পাঠ করবে না।[৫]

---

৪. হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ তৃতীয় তাকবীরের পর যে দোয়া পড়েন তা কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহকারে মুসনাদে আহ্‌মাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ . اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ .

"হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়ো, পুরুষ ও মহিলা সকলকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখবে, তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো এবং যাকে মৃত্যু দান করবে, তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! তার মৃত্যুতে আমাদের যে কষ্ট হয়েছে তার সওয়াব থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না এবং তার মৃত্যুতে আমাদের বিপদে ফেলো না"।

নিয়াত করে প্রথম তাকবীর বলার পর সানা (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামাদিক......) পড়বে। অতঃপর দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ (যা নামাযের শেষ বৈঠকে পড়া হয়) পাঠ করবে। তৃতীয় তাকবীরের পর উপরোল্লিখিত দোয়া পড়বে, অতঃপর সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। নাবালেগ শিশুর জানাযা হলে উপরোল্লিখিত দোয়ার পরিবর্তে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا .

"হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী, শ্রমের প্রতিফল, রক্ষিত ভাণ্ডার ও শাফাআতের মাধ্যমে পরিণত করো" (অনুবাদক)।

৫. ইমাম শাফিঈর মতে জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নাত। হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (তাবিঈ) বলেন, 'আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র সাথে জানাযা পড়েছি। তিনি তাতে সূরা ফাতিহা পড়েন, অতঃপর বলেছেন, আমি তা এজন্য পড়লাম যেন তোমরা জানতে পারো এটা সুন্নাত" (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)। ইমাম শাফিঈ জাবের (রা)-র সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ চার তাকবীরে জানাযা পড়েছেন এবং প্রথম তাকীরের পর সূরা ফাহিতা পড়েছেন" (হাকেম)। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজা ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার নামাযে সূরা ফাহিতা পড়েছেন"। তবে এ হাদীসের এক রাবী ইবরাহীম ইবনে উছমান আবু শায়বা ওয়াসেতী হাদীস শাস্ত্রে চরম দুর্বল। মুজাহিদ বলেন, আমি ১৮জন সাহাবীর কাছে ফাহিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, সূরা ফাহিতা পড়তে হবে। আবু উমামা (রা), ইবনে মাসউদ (রা), হাসান ইবনে আলী, ইবনে যুবায়ের ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।

ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও সুফিয়ান সাওরীর মতে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সনদ সূত্রে প্রমাণিত নয়। কোন কোন সাহাবী তা দোয়া বা সানা হিসাবে পাঠ করেছেন। ইবনুদ-দিয়া তার 'শারহুল মাজমা' গ্রন্থে ইবনে বাত্তালের সূত্রে উল্লেখ

٣١٢- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ سَلَّمَ حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيْهِ .

৩১২। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) যখন জানাযার নামায পড়তেন, তখন এতোটা জোরে সালাম বলতেন যে, তার কাছের লোকেরা তা শুনতে পেতো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। ডানে-বাঁয়ে সালাম ফিরানোর সময় কণ্ঠস্বর এতোটা উচ্চু করবে যাতে তা অন্তত কাছের লোকেরা শুনতে পায়। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٣١٣- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّىْ عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ اِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا .

৩১৩। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) আসরের নামায এবং ফজরের নামায ওয়াক্তমত পড়ার পর জানাযার নামায পড়তেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ফজর ও আসর নামাযের পর (সূর্য উঠা এবং অস্ত যাওয়ার পূর্বে) জানাযার নামায পড়ায় কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের মধ্যে জানাযার নামায পড়া।

٣١٤- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ مَا صُلِّىَ عَلَىْ عُمَرَ اِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ .

৩১৪। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র জানাযা মসজিদের মধ্যেই পড়া হয়েছিল।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মসজিদের মধ্যে জানাযার নামায পড়বে না। আবু হুরায়রা (রা) থেকে আমরা এরূপই জানতে পেরেছি। মদীনায় মসজিদের বাইরে জানাযার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানেই জানাযা পড়তেন।[৬]

করেছেন যে, আলী (রা), ইবনে উমার (রা), আবু হুরায়রা (রা), আতা, তাউস, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, ইবনে সীরীন, ইবনে জুবায়ের ও শাবী (র) জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়তেন না।

মতভেদের বিষয় হলো, ওয়াক্তিয়া নামযের মতো জানাযার নামাযেও সূরা ফাহিতা পড়া বাধ্যতামূলক কিনা? হানাফী মতে তা বাধ্যতামূলক নয়, তবে কেউ তা দোয়া হিসাবে পড়তে চাইলে পড়তে পারে। সূরা ফাতিহা পাঠের পক্ষের লোকদের মতে তা পড়া বাধ্যতামূলক (অনুবাদক)।

৬. হানাফী মাযহাবমতে মসজিদের মধ্যে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ। কেননা আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে জানাযার নামায পড়ে তার কোন সওয়াব হয় না" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)। ইমাম শাফিঈ ও আহমাদের মতে মসজিদের মধ্যে জানাযার নামায পড়া জায়েয। বর্ণিত আছে যে, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ইন্তেকাল করলে আয়েশা (রা) বলেন, তাকে মসজিদে নিয়ে এসো, যাতে আমিও তার জানাযা পড়তে পারি। কিন্তু তার এই ইচ্ছাকে অপছন্দ করা হলো। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ লাশ বহন করলে, তার দেহে সুগন্ধি লাগালে এবং তাকে গোসল দিলে তাতে উযু নষ্ট হয় কিনা।

٣١٥– أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنَّطَ ابْنًا لِّسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩১৫। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) সাঈদ ইবনে যায়েদের এক পুত্রের (আবদুর রহমানের) মৃতদেহে সুগন্ধি লাগালেন, তাকে বহন করলেন, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লেন, কিন্তু (নতুন করে) উযু করেননি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। যে ব্যক্তি লাশকে গোসল করায়, কাফন পরায়, সুগন্ধি লাগায় এবং তা বহন করে, তার জন্য উযু করা জরুরী নয় (অর্থাৎ উযু করে এসব কাজ করলে তাতে উযু নষ্ট হয় না)। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٣١٦– عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لاَ يُصَلِّى الرَّجُلُ عَلَى جَنَازَةٍ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ .

৩১৬। ইবনে উমার (রা) বলতেন, কোন ব্যক্তি পবিত্র অবস্থা ছাড়া যেন জানাযার নামায না পড়ে।[৭]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। কোন ব্যক্তি যেন পবিত্র অবস্থা ছাড়া জানাযার নামায না পড়ে। যদি হঠাৎ করে অপ্রস্তুত অবস্থায় জানাযা সামনে এসে যায়, তবে তাইয়াম্মুম করে নামায পড়বে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ লাশ দাফন করার পর জানাযার নামায পড়া।

٣١٧– عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ .

৩১৭। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। নাজ্জাশী যেদিন ইন্তেকাল করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (লোকদের) তার মৃত্যুসংবাদ শুনান। তারপর তাদেরকে নিয়ে তিনি ঈদের মাঠে যান, তাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান এবং চার তাকবীর সহকারে তার জানাযা পড়ান।[৮]

ﷺ নিজেই বাইদার দুই ছেলে সুহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদেই পড়েছেন (মুসলিম, আবু দাউদ)। মহিলাদের জন্য জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা পুরুষদের মতো বাধ্যতামূলক নয়, তবে ইচ্ছা করলে তারা এতে শরীক হতে পারে (অনুবাদক)।

৭. মুল্লা আলী আল-কারী (র) বলেছেন, 'জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা শর্ত। এ ব্যাপারে সবাই একমত'। কিন্তু ইমাম শা'বী ও মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবাবীর মতে, 'বিনা উযুতে জানাযার নামায পড়া জায়েয'। উযু করতে গেলে জানাযার জামাআত না পাওয়ার আশংকা থাকলে তাইয়াম্মুম করে জামাআতে শামিল হওয়া যেতে পারে (অনুবাদক)।

৮. তৎকালীন হাবশার রাজার রাষ্ট্রীয় পদবী ছিল নাজ্জাশী। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমসাময়িক নাজ্জাশীর নাম ছিল আসহিমাহ (اصحمه)। তিনি তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদিও তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ

٣١٨- اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا اُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ مِسْكِيْنَةً مَرِضَتْ فَاُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَرَضِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَسَاكِيْنَ وَيَسْاَلُ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَتْ فَاٰذِنُوْنِىْ بِهَا قَالَ فَاُتِىَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلاً فَكَرِهُوْا اَنْ يُؤْذِنُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَلَمَّا اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُخْبِرَ بِالَّذِىْ كَانَ مِنْ شَاْنِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَمْ اٰمُرْكُمْ اَنْ تُؤْذِنُوْنِىْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَرِهْنَا اَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلاً اَوْ نُوْقِظَكَ قَالَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلٰى قَبْرِهَا فَصَلّٰى عَلٰى قَبْرِهَا فَكَبَّرَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ .

৩১৮। আবু উমামা ইবনে সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক দরিদ্র নিঃস্ব মহিলার অসুখ সম্পর্কে অবহিত করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল রুগ্ন-দরিদ্রদের দেখতে যাওয়া ও তাদের খোঁজ-খবর নেয়া। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "সে মারা গেলে তোমরা আমাকে খবর দিও"। রাবী বলেন, ঘটনাক্রমে সেই মহিলা (রাতে) মারা যায় এবং রাতেই তার জানাযা ও দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। লোকেরা রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খবর দিয়ে তাঁকে কষ্ট দেয়া সমীচীন মনে করলো না।

-এর জীবনকালেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সাথে সরাসরি সাক্ষাত না হওয়ায় তিনি সাহবীর মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। তবে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আস (রা) নাজ্জাশীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। একজন তাবিঈর হাতে একজন সাহাবীর ইসলাম গ্রহণের এটাই প্রথম দৃষ্টান্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজ্জাশীর কাছে দু'টি পত্র লিখেন এবং আমর ইবনে উমাইয়া (রা)-র মাধ্যমে তার কাছে তা পাঠান। এর একটিতে তিনি নাজ্জাশীকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং অপরটিতে উম্মে হাবীবা (রা)-কে তাঁর সাথে বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দেন। নাজ্জাশী পত্র পেয়ে তা নিজের দু'চোখের উপর রাখেন, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বিবাহ প্রস্তাব গ্রহণ করে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করেন। এজন্য তিনি ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বিবাহ সম্পর্কিত ঘটনাটি উম্মে হাবীবা (রা)-র সূত্রে আবু দাউদ ও নাসাঈ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তার ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের নিয়ে তার গায়বী জানাযা পড়েন। এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং পূর্ববর্তী কালের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম গায়বী জানাযা পড়া জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে হানাফী ও মালেকী মাযহাবমতে গায়েবী জানাযা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে গায়েবী জানাযা পড়েছেন তা তাঁর বিশেষত্বের কারণে ছিল। তার দোয়া যে কোন লোকের জন্য কাল্যাণ ও বরকতের কারণ। অবশ্য শায়েখ দেহলবী বলেন, 'আজকাল মক্কা-মদীনার হানাফী আলেমগণও গায়েবী জানাযা পড়েন'। বর্তমানে দুনিয়ার সর্বত্র গায়েবী জানাযা পড়া একটা সাধারণ রীতিকে পরিণত হয়েছে (অনুবাদক)।

ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার মৃত্যুসংবাদ শুনানো হলো। তখন তিনি বলেন ঃ "আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি যে, সে মারা গেলে আমাকে অবহিত করবে?" তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাতের বেলা আপনাকে ঘর থেকে বের করা বা আপনার ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করা আমরা পছন্দ করিনি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং তার কবরের পাশে লোকদের কাতারবন্দী করলেন, অতঃপর তার কবরকে সামনে রেখে চার তাকবীরের সাথে তার জানাযা পড়লেন।[৯]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতেও জানাযার নামায চার তাকবীরের সাথে পড়তে হবে। যার একবার জানাযা পড়া হয়েছে, তার উপর পুনর্বার জানাযা না পড়াই উচিৎ। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদাহরণ পেশ করা ঠিক নয় যে, তিনি মদীনায় নাজ্জাশীর জানাযা পড়েছেন, অথচ তিনি মারা গেছেন হাবশায় (আবিসিনিয়া, বর্তমান নাম ইথিওপিয়া)। অন্য লোকদের নামাযের সাথে তাঁর নামাযের তুলনা হয় না। তাঁর নামায তাদের জন্য পবিত্রতা ও বরকতের কারণ ছিল। সুতরাং তাঁর নামায অন্যদের নামাযের সাথে তুলনীয় নয়। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ জীবিত ব্যক্তির ক্রন্দনে মৃত ব্যক্তিকে কি সাজা দেয়া হয়?

٣١٩-عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ لاَ تَبْكُوْا عَلٰى مَوْتَاكُمْ فَاِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ .

৩১৯। ইবনে উমার (রা) বলেন, তোমরা মৃতের জন্য কান্নাকাটি করো না। কেননা মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকদের কান্নার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয়।

---

৯. ইমাম শাফিঈ ও জমহূর আলেমদের মতে, কবরের উপর জানাযা পড়া জায়েয। ইমাম আবু হানীফা, মালেক (তার প্রসিদ্ধ মত) ও ইবরাহীম নাখঈর মতে, দাফনের পূর্বে জানাযা না পড়া হয়ে থাকলে কবরের উপর জানাযা পড়া জায়েয, অন্যথায় জায়েয নয়।

জানাযার তাকবীর সংখ্যা

হযরত উমার, হাসান, হুসাইন, যায়েদ ইবনে ছাবিত, ইবনে আবু আওফা, ইবনে উমার, সুহাইব, উবাই ইবনে কাব, বারাআ ইবনে আযেব, আবু হুরায়রা, উকবা ইবনে আমের (রা), মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা, শাবী, আলকামা, আতা, উমার ইবনে আবদুল আযীয, মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন, সুফিয়ান সাওরী, কুফার অধিকাংশ আলেম, মালেক, হেজাযের অধিকাংশ আলেম, আওযাঈ, সিরিয়ার অধিকাংশ আলেম, শাফিঈ, আহমাদ (তার প্রসিদ্ধ মত) ও ইসহাকের মতে, জানাযার তাকবীর সংখ্যা চার। ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-র মতে তাকবীর সংখ্যা পাঁচ, আলী (রা)-র মতে ছয়, যির ইবনে হুবাইশ (র)-র মতে সাত এবং আনাস ও জাবের (রা)-র মতে তিন। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে আবু বাক্র (রা)-র খেলাফতকাল পর্যন্ত চার, পাঁচ ও ছয় তাকবীরের সাথে জানাযা পড়তো। অতঃপর উমার (রা)-র খেলাফতকালে তার আহবানে অনুসন্ধান করে দেখা গেলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ আমল ছিলো চার তাকবীর। অতঃপর এটাই গৃহীত হয় (অনুবাদক)।

٣٢٠- عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَذُكِرَ لَهَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَغْفِرُ اللّٰهُ لاِبْنِ عُمَرَ اَمَا اِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلٰكِنَّهُ قَدْ نَسِيَ اَوْ اَخْطَاَ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ يُبْكٰى عَلَيْهَا فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهَا .

৩২০। আমরাহ্ বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-র কাছে শুনেছেন, যখন তার কাছে বলা হলো যে, ইবনে উমার (রা) বলে থাকেন, "জীবিতদের কান্নাকাটির দরুন মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়"। একথা শুনে আয়েশা (রা) বলেন, ইবনে উমারকে আল্লাহ ক্ষমা করুন। তিনি (রাসূলুল্লাহ্‌র নামে) মিথ্যা কথা বলছেন না, বরং তিনি (তাঁর কথা) ভুলে গেছেন অথবা (তাঁর কথা) ভুল বুঝেছেন। আসল ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি জানাযার (লাশের) সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার জন্য কান্নাকাটি করা হচ্ছিল। তখন তিনি বলেন ঃ এরা তো তার জন্য কান্নাকাটি করছে অথচ তার কবরে তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।[১০]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এবং ইমাম আবু হানীফা (র) হযরত আয়েশা (রা)-র মত গ্রহণ করেছি।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ কবরকে সিজদার জায়গায় পরিণত করা, কবর সামনে রেখে নামায পড়া অথবা কবরের সাথে হেলান দিয়ে বসা।

٣٢١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدًا .

---

১০. বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে যে, তা এক ইহুদী নারীর লাশ ছিল। হযরত আয়েশা (রা) তার মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন, "কোন ভার বহনকারীই অপর কারো বোঝা বহন করে না" (আনআম ১৬৪, ইসরা ১৫, ফাতির ১৮, যুমার ৭, নাজ্‌ম ৩৮)। তবে যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় কান্নাকাটি করার ওসিয়াত করে যায়, তাকে এই নাজায়েয ওসিয়াতের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ একমত। অন্যথায় আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটির জন্য মৃত ব্যক্তি দায়ী নয় (অনুবাদক)।

৩২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ ইহূদীদের ধ্বংস করুন। তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে।

٣٢٢- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ يَتَوَسَّدُ عَلَيْهَا وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا قَالَ بِشْرٌ يَعْنِى الْقُبُوْرَ .

৩২২। ইমাম মালেক (র) বলেন, হযরত আলী (রা) তার সাথে ঠেস দিয়ে বসতেন এবং তার উপর শয়ন করতেন। বিশ্‌র (র) বলেন, আর্থাৎ কবরের উপর।[১১]

১১. শেরেক অনুপ্রবেশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে এই কবর। বর্তমানে পীর-আওলিয়া বলে কথিত লোকদের কবরকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হচ্ছে তা ইসলাম বিরোধী এবং সুস্পষ্ট শেরেক। এজন্য নবী ﷺ তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এই সম্পর্কে উম্মাতকে সতর্ক করে দিয়েছেন। হযরত জুনদুব (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে তার ইন্তেকালের পাঁচ দিন পূর্বে একথা বলতে শুনেছি ঃ "সাবধান! তোমাদের পূর্বেকার উম্মাতগণ তাদের নবী-রাসূল ও নেককার লোকদের কবরকে সিজদার স্থান বনিয়ে নিয়েছিল। সাবধান! তোমরা কখনো কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করবে না। মনে রেখো, আমি তোমাদের এরূপ করতে নিষেধ করছি" (মুসলিম)। হযরত আয়েশা (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ যখন মৃত্যুকালীন রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তিনি মুখ চাদর দিয়ে (ঢেকে) রাখতেন। যখন তাঁর বেশী কষ্ট হতো, মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলতেন। এরূপ অবস্থায় একবার তিনি বলেন ঃ "ইহূদী ও খৃস্টানদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক। তারা নিজেদের নবী-রাসূলদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে"। তিনি ইহূদী-খৃস্টানদের এসব কাজের পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছিলেন (বুখারী, মুসলিম)। হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর পাকা করতে, এর পাশে আসন গ্রহণ করতে এবং এর উপর কোঠা নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ)। আবু মারসাদ আল-গানাবী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তোমরা কবরের উপর বসো না এবং এর দিকে মুখ করে নামাযও পড়ো না" (মুসলিম)। নবী ﷺ তাঁর নিজের কবর সম্পর্কে বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে পূজনীয় মূর্তি বানিও না। যে জাতি নিজেদের নবী-রাসূলদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব তীব্রতর হয়েছে (মালেক, বায্‌যার)। এ পর্যায়ে শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবী (র) বলেন, 'আমি বলছি, শুরুতে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। কেননা তা কবর পূজার দ্বার খুলে দিতো। কিন্তু যখন ইসলামের নীতিমালা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো এবং আল্লাহ ছাড়া অপর কিছুর ইবাদত হারাম হওয়ার ব্যাপারে মানুষের মনমগজ আশ্বস্ত হলো, তখন কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ১ম খণ্ড, অনুচ্ছেদঃ কবর যিয়ারত) (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ৪

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

যাকাত

১. অনুচ্ছেদ ঃ ধন-সম্পদের যাকাত।

٣٢٣- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُوْلُ هٰذَا شَهْرُ زَكٰوتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتّٰى تَحْصُلَ اَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوْا مِنْهَا الزَّكٰوةَ .

৩২৩। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। উছমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) বলতেন, এটা তোমাদের যাকাত আদায় করার মাস। অতএব যার ঋণ রয়েছে সে যেন প্রথমে তা পরিশোধ করে, অতঃপর অবশিষ্ট মালের যাকাত দেয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। যে ব্যক্তির দেনা রয়েছে, সে তার মাল থেকে প্রথমে সেই দেনা পরিশোধ করবে, অতঃপর যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ মাল অবশিষ্ট থাকলে তার যাকাত দিবে। তার পরিমাণ যদি দুই শত দিরহাম অথবা বিশ মিছকাল সোনা বা তার অধিক হয়, তবে তার যাকাত আদায় করতে হবে।[১] যদি অবশিষ্ট মালের পরিমাণ এর কম হয় তবে তার উপর যাকাত ধার্য হবে না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٣٢٤- اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ اَنَّهُ سَئَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ اَعَلَيْهِ الزَّكٰوةُ فَقَالَ لاَ .

৩২৪। ইয়াযীদ ইবনে খুসাইফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এক ব্যক্তির মালিকানায় যে পরিমাণ মাল রয়েছে, তার সেই পরিমাণ ঋণও রয়েছে, তাকে কি যাকাত দিতে হবে? তিনি বলেন, না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের এবং ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

---

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমার কাছে যদি দুই শত দিরহাম থাকে এবং তার উপর দিয়ে এক বছর অতিবাহিত হয়ে থাকে, তাহলে এর উপর পাঁচ দিরহাম যাকাত ধার্য হবে। তোমাকে সোনার উপর যাকাত দিতে হবে না, যতক্ষণ তা বিশ দীনারে না পৌছবে। যখন তোমার কাছে বিশ দীনার থাকে এবং তার উপর যদি এক বছর অতিবাহিত হয়ে থাকে, তাহলে এর উপর অর্ধ দীনার যাকাত ধার্য হবে। যদি তার পরিমাণ এর বেশী হয়, তাহলে উল্লেখিত হারে এর উপর যাকাত ধার্য হবে" (আবু দাউদ)। একদল সাহাবীর বর্ণনামতে, সোনার পরিমাণও দুই শত দিরহামের সমান হলে তার উপর নির্দিষ্ট হারে যাকাত ধার্য হবে (দারু কুতনী) (অনুবাদক)।

২. অনুচ্ছেদ ঃ যেসব জিনিসের উপর যাকাত ধার্য হয়।

٣٢٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِّنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِّنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ .

৩২৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ খেজুরে যাকাত নাই, পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রূপায় যাকাত ধার্য হবে না এবং পাঁচ যাওদের কম সংখ্যক উটে যাকাত ধার্য হবে না।[২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফাও এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেন, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। ইমাম সাহেব বলেন, কৃষি উৎপাদনের উপর উশর ধার্য হবে, উৎপাদনের পরিমাণ কম হোক অথবা বেশী, যদি জমি নদীর পানি বা বৃষ্টির পানির দ্বারা সঞ্জীবিত হয়। কিন্তু সেচের মাধ্যমে যে জমীনে পানি সরবারহ করা হয়, তার উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ-উশর ধার্য হবে। ইবরাহীম নাখাঈ ও মুজাহিদ (র)-ও এই মত পোষণ করেন।

---

২. এক ওয়াসাক 'ষাট সা'। ইমাম আবু হানীফার মতে 'এক সা' আট রোতল; ইমাম শাফিঈ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে 'সোয়া পাঁচ রোতল'। এক সা' তিন সের নয় ছটাক। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাকে ২৬ মণ ২৮ সের ৯ ছটাক। এক 'উকিয়ায় ৪০ দিরহাম, পাঁচ উকিয়া আমাদের 'সাড়ে বায়ান্ন' তোলার সমান। 'পাঁচ যাওদ ১৫ থেকে ৫০টি উট। এখানে ২৪টি উট বুঝানো হয়েছে। বুখারীতে আনাস (রা)-র সূত্রে উল্লেখিত যাকাত সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীস থেকে তা জানা যায়।

ইমাম শাফিঈ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও জমহুরের মতে, উৎপাদিত ফল ও ফসলে যাকাত ধার্য হওয়ার নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ ওয়াসাক। এর কম পরিমাণের উপর যাকাত ধার্য হবে না। বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে আবু সাঈদ, জাবের, ইবনে উমার, ইবনে হাযম প্রমুখ সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস তাদের মতের সমর্থক। অপরদিকে ইমাম আবু হানীফা ও উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর মতে উৎপাদিত ফল ও ফসলের উপর যাকাত ধার্য হবে না, উশর (উৎপাদনের এক-দশমাংশ) বা অর্ধ উশর ধার্য হবে। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলেও তার উপর উশর ধার্য হবে। কেননা বুখারীতে ইবনে উমারের সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যে জমীনকে আকাশ অথবা প্রবহমান নহর পানি দান করে অথবা যা নালার পানিতে সিক্ত হয় তার উপর উশর ধার্য হবে। আর যে জমীন সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তাতে অর্ধ উশর ধার্য হবে"। আবু দাউদে ইবনে উমার ও জাবের (রা)-র সূত্রে, মুসলিমে জাবেরের সূত্রে এবং ইবনে মাজায় মুআয (রা)-র সূত্রে বর্ণিত একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীসও এই মতের স্বপক্ষে দলীল। ইমাম আবু হানীফার মতে, স্বল্পস্থায়ী শস্য, যেমন শাকসব্জি ইত্যাদির উপর উশর ধার্য হবে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ ও অপর ইমামদের মতে, শাকসবজির মতো স্বল্পস্থায়ী শস্যের উপর যাকাত ধার্য হবে না (অনুবাদক)।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত কখন ওয়াজিব হয়।

٣٢٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لاَ تَجِبُ فِيْ مَالٍ زَكٰوةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .

৩২৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, যে মালের উপর দিয়ে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়নি তাতে যাকাত ধার্য হবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের এবং ইমাম আবু হানীফারও এই মত। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি নতুন সম্পদ অর্জন করে পূর্বেকার সম্পদের সাথে যোগ করে, তবে যাকাত দেয়ার সময় পুরাতন মালের সাথে এই নতুন মালেরও যাকাত দিতে হবে। ইবরাহীম নাখঈ ও ইমাম আবু হানীফারও এই মত।[৩]

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ধারের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের কি যাকাত দিতে হবে?

٣٢٧-اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ مَوْلٰى الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَئَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتِبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيْمٍ قَالَ قُلْتُ هَلْ فِيْهِ زَكٰوةٌ قَالَ الْقَاسِمُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ كَانَ لاَ يَاْخُذُ مِنْ مَالٍ صَدَقَةً حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ الْقَاسِمُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا اَعْطَى النَّاسَ عَطِيَّاتِهِمْ سَئَلَ الرَّجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَّالٍ قَدْ وَجَبَ فِيْهِ الزَّكٰوةُ فَاِنْ قَالَ نَعَمْ اَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكٰوةَ ذٰلِكَ الْمَالِ وَاِنْ قَالَ لاَ سَلَّمَ اِلَيْهِ عَطَائَهُ .

৩২৭। যুবাইর (রা)-র মুক্তদাস মুহাম্মাদ ইবনে উকবা (র) বলেন যে, তিনি কাসিম ইবনে মুহাম্মাদের কাছে তার মুকাতাব দাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে দাসত্বমুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে একটি মোটা অংক দেয়ার জন্য যুবাইরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলো। ইবনে উকবা বলেন, আমি বললাম, এই অংকের উপর কি যাকাত ধার্য হবে? কাসিম (র) বললেন, (আমার দাদা) আবু বাক্‌র (রা) এমন মালের যাকাত গ্রহণ করতেন না যার উপর দিয়ে এক বছর অতিবাহিত হয়নি। কাসিম (র) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) যখন লোকদের বাৎসরিক ভাতা প্রধান করতেন তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে কি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ মাল আছে? সে "হাঁ' বললে তিনি এই ভাতা থেকে ঐ মালের যাকাত কেটে রাখতেন। আর "না" বললে তিনি তার পূর্ণ ভাতা দিয়ে দিতেন।[৪]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এবং ইমাম আবু হানীফা (র) এই মত গ্রহণ করেছি।

---

৩. ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদের মতে, এই নতুন মালকে পুরাতন মালের সাথে যোগ করবে না এবং নতুন মালের উপর দিয়ে বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর যাকাত ধার্য হবে না (অনুবাদক)।

৪. হযরত আবু বাক্‌র (রা) ও উছমান (রা)-র কর্মনীতি অনুযায়ী সরকার ইচ্ছা করলে তার কর্মচারীদের বেতন-ভাতা থেকে তার সম্পদের যাকাত কেটে রাখতে পারে কর্মচারীর সম্মতি সাপেক্ষে (অনুবাদক)।

٣٢٨- عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُوْنٍ عَنْ اَبِيْهَا قَالَ كُنْتُ اِذَا قَبَضْتُ عَطَائِىْ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ سَئَلَنِىْ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَّالٍ وَجَبَ عَلَيْكَ فِيْهِ الزَّكٰوةُ فَاِنْ قُلْتُ نَعَمْ اَخَذَ مِنْ عَطَائِىْ زَكٰوةَ ذٰلِكَ الْمَالِ وَاِلاَّ دَفَعَ اِلَىَّ عَطَائِىْ .

৩২৮। কুমাদা ইবনে মাযউন-কন্যা আয়েশা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (কুদামা) বলেন, আমি যখন হযরত উছমান (রা)-র নিকট থেকে আমার ভাতা গ্রহণ করতাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে যাকাত ধার্য হওয়ার পরিমাণ মাল আছে কি? আমি যদি হাঁ বলতাম, তিনি আমার ভাতা থেকে ঐ মালের যাকাত কেটে রাখতেন। অন্যথায় তিনি আমাকে পূর্ণ ভাতা দিয়ে দিতেন।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ অলংকার সামগ্রীর যাকাত।

٣٢٩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلِىْ بَنَاتِ اَخِيْهَا يَتَامٰى حَجْرِهَا لَهُنَّ حُلِىٌّ فَلاَ تَخْرُجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكٰوةَ .

৩২৯। হযরত আয়েশা (রা) তার ভাই মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্র (রা)-র ইয়াতীম কন্যাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ করতেন। তাদের অলংকারপত্র ছিল। কিন্তু তিনি তার যাকাত দিতেন না।

٣٣٠- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّىْ بَنَاتَهُ وَجَوَارِيْهِ فَلاَ يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكٰوةَ .

৩৩০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার কন্যাদের এবং দাসীদের সোনার অলংকার বানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এর যাকাত দিতেন না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, হিরা ও মুনিমুক্তার তৈরী অলংকারের উপর কোন অবস্থায়ই যাকাত অরোপিত হবে না। কিন্তু সোনা-রূপার তৈরী অলংকারের উপর যাকাত ধার্য হবে।[৫]

---

৫. হিরা, মুনিমুক্তা বা এ জাতীয় মূল্যবান পাথর ও তার অলংকারের উপর যাকাত ধার্য হয় না। তবে তা ব্যবসায়িক পণ্য হলে এর উপর যাকাত ধার্য হবে। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে অলংকারপত্রের যাকাত দেয়া ফরয নয়। ইমাম আহমাদ বলতেন, পাঁচজন সাহাবীর মতে অলংকারের উপর যাকাত ধার্য হয় না। তারা হচ্ছেন, আনাস ইবনে মালেক (দারু কুতনী), জাবের (বায়হাকী ও শাফিঈর কিতাবুল উম্ম), আসমাআ (দারু কুতনী), আয়েশা ও ইবনে উমার (রা)। কিন্তু হানাফী মাযহাবমতে, অলংকারের উপর যাকাত ধার্য হবে। হযরত উমার, ইবনে উমার, আবু মূসা, ইবনে জুবায়ের (রা), আতা, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, তাউস, ইবনে সীরীন, মুজাহিদ, দাহ্হাক, জাবের ইবনে ইয়াযীদ, আলকামা, আসওয়াদ, উমার ইবনে আবদুল আযীয, সুফিয়ান সাওরী ও যুহরী (র)-এর এই মত। আয়েশা, উম্মে সালামা ও ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা)-রও এই মত (আইনী)। আয়েশা (রা) যে তার ভ্রাতুষ্পুত্রীদের অলংকারের যাকাত দিতেন না তার কারণ ছিলো, শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মালে যাকাত ধার্য হয় না। ইবনে উমার (রা)-র কন্যাও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল। তার মতে দাস-দাসীর উপর যাকাত ফরয নয় (অনুবাদক)।

তবে ইয়াতীম বালক-বালিকাদের অলংকারের উপর তার বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ধার্য হবে না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ উশর (ফসলের যাকাত)।

٣٣١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ كَانَ يَاْخُذُ مِنَ النَّبَطِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيْدُ اَنْ يُكْثِرَ الْحَمْلُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَيَاْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ .

৩৩১। ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) দূরবর্তী এলাকার জমীনে উৎপাদিত গম ও যাইতূনের অর্ধ-উশর (উৎপন্ন শস্যের বিশ ভাগের এক ভাগ) আদায় করতেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো (দূরবর্তী এলাকার লোকদের উৎসাহিত করা এবং) মদীনায় শস্যের আমদানী বৃদ্ধি করা। এছাড়া তিনি আর সব শস্যের উপর উশর (এক-দশমাংশ) ধার্য করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যিম্মীদের (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) পণ্যদ্রব্য, তা গম হোক বা অন্য কোন শস্য, তার উপর বছরে একবার অর্ধ-উশর ধার্য হবে।[৬] কোন হরবী (শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিক) যখন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে এসে যায়, তার সর্বপ্রকার (ব্যবসায়িক) শস্যের উপর উশর ধার্য হবে। হযরত উমার (রা) যখন যিয়াদ ইবনে হুদাইর এবং আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে উশর আদায় করার জন্য কূফা ও বসরায় পাঠান, তখন তাদের এই নির্দেশই দিয়েছিলেন। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ জিয্য়ার বর্ণনা।

٣٣٢- عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَخَذَ مِنْ مَجُوْسِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ وَاَنَّ عُمَرَ اَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ فَارِسَ وَاَخَذَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنَ الْبَرْبَرِ .

৩৩২। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বাহরাইনের মজুসীদের (অগ্নি উপাসক) নিকট থেকে জিয্য়া আদায় করেছেন। অনুরূপভাবে উমার (রা) পারস্যের (ইরান) মজুসীদের কাছ থেকে এবং উছমান ইবনে আফফান (রা) বারবারদের (পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসী) নিকট থেকে জিয্য়া আদায় করেছেন।

---

৬. ইবনে আবু লায়লা, শাফিঈ, সুফিয়ান সাওরী এবং আবু উবায়েদ (র) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালেক (র) বলেছেন, যিম্মীরা যদি নিজেদের এলাকার বাইরে ব্যবসা করে, তবে তাদের কাছ থেকে উশর আদায় করতে হবে। হানাফী মাযহাবের মতঃ ইবনে সীরীন বলেন, আনাস (রা) আমাকে আইলা এলাকায় পাঠানোর সময় হযরত উমার (রা)-র একটি পত্র খুলে দেখান ঃ "মুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম, যিম্মীদের কাছ থেকে প্রতি বিশ দিরহামে এক দিরহাম এবং হরবীদের থেকে প্রতি দশ দিরহামে এক দিরহাম আদায় করতে হবে" (মুসনাদে আবদুর রায্যাক)। আবুল হাসান কুদূরী (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত উমার (রা) উশর আদায়কারীদের নিয়োগ করে বলেছেন, মুসলমানদের কাছ থেকে এক-চতুর্থাংশ উশর, যিম্মীদের কাছ থেকে অর্ধ উশর এবং হরবীদের কাছ থেকে পূর্ণ উশর আদায় করো" (শারহু মুখতাসারিল কারখী) (অনুবাদক)।

٣٣٣-عَنْ اَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى اَهْلِ الْوَرَقِ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا وَعَلَى اَهْلِ الذَّهَبِ اَرْبَعَةَ دَنَانِيْرَ وَمَعَ ذٰلِكَ اَرْزَاقُ الْمُسْلِمِيْنَ وَضِيَافَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ .

৩৩৩। হযরত উমার (রা) রূপার মালিকদের উপর চল্লিশ দিরহাম এবং সোনার মালিকদের উপর চার দীনার বাৎসরিক জিয্য়া ধার্য করতেন। এর সাথে তিনি মুসলমানদের (পরিব্রাজকদের) খাদ্যের ব্যবস্থা ও তিন দিনের মেহমানদারি করারও নির্দেশ দিতেন।

٣٣٤- اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُؤْتٰى بِنَعَمٍ كَثِيْرَةٍ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ قَالَ مَالِكٌ اُرَاهُ تُؤْخَذُ مِنْ اَهْلِ الْجِزْيَةِ فِىْ جِزْيَتِهِمْ .

৩৩৪। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার (রা)-র কাছে জিয্য়ার খাত থেকে অসংখ্য উট আসতো। ইমাম মালেক (র) বলেন, আমার মনে হয় জিয্য়া প্রদানকারীদের কাছ থেকে জিয্য়া বাবদ এই উট আদায় করা হতো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মজূসীদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায় করা সুন্নাত। কিন্তু তাদের স্ত্রীলোকদের বিবাহ করা যাবে না এবং তাদের যবেহকৃত পশুর গোশতও খাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে আমরা এই নির্দেশই পেয়েছি। হযরত উমার (রা) কুফার দরিদ্র লোকদের উপর বারো দিরহাম, মধ্যবিত্তদের উপর চব্বিশ দিরহাম এবং ধনীদের উপর আটচল্লিশ দিরহাম জিয্য়া ধার্য করেছিলেন। ইমাম মালেক (র) যে উটের কথা বলেছেন, আমাদের জানামতে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জিয্য়া বাবদ তা আদায় করতেন না, বরং একবার তিনি তাগলিব গোত্রের উপর চুক্তি মোতাবেক তাদের দেয় করের পরিমাণ দ্বিগুণ করেন। তিনি এটাকে তাদের জিয্য়ায় রূপান্তরিত করেন এবং উট, গরু ও মেষ-বকরীর আকারে গ্রহণ করেন।[৭]

৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়া, গোলাম এবং ইরানী ও তুর্কী প্রজাতির ঘোড়ার যাকাত।

٣٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَئَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِيْنَ فَقَالَ اَوَفِى الْخَيْلِ صَدَقَةٌ .

৩৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে তুর্কী ঘোড়ার যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, ঘোড়ার উপরও কি যাকাত ধার্য হয়?

---

৭. জিয্য়া সাধারণত অমুসলিম নাগরিকদের উপর ধার্য করা হয়। ইসলামী সরকার ও মুসলিম নাগরিকগণ রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে তুলে নেয়। তাছাড়া তাদেরকে যুদ্ধে যোগদানের বাধ্যবাধকতা থেকেও মুক্ত রাখা হয়। এর বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায় করা হয়। কিন্তু তারা মুসলিম সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ করলে তাদের জিয্য়া মওকুফ হয়ে যায়। ইমাম আবু ইউসুফ (র) তার কিতাবুল খারাজে লিখেছেন, সমস্ত মুশরিক, মজূসী, মূর্তিপূজক, অগ্নি উপাসক, পাথর পূজক ও সায়েবদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায় করতে হবে (অনুবাদক)।

٣٣٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهٖ وَلَا فِىْ فَرَسِهٖ صَدَقَةٌ .

৩৩৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমানদের গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। যে কোন প্রকারের ঘোড়ার উপর, তা ভারবাহী হোক অথবা মুক্ত, যাকাত ধার্য হবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে ঘোড়াকে যদি বংশবৃদ্ধির জন্য ছেড়ে দেয়া হয়, তবে এর উপর যাকাত ধার্য হবে। তা ঘোড়া প্রতি এক দীনারও দেয়া যেতে পারে অথবা ঘোড়ার মূল্য অনুমান করে প্রতি দুইশো দিরহামে পাঁচ দিরহামও দেয়া যেতে পারে। ইবরাহীম নাখঈরও এই মত।

٣٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنْ لَّا يَاْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ وَلَا الْعَسَلِ صَدَقَةً .

৩৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) তাকে লিখে পাঠানঃ ঘোড়া ও মধুর উপর যাকাত আরোপ করা হবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ঘোড়ার যাকাত সম্পর্কে সেই একই হুকুম যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর মধুর পরিমাণ পাঁচ ফারাক (এক মন ১৩ সের ৭ ছকাট)-এর বেশী হলেই তার উপর উশর ধার্য হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে, মধুর পরিমাণ কম বা বেশী যাই হোক তার উপর উশর ধার্য হবে। আমরা জানতে পেরেছি যে, নবী ﷺ মধুর উপর উশর ধার্য করেছেন।

٣٣٨- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ اَهْلَ الشَّامِ قَالُوْا لِاَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيْقِنَا صَدَقَةً فَاَبٰى ثُمَّ كَتَبَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ اِنْ اَحَبُّوْا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَعْنِىْ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ وَارْزُقْ رَقِيْقَهُمْ .

৩৩৮। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। সিরিয়ার অধিবাসীরা আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে বললো, 'আমাদের গোলাম ও ঘোড়ার যাকাত নিন'। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তিনি এ সম্পর্কে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে লিখলেন। উমার (রা) তাকে লিখে পাঠান, "তারা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তোমাকে এর যাকাত দিলে তুমি তা গ্রহণ করো। অতঃপর তা তাদের গোলাম ও গরীব লোকদের মধ্যে বন্টন করে দাও"।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মূলনীতি হচ্ছে পূর্ববৎ। মুসলমানদের ঘোড়া ও গোলামের উপর সদকায় ফিতর (গোলামদের ক্ষেত্রে) ছাড়া কোনরূপ যাকাত ধার্য হবে না।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ ভূগর্ভে প্রোথিত দ্রব্যের যাকাত।

٣٣٩- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِىِّ مَعَادِنَ مِنْ مَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ وَهِىَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ اِلَى الْيَوْمِ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا اِلاَّ الزَّكٰوةُ .

৩৩৯। তাবীঈ রবীআ ইবনে আবু আবদুর রহমান (র) থেকে একাধিক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবালিয়া নামক স্থানের একটি খনি বিলাল ইবনুল হারিছ আল-মুযানীকে জায়গীররূপে দান করেছিলেন। তা আল-ফুরআ নামক এলাকার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। ঐসব খনি থেকে তখন পর্যন্ত যাকাত ছাড়া অন্য কিছু আদায় করা হয়নি (অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা হয়)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, নিম্নোক্ত হাদীসটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الرِّكَازُ قَالَ الْمَالُ الَّذِىْ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْاَرْضِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ هٰذِهِ الْمَعَادِنِ فَفِيْهَا الْخُمُسُ (اَخْرَجَهُ الْاَئِمَّةُ السِّتَّةِ وَغَيْرُهُمْ) .

"নবী ﷺ বলেন ঃ খনিজ দ্রব্যের উপর খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) ধার্য হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'রিকায' কি?[৮] তিনি বলেনঃ সেই সম্পদ যা আল্লাহ তাআলা আসমান-জমীন সৃষ্টির দিন ভূগর্ভস্থ খনির মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছেন। এর এক-পঞ্চমাংশ যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে"।

ইমাম আবু হানীফা (র) ও সাধারণ ফিক্‌হবিদদেরও এই মত।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত।

٣٤٠-عَنْ طَاؤُسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اِلَى الْيَمَنِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً فَاُتِىَ بِمَا دُوْنَ ذٰلِكَ فَاَبٰى

---

৮. হানাফী ফিক্‌হবিদদের মতে 'রিকায' হলো ভূগর্ভে প্রাপ্ত সম্পদ। তা খনিতে হোক বা প্রোথিত সম্পদ হিসাবে পাওয়া যাক। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও অন্যদের মতে রিকায হলো জাহিলী যুগে জমীনের অভ্যন্তরে প্রোথিত সম্পদ। আর 'কানূয' হলো জমীনের অভ্যন্তরে খনিজ সম্পদ যা সাধারণভাবে সঞ্চিত সম্পদ হিসাবে গণ্য (অনুবাদক)।

أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذٌ .

৩৪০। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামনে পাঠান। তিনি গরুর যাকাত সম্পর্কে তাকে নির্দেশ দিলেন ঃ "প্রতি তিরিশটি গরুতে এক বছর বয়সের একটি বাছুর এবং প্রতি চল্লিশটি গরুতে দুই বছর বয়সের একটি বাছুর যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে"। অতঃপর তাকে তিরিশের কম সংখ্যক গরুর যাকাত দেয়া হলে, তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে এ সম্পর্কে কিছু শুনিনি। আমি তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে এ সম্পর্কিত নির্দেশ জেনে নিবো। (রাবী বলেন) মুআয (রা) ফিরে আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। তিরিশের কম সংখ্যক গরুর উপর যাকাত ধার্য হবে না। তিরিশ থেকে উনচল্লিশ সংখ্যক পর্যন্ত গরুর উপর এক বছরের একটি এড়ে বাছুর বা বকনা বাছুর যাকাত ধার্য হবে। গরুর সংখ্যা যখন চল্লিশে পৌঁছে যাবে, তখন দুই বছরের একটি এড়ে বাছুর বা বকনা বাছুর তার যাকাত হিসাবে ধার্য হবে।[৯] ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সাধারণ ফিক্‌হবিদদেরও এই মত।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ কান্‌য বা যে সম্পদের যাকাত পরিশোধ করা হয় না।

٣٤١- حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْكَنْزِ فَقَالَ هُوَ الْمَالُ الَّذِيْ لاَ تُؤَدَّى زَكٰتُهُ.

৩৪১। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা)-কে কান্‌য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, যে মালের যাকাত পরিশোধ করতে হয় না তাকে কান্‌য বলে।

٣٤٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتّٰى يُمْكِنَهُ فَيَقُوْلُ أَنَا كَنْزُكَ .

৩৪২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যার ধন-সম্পদ আছে অথচ সে তার যাকাত পরিশোধ করে না, তার সেই সম্পদকে কিয়ামতের দিন মাথায় টাকবিশিষ্ট অজগর সাপে পরিণত করা হবে। এর দুই চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। তা তার দিকে ধাবিত হবে এবং তার নাগালে পৌঁছে বলবে, আমি তোমার সেই সম্পদ, যার যাকাত আদায় করোনি।

---

৯. কৃষিকাজে ব্যবহৃত গরুর উপর যাকাত ধার্য হয় না। মহিষ গরুর পর্যায়ভুক্ত। এর যাকাত ও গরুর যাকাতের নিয়মে দিতে হবে (অনুবাদক)।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ যাদের জন্য যাকাতের মাল গ্রহণ করা জায়েয।

٣٤٣- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ اِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا اَوْ لِغَارِمٍ اَوْ لِرَجُلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ اَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِّسْكِيْنٌ تُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَاَهْدٰى اِلَى الْغَنِىِّ .

৩৪৩। আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাতের মাল খাওয়া জায়েয নয়। কিন্তু পাঁচ ব্যক্তির জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয (তারা ধনী হলেও) ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তি, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নিজের সম্পদের বিনিময়ে যাকাতের মাল কিনে নিবে এবং কোন ব্যক্তির মিসকীন প্রতিবেশীকে যাকাত দেয়া হলো এবং সে তা তার ধনী প্রতিবেশীকে উপঢৌকন হিসাবে দান করলো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করি। আল্লাহ্‌র পথের সৈনিক যদি যাকাতের মুখাপেক্ষী হয়ে না পড়ে তার জন্য যাকাতের মাল গ্রহণ না করাই উত্তম। অনুরূপভাবে কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে যদি ঋণ পরিশোধ করার পরও নিসাব পরিমাণ মাল থেকে যাওয়ার মতো সম্পদ থাকে, তবে তার জন্যও যাকাতের মাল গ্রহণ করা ভালো নয়। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ রোযার ফিতরা সম্পর্কে।

٣٤٤- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ اِلَى الَّذِىْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ اَوْ ثَلٰثَةٍ .

৩৪৪। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) ঈদের দুই-তিন দিন আগেই রোযার ফিতরা যার কাছে স্তূপীকৃত হয় তার নিকট পাঠিয়ে দিতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরাও এই মত গ্রহণ করেছি। ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বেই ফিতরা আদায় করা অতি উত্তম কাজ। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।[১০]

---

১০. মুসলমানগণ চরম ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে রমযান মাসের রোযা রেখে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করে। দীর্ঘ একমাস ধরে তারা রোযা রাখতে পেরেছে, আল্লাহ তাদেরকে যে রোযা রাখার যোগ্যতা দান করেছেন তার শুকরিয়া স্বরূপ তারা রোযার শেষে ঈদের দিন বিশেষভাবে দান-খয়রাত করে থাকে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলও এদিন দান-খয়রাত বাধ্যতামূলক করেছেন। পরিভাষাগতভাবে একে বলা হয় সদাকাতুল ফিত্‌র বা ফিতরা। হাদীস শরীফে ফিতরার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতরা অবশ্যই আদায়যোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন রোযাদারকে অযথা, অবাঞ্ছনীয় ও অশ্লীল কথাবার্তা ও কাজকর্মের মলিনতা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং

গরীব-মিসকীনদের (অন্তত ঈদের দিন) খাদ্যের সংস্থান করার জন্য তিনি ফিতরার প্রবর্তন করেছেন" (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার সময়

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঈদের ফজর (ভোর) শুরু হওয়ার সাথে সাথে ফিতরা ওয়াজিব হয়, তার পূর্বে নয়। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-র মতে শেষ রোযার দিনের সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে ওয়াজিব হয়। ইমাম মালেক (র) ও শাফিঈ (র)-এর দু'টি মত রয়েছে যা উপরোল্লিখিত দু'টি মতের সমর্থন করে। ইমাম মালেক ও আহ্মাদের মতে ঈদের একদিন অথবা দু'দিন পূর্বে ফিতরা আদায় করা যেতে পারে। ইমাম শাফিঈর মতে রমযান মাসের প্রথম দিক থেকেই ফিতরা দেয়া জায়েয। ইমাম আবু হানীফার মতে তা রমযানের পূর্বেও পরিশোধ করা জায়েয এবং পরেও আদায় করা জায়েয। কিন্তু যে ব্যক্তি ফিতরা পরিশোধ করে না, তা তার উপর ঋণ হিসাবে থেকে যায়। এ ব্যাপারে ফিক্হবিদগণ একমত।

ফিতরা কার উপর ওয়াজিব

ইমাম নববী (র) বলেন, জমহুর উলামায়ে সালাফের মতে ফিতরা আদায় করা ফরয, ইমাম আবু হানীফার মতে ওয়াজিব এবং ইমাম মালেক, শাফিঈ ও দাউদ যাহেরীর মতে সুন্নাত। ইমামদের ঐক্যমত অনুযায়ী স্বাধীন মুসলমানদের উপর ফিতরা আদায় করা বাধ্যতামূলক। মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের মতে যে ব্যক্তির কাছে ঈদের দিন ও রাতের খাদ্যের অতিরিক্ত পরিমাণ সম্পদ আছে তাকেই ফিতরা আদায় করতে হবে। আবু হানীফার মতে ঈদের দিন সকালে কোন ব্যক্তির কাছে 'মালেকে নিসাব' বা যাকাত ফরয হওয়ার পরিমাণ সম্পদ থাকলেই তার উপর ফিতরা ওয়াজিব। পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে তার নিজের, তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে। কিন্তু আবু হানীফার মতে স্ত্রীর ফিতরা আদায় করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। অনুরূপভাবে সন্তানদের ফিতরা আদায় করাও মায়ের উপর বাধ্যতামূলক নয়। বাড়িতে স্থায়ী কাজের লোকদের পক্ষ থেকে নিয়োগকর্তাকে ফিতরা আদায় করতে হবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। একদল ফিক্হবিদের মতে তাকে তাদের ফিতরা আদায় করতে হবে এবং অপর দলের মতে তা তার উপর বাধ্যতামূলক নয়।

ফিতরা বণ্টনের খাত

ফিতরা পাওয়ার প্রথম হকদার হচ্ছে একান্ত নিকটাত্মীয় গরীবগণ, অতঃপর দূরাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী, মিসকীন, নও মুসলিম, ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি এবং সাময়িক আর্থিক সংকটে পতিত ব্যক্তিগণ। হকদার ব্যক্তি যদি দূরে থাকে তবে তার অংশ পৃথক করে রেখে দেয়া জায়েয। সাময়িকভাবে কোথাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানেও ফিতরা বণ্টন করা যেতে পারে। অমুসলিম গরীবদের যাকাত ও ফিতরার খাত থেকে সাহায্য করা যাবে না। তাদের ভিন্ন খাত থেকে সাহায্য করতে হবে।

ফিতরার উপকরণ

হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে জিনিসকে ফিতরা আদায়ের মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে গম, বার্লি, খেজুর, কিশমিশ ও পনির। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় মাথাপিছু এক সা' খেজুর, এক সা' পনির অথবা

এক সা' কিশমিশ ফিতরা হিসাবে আদায় করতাম" (মুসলিম)। আবদুল্লাহ ইবনে সালাবা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের প্রত্যেক স্বাধীন, ক্রীতদাস, ছোট ও বড়োর পক্ষ থেকে মাথাপিছু আধা সা' গম বা এক সা' যব (বার্লি) বা এক সা' খেজুর ফিতরা বাবদ আদায় করো" (আবু দাউদ, যাকাত, মুসনাদে আবদুর রাযযাক, দারু কুতনী, তাবারানী, মুসতাদরাক হাকেম, মুসনাদে আহমাদ)।

ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ, আহমাদ এবং জমহুর আলেমদের মতে উল্লেখিত খাদ্যদ্রব্যগুলোর যে কোন একটির মাধ্যমে ফিতরা আদায় করা জায়েয। তবে এর পরিমাণ হবে মাথা পিছু এক সা'। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে গম বা আটার ক্ষেত্রে এর পরিমাণ অর্ধ সা' হতে পারে। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের মতে কেবল উল্লেখিত খাদ্যবস্তুগুলোর মাধ্যমেই ফিতরা আদায় করতে হবে। এর মূল্য ফিতরা হিসাবে দান করা জায়েয নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে উল্লেখিত বস্তুগুলোর মূল্যও ফিতরা হিসাবে আদায় করা জায়েয। ইমাম মালেক ও আহমাদের মতে ঐ পাঁচটি দ্রব্যের মধ্যে খেজুর দিয়ে ফিতরা আদায় করা সর্বোত্তম, অতঃপর কিশমিশ। ইমাম শাফিঈর মতে গম বা আটার মাধ্যমে এবং ইমাম আবু হানীফার মতে উল্লেখিত পাঁচটি বস্তুর মধ্যে যেটির বাজারদর সর্বাধিক তা দিয়ে ফিতরা আদায় করা সর্বোত্তম। ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদের মতে আটা বা ছাতু দিয়েও ফিতরা আদায় করা জায়েয। কিন্তু অপর দুই ইমামের মতে তা জায়েয নয়।

আমাদের দেশে সাধারণত গম বা আটাকে 'মান' ধরে ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। গম বা আটা অথবা এর মূল্য অথবা মূল্যের সম-পরিমাণ চাল দিয়ে ফিতরা আদায় করা যেতে পারে। চাল যেহেতু এখানকার প্রধান খাদ্যশস্য, তাই বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এর মাধ্যমে ফিতরা আদায় করা জায়েয বলেছেন।

সা' (صاع)-এর পরিমাণ।

সা'-এর পরিমাণ নির্ধারণে ইমামদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আবু হানীফার মতে এক সা' ইরাকের আট রোতলের সমান, কিন্তু ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের মতে হিজাযী সোয়া পাঁচ রোতলের সমান। আমাদের দেশী ওজনে এক রোতল প্রায় আধা সেরের সমান, এক হিজাযী সা' প্রায় পৌনে তিন সেরের সমান এবং এক ইরাকী সা' পৌনে চার সেরের সমান। অতএব খেজুর, কিশমিশ, বার্লি, পনির অথবা গমের মাধ্যমে ফিতরা দিতে হলে আমাদের দেশী ওজনে (মাথাপিছু) প্রতিটির পরিমাণ হবে প্রায় পৌনে তিন সের অথবা পৌনে চার সের। আর অর্ধ-সা' ধরা হলে তার পরিমাণ হবে এক সের সাড়ে বারো ছটাক অথবা ছয় ছটাক। ফিতরা প্রদানকারীগণ উল্লেখিত পাঁচটি দ্রব্যের যে কোন একটি অথবা তার মূল্য দিয়ে ফিতরা আদায় করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তারা হিজযী সা' অথবা ইরাকী সা' এর যে কোন একটি পরিমাণ অনুসরণ করার ব্যাপারেও স্বাধীন।

সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ ধনী-গরীব সবাইকে ফিতরা আদায় করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ "তোমরা ফিতরা দিও। আল্লাহ তোমাদের অনেক গুণ বেশী ফেরত দিবেন"। আমাদের সমাজে সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই (অর্থের মাধ্যমে) ফিতরা আদায় করার ক্ষেত্রে গমকেই 'মান' হিসাবে অনুসরণ করে। এর ফলে ধনী-গরীব সবার মাথাপিছু ফিতরা একই সমান হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা যাকে যতোটুকু আর্থিক সচ্ছলতা দান করেছেন তার সেই অনুযায়ী ব্যয় করা উচিত। যে পাঁচটি জিনিসকে ফিতরার উপকরণ হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, আমাদের বাজারে এগুলোর মূল্যের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। যেমন (১৩ রমযান

১৪০৫ হি./মে ১৯৮৫ খৃ.) বাজারে খেজুরের দর (সের প্রতি) ৩৫.০০, খোরমা ৫০.০০,কিশমিশ ১০০.০০, বার্লি ১৮.০০ এবং গম ৫.০০ টাকা। তাহলে মাথাপিছু ফিতরার পরিমাণ দাঁড়ায় (টাকার অংকে) ঃ

	(হিজাযী পরিমাপ অনুযায়ী)		(ইরাকী পরিমাপ অনুযায়ী)	
খেজুর	(এক সা)	৯৬.২০	(এক সা)	১৩১.২৫
খোরমা		১৩৭.৫০		১৮৭.৫০
কিশমিশ		২৭৫.০০		৩৭৫.০০
বার্লি		৪৯.৫০		৬৭.৫০
পনির		১১০.০০		১৫০.০০
গম		১৩.৭৫		১৮.৭৫

গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা হিসাবে মাথাপিছু ফিতরার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে টা ৬.৯০ (হিজাযী ওজন) অথবা ৯.৪০ (ইরাকী ওজন)। আমাদের দেশে ফিতরার ক্ষেত্রে সাধারণত ইরাকী ওজন অনুসরণ করা হয়। অতএব ধনবান ব্যক্তিদের সর্বাধিক মূল্যবান দ্রব্যটি দিয়ে ফিতরা দেয়া উচিৎ।

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

একদল লোক ধারণা করে থাকে যে, গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্ধারণ করেননি, বরং আমীর মুআবিয়া (রা) তার রাজত্বকালে এর প্রবর্তন করেন। একথা ঠিক নয়। বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেই গম সম্পর্কে দুই ধরনের (অর্ধ সা' এবং এক সা') বক্তব্য সম্বলিত হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। একটি হাদীস আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। হাসান বসরী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) রমযানের শেষদিকে বসরার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, তোমরা রোযার ফিতরা পরিশোধ করো।.....রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোট-বড়ো, স্ত্রী-পুরুষ এবং স্বাধীন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সদাকাতুল ফিত্‌র এক সা' খোরমা অথবা এক সা' বার্লি অথবা অর্ধ সা' গম নির্ধারণ করেছেন" (আবু দাউদ)। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, নবী ﷺ এই সদাকা (ফিতরা) এক সা' বার্লি অথবা এক সা' খোরমা অথবা অর্ধ সা' গম নির্ধারণ করেছেন (মুসনাদে আহমাদ, ফাতহুর রব্বানী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪১ থেকে গৃহীত)। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে গমের অর্ধ সা' সম্পর্কিত আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছে (ফাতহুর রব্বানী, ৯খ, ১৪৪)। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মারফূ সূত্রে অনেক হাদীস এসেছে যাতে অর্ধ সা' গমের মাধ্যমে ফিতরা আদায় করার উল্লেখ রয়েছে। যারা অর্ধ সা গমের মাধ্যমে ফিতরা আদায় করার সুযোগকে অস্বীকার করেন, এসব হাদীস তাদের কাছে পৌছেনি (ফাতহুর রব্বানী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪০)।

মহানবী ﷺ -এর যে সকল সাহাবী অর্ধ সা' গমের মাধ্যমে ফিতরা আদায়ের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন তারা হচ্ছেন ঃ আবু বাক্‌র সিদ্দীক, উমার ফারূক, উছমান ইবনে আফ্‌ফান, আলী ইবনে আবু তালিব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুআবিয়া এবং আসমা বিনতে আবু বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাবিঈদের মধ্যে রয়েছেন ঃ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, উমার ইবনে আবদুল আযীয, তাউস, ইবরাহীম নাখঈ, আলকামা, আসওয়াদ, উরওয়া, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান, আবদুল মালেক ইবনে মুহাম্মাদ, আবদুর রহমান আল-আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আবদুল্লাহ ইবনে শাইবান এবং মুসআব ইবনে সাদ (রহিমাহুমুল্লাহ) (অনুবাদক)।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ যাইতূনের যাকাত।[১১]

٣٤٥- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ صَدَقَةُ الزَّيْتُوْنِ الْعُشْرُ .

৩৪৫। ইবনে শিহাব (র) বলেন, যাইতূনের যাকাত হচ্ছে এক-দশমাংশ।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। যখন তার পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক বা তার বেশী হবে তখন এর উপর উশর ধার্য হবে। যাইতূনের তেলের পরিবর্তে ফলের অনুমানে উশর ধার্য করা উত্তম। আর ইমাম আবু হানীফার মতে যাইতূন পরিমাণে কম হোক বা বেশী হোক, তার উপর উশর ধার্য হবে।

---

১১. যাকাত (زكوة) ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভ। পবিত্র কুরআনের ছাব্বিশ জায়গায় নামাযের সাথে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। যাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শরীআতের নির্দেশ ও নির্ধারণ অনুযায়ী নিজ সম্পদের একটি অংশের স্বত্বাধিকার কোন অভাবীকে অর্পণ করা এবং এর উপকারিতা থেকে নিজকে বঞ্চিত করা'। যাকাত আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় হিজরী সনে ফরয হয় এবং এর হার রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যাকাতের বৈধতা অস্বীকারকারী মুরতাদ অথবা কাফের সাব্যস্ত হবে। এজন্যই প্রথম খলীফা হযরত আবু বাক্র (রা) ইয়ামামার যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। সূরা তওবা-র ৬০ নম্বর আয়াতে যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ .

"সদাকাসমূহ (যাকাত) কেবল অভাবীদের জন্য, মিসকীনদের জন্য, যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, (নও-মুসলিম অথবা অন্যদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাদের) মনোতুষ্টির জন্য, দাসত্ব মোচনের জন্য, ঋণমুক্ত করার জন্য, আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং (সাময়িকভাবে অভাবে পতিত) মুসাফিরদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষে থেকে নির্ধারিত" (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ৫

كِتَابُ الصَّوْمِ

(রোযার বিবরণ)

১. অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখে রোযা শুরু করা এবং চাঁদ দেখে তা সমাপ্ত করা।

٣٤٦– عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ .

৩৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের উল্লেখ করে বলেনঃ তোমরা রমযানের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রেখো না এবং চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা শেষ করো না। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে মাসের তিরিশ দিন হিসাব করো।[১]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

২. অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ সময় পানাহার হারাম হয়?

٣٤٧– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِلاَلاً يُّنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

৩৪৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। অতএব তোমরা পানাহার করতে থাকো যে পর্যন্ত ইবনে উম্মে মাকতূম আযান না দেয়।

---

১. শাবান মাসের ২৯ তারিখে চাঁদ না দেখা গেলে পরের দিন থেকে রোযা শুরু করবে না, বরং ঐ মাসের তিরিশ দিন পূর্ণ করবে। আবার রমযান মাসের ২৯ তারিখে চাঁদ না দেখা গেলে পরের দিন ঈদ করবে না, বরং ৩০টি রোযা পূর্ণ করবে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাঁদ খোঁজার কোন প্রয়োজন নেই। মেঘের কারণে চাঁদ দেখা সম্ভব না হলে মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করবে। তবে নিকটবর্তী কোন এলাকায় চাঁদ দেখার খবর পেলে রোযা শুরু করবে বা ঈদ করবে। প্রাকৃতিক কারণে যদি চাঁদ দেখা সম্ভব না হয় এবং পরে প্রমাণিত হয় যে, একটি রোযা সরে গেছে, তবে পরে তা রেখে নিবে। আল্লাহ তাআলা ৩০টি রোযা ফরয করেননি, বরং এক মাসের রোযা ফরয করেছেন। অতএব চান্দ্রমাস তিরিশ দিনেও হতে পারে আবার উনত্রিশ দিনেও হতে পারে। যদি শাওয়াল মাস এবং রমযান মাসের তিরিশ দিন পূর্ণ হয়ে যায়, তবে রোযা শুরু করতে বা ঈদ করতে চাঁদ দেখার প্রয়োজন নেই। কতক মনীষী এই হাদীসের শেষাংশের ভিত্তিতে পঞ্জীকার হিসাবের উপর নির্ভর করে রোযা রাখা এবং ঈদ করা বৈধ বলেছেন (অনুবাদক)।

٣٤٨- حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ مِثْلَهُ قَالَ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ قَدْ أَصْبَحْتَ .

৩৪৮। যুহরী (র)-ও সালেমের সূত্রে (আবদুল্লাহ ইবনে উমারের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)-কে যতোক্ষণ না বলা হতো, "ভোর হয়েছে", ততোক্ষণ তিনি আযান দিতেন না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বিলাল (রা) রমযান মাসে লোকদের সাহরী খেতে উঠানোর জন্য রাত থাকতে আযান দিতেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পর ফজরের নামাযের জন্য আযান দিতেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে থাকো"।[২]

---

২. রমযানের রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে লোকদের মধ্যে ভোররাতে পানাহারের কোন প্রচলন ছিলো না। রোযা শুরু হওয়ার মুহূর্ত সম্পর্কেও তাদের পরিষ্কার ধারণা ছিলো না। কেউ মনে করতো, এশার নামাযের পর থেকেই পরবর্তী দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কেউ মনে করতো, যতোক্ষণ সজাগ থাকা যায় ততোক্ষণ পানাহার নিষিদ্ধ হয় না, কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠার পর আর পানাহার করা যাবে না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করে সাহরী বা পানাহারের সর্বশেষ সময়সীমা নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন ঃ

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ .

"রাতের কালো (অন্ধকার) রেখার বুক চিরে ভোরের শুভ্র রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠা পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)।

ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বলসহ জমহূর আলেমদের মতে সুবহে সাদেক শুরু হওয়ার মুহূর্তই হচ্ছে পানাহার হারাম হওয়ার এবং রোযা শুরু হওয়ার সীমা। অপর একদল আলেম মনে করেন, প্রভাতের শুভ্র আলো পূর্ব দিগন্তে বিস্তৃত হওয়া পর্যন্ত সাহরী খাওয়া জায়েয। তৃতীয় একদল আলেমের মতে প্রভাত-লালিমা পূর্ব দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত সাহরী খাওয়া জায়েয। বস্তুত সাহাবা ও তাবিঈদের যুগ থেকে পানাহারের সর্বশেষ সময়সীমা নিয়ে মতভেদ চলে আসছে। এখানে কয়েকজন ইমামের অভিমত উল্লেখ করা হলো ঃ

আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র) বলেন, প্রকৃতপক্ষে এই বিরোধের মূল হচ্ছে কুরআন মজীদের 'তবায়্যানা' শব্দ। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম এর অর্থ করেছেন, পরিপূর্ণ স্পষ্টতা, অপর দল এর অর্থ করেছেন, শুধু স্পষ্ট হওয়া (ফয়যুল বারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫)। তিনি আরো বলেন, তাবায়্যানা শব্দ কি ভোরের পূর্ণাংগ শুভ্রতা বুঝায় না শুধু ফজর উদয় হওয়া বুঝায়? যারা প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন তারা ফজরের পরও সাহ্‌রী খাওয়া জায়েয মনে করেন। যেমন কাযীখান গ্রন্থে আছে, "ভুলে যাওয়া (ঘুমে বিভোর) ব্যক্তি যদি ফজরের পর আহার গ্রহণ করে তবে তার রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে"। কিন্তু বেশীরভাগ লোক দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে ফজরের পর আহার করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে (ঐ, ২খ, পৃ. ১৫৭)। তিনি আরো বলেন, ইমাম তাহাবী (র) দাবি করে বলেন যে, ফজর উদয় হওয়ার পরও সাহ্‌রী খাওয়া জায়েয। বুখারীর অন্যতম ব্যাখ্যাকার দাউদ মালিকীও এই মত পোষণ করেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) এই মতের জোরালো সমর্থন করেছেন এবং আবু বাক্‌র (রা) থেকে দলীল পেশ করেছেন। কেননা তিনি ফজরের পর সাহরী খেয়েছেন। হুযায়ফা

(রা) থেকেও অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে (১৬৯৫ নং হাদীস)। একাদিক্রমে বিভিন্ন ফিক্হ গ্রন্থে ফজর উদয় হওয়ার পর সাহরী খাওয়া জায়েয বলে বর্ণিত আছে। তবে এ সময় পানাহার না করাই অধিক সতর্কতামূলক কাজ (ঐ, পৃ. ১৭৪)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "তোমরা পানাহার করো, দিগন্তে প্রসারিত শুভ্র আলোকরশ্মি যেন তোমাদেরকে পানাহার থেকে বিরত না রাখে। তোমরা পানাহার করো যতোক্ষণ পর্যন্ত প্রভাত লালিমা তোমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে না উঠে" (তিরমিযী, হাদীস নং ৬৫৫)। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম তিরমিযী লিখেছেন, প্রভাত লালিমা (পূর্ব দিগন্তে) ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয় না। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেম এই মত ব্যক্ত করেছেন (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮)। ফয়যুল বারীর টীকায় লেখা আছে, ইমাম তিরমিযী সংকলিত একটি হাদীস প্রভাত-লালিমা উদয় হওয়া পর্যন্ত রোযাদারের জন্য পানাহার জায়েয প্রমাণিত করে। আর প্রভাত-লালিমা (আহ্মার) ফজরের (সুব্হে সাদেক) পরই দেখা দেয় (৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭)। ইমাম ইবনে হাজারের আলোচনা তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে, ১১০ নং পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা শাব্বীর আহ্মাদ উছমানী লিখিত ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে, ১২০ নং পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে।

আল্লামা মোল্লা আলী কারী বলেন, জমহূরের মতে ফজরের সূচনা বিন্দুই (রোযা শুরু হওয়ার) নির্ভরযোগ্য সময়। অপর এক দলের মতে ভোরের আলো ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য সময়। এই শেষোক্ত মতটি হযরত উছমান (রা), হুযায়ফা (রা), তলক ইবনে আলী (রা), আতা ইবনে আবু রাবাহ ও আমাশ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে (শারহু নিকায়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮)। আল্লামা ইবনে রুশদ মালেকী লিখেছেন, 'জমহূরের মতে সাহ্রীর সর্বশেষ সময়সীমা হচ্ছে সুবহে সাদেকের সূচনা বিন্দু। আর তা হচ্ছে (পূর্ব) দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া শুভ্র আলোকচ্ছটা। আলেমদের একটি ক্ষুদ্র দলের মতে, শুভ্র আলোকচ্ছটার পর যে রংগিন আভা উদিত হয় তা-ই হচ্ছে সাহ্রীর সর্বশেষ সীমা। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও হুযায়ফা (রা) থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে (বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮—৮৯)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "তোমাদের কেউ যদি সাহরীর পাত্র তার হাতে (আহাররত) থাকা অবস্থায় আযান শুনতে পায়, তবে সে যেন পাত্র রেখে না দেয়, বরং তা থেকে প্রয়োজনমত খেয়ে নেয়" (আবু দাউদ, কিতাবুস সিয়াম, বাব আর-রাজুল ইয়াসমাউন-নিদা ওয়াল-ইনাউ আলা ইয়াদিহী)। এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (র) লিখেছেন, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া সাহেব তার শায়খ মাওলানা রশীদ আহ্মাদ গাংগুহী (র)-এর একটি বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, উল্লেখিত হাদীস এবং "হাত্তা ইয়াতাবায়্যানা....." আয়াতের ভিত্তিতে একদল আলেম বলেছেন, তাবায়্যানা শব্দের অর্থ "ভোরের শুভ্রতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া, কেবল ফজর উদয় হওয়াই নয়"। শরীআতী আইনের সহজতা বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণ লোকদের অবস্থা বিবেচনা করলে এই মত গ্রহণ করাই উত্তম। কেননা ফজরের ঠিক প্রারম্ভ নির্ধারণে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী লোকেরাও অপারগ, সাধারণ মানুষের তো প্রশ্নই উঠে না। অতএব ফজরের ওয়াক্তের সূচনা বিন্দুর সাথে সাহরী খাওয়ার বৈধতা-অবৈধতাকে সম্পৃক্ত করা ত্রুটি, অসুবিধা ও কঠোরতা থেকে মুক্ত নয় (বাযলুল মাজহূদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪০)।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বিলাল (র) ও ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)-র আযান সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন, 'আসবাহ্তা' (তুমি ভোরে উপনীত হয়েছো) শব্দটি তার প্রত্যক্ষ (হাকীকী) অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে বরং রূপক (মাজাযী) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ফজরের সময় ঘনিয়ে এসেছে। অতএব ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান ছিলো ফজর শুরু হওয়ার সময়ে, আর পানাহারের শেষ সময়সীমা ছিল ফজর উদয় হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে। অপরদিকে 'আসবাহ্তা' শব্দটি

৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে রমযানের রোযা ভংগ করে।

٣٤٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ اِطْعَامِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ أَجِدُ فَأُتِىَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَقٍ مِّنْ تَمْرٍ فَقَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ اِلَيْهِ مِنِّىْ قَالَ كُلْهُ .

৩৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোযা ভেংগে ফেললো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এর কাফফারা স্বরূপ একটি ক্রীতদাস আযাদ করতে অথবা একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে অথবা ষাটজন মিসকীনকে এক বেলা আহার করার নির্দেশ দেন। লোকটি বললো, এর কোনটি করারই সামর্থ্য আমার নেই। এসময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক ঝুড়ি খেজুর নিয়ে আসা হলো। তিনি বলেন ঃ এগুলো নাও এবং তা দিয়ে সদাকা করো। সে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই শহরে আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোক আমি দেখতে পাচ্ছি না। তিনি বলেন ঃ তুমি নিজেই তা খাও।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করি। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক পানাহার অথবা সহবাসের মাধ্যমে রমযানের রোযা ভংগ করলে তাকে সেই রোযাটির কাযা এবং যিহারের সমপরিমাণ কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। অর্থাৎ একটি গোলাম আযাদ করতে হবে। গোলাম আযাদ করা সম্ভব না হলে একাধারে দুই (চান্দ্র) মাস রোযা রাখতে হবে। রোযা রাখতে সক্ষম না হলে ষাটজন মিসকীনকে এক বেলা আহার করাতে হবে। মাথাপিছু এর পরিমাণ গমে অর্ধ সা' অথবা খেজুরে এক সা' অথবা বার্লিতে এক সা' (১ সা' = ৩ সের ৯ ছটাক)।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ সহবাসজনিত নাপাক অবস্থায় ভোর হলে।

٣٥٠- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ اِنِّىْ أَصْبَحْتُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيْدُ الصَّوْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا

প্রত্যক্ষ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। এক্ষেত্রে উল্লেখিত হাদীস থেকে ফজর হওয়ার পরও পানাহারের বৈধতা সাব্যস্ত হয়। ফিক্হবিদদের একটি মত অনুসারে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। কেননা আমাদের সাথীরা (হানাফী আলেমগণ) এই সীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে মতভেদ করেছেনঃ এ সীমা কি ফজর শুরু হওয়ার ঠিক মুহূর্ত না ভোরের শুভ্রতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত? খিযানাতুল ফাতাওয়া গ্রন্থের আলোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ আলেম দ্বিতীয় মত গ্রহণ করেছেন (বুখারীর শারহ উমদাতুল কারী, আযান অনুচ্ছেদ, পৃ. ৭০)। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো দ্রষ্টব্য ঃ ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬; শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০; হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ ইনায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩; খিযানাতুল ফাতাওয়া এবং আল-মুহীত (অনুবাদক)।

ثُمَّ اَغْتَسِلُ فَاَصُوْمُ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا فَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَعْلَمَكُمْ بِمَا اَتَّقِىْ .

৩৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললো, 'সহবাস জনিত নাপাক অবস্থায় আমার ভোর হয়ে গেছে এবং আমি রোযা রাখতে ইচ্ছুক। এ সময় তিনি ঘরের দরজায় দাঁড়ানো ছিলেন এবং আমি তাদের আলাপ শুনলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাকে) বলেনঃ "সহবাস জনিত নাপাক অবস্থায় আমারও ভোর হয়ে যায়। অতঃপর আমি গোসল করি এবং রোযা রাখি"। লোকটি বললো, আপনি তো আমাদের মতো নন। আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেনঃ "আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই মহামহিম আল্লাহ্‌কে তোমার চেয়ে অধিক বেশী ভয় করার আশা পোষণ করি এবং পরহেযগারীর কথা তোমাদের চেয়ে অধিক বেশী জানি"।

٣٥١- عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاَبِىْ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فَذَكَرَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ اَصْبَحَ جُنُبًا اَفْطَرَ فَقَالَ مَرْوَانُ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لَتَذْهَبَنَّ اِلَى اُمَّىِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ فَتَسْئَلُهُمَا عَنْ ذٰلِكَ قَالَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ مَنْ اَصْبَحَ جُنُبًا اَفْطَرَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ قَالَتْ لَيْسَ كَمَا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ قَالَ لَا وَاللّٰهِ قَالَتْ فَاَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِّنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَسَئَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجْنَا حَتّٰى جِئْنَا مَرْوَانَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مَا قَالَتَا فَقَالَ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِىْ فَاِنَّهَا بِالْبَابِ لَتَذْهَبَنَّ اِلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَاِنَّهُ بِاَرْضِهِ بِالْعَقِيْقِ فَلْتُخْبِرَنَّهُ ذٰلِكَ قَالَ فَرَكِبَ عَبْدُ

الرَّحْمٰنِ وَرَكِبْتُ مَعَهُ حَتّٰى اَتَيْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَاعَةً ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لاَ عِلْمَ لِيْ بِذٰلِكَ اِنَّمَا اَخْبَرَنِيْهِ مُخْبِرٌ .

৩৫১। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি এবং আমার পিতা (আবদুর রহমান) মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে বসা ছিলাম। তিনি তখন মদীনার গভর্নর ছিলেন। এ সময় কথা উঠলো যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হয় তার রোযা হবে না"। তখন মারওয়ান বলেন, হে আবদুর রহমান! আমি আপনাকে দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি অবশ্যই উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত উম্মু সালামা (রা)-র কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। রাবী বলেন, আমার পিতা রওয়ানা হলেন এবং আমিও তার অনুসরণ করলাম। আমরা আয়েশা (রা)-র বাড়িতে পৌঁছে তাকে সালাম জানালাম। অতঃপর আবদুর রহমান (রা) বলেন, হে মুমিন-জননী! আমরা এতোক্ষণ মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে বসা ছিলাম। সেখানে কথা উঠলো যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তির ভোর হয়ে গেলে তার রোযা হয় না। আয়েশা (রা) বলেন, হে আবদুর রহমান! আবু হুরায়রা যা বলে, ব্যাপারটি তদ্রূপ নয়। এরূপ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে কর্মনীতি ছিলো তা কি তুমি অপছন্দ করবে? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! অবশ্যই না। আয়েশা (রা) বলেন, আমি শপথ করে বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ সহবাস জনিত নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন, স্বপ্নদোষ জনিত নাপাক অবস্থায় নয়। অতঃপর তিনি ঐ দিনের রোযা রাখতেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উম্মু সালামা (রা)-র বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হই। আবদুর রহমান (রা) তার কাছেও এই বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনিও আয়েশা (রা)-র অনুরূপ জওয়াব দিলেন। অতঃপর আমরা ফিরে গিয়ে মারওয়ানের কাছে উপস্থিত হলাম। আবদুর রহমান (রা) তাকে তাদের উভয়ের বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলেন। মারওয়ান বলেন, হে আবু মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে দোহাই দিয়ে বলছি, অবশ্যই আপনি দরজার সামনে দাঁড়ানো আমার জন্তুযানে চড়ে আবু হুরায়রার কাছে যান। তিনি বর্তমানে আকীক নামক স্থানে অবস্থান করছেন। তাকে এই বিষয়টি অবহিত করুন। আবদুর রহমান (রা) সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং আমি তার অনুসরণ করলাম। অতঃপর আমরা আবু হুরায়রার কাছে পৌঁছে গেলাম। আবদুর রহমান কিছুক্ষণ তার সাথে কথাবার্তা বলেন, অতঃপর আসল বিষয় উত্থাপন করেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এ ব্যাপারে সরাসরি আমার কিছু জানা ছিলো না। এক ব্যক্তি আমাকে এরূপ বলেছিল।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। রমযান মাসে কোন ব্যক্তি সহবাস জনিত নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনিত হলো, অতঃপর সুবহে সাদেক হওয়ার পর গোসল করলো, এতে তার রোযার কোন ক্ষতি হবে না। স্বপ্নদোষে রোযা নষ্ট হয় না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ

(يَعْنِى الْجِمَاعَ) وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ (يَعْنِى الْوَلَدَ) وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ .

“রোযার সময় রাতের বেলা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। তারা তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ এবং তোমরাও তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ। আল্লাহ জানতে পেরেছেন যে, তোমরাও গোপনে গোপনে নিজেদের সাথে নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা অন্বেষণ করো। আর রাতের অন্ধকার রেখার বুক চিরে ভোরের শুভ্র রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠা পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো” (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)।

অর্থাৎ ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত পানাহার এবং সহবাসের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতএব ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত যখন পানাহার ও সহবাসের অনুমতি দেয়া হলো, তখন গোসল কেবল ফজরের পরেই হতে পারে। আর এতে দোষের কিছু নেই। ইমাম আবু হানীফা এবং সাধারণ ফিক্হবিদদেরও এই মত।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেয়া।

٣٥٢- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلاً قَبَّلَ امْرَاَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَوَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ وَجْداً شَدِيْداً فَاَرْسَلَ امْرَاَتَهُ تَسْئَلُ لَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَدَخَلَتْ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَتْهَا اُمُّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتْ اِلَيْهِ فَاَخْبَرَتْهُ بِذٰلِكَ فَزَادَهُ ذٰلِكَ شَرًّا فَقَالَ اِنَّا لَسْنَا مِثْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُحِلُّ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ مَا شَاءَ فَرَجَعَتِ الْمَرْاَةُ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ الْمَرْاَةِ فَاَخْبَرَتْهُ اُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اَخْبَرْتِهَا اَنِّىْ اَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَتْ اَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ اِلٰى زَوْجِهَا فَاَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذٰلِكَ شَرًّا وَقَالَ اِنَّا لَسْنَا مِثْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُحِلُّ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ مَا شَاءَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَعْلَمُكُمْ بِحُدُوْدِهِ .

৩৫২। আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রোযা অবস্থায় তার স্ত্রীকে চুমা দিলো। এজন্য সে চরম অনুতপ্ত হলো। অতএব এ সম্পর্কে বিধান জানার জন্য সে তার স্ত্রীকে নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা)-র কাছে পাঠায়। সে তার কাছে এসে ব্যাপারটা

খুলে বলে। উম্মে সালামা (রা) তাকে অবহিত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা অবস্থায় নিজ স্ত্রীদের চুমা দিয়েছেন। মেয়েলোকটি ফিরে গিয়ে তার স্বামীকে এ সম্পর্কে অবহিত করলো। এতে সে আরো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো এবং বললো, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতো নই। আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য যা খুশি তাই হালাল করেন। তার স্ত্রী পুনরায় উম্মে সালামা (রা)-র কাছে আসলো এবং তার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও দেখতে পেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই মেয়েলোকটির আগমনের কারণ কি? উম্মে সালামা (রা) তাঁকে ব্যাপারটি অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তুমি কেন তাকে জানিয়ে দাওনি যে, আমি নিজেও (রোযা অবস্থায়) তা করি (চুমা দেই)"? উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছি। সে তার স্বামীর কাছে গিয়ে তাকে তা জানিয়েছে। এতে তার মনোবেদনা আরো বেড়ে গেছে এবং বলেছে, "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুরূপ নই। আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য যা খুশি হালাল করেন"। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের তুলনায় আমি আল্লাহ্‌কে অধিক বেশী ভয় করি এবং তার নির্ধারিত সীমা তোমাদের চেয়ে অধিক ভালো জানি"।

٣٥٣- عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْنُوَ اِلَى اَهْلِكَ وَتُقَبِّلَهَا وَتُلاَعِبَهَا قَالَ اُقَبِّلُهَا وَاَنَا صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ .

৩৫৩। আয়েশা বিনতে তালহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-র কাছে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (আয়েশার ভ্রাতুষ্পুত্র) তার কাছে এলেন। আয়েশা (রা) ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলেন, তোমার স্ত্রীর কাছে যেতে, তাকে চুমা দিতে এবং তার সাথে খোশগল্প করতে কোন জিনিস তোমাকে বাধা দিচ্ছে? আবদুল্লাহ বলেন, আমি রোযা অবস্থায় তাকে চুমা দিবো? তিনি বলেন, হাঁ, এতে কোন দোষ নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমা দেয়ায় কোন দোষ নেই যদি নিজেকে সহবাসের আকাঙ্খা থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না বলে আশংকা হয় তবে চুমা দেয়া থেকে বিরত থাকাই অধিক উত্তম। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের পূর্ববর্তী আলেমদের এটাই সাধারণ মত।

٣٥٤- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَنْهٰى عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ .

৩৫৪। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) রোযাদার ব্যক্তিকে নিজ স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতে এবং চুমা দিতে নিষেধ করতেন (তার এ নিষেধাজ্ঞা সতর্কতার পর্যায়ভুক্ত)।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো।

٣٥٥- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ اَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ بَعْدَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ .

৩৫৫। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করাতেন। অতঃপর তিনি সূর্যাস্তের পর রক্তমোক্ষণ করাতেন।

٣٥٦- حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ اَنَّ سَعْدًا وَّابْنَ عُمَرَ كَانَ يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ .

৩৫৬। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) এবং ইবনে উমার (রা) রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করাতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানোয় কোন দোষ নেই। কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে তা মাকরূহ। দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা না থাকলে শিংগা লাগানোয় কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٣٥٧- اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَبِىْ قَطُّ اِحْتَجَمَ اِلاَّ وَهُوَ صَائِمٌ .

৩৫৭। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) বলেন, আমি আমার পিতাকে রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করাতে দেখেছি।[৩]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত এবং ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা অথবা আপনা আপনি বমি হওয়া।

٣٥٨- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ .

৩৫৮। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে, তাকে রোযার কাযা আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তির স্বাভাবিকভাবেই বমি হয়ে যায়, তাকে রোযার কাযা করতে হবে না।[৪]

৩. এসবদলীলের ভিত্তিতে রোযা অবস্থায় পরীক্ষার জন্য অথবা কোন মুমূর্ষু রোগীকে নিজের দেহের রক্ত দিলে তাতে রোযা নষ্ট হবে না। তবে সুস্থ-সবল ব্যক্তির দেহে রক্ত প্রবেশ করালে তার রোযা নষ্ট হবে। সাধারণত মুমূর্ষু রোগী ও মারাত্মকভাবে আহত ব্যক্তির দেহেই বাইরে থেকে রক্ত দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ধরনের রোগীদের সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত রোযা ভংগ করার অনুমতি আছে (অনুবাদক)।

৪. ইবরাহীম নাখঈ, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, আবু ইউসুফ এবং আর সব আলেমের এটাই সাধারণ মত। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "স্বাভাবিকভাবেই যার বমি হয়ে যায়, তাকে রোযার কাযা করতে হবে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে, তাকে রোযার কাযা করতে হবে" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, দারু কুতনী) (অনুবাদক)।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ সফররত অবস্থায় রোযা রাখা।

٣٥٩- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَصُوْمُ فِى السَّفَرِ .

৩৫৯। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সফররত অবস্থায় রোযা রাখতেন না।

٣٦٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَكَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ قَالَ وَكَانُوْا يَأْخُذُوْنَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর রমযান মাসে সফরে বের হলেন এবং রোযা রাখলেন। এভাবে তিনি কাদীদ নামক স্থান পর্যন্ত পৌছলেন,[৫] অতঃপর রোযা ভংগ করলেন এবং তাঁর সাথের লোকজনও রোযা ভংগ করলো। রমযান মাসে মক্কা বিজয় হয়েছিল। রাবী বলেন, সাহাবাদের নিয়ম ছিলো যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাজের মধ্যে নতুন নতুন কাজগুলো গ্রহণ করে নিতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সফররত অবস্থায় রোযা রাখা বা ভংগ করা উভয়টিরই অনুমতি আছে। কিন্তু যে ব্যক্তির সামর্থ্য রয়েছে তার জন্য রোযা রাখাই উত্তম। আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় যাওয়ার পথে এজন্য রোযা ভংগ করেছিলেন যে, লোকজন তাঁর কাছে রোযার কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলো। আমরা আরো জানতে পেরেছি যে, হামযা আল-আসলামী (রা) তার কাছে সফরত অবস্থায় রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "ইচ্ছা করলে তুমি রোযা রাখতেও পারো আবার চাইলে রোযা ভংগও করতে পারো"।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের কাযা রোযা বিরতি দিয়ে রাখা যায় কি?

٣٦١- حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ لاَ يُفَرِّقُ قَضَاءُ رَمَضَانَ .

৩৬১। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলতেন, রমযানের কাযা রোযা বিরতি দিয়ে রাখা ঠিক নয় (একাধারেই রাখা উচিৎ)।

٣٦٢- أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ اِخْتَلَفَا فِىْ قَضَاءِ رَمَضَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَقَالَ الْأُخَرُ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ .

---

৫. কাদীদ নামাক স্থান মদীনা থেকে ১৪৭ মাইল এবং মক্কা থেকে ৪২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুনভাবে যে কাজটি করতেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর সেই কাজটি গ্রহণ করতেন। আবার কখনো তিনি সেটির পরিবর্তে নতুন কিছু করলে তারা পূর্বেরটি বাদ দিয়ে শেষোক্তটি গ্রহণ করতেন। "বিল-আহ্দাছ ফাল-আহ্দাছ" দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

৩৬২। ইবনে শিহাব (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) রমযানের কাযা রোযা পূর্ণ করার নিয়ম প্রসংগে মতভেদ করেন। তাদের একজন বলেন, বিরতি দিয়ে কাযা রোযা রাখা যেতে পারে। অপরজন বলেন, বিরতি দিয়ে রাখা যাবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কাযা রোযা ধারাবাহিকভাবে রাখাই সবচেয়ে উত্তম, তবে বিরতি দিয়েও রাখা যেঁতে পারে। এতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের পূর্ববর্তী যুগের আলেমদেরও এই মত।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ নফল রোযা রেখে তা ভংগ করা।

٣٦٣- عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ اَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَاُهْدِىَ لَهُمَا طَعَامٌ فَاَفْطَرَتَا عَلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَبَدَرَتْنِىْ بِالْكَلَامِ وَكَانَتِ ابْنَةَ اَبِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ اَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ فَاُهْدِىَ لَنَا طَعَامٌ فَاَفْطَرْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ .

৩৬৩। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) একদিন নফল রোযা রাখলেন। অতঃপর তাদের কাছে উপঢৌকন স্বরূপ খাবার (ছাগলের গোশত) আসলে তা খেয়ে তারা রোযা ভেংগে ফেলেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে এসে উপস্থিত হন। আয়েশা (রা) বলেন, হাফসা (রা) এ ঘটনা তাঁর কাছে আমার আগেই বর্ণনা করেন। কেননা তিনি বাপের বেটি (উমারের কন্যা)। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ও আয়েশা আজ নফল রোযা রেখেছিলাম। আমাদের কাছে উপঢৌকন (খাদ্য) আসলে আমরা তা খেয়ে রোযা ভেংগে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়কে বলেন ঃ "এর পরিবর্তে আরেক দিন রোযা রেখে নিও"।[৬]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। কোন ব্যক্তি নফল রোযা রেখে তা ভেংগে ফেললে তাকে এর কাযা করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের পূর্ববর্তী যুগের আলেমদেরও এই মত।

---

৬. ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আবু সাওরের মতে নফল রোযার কাযা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ" তোমরা তোমাদের কাজ বিনষ্ট করো না" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৩)। অপরদিকে ইমাম শাফিঈ ও আহমাদের মতে নফল রোযার কাযা জরুরী নয়, তবে মুস্তাহাব। উম্মে হানী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে দুধ পান করার পর বলেন, আমি রোযা রেখেছিলাম, কিন্তু আপনার উচ্ছিষ্ট প্রত্যাখ্যান করা আমার পছন্দ হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যদি রমযান মাসের কাযা রোযা হয়ে থাকে, তবে পরিবর্তে একটি রোযা রেখে নিও। আর যদি নফল রোযা হয়ে থাকে তবে তুমি এর কাযা করতেও পারো নাও করতে পারো" (অনুবাদক)।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ ইফতারে বিলম্ব করা।

٣٦٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الاَفْطَارَ .

৩৬৪। সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ লোকেরা যতোদিন তাড়াতাড়ি ইফতার করবে, ততোদিন তারা কল্যাণের সাথে থাকবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ইফতার ও মাগরিবের নামাযে বিলম্ব না করা উত্তম। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অন্যসব আলেমেরও এই মত।

٣٦٥- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ حِيْنَ يَنْظُرَانِ اللَّيْلَ الْاَسْوَدَ قَبْلَ اَنْ يُفْطِرَا ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فِىْ رَمَضَانَ .

৩৬৫। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ও উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) রমযান মাসে রাতের কালো রেখা দেখার সাথে সাথে মাগরিবের নামায পড়তেন, অতঃপর ইফতার করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রশস্ততা রয়েছে। কেউ ইচ্ছা করলে মাগরিবের নামাযের পূর্বেও ইফতার করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে নামাযের পরও ইফতার করতে পারে। উভয় অবস্থায়ই দোষের কিছু নেই।

٣٦٦- اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَفْطَرَ فِىْ يَوْمِ رَمَضَانَ فِىْ يَوْمِ غَيْمٍ وَرَاٰى اَنَّهُ قَدْ اَمْسٰى اَوْ غَابَتِ الشَّمْسُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ الْخَطْبُ يَسِيْرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا .

৩৬৬। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। রমযানের এক মেঘলা দিনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) সূর্য ডুবে গেছে ধারণা করে ইফতার করে বসলেন। এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! সূর্য বের হয়েছে। তিনি বলেন, এর বিনিময় অথবা কাযা খুবই সহজ। ইফতার করার ব্যাপারে আমরা জলদি করে ফেলেছি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি সূর্য ডুবে গেছে ধারণা করে ইফতার করার পর জানতে পারলো যে, আসলে সূর্য ডুবেনি, এ অবস্থায় সে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আর পানাহার করবে না এবং পরে এই রোযার পরিবর্তে একটি রোযা রাখবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ সাওমে বিসাল।[৭]

٣٦٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْوِصَالِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى .

৩৬৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে বলা হলো, নিশ্চয় আপনি এই ধরনের রোযা রাখেন? তিনি বলেন ঃ "আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়। (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে) আমাকে পানাহার করানো হয়"।

٣٦٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ اِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ فَاكْلَفُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ .

৩৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "সাবধান! তোমরা এক রোযাকে অন্য রোযার সাথে মিলিত করে রোযা রাখা থেকে বিরত থাকো"। লোকজন বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যে এধরনের রোযা রাখেন? তিনি বলেন ঃ "আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়। রাতের বেলা আমার রব আমাকে পানাহার করান। তোমরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। একাধিক রোযাকে পরস্পরের সাথে মিলিত করে রাখা মাকরূহ। সাওমে বিসাল এই যে, দিনরাত ২৪ ঘণ্টা রোযা রাখা। রাতের বেলা কিছু পানাহার না করে দ্বিতীয় দিনও রোযা রাখা। ইমাম আবু হানীফার মতেও এ নিয়মে রোযা রাখা মাকরূহ।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের দিন রোযা রাখা।

٣٦٩- عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ ابْنَةِ الْحَارِثِ اَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا فِىْ صَوْمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَائِمٌ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَاَرْسَلَتْ اُمُّ الْفَضْلِ بِقَدَحٍ مِّنْ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ .

৩৬৯। হারিস-কন্যা উম্মুল ফাদ্‌ল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতের দিন রোযা রেখেছেন কিনা তা নিয়ে লোকে সন্দেহ করছিল। একদল বললো, তিনি রোযা

---

৭. ইফতারের সময় সামান্য পরিমাণ আহার করে একাধারে কয়েক দিন যে রোযা রাখা হয় তাকে সাওমে বিসাল বলে (অনুবাদক)।

আছেন। অপর দল বললো, তিনি রোযা রাখেননি। ব্যাপারটি যাচাই করার জন্য উম্মুল ফাদল (রা) তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠান। তিনি তখন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছিলেন। তিনি দুধ পান করলেন।[৮]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আরাফাতে অবস্থানের দিন ইচ্ছা করলে রোযা রাখাও যায়, আবার নাও রাখা যায়। কেননা এটা নফল রোযা। কোন ব্যক্তি এদিন রোযা রাখলে দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে এবং দোয়া-কামাল পড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হলে রোযা না রাখাই উত্তম।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ যেসব দিনে রোযা রাখা মাকরূহ।

٣٧٠- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ اَيَّامِ مِنًى .

৩৭০। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনার দিনগুলোতে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

٣٧١- عَنْ اَبِىْ مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ دَخَلَ عَلٰى اَبِيْهِ فِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ فَقَرَّبَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لِاَبِيْهِ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ كُلْ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُنَا بِالْفِطْرِ فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ.

৩৭১। আবু মুররা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (রা) আইয়ামে তাশরীকে (ঈদুল আযহার দিনের পরের তিন দিন) তার পিতা আমর ইবনুল আস (রা)-র কাছে গেলেন। তার সামনে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আমর (রা) বলেন, খাও। আবদুল্লাহ (রা) তার পিতাকে বলেন, আমি রোযা রেখেছি। আমর (রা) বলেন, খেয়ে নাও। তুমি কি জানো না, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কয়দিন রোযা না রাখার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন?

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি। আইয়ামে তাশরীকে (১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ) কারো রোযা রাখা ঠিক নয়, চাই সে তামাত্তু হজ্জকারী হোক অথবা অন্য প্রকারের হজ্জকারী। কেননা নবী ﷺ এই কয়দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের পূর্ববর্তী যুগের সব আলেমের এই মত। ইমাম মালেক (র) বলেন, যে তামাত্তু হজ্জকারী কোরবানী করার জন্য পশু সংগ্রহ করতে পারেনি অথবা কোরবানীর পূর্বেকার তিন দিন (৭, ৮ ও ৯ যিলহজ্জ) রোযাও রাখতে পারেনি, তার জন্য আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন রোযা রাখা জায়েয।

---

৮. কোন কোন বর্ণনায় আরাফাতের দিন রোযা রাখার ফযীলাত সম্পর্কে উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "আরাফাত দিবসে রোযা রাখলে এক বছরের গুনাহ মাফ হয়" (তিরমিযী)। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, এই দিন হাজ্জীদের জন্য রোযা রাখা জায়েয তবে বাধ্যতামূলক নয় (অনুবাদক)।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাত থাকতেই রোযার নিয়াত করা।

٣٧٢- حَدَّثَنَا نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لاَ يَصُومُ الاَّ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

৩৭২। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি সুব্হে সাদেকের পূর্বে রোযার নিয়াত না করলে তার রোযা হবে না।[৯]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যে ব্যক্তি দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রোযার নিয়াত করবে, তার রোযাও ঠিক হবে। একাধিক বিশেষজ্ঞ আলেম এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের পূর্বেকার আলেমদেরও এই মত।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ অধিক পরিমাণে রোযা রাখা।

٣٧٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتّٰى يُقَالَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى يُقَالَ لاَ يَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ الاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

৩৭৩। আয়েশা (রা) বলেন, কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে রোযা রেখে যেতেন। এমনকি বলা হতো, তিনি আর রোযা ভাংবেন না। আবার কখনো তিনি একাধারে রোযাহীন অবস্থায় থাকতেন। এমনকি বলা হতো, তিনি আর রোযা থাকবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে রমযান মাস ছাড়া কখনো পূর্ণ একমাস রোযা রাখতে দেখিনি। আবার শাবান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে তাঁকে অধিক নফল রোযা রাখতেও দেখিনি।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ আশূরার রোযা।

٣٧٤- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاءُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِهٰذَا الْيَوْمِ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ لَمْ يَكْتُبِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.

৩৭৪। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফা (র) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) যে বছর হজ্জ করতে আসেন, তখন তিনি তাকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি এই দিন

---

৯. ইমাম শাফিঈ ও তার অনুসারীদের মতে রমযানের রোযার নিয়াত সুবহে সাদেকের পূর্বেই করতে হবে, অন্যথায় রোযা হবে না। তবে নফল রোযার নিয়াত দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করা যেতে পারে (অনুবাদক)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "আজ আশূরার দিন (মুহাররমের দশ তারিখ)। আল্লাহ তোমাদের উপর এদিনের রোযা ফরয করেননি। আমি রোযা রেখেছি। অতএব তোমাদের যে চায় (এদিন) রোযা রাখতে পারে, আর ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারে"।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আশূরার রোযা ফরয ছিল। অতঃপর রমযানের রোযার মাধ্যমে তা রহিত হয়ে যায়। এখন তা নফল রোযা হিসাবে গণ্য। যার ইচ্ছা এদিন রোযা রাখতেও পারে এবং যার ইচ্ছা নাও রাখতে পারে।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কদরের রাতের বর্ণনা।

٣٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

৩৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তোমরা রমযান মাসের শেষ সাত দিনের মধ্যে কদরের রাত খোঁজ করো"।

٣٧٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

৩৭৬। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তোমরা রমযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে কদরের রাত তালাশ করো"।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ ইতেকাফের বর্ণনা।

٣٧٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِىْ اِلَىَّ رَأْسَهُ فَاُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ .

৩৭৭। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতেকাফরত অবস্থায় নিজের মাথা আমার দিকে ঝুঁকিয়ে দিতেন এবং আমি তাতে চিরুনী করে দিতাম। তিনি বিশেষ মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া ঘরে আসতেন না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। ইতেকাফ অবস্থায় পায়খানা- পেশাবের প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হবে না। ইতেকাফের স্থানে বসেই পানাহার সেরে নিবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٣٧٨- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوَسْطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتّٰى اِذَا كَانَ لَيْلَةُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَهِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ يَخْرُجُ فِيْهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِىْ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ

الْأَوَاخِرَ وَقَدْ رَأَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي مِنْ صَبِيْحَتِهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِيْ كُلِّ وِتْرٍ قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ سَقْفُهُ عَرِيْشًا فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ عَلَيْنَا وَعَلٰى وَجْهِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ .

৩৭৮। আবু সাঈদ (রা) বলেন, এক বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসের মধ্যম দশকে ইতেফাক করেন। যখন একুশতম রাত আসলো যে রাত শেষ হওয়ার পর ভোরে তিনি ইতেকাফ ভংগ করতেন, তিনি বলেন ঃ "যারা আমার সাথে ইতেকাফ করেছে তারা যেন শেষ দশকেও ইতেফাক করে। আমি কদরের রাত অবগত হয়েছিলাম, কিন্তু তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, আমি যেন কদর রাতের ভোরে কাদা ও পানির মধ্যে সিজদা করছি। অতএব তোমরা তা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে অনুসন্ধান করো"। আবু সাঈদ (রা) বলেন, ঐ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। মসজিদে নবরীর ছাদ ছিল পাতা দিয়ে ছাওয়া। তাই ছাদ দিয়ে পানি টপকে পড়েছিল। আবু সাঈদ (রা) আরো বলেন, আমার দুই চোখ সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছে যে, তিনি যখন নামায থেকে অবসর হলেন, তখন তাঁর কপাল এবং নাকে পানি ও কাদার চিহ্ন ছিল। এটা ছিল একুশতম রাতের ঘটনা।

٣٧٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ سَئَلْتُ بْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ الْمُعْتَكِفِ يَذْهَبُ لِحَاجَةٍ تَحْتَ سَقْفٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ .

৩৭৯। ইমাম মালেক (র) বলেন, আমি ইবনে শিহাব যুহরী (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ইতেকাফরত ব্যক্তি কি ছাদযুক্ত স্থানে পায়খানা-পেশাবের জন্য যেতে পারে? তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। ইতেকাফরত ব্যক্তি পায়খানা-পেশাবের উদ্দেশে ঘরে বা ছাদযুক্ত স্থানে যেতে পারে। এতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

অধ্যায় ঃ ৬

كِتَابُ الْحَجِّ

(হজ্জের বিবরণ)

১. অনুচ্ছেদ ঃ মীকাতসমূহের বর্ণনা।

٣٨٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ اَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ اَهْلُ نَجْدٍ مِّنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَيَزْعَمُوْنَ اَنَّهُ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ .

৩৮০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "মদীনাবাসীগণ যুল-হুলাইফা থেকে, সিরিয়ার অধিবাসীগণ আল-জুহফা থেকে এবং নজদের অধিবাসীগণ কারন থেকে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে"। ইবনে উমার (রা) বলেন, লোকদের ধারণা, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন ঃ "ইয়ামানবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে"।

٣٨١- قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَنْ يُّهِلُّوْا مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلَ نَجْدٍ مِّنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَمَّا هٰؤُلَاءِ الثَّلْثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاُخْبِرْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاَمَّا اَهْلُ الْيَمَنِ فَيُهِلُّوْنَ مِنْ يَلَمْلَمَ .

৩৮১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে ঃ "মদীনাবাসীগণ যুল-হুলাইফা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে, সিরিয়াবাসীরা আল-জুহফা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং নজদবাসীরা কারন থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে"। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এই তিনটি মীকাতের কথা আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছি। আমাকে জানানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন ঃ "আর ইয়ামনবাসীরা ইয়ালামলাম থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে"।

٣٨٢- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَحْرَمَ مِنَ الْفَرْعِ .

৩৮২। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (র) আল-ফারআ থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

٣٨٣- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنِى الثِّقَةُ عِنْدِى اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَحْرَمَ مِنْ اِيْلِيَاءَ .

৩৮৩। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) ঈলিয়া (বায়তুল মুকাদ্দাস) থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, আমরা তা-ই অনুসরণ করি। যে ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরার নিয়াত করেছে তার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধা ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নয়। ইহ্‌রাম বেঁধেই কেবল মীকাত অতিক্রম করা যায়। ইবনে উমার (রা) যে ফারআ নামক এলাকা থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছিলেন তার কারণ, যুল-হুলাইফার তুলনায় এ স্থানটি মক্কার অধিক নিকটে। যুল-হুলাইফার সম্মুখভাগে আল-জুহ্‌ফা নামে আরো একটি মীকাত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের আল-জুহ্‌ফা থেকে ইহরাম বাঁধার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা আল-জুহ্‌ফাও একটি মীকাত। আমরা জানতে পেরেছি যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَمْتِعَ بِثِيَابِهِ اِلَى الْجُحْفَةِ فَلْيَفْعَلْ .

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল-জুহ্‌ফা পর্যন্ত পোশাক-পরিচ্ছদসহ যেতে চায় সে যেতে পারে"।[১]

এই রিওয়ায়াতটি আমরা আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে জানতে পেরেছি । তিনি ইসহাক ইবনে রাশেদের সূত্রে, তিনি আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলীর সূত্রে নবী ﷺ -এর এ হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

---

১. যে স্থান বরাবর পৌঁছে হজ্জযাত্রীদের ইহ্‌রাম বাঁধতে হয় তাকে মীকাত বলে। হজ্জযাত্রীরা ইহ্‌রাম না বেঁধে এই স্থান অতিক্রম করতে পারে না। মীকাতের স্থানসমূহ নিম্নরূপ ঃ

'যুল-হুলায়ফা' মদীনাবাসীদের মীকাত। এর বর্তমান নাম 'আবইয়ারু আলী"। এলাকাটি মদীনার ছয়-সাত মাইল দূরে অবস্থিত। 'আল-জুহ্‌ফা' সিরিয়াবাসীদের এবং এপথ দিয়ে যারা আসবে তাদের মীকাত। এটা রাবাগ নামক এলাকার একটি জনশূন্য গ্রাম।

'কারনুল মানাযিল' নজ্‌দবাসীদের মীকাত, এর বর্তমান নাম আস-সায়েল।

'ইয়ালামলাম' ইয়ামনবাসীদের মীকাত। এটা তিহামার একটি পাহাড়ের নাম। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানসহ পূর্বাঞ্চলের হজ্জযাত্রীদেরও এটাই মীকাত।

'যাতু ইর্‌ক' ইরাকবাসীদের মীকাত। সহীহ্ মুসলিমে জাবের (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এই মীকাতের উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "ওয়া মাহাল্লু আহলিল ইরাকে মিন যাতে ইরকিন" (ইরাকবাসীদের মীকাত হচ্ছে যাতু ইর্‌ক)।

যারা হজ্জ বা উমরা করার ইচ্ছা রাখে না তাদের জন্য মীকাতে পৌঁছে ইহরাম বাঁধা জরুরী নয়। ইমাম শাফিঈর এই মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে মীকাতের সীমার অভ্যন্তরের লোকদের ছাড়া অন্য লোকদের পক্ষে কোন অবস্থায়ই ইহ্‌রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় প্রবেশ জায়েয নয়। হজ্জ ও উমরা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় মাসয়ালার জন্য আমার লেখা "কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে হজ্জ উমরা যিয়ারত" গ্রন্থখানি পড়া যেতে পারে (অনুবাদক)।

২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়ার পর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে ইহ্‌রাম বাঁধে।

٣٨٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ فَاِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ اَحْرَمَ .

৩৮৪। ইবনে উমার (রা) যুল-হুলায়ফার মসজিদে নামায পড়তেন। যখন তাঁর বাহন তাকে নিয়ে রওয়ানা হতো তখন তিনি ইহ্‌রাম বাঁধতেন।

٣٨٥- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ بَيْدَائُكُمْ هٰذِهِ الَّتِىْ تُكَذِّبُوْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا وَمَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِىْ مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ .

৩৮৫। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেন, এই সেই জায়গা যে সম্পর্কে তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকো যে, তিনি এখান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন। অথচ তিনি যুল-হুলায়ফার মসজিদের কাছে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরাও এই মত গ্রহণ করেছি। কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে নামাযের পরও ইহ্‌রাম বাঁধতে পারে, আবার উটে (বা বাহনে) আরোহণ করেও ইহ্‌রাম বাঁধতে পারে। উভয়টিই উত্তম। ইমাম আবু হানীফা (র) এবংআমাদের সকল ফিক্‌হ্‌বিদের এই মত।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ তালবিয়া পাঠের বর্ণনা।

٣٨٦-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِىِّ ﷺ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيْدُ فِيْهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

৩৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ নিম্নরূপ তালবিয়া পাঠ করতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দণ্ডায়মান আছি, তোমার কাছে উপস্থিত আছি, তোমার দরবারে হাযির হয়েছি। তোমার কোন শরীক নাই, আমি তোমার কাছে হাযির হয়েছি। যাবতীয় প্রশংসা ও নিআমত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার। তোমার কোন শরীক নাই"। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নিজের তরফ থেকে এর সাথে আরো যোগ করতেন ঃ "তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, তোমার কাছে হাযির হয়েছি,

তোমার খেদমতের সৌভাগ্য লাভ করেছি। সমস্ত কাল্যাণ তোমার হাতে, আমি তোমার সমীপে উপস্থিত আছি, সমস্ত আকর্ষণ তোমার প্রতি এবং সকল কাজ তোমারই নির্দেশে"।[২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। প্রথম তালবিয়া যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে উধৃত করা হয়েছে, তাই আমরা গ্রহণ করেছি। এর সাথে আরো যা যুক্ত করা হয়েছে তাও ভালো। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এই মত।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ তালবিয়া পাঠ বন্ধ করার বর্ণনা।

٣٨٧- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ الثَّقَفِىِّ اَنَّهُ سَئَلَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ اِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هٰذِهِ الْيَوْمِ قَالَ كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ .

৩৮৭। মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্র আস-ছাকাফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এবং আনাস ইবনে মালেক (রা) সকাল বেলা মিনা থেকে আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলেন। মুহাম্মাদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এই দিন কি কি কাজ করতেন? তিনি বলেন, আমাদের কেউ সশব্দে তালবিয়া পাঠ করতো, আবার কেউ তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতো। এদের কারো কাজকেই বাধা দেয়া হতো না।

٣٨٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ رَاَيْتُ النَّاسَ يَفْعَلُوْنَهُ فَاَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ .

৩৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি লোকদের তালবিয়া এবং তাকবীর উভয়ই পাঠ করতে দেখেছি। তবে আমরা তাকবীর বলতাম। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি যে, আজকের দিন তালবিয়া পাঠ করা ওয়াজিব। তবে কখনো তাকবীর বলাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে তালবিয়া পাঠ করতেই হবে।

٣٨٩- اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَدَعُ التَّلْبِيَةَ (فِى الْحَجِّ) اِذَا انْتَهٰى اِلَى الْحَرَمِ حَتّٰى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُلَبِّى حَتّٰى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَةَ فَاِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ .

---

২. কিন্তু বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা অনুসারে তালবিয়ার শেষের অংশটুকুও রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়েছেন। যেমন ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলায়ফায় দুই রাক্আত নামায পড়লেন। অতঃপর যুল-হুলায়ফার মসজিদের নিকট তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন তিনি নিম্নোক্ত শব্দ দ্বারা তালবিয়া পাঠ করেন ঃ

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

৩৮৯। নাফে (র) বলেন, (হজ্জের ইহ্‌রাম অবস্থায়) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হজ্জের দিন হেরেম শরীফে প্রবেশ করে তাওয়াফ (কাবাঘর প্রদক্ষিণ) এবং সাঈ (সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়ানো) করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ বন্ধ রাখতেন, অতঃপর আবার তালবিয়া শুরু করতেন। অতঃপর সকাল বেলা যখন তিনি মিনা থেকে আরাফাতের দিকে যেতেন, তখন তালবিয়া পাঠ পুনরায় বন্ধ করে দিতেন।

٣٩٠- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ اِذَا رَاحَتْ اِلَى الْمَوْقِفِ .

৩৯০। আয়েশা (রা) যখন আরাফাতের দিকে যেতেন, তখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন।

٣٩١- حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِىْ عَلْقَمَةَ اَنَّ اُمَّهُ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْزِلُ بِعَرَفَةَ بِنَمِرَةَ ثُمَّ تَحَوَّلَتْ فَنَزَلَتْ فِى الْاَرَاكِ فَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِىْ مَنْزِلِهَا وَمَنْ كَانَ مَعَهَا فَاِذَا رَكِبَتْ تَوَجَّهَتْ اِلَى الْمَوْقِفِ تَرَكَتِ الْاِهْلَالَ وَكَانَتْ تُقِيْمُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ فَاِذَا كَانَ قَبْلَ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ خَرَجَتْ حَتّٰى تَاْتِىَ الْجُحْفَةَ فَتُقِيْمُ بِهَا حَتّٰى تَرَى الْهِلَالَ فَاِذَا رَاَتِ الْهِلَالَ اَهَلَّتْ بِالْعُمْرَةِ .

৩৯১। আলকামা (র) থেকে তার মায়ের (মারজানা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মারজানা) বলেন, আয়েশা (রা) আরাফাতে পৌছে নামেরা নামক স্থানে তাঁবু ফেলতেন। অতঃপর এখান থেকে অগ্রসর হয়ে আরাক নামক স্থানে তাঁবু ফেলতেন। তিনি যখন নিজ অবস্থান স্থানে থাকতেন, তখন তিনি ও তার সংগীরা তালবিয়া পাঠ করতেন। যখন তিনি আরাফাতে আসার জন্য সওয়ারীতে উঠতেন, তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন। হজ্জের পর তিনি মক্কায় অবস্থান করতেন এবং মুহাররমের নতুন চাঁদ উঠার আগেই মক্কা ত্যাগ করে আল-জুহফায় চলে আসতেন। নতুন চাঁদ উঠা পর্যন্ত তিনি এখানেই অবস্থান করতেন। মুহাররমের চাঁদ উঠার পর তিনি সেখানে থেকে উমরা করার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যে ব্যক্তি ইফরাদ অথবা কিরান হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে, সে কোরবানীর দিন জামরায় প্রথম পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করবে। এরপর তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে। আর যে ব্যক্তি শুধু উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধবে, সে তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী (হাজারে আসওয়াদ) স্পর্শ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে। এর সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং আরো কতক সাহাবীর আছার (কর্মনীতি) বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের আর সব ফিক্‌হবিদেরও এই মত।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা ।

٣٩٢- عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اٰمُرَ اَصْحَابِىْ وَمَنْ مَعِىَ اَنْ يَّرْفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالْاِهْلاَلِ بِالتَّلْبِيَةِ .

৩৯২। খাল্লাদ ইবনুস সায়েব আল-আনসারী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন আমার সাহাবী এবং আমার সাথের লোকদের নির্দেশ দেই, তারা যেন উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে"।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। নিচুস্বরে তালবিয়া পাঠ করার তুলনায় উচ্চস্বরে পাঠ করা অধিক উত্তম। ইমাম আবু হানীফাসহ আমাদের সকল ফিক্হবিদের এই মত।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ কিরান হজ্জের বর্ণনা।

٣٩٣- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ مِنْ اَصْحَابِهِ مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَّمَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَحَلَّ مَنْ كَانَ اَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يُحِلُّوْا .

৩৯৩। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদায় হজ্জের বছর কতক সাহাবী শুধু হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলেন, কতকে উমরার ইহ্রাম এবং কতকে হজ্জ ও উমরা উভয়টির ইহ্রাম বাঁধলেন। যেসব সাহাবী কেবল উমরার (তামাত্তু হজ্জের) ইহ্রাম বেঁধেছিলেন, তারা উমরা করার পর ইহ্রাম খুলে ফেললেন। আর যারা শুধু হজ্জ অথবা হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহ্রাম বেঁধেছিলেন, তারা ইহরাম খুলেননি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে এবং ইমাম আবু হানীফার মতে এই পন্থাই উত্তম।

٣٩٤- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ فِى الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ اِنْ صُدِدْتُّ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَخَرَجَ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَسَارَ حَتّٰى اِذَا ظَهَرَ عَلٰى ظَهْرِ الْبَيْدَاءِ اِلْتَفَتَ اِلٰى اَصْحَابِهِ وَقَالَ مَا اَمْرُهُمَا اِلاَّ وَاحِدًا اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ حَتّٰى اِذَا جَاءَ

الْبَيْتَ طَافَ بِهِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَاءَ ذٰلِكَ مَجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدٰى .

৩৯৪। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ফিতনার যুগে[৩] উমরা করার জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি বললেন, যদি আমি কাবাঘরে পৌছতে বাঁধাপ্রাপ্ত হই, তবে এরূপ পরিস্থিতিতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলাম, এক্ষেত্রেও তাই করবো। নাফে (র) বলেন, অতঃপর তিনি রওয়ানা হলেন এবং উমরার ইহ্‌রাম বাঁধলেন। বাইদা নামক স্থানে পৌছে তিনি নিজের সফরসংগীদের সম্বোধন করে বললেন, হজ্জ ও উমরার নিয়ম একই। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি উমরার সাথে হজ্জেরও নিয়াত করেছি।[৪] সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি বাইতুল্লায় পৌছলেন এবং সাতবার তাওয়াফ করলেন, অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করলেন, এর অধিক কিছু করলেন না। অর্থাৎ এক তাওয়াফকেই যথেষ্ট মনে করলেন এবং কোরবানী করলেন।

٣٩٥- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلٰثَةٍ وَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَسْئَلُوْنَهُ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ثَائِرُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنِّىْ ضَفَّرْتُ رَأْسِىْ وَأَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ مُّفْرَدَةٍ فَمَا ذَا تَرٰى قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ كُنْتُ مَعَكَ حِيْنَ أَحْرَمْتَ لَأَمَرْتُكَ أَنْ

---

৩. যে বছর আবদুল্লাহ ইবনুব যুবায়ের (রা) ও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মধ্যে খেলাফতের ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাকে ফিতনার যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে (অনুবাদক)।

৪. হজ্জ তিন প্রকার। যথা ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু। শুধু হজ্জের নিয়াত করে ইহ্‌রাম বাঁধলে তাকে ইফরাদ হজ্জ বলে। এক্ষেত্রে হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করার পর পুনরায় নতুনভাবে ইহ্‌রাম বেঁধে ও নিয়াত করে উমরা করতে হয়। হজ্জের মাসে প্রথমে উমরার নিয়াত করে হজ্জের নিয়াতে ইহ্‌রাম বাঁধলে তাকে তামাত্তু হজ্জ বলে। এক্ষেত্রে মক্কায় পৌছে প্রথমে উমরা করতে হয়। অতঃপর ইহ্‌রাম ভংগ করে পুনরায় ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাধা করতে হয়। তামাত্তু হজ্জকারীদের জন্য কোরবানী করা বাধ্যতামূলক। অন্য দুই প্রকারের হজ্জকারীদের জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়। একত্রে হজ্জ ও উমরার নিয়াতে ইহ্‌রাম বাঁধলে তাকে কিরান হজ্জ বলে। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকতে হয় এবং হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ করার পরই ইহ্‌রাম খোলা যায়।

উমরা শব্দের অর্থ যিয়ারত বা দর্শন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে বাইতুল্লাহ যিয়ারত করা। হজ্জের কার্যক্রম সমাধা করতে হয় যিলহজ্জ মাসে। কিন্তু উমরা বছরের যে কোন সময় করা যায়। তবে মক্কাবাসীদের জন্য হজ্জের মাসে উমরা করা নিষেধ। ইমাম মালেক ও শাফিঈর মতে উমরা করা ফরয। কেননা কুরআন মজীদে হজ্জ এবং উমরাকে যুগপৎভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে উমরা করা সুন্নাত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "উমরা কি ফরয?" তিনি বলেন ঃ "না, তবে তোমাদের পক্ষে উমরা করা উত্তম" (তিরমিযী) (অনুবাদক)।

تُهِلَّ بِهِمَا جَمِيْعًا فَاِذَا قَدِمْتَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكُنْتَ عَلٰى اِحْرَامِكَ لاَ تَحِلُّ مِنْ شَيْئٍ حَتّٰى تَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا يَوْمَ النَّحْرِ وَتَنْحَرَ هَدْيَكَ وَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَاَهْدِ فَقَالَتْ لَهُ امْرَاَةٌ فِى الْبَيْتِ وَمَا هَدْيُهُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ هَدْيُهُ ثَلٰثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ هَدْيُهُ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ ابْنُ عُمَرَ حَتّٰى اِذَا اَرَدْنَا الْخُرُوْجَ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْ لَمْ اَجِدْ اِلاَّ شَاةً لَكَانَ اُرٰى اَنْ اَذْبَحَهَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَصُوْمَ .

৩৯৫। স'দাকা ইবনে ইয়াসার আল-মক্কী (র) বলেন, আমি তারবিয়ার দিনের (৮ যিলহজ্জ) দুই-তিনদিন পূর্বে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র কাছে আসলাম। বহু লোক তার কাছে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসতো। এসময় ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার কাছে আসলো। তার মাথার চুলগুলো ছিল উষ্কখুষ্ক। সে বললো, হে আবু আবদুর রহমান! আমি আমার চুলগুলো বেঁধে নিয়েছি এবং শুধু উমরার জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছি। এখন আমার জন্য কি হুকুম? ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি যদি তোমার ইহ্‌রাম বাঁধার সময় তোমরা সাথে থাকতাম তবে আমি তোমাকে কিরান হজ্জ করার নির্দেশ দিতাম। অতঃপর যখন বাইতুল্লায় পৌছতে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে এবং কোরবানীর দিন কোরবানী না করা পর্যন্ত তুমি ইহরামমুক্ত হতে না । ইবনে উমার (রা) তাকে আরো বলেন, তোমার উষ্কখুষ্ক চুলগুলি কেটে ফেলো এবং পশু যবেহ করো। ঘরের মধ্য থেকে এক মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু আবদুর রহমান! তাকে কি যবেহ করতে হবে? তিনি বলেন, চুল কাটলে যে পশু যবেহ করতে হয় তা। মহিলাটি তিনবার জিজ্ঞেস করলো, আর তিনি তিনবার একই উত্তর দিলেন। অতঃপর ইবনে উমার (রা) নীরব হলেন। আমরা যখন বিদায় নেয়ার ইচ্ছা করলাম তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যদি বকরী ছাড়া অন্য কোন জন্তু না পাই, তাহলে আমার মতে রোযা রাখার চেয়ে বকরী যবেহ করাই উত্তম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি। আমাদের মতে কিরান হজ্জই সর্বোত্তম, যেমন ইবনে উমার (রা) বলেছেন। আর যখন উমরার জন্য ইহ্‌রাম বেঁধে তামাত্তু হজ্জের নিয়াত করবে, তখন তাওয়াফ ও সাঈ করার পর মাথার চুল খাটো করে ফেলবে এবং ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে যাবে। পুনরায় হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে হজ্জ করবে। অতঃপর কোরবানীর দিন মাথা কামিয়ে একটি বকরী যবেহ করলে তাও জায়েয হবে, যেমন ইবনে উমার (রা) বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

٣٩٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ وَهُمَا

يَذْكُرَانِ الْمُتْعَةَ (التَّمَتُّعَ) بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ لاَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ اِلاَّ مَنْ جَهِلَ اَمْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِى وَقَّاصٍ بِئْسَ مَا قُلْتَ قَدْ صَنَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ .

৩৯৬। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ও দাহ্হাক ইবনে কায়েস (রা) বলেন, যে বছর মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) হজ্জ করতে এসেছিলেন, তখন তারা উভয়ে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। দাহ্হাক ইবনে কায়েস (রা) বললেন, তামাত্তু হজ্জ সেই ব্যক্তি করতে পারে, যে আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে অবহিত নয়। উত্তরে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বললেন, তুমি এটা ঠিক বলোনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু হজ্জ করেছেন এবং আমরাও তাঁর সাথে এই হজ্জ করেছি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে ইফরাদ হজ্জ ও উমরার তুলনায় কিরান হজ্জ উত্তম। কিরান হজ্জকারী উমরার জন্য এক তাওয়াফ (সাত চক্কর) ও এক সাঈ (সাফা-মাওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়) করবে এবং দ্বিতীয় তাওয়াফ ও দ্বিতীয় সাঈ হজ্জের জন্য করবে। কেননা আমাদের মতে এক তাওয়াফ ও এক সাঈর তুলনায় দুই তাওয়াফ ও দুই সাঈ করা উত্তম। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে তা প্রমাণিত। তিনি কিরান হজ্জকারীকে দুই তাওয়াফ ও দুই সাঈ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হ্বিদের এই মত।

٣٩٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ اَفْصِلُوْا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ فَاِنَّهُ اَتَمُّ لِحَجِّ اَحَدِكُمْ وَاَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ اَنْ يَّعْتَمِرَ فِىْ غَيْرِ اَشْهُرِ الْحَجِّ .

৩৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, তোমরা নিজেদের হজ্জ ও উমরার মাঝখানে ব্যবধান সৃষ্টি করো। তাহলে তোমাদের প্রত্যেকের হজ্জও পূর্ণাংগ হবে এবং উমরাও পূর্ণাংগ হবে। অর্থাৎ সে যেন হজ্জের মাস ভিন্ন অন্য মাসে উমরা করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যে ব্যক্তি উমরা করে বাড়িতে ফিরে গেলো, অতঃপর পুনরায় এসে হজ্জ করে বাড়ি ফিরে গেলো, তার এই হজ্জ ও উমরা দুই সফরে সমাধা হলো। এটা কিরান হজ্জের তুলনায় অধিক উত্তম। তবে কিরান হজ্জ, মক্কা থেকে ইফরাদ হজ্জ, উমরা ও তামাত্তু হজ্জের তুলনায় অধিক উত্তম। কেননা কিরান হজ্জকারী হজ্জ ও উমরা বাড়ী থেকে এসে করলো। আর যখন সে তামাত্তু হজ্জ করলো তখন এটা তার মক্কী হজ্জ হলো। আর যদি ইফরাদ হজ্জ হয়ে থাকে, তবে তার উমরা মক্কী উমরা হিসাবে গণ্য হবে। এসব অবস্থায় কিরান হজ্জই উত্তম। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হ্বিদেরও এই মত।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশু মক্কায় পাঠানো।

٣٩٨- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ زِيَادَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ كَتَبَ اِلٰى عَائِشَةَ اَنَّ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ اَهْدٰى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْىِ فَاكْتُبِىْ اِلَىَّ بِاَمْرِكِ اَوْ بِاَمْرِ صَاحِبِ الْهَدْىِ قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىْ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ وَبَعَثَ بِهَا مَعَ اَبِىْ ثُمَّ لَمْ يَحْرُمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئٌ كَانَ اَحَلَّهُ اللّٰهُ حَتّٰى نُحِرَ الْهَدْىُ .

৩৯৮। আমরা বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান আয়েশা (রা)-র কাছে লিখে পাঠালো যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের কোরবানীর পশু মক্কায় (কোরবানী করার জন্য) পাঠাবে, হজ্জকারীর জন্য যা যা হারাম, তার জন্যও সেগুলো হারাম হবে"। আমি আমার কোরবানীর পশু মক্কায় পাঠিয়েছি। পত্রের মাধ্যমে অথবা লোক মারফত আমাকে আপনার পালনীয় কার্য অথবা কোরবানীর পশু প্রেরণকারীদের কার্য সম্পর্কে অবহিত করুন। আমরা বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, ইবনে আব্বাস (রা) যা বলেছেন, ব্যাপারটি তদ্রূপ নয়। আমার নিজ হাতে কোরবানীর পশুর গলার মালা তৈরি করেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তা পশুর গলায় বেঁধেছেন, অতঃপর আমার পিতার মারফত তা মক্কায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু পশু কোরবানী হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর উপর এমন কোন জিনিস হারাম হয়নি যা আল্লাহ তাঁর জন্য হালাল করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরাও এই মত গ্রহণ করেছি। কোরবানীর পশু মক্কায় পাঠালেই কোন ব্যক্তি ইহ্রামধারীদের পর্যায়ে পৌছে যায় না, যতোক্ষণ সে নিজে পশুর সাথে মক্কায় না যায়। কোন ব্যক্তি হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে কোরবানীর পশুসহ মক্কায় গেলে কেবল তার উপরই হজ্জকারীদের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ কার্যকর হয়। কিন্তু নিজ স্থানে অবস্থানকারী কোরবানীরপশু মক্কায় পাঠানোর কারণে ইহরামধারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং তার উপর কোন হালাল জিনিসও হারাম হবে না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর উটের গলায় মালা পরানো এবং কুঁজ ফেঁড়ে দেয়া।

٣٩٩- حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَهْدٰى هَدْيًا مِّنَ الْمَدِيْنَةِ وَقَلَّدَهُ وَاَشْعَرَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ يُقَلِّدُهُ قَبْلَ اَنْ يُّشْعِرَهُ وَذٰلِكَ فِىْ مَكَانٍ وَّاحِدٍ وَّهُوَ مُوَجِّهُهُ

اِلَى الْقِبْلَةِ يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهُ مِنْ شِقِّهِ الْاَيْسَرِ ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ حَتّٰى يُوْقَفُ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ يُدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ حَتّٰى اِذَا دَفَعُوْا فَاِذَا قَدِمَ مِنًى مِّنْ غَدَاتِ يَوْمِ النَّحْرِ نَحَرَهُ قَبْلَ اَنْ يَحْلِقَ اَوْ يُقَصِّرَ وَكَانَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ يَصُفُّهُنَّ قِيَامًا وَيُوَجِّهُهُنَّ لِلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَاْكُلُ وَيُطْعِمُ .

৩৯৯। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) যখন মদীনা থেকে কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে যেতেন, তখন যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে এর গলায় মালা পরাতেন এবং কুঁজ ফেঁড়ে দিতেন। কিন্তু তিনি কুঁজ ফাঁড়ার পূর্বে গলায় মালা পরাতেন, তবে উভয় কাজ এক জায়গায়ই করতেন। প্রথমে তিনি কোরবানীর পশুর মুখ কিবলার দিকে করে এর গলায় একজোড়া জুতা বেঁধে দিতেন, অতঃপর বাঁদিক থেকে এর কুঁজ ফেঁড়ে দিতেন। অতঃপর তিনি কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে আরাফাতের ময়দান পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন এবং আরাফাতের দিন লোকদের সাথে একত্রে অবস্থান করতেন। অতঃপর তিনি লোকদের সাথে মুযদালিফায় প্রত্যাবর্তন করতেন এবং কোরবানীর পশু সাথেই থাকতো। কোরবানীর দিন সকালবেলা তিনি মিনায় পৌঁছে মাথা কামানোর পূর্বে কোরবানী করতেন। তিনি নিজের পশু নিজ হাতেই কোরবানী করতেন। কাতারবন্দী করে পশুগুলোকে তিনি কিবলামুখী করে দাঁড় করাতেন। কোরবানীর গোশত তিনি নিজেও খেতেন এবং অন্যদেরও খাওয়াতেন।

٤٠٠-حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا وَخَزَ فِىْ سَنَمِ بَدَنَةٍ وَهُوَ يُشْعِرُهَا قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ .

৪০০। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) যখন খোঁচা মেরে কোরবানীর পশুর কুঁজ জখম করতেন, তখন 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলতেন।

٤٠١- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُشْعِرُ بَدَنَتَهُ فِى الشِّقِّ الْاَيْسَرِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صِعَابًا مُّقَرَّنَةً فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمَا اَشْعَرَ مِنَ الشِّقِّ الْاَيْمَنِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُّشْعِرَهَا وَجَّهَهَا اِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ فَاِذَا اَشْعَرَهَا قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَكَانَ يُشْعِرُهَا بِيَدِهِ وَيَنْحَرُهَا بِيَدِهِ قِيَامًا .

৪০১। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) কোরবানীর পশুর কুঁজ বাঁদিক থেকে ফেঁড়ে দিতেন, কিন্তু পশুর চলতে কষ্ট হলে ডানদিক থেকে ফাঁড়তেন। এ সময় তিনি পশুকে কিবলামুখী করে নিতেন এবং বলতেন, "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার"। তিনি নিজ হাতেই কুঁজ ফাঁড়তেন এবং নিজ হাতেই (পশু) দাঁড়ানো অবস্থায় কোরবানী করতেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। কুঁজ ফাঁড়ার চেয়ে মালা পরানোই উত্তম। আর বাঁদিক থেকে কুঁজ ফাঁড়তে হবে কিন্তু বাঁদিক থেকে করলে কষ্ট বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে কুঁজের ডানদিক ফেঁড়ে দিবে।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা।

٤٠٢- عَنْ اَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنْ عُمَرَ وَجَدَ رِيْحَ طِيْبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ فَقَالَ مِمَّنْ رِيْحُ هٰذَا الطِّيْبِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ مِنِّىْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ مِنْكَ لَعَمْرِىْ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ طَيَّبَتْنِىْ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَّهُ .

৪০২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র মুক্তদাস আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) শাজার[৫] নামক স্থানে সুগন্ধি আঁচ করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কার কাছ থেকে সুগন্ধির ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে? মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার কাছ থেকে ঘ্রাণ আসছে। তিনি বলেন, আমার শপথ! তোমার কাছ থেকে ঘ্রাণ আসছে? তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! উম্মে হাবীবা আমাকে সুগন্ধি মেখে দিয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র দোহাই! তুমি তা এখনই ফিরে গিয়ে ধুয়ে ফেলো।

٤٠٣- اَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ زُبَيْدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ اَهْلِهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَجَدَ رِيْحَ طِيْبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ وَاِلَى جَنْبِهِ كَثِيْرُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ مِمَّنْ رِيْحُ هٰذِهِ الطِّيْبِ قَالَ كَثِيْرُ مِنِّىْ لَبَّدْتُ رَاْسِىْ وَاَرَدْتُ اَنْ لاَّ اُحْلِقَ قَالَ عُمَرُ فَاذْهَبْ اِلَى شُرَبَةٍ فَادْلُكْ مِنْهَا رَاْسَكَ حَتّٰى تُنْقِيَهُ فَفَعَلَ كَثِيْرُ بْنُ الصَّلْتِ .

৪০৩। সালত ইবনে যুবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) শাজার নামক স্থানে সুগন্ধির ঘ্রাণ পেলেন। তার পাশে ছিল কাছীর ইবনুস সাল্ত (র)। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কার কাছ থেকে এই ঘ্রাণ আসছে? কাছীর বললেন, আমার কাছ থেকে। আমি তা মাথায় মেখেছিলাম, আমার ইচ্ছা ছিল মাথা কামাবো না। উমার (রা) বলেন, শুরাবার (কূপ) কাছে চলে যাও এবং তাতে মাথা ভালো করে মলে ধুয়ে নাও। কাছীর ইবনুস সাল্ত তাই করলেন

---

৫. মদীনা থেকে ছয় মাইল দূরে একটি জায়গার নাম আশ-শাজার (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। ইহ্‌রাম বাঁধার নিয়াত করলে আর সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না। তবে সুগন্ধি মাখার পর গোসল করে নিলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহারে কোন দোষ নেই।[৬]

১০. অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশু পথিমধ্যে চলতে অক্ষম হয়ে পড়লে।

٤٠٤- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا ثُمَّ عَطِبَتْ فَنَحَرَهَا فَلْيَجْعَلْ قِلاَدَتَهَا وَنَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا ثُمَّ يَتْرُكْهَا لِلنَّاسِ يَاكُلُوْنَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْئٌ فَاِنْ هُوَ اَكَلَ مِنْهَا اَوْ اَمَرَ بِاَكْلِهَا فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ .

৪০৪। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলতেন, যে ব্যক্তি নফল কোরবানীর উট নিয়ে রওয়ানা হয় এবং পথিমধ্যে যদি তা হালাক হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তবে সে পশুটি যবেহ করবে এবং তার গলার মালা ও জুতা তার রক্তের মধ্যে ফেলে দিবে। অতঃপর তা লোকদের খাওয়ার জন্য রেখে দিবে এবং তাকে এর কোন ক্ষতিপূরণ করতে হবে না। অবশ্য সে যদি তার গোশত খায় অথবা অন্যদের খেতে নির্দেশ দেয়, তবে তাকে এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

٤٠٥- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ كَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْحَرْ وَاَلْقِ قِلاَدَتَهَا اَوْ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا وَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا يَاكُلُوْنَهَا .

৪০৫। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোরবানীর পশু নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, পথিমধ্যে কোরবানীর পশু অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা কি করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তা যবেহ করো এবং তার মালা ও জুতা তার রক্তের মধ্যে ফেলে দাও। অতঃপর তা লোকদের খাওয়ার জন্য রেখে দাও"।

٤٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ كُنْتُ اَرَى ابْنَ عُمَرَ يُهْدِيْ فِى الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ وَفِى الْعُمْرَةِ بَدَنَةً قَالَ وَرَاَيْتُهُ فِى الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِىَ قَائِمَةٌ

---

৬. ইমাম আবু হানীফার মতে, ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা বরং মুস্তাহাব। তিনি নিম্নোক্ত হাদীস নিজের মতের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন ঃ আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইহ্‌রাম বাঁধার প্রস্তুতি নিতেন, তখন আমি তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিতাম (আবু দাউদ)। সাঈদ ইবনে মানসূর নকল করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, "আমার পিতা যখন ইহ্‌রাম বাঁধতেন, আমি তাঁকে সুগন্ধি মেখে দিতাম। মুনযিরী বলেন, অধিকাংশ সাহাবীই ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহারকে মুস্তাহাব বলেছেন (অনুবাদক)।

فِيْ حَرْفِ دَارِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ وَكَانَ فِيْهَا مَنْزِلُهُ وَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِيْ لَبَّةِ بَدَنَتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ سِنَّةُ الْحَرْبَةِ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا (حَنَكِهَا) .

৪০৬। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি হজ্জের বেলায় দু'টি করে উট এবং উমরার বেলায় একটি উট কোরবানীর জন্য পাঠাতেন। রাবী বলেন, আমি আরো দেখেছি যে, তিনি উমরার সময় একটি উট দাঁড়ানো অবস্থায় খালিদ ইবনে উসাইদের ঘরের কাছে যবেহ করেছেন। এই সময় তিনি তার ঘরেই অবস্থান করতেন। রাবী বলেন, আমি আরো দেখেছি যে, তিনি তার উটের কণ্ঠনালীতে এতো জোরে বল্লম মেরেছেন যে, তার ফলা উটের কাঁধ ভেদ করে চলে গেছে।

٤٠٧- أَخْبَرَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ الْقَارِيُّ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسِ بْنِ أَبِيْ رَبِيْعَةَ أَهْدَى عَامًا بَدَنَتَيْنِ اِحْدٰهُمَا بُخْتِيَّةٌ .

৪০৭। আবু জাফর আল-কারী (র) বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আইয়্যাশ ইবনে আবু রবীআকে দেখছেন যে, এক বছর তিনি দু'টি উট কোরবানী করেছেন। তার মধ্যে একটি ছিল বুখতী (লম্বা কুঁজবিশিষ্ট) উট।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। নফল কোরবানীর পশু পথিমধ্যে অচল হয়ে পড়লে হাদীসে উল্লেখিত পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তা যবেহ করে লোকদের খাওয়ার জন্য রেখে দিবে। কিন্তু গরীব লোক ছাড়া অন্যদের তা খাওয়া ঠিক নয়।

٤٠٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ أَوْ أُشْعِرَ وَأُوْقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ .

৪০৮। ইবনে উমার (রা) বলতেন, হাদ্‌য়ি (কোরবানীর পশু) তাই যার গলায় মালা পরানো হয়েছে অথবা কুঁজ কাটা হয়েছে এবং আরাফাতের ময়দানে দাঁড় করানো হয়েছে।

٤٠٩- حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلاً وَيُشْعِرُهَا ثُمَّ يَسُوْقُهَا فَيَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهُ مَحِلٌّ دُوْنَ ذٰلِكَ وَمَنْ نَذَرَ جَزُوْرًا مِّنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ .

৪০৯। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানত হিসাবে কোরবানীর পশু (মক্কায়) পাঠাবে, সে যেন তার গলায় জুতার মালা পরিধান করায়, তার কুঁজ কাটে এবং এটাকে আল্লাহ্‌র ঘরের নিকট অথবা মিনায় কোরবানীর দিন কোরবানী করে। কেননা এটাই তার কোরবানীর স্থান। আর যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্য উট অথবা গরু মানত করে, সে তা যেখানে ইচ্ছা কোরবানী করতে পারে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র বক্তব্য। অন্যথায় নবী ﷺ এবং অধিকাংশ সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা যে কোন স্থানে উট কোরবানী করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু একদল মনীষী বলেছেন, হাদ্‌য়ি-কে মক্কায় যবেহ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ "নজরানা কাবায় পৌছিয়ে দিতে হবে" (মাইদা ঃ ৯৫)। কিন্তু উট ও গরুর ক্ষেত্রে এই শর্ত নেই। তাই তা যেখানে ইচ্ছা কোরবানী করা যেতে পারে। তবে যে ব্যক্তি হেরেম শরীফের এলাকায় কোরবানী করার নিয়াত করেছে তাকে সেখানেই কোরবানী করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা, ইবরাহীম নাখঈ এবং মালেক ইবনে আনাসেরও এই মত।

٤١٠- اَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّهُ سَئَلَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدَنَةٍ جَعَلَتْهَا امْرَاَتُهُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ سَعِيْدٌ الْبُدْنُ مِنَ الْاِبِلِ وَمُحِلُّ الْبُدْنِ الْبَيْتُ الْعَتِيْقُ الاَّ اَنْ تَكُوْنَ سَمَّتْ مَكَانًا مِّنَ الْاَرْضِ فَلْتَنْحَرْهَا حَيْثُ سَمَّتْ فَاِنْ لَّمْ تَجِدْ بُدْنَةً فَبَقَرَةٌ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ بَقَرَةٌ فَعَشْرَةٌ مِّنَ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ سَئَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اِنْ لَّمْ تَجِدْ بَقَرَةً فَسَبْعٌ مِّنَ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ خَارِجَةَ ابْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَئَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمٌ ثُمَّ جِئْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ.

৪১০। আমর ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আনসারী (র) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বুদনা (কুরবানীর পশু) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যা তার স্ত্রী মানত করেছিল। সাঈদ জবাব দিলেন, তা উট এবং বাইতুল্লাহ্‌র চত্বর হলো তার কোরবানীর স্থান। তবে মানত করার সময় সে কোন নির্দিষ্ট স্থানের নাম উল্লেখ করে থাকলে তা সেখানেই যবেহ করতে হবে। যদি উট পাওয়া না যায় তবে তার পরিবর্তে একটি গরু এবং গরুও না পাওয়া গেলে দশটি বকরী কোরবানী করতে হবে। রাবী বলেন, অতঃপর আমি এ ব্যাপারে সালেম ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও সাঈদের অনুরূপ কথা বলেন। তবে তিনি বলেন, উটের পরিবর্তে গরুও না পাওয়া গেলে সাতটি বকরী কোরবানী করতে হবে। রাবী বলেন, অতঃপর আমি খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিতের কাছে গিয়ে একই বিষয় জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সালেমের অনুরূপ জওয়াব দিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলীর কাছে গেলাম, তিনিও সালেমের অনুরূপ জওয়াব দিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উট ও গরুকে 'বুদনা' বলে। তা যে কোন স্থানে কোরবানী করা যেতে পারে। কিন্তু যদি তা হেরেম শরীফের এলাকায় যবেহ করার নিয়াত করা হয়ে থাকে, তবে তা সেখানেই যবেহ করতে হবে এবং এটা তার পক্ষ থেকে হাদ্‌য়ি হবে। উট ও

গরু একত্রে সাতজনে কোরবানী করতে পারে, এর অধিক নয়। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের অন্যান্য ফিক্‌হবিদেরও এই মত।[৭]

১১. অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুর পিঠে সওয়ার হওয়া।

٤١١- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ اِذَا اضْطَرَرْتَ اِلَى بُدْنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوْبًا غَيْرَ قَادِحٍ .

৪১১। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রয়োজনবোধে তুমি তোমার কোরবানীর পশুর পিঠে সওয়ার হতে পারো। কিন্তু এতো বেশী পরিমাণে নয় যাতে তার কষ্ট হতে পারে।

٤١٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ يَّسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ لَهُ بَعْدَهَا مَرَّتَيْنِ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ .

---

৭. গোটা অনুচ্ছেদে কোরবানীর পশুর পরিভাষা হিসাবে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঃ হাদ্‌য়ি (الهدى) এবং বুদন (البدن)। কুরআন মজীদে 'হাদ্‌য়ি' শব্দটি সূরা বাকারার ১৯৬ নং আয়াতে তিনবার, সূরা মাইদার ২, ৯৫ ও ৯৭ নং আয়াতে একবার করে এবং সূরা ফাত্‌হ্-এর ১৫ নং আয়াতে একবার ব্যবহৃত হয়েছে। এসব স্থানে শব্দটির অর্থ করা হয়েছে "কোরবানীর পশু"। উল্লেখিত আয়াতগুলো পাঠে অনুধাবন করা যায় যে, হজ্জযাত্রীগণ মক্কায় কোরবানীর উদ্দেশ্যে যেসব পশু নিজেদের সাথে করে নিয়ে যান হাদ্‌য়ি (الهدى) শব্দের দ্বারা এই ধরনের পশুকে বুঝানো হয়েছে। মান্নতের কোরবানীর পশু বুঝাতেও শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। অপরদিকে 'বুদ্‌ন' শব্দটি সাধারণ কোরবানীর পশুকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মজীদের শুধু এক জায়গায়ই (সূরা হজ্জের ৩৬ নং আয়াত) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। আরবী ভাষায় কেবল উটের জন্যই এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নবী ﷺ কোরবানীর ক্ষেত্রে উটের সংগে গরুকেও এই শব্দের মধ্যে শামিল করেছেন।

একটি উট যেমন সাতভাগে কোরবানী করা যায়, অনুরূপভাবে একটি গরুও সাতভাগে কোরবানী করা যায়। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ

اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَشْتَرِكَ فِى الْاَضَاحِىْ الْبُدْنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কোরবানীর ব্যাপারে আমাদেরকে পরস্পরের সাথে শরীক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। একটি উটে সাত ব্যক্তি এবং একটি গরুতেও সাত ব্যক্তি শরীক হতে পারে" (মুসলিম)।

ইবরাহীম নাখঈ, আবু হানীফা, মালেক, মুহাম্মাদ এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী আবু ইউসুফের মতে সামর্থ্যবান মুসলমানদের উপর কোরবানী করা ওয়াজিব। কিন্তু শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং আবু ইউসুফের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী কোরবানী করা সুন্নাত।

এখানে একটি কথা জেনে রাখা ভালো যে, মক্কা শরীফে কোরবানীর দিন হাজ্জীদের ঈদের নামায পড়তে হয় না। এই দিন তারা প্রথমে জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করেন, অতঃপর কোরবানী করেন, অতঃপর মাথার চুল কাটান, অতঃপর কাবা ঘর তাওয়াফ করেন এবং কোন কোন হাজ্জীকে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে হয় (অনুবাদক)।

৪১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে একটি কোরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি তাকে বলেন ঃ "এর পিঠে সওয়ার হয়ে যাও"। সে বললো, এটা কোরবানীর উট। এরপর তিনি দুইবার বলেন ঃ "এর পিঠে চড়ে যাও, তোমার জন্য দুঃখ হয়"।

٤١٣-أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا انْتَجَتِ الْبَدَنَةُ فَلْيَحْمِلْ وَلَدَهَا مَعَهَا حَتّٰى يُنْحَرَ مَعَهَا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَحْمَلاً فَلْيَحْمِلْهُ عَلٰى اُمِّهٖ حَتّٰى يُنْحَرَ مَعَهَا .

৪১৩। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, কোরবানীর উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসব করলে তাও সাথে নিয়ে যেতে হবে এবং এটাও তার মায়ের সাথে কোরবানী করতে হবে। যদি তা সাথে করে নিয়ে যাওয়ার কোন উপায় না থাকে, তবে তাকে এর মায়ের পিঠের উপর উঠিয়ে দিবে, অতঃপর গন্তব্যে পৌছে উভয়টি কোরবানী করতে হবে।

٤١٤- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَوْ عُمَرَ شَكَّ مُحَمَّدٌ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ اَهْدٰى بَدَنَةً فَضَلَّتْ اَوْ مَاتَتْ فَاِنْ كَانَتْ نَذْرًا اَبْدَلَهَا (بَدَّلَهَا) وَاِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَاِنْ شَاءَ اَبْدَلَهَا وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهَا .

৪১৪। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) অথবা (ইমাম মুহাম্মাদের সন্দেহ) উমার (রা) বলতেন, কোন ব্যক্তি (মক্কায়) কোরবানীর উট পাঠালো, অতঃপর তা হারিয়ে গেলো অথবা মারা গেলো। যদি তা মানতের কোরবানী হয়ে থাকে, তবে এর পরিবর্তে আরেকটি উট কোরবানী করতে হবে। আর যদি তা নফল কোরবানী হয়ে থাকে, তবে সে ইচ্ছা করলে এর পরিবর্তে আরেকটি পশু কোরবানী করতে পারে আবার নাও করতে পারে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি। প্রয়োজনবোধে কোরবানীর পশু বাহন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে যতোটুকু ক্ষতি হবে ততো পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ।

٤١٥- عَنْ نَافِعٍ قَالَ الْمُحْرِمُ لاَ يُصْلِحُ لَهُ اَنْ يَّنْتِفَ مِنْ شَعْرِهٖ شَيْئًا وَلاَ يَحْلِقَهُ وَلاَ يُقَصِّرَهُ اِلاَّ اَنْ يُّصِيْبَهُ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يُّقَلِّمَ اَظْفَارَهُ وَلاَ يَقْتُلُ قُمْلَةً وَّلاَ يَطْرَحُهَا مِنْ رَّاْسِهٖ اِلَى الْاَرْضِ وَلاَ مِنْ جَسَدِهٖ (جِلْدِهٖ) وَلاَ مِنْ ثَوْبِهٖ وَلاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَاْمُرُ بِهٖ وَلاَ يَدُلُّ عَلَيْهِ .

৪১৫। নাফে (র) বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় নিজ দেহের চুল তোলা, মাথা কামানো, চুল খাটো করা ইত্যাদি সংগত নয়। কিন্তু মাথায় ঘা বা অন্য কোন রোগ দেখা

দিলে চুল কামানো বা খাটো করা জায়েয। তবে এজন্য ফিদ্‌য়া দিতে হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। ইহরাম অবস্থায় নখ কাটা, উকুন মারা বা তা মাথা অথবা শরীর অথবা পরিধানের কাপড়ের উপর থেকে নিচে ফেলে দেয়া, নিজে শিকার করা বা অন্যকে শিকারের নির্দেশ দেয়া বা একাজে সাহায্য করা তার জন্য বৈধ নয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। ইমাম আবু হানীফা (র)-ও এই মত গ্রহণ করেছেন।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো।

٤١٦- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ اِلاَّ اَنْ يُضْطَرَّ اِلَيْهِ مِمَّا لاَ بُدَّ مِنْهُ .

৪১৬। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, কেউ ইহ্‌রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করাবে না। তবে কোন কারণে সে বাধ্য হয়ে পড়লে তা জায়েয।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করাতে কোন দোষ নেই, কিন্তু মাথা কামানো জায়েয নয়। আমরা জানতে পেরেছি যে, নবী ﷺ রোযা অবস্থায় ও ইহ্‌রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।[৮] আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হ্‌বিদের এই মত।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় মুখ ঢাকা।

٤١٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَاَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ قَدْ غَطّٰى وَجْهَهُ بِقَطِيْفَةٍ اُرْجُوَانٍ ثُمَّ اُتِىَ بِلَحْمِ صَيْدٍ فَقَالَ كُلُوْا قَالُوْا لاَ تَاكُلُ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنَّمَا صِيْدَ مِنْ اَجْلِيْ .

৪১৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীআ (র) বলেন, আমি আল-আর্‌য নামক স্থানে উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে গরমের দিনে ইহ্‌রাম অবস্থায় একটি লাল চাদর দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে দেখেছি। ইতিমধ্যে তার কাছে শিকার করা প্রাণীর গোশত এলো। তিনি সাথের লোকদের বলেন, তোমরা খাও। তারা বললো, আপনি খাবেন না? তিনি বলেন, আমার অবস্থা তোমাদের মতো নয়, শিকার আমার উদ্দেশেই করা হয়েছিল।

٤١٨- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّاْسِ فَلاَ يُخَمِّرُهُ الْمُحْرِمُ .

---

৮. ইমাম মালেকের 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থে মুরসাল রিওয়ায়াত এবং বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে মারফূ রিওয়ায়াত এসেছে যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন" (অনুবাদক)।

৪১৮। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, চিবুকের উপরিভাগ মাথার মধ্যে গণ্য হবে। ইহ্‌রাম অবস্থায় কেউ তা ঢেকে রাখবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-র মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা ধোয়া বা গোসল করা।

٤١٩-حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ الاَّ مِنَ الْاِحْتِلاَمِ.

৪১৯। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) স্বপ্নদোষ না হলে ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা ধৌত করতেন না।

٤٢٠- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَّالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ تَمَارَيَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ فَاَرْسَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اِلَى اَبِىْ اَيُّوْبَ يَسْئَلُهُ فَوَجَدَهُ يَغْسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَسْئَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الثَّوْبِ وَطَأْطَأَ حَتّٰى بَدَا لِىْ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لاِنْسَانٍ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ اُصْبُبْ فَصَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَاَقْبَلَ بِيَدِهِ وَاَدْبَرَ فَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُهُ يَفْعَلُ.

৪২০। ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবওয়া নামক স্থানে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা)-র মতবিরোধ হলো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহরামধারী ব্যক্তি তার মাথা ধৌত করতে পারে। আর মিসওয়ার (রা) বলেন, না। ইবনে আব্বাস (রা) সঠিক মাসআলা অবগত হওয়ার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইনকে আবু আইউব আনসারী (রা)-র কাছে পাঠান। তিনি গিয়ে দেখলেন, আবু আইউব (রা) কূপের সাথে লাগানো দুই খুঁটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে পর্দা টানিয়ে গোসল করছেন। রাবী বলেন, আমি তাকে সালাম দিলাম। তিনি বলেন, কে? আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন। ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় কিভাবে তাঁর মাথা ধৌত করতেন? আবু আইউব (রা) তার উভয় হাত পর্দার কাপড়ের উপর রেখে তা মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করলেন এবং আমাকে তার মাথা দেখান। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন, পানি ঢালো। লোকটি

আগে থেকেই তাকে গোসলে সাহায্য করছিল। সে তার মাথায় পানি ঢাললো। তিনি নিজ হাতে গোটা মাথা মললেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে তার মাথা ধৌত করতে দেখেছি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা আবু আইউব আনসারী (রা)-র বক্তব্য গ্রহণ করেছি। ইহ্‌রাম অবস্থায় পানি দিয়ে মাথা ধোয়ায় কোন দোষ নেই। কেননা মাথায় পানি ঢাললে চুল আরো এলোমেলো হয়ে যায়। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

٤٢١- عَنْ عَطَاءِ ابْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنَيَّةَ وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ مَاءً وَعُمَرُ يَغْتَسِلُ اُصْبُبْ عَلَى رَأْسِىْ قَالَ لَهُ يَعْلَى اَتُرِيْدُ اَنْ تَجْعَلَهَا فِىَّ اِنْ اَمَرْتَنِىْ صَبَبْتُ قَالَ اُصْبُبْ فَلَمْ يَزِدْ (فَلَنْ يُزِيْدَهُ) الْمَاءُ اِلاَّ شَعْثًا

৪২১। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইয়ালা ইবনে মুনাইয়্যা (র)-কে বললেন, গোসলের সময় তিনি তার মাথায় পানি ঢালছিলেন, আমার মাথায় পানি ঢালো। ইয়ালা (র) বলেন, আপনি আমার দ্বারা এই গুনাহ করাতে চান? আপনি যদি নির্দেশ দেন তবে আমি আপনার মাথায় পানি ঢালবো। উমার (রা) বলেন, পানি ঢালো। কেননা মাথায় পানি ঢাললে চুল আরো বেশী এলোমেলো হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথায় পানি ঢালতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় যে ধরনের কাপড় পরিধান করা মাকরূহ।

٤٢٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَئَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَاذَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقُمُسَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ .

৪২২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলো, ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে? তিনি বলেন ঃ সে জামা, পাগড়ি, টুপি, পাজামা ও মোজা পরিধান করবে না। যদি কোন ব্যক্তি জুতা সংগ্রহ করতে না পারে, তবে সে মোজা পরিধান করতে পারবে। কিন্তু মোজার উপরিভাগ পায়ের গোছার নিচে থেকে কেটে নিতে হবে। যে কাপড়ে জাফরান অথবা সুগন্ধ ঘাসের রং লাগানো আছে, ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি তাও পরিধান করবে না।

٤٢٣- قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَّصْبُوْغًا بِزَعْفَرَانَ اَوْ وَرْسٍ وَقَالَ مَنْ لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৪২৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরামধারী ব্যক্তিকে জাফরান অথবা সুগন্ধ ঘাসে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুতা সংগ্রহ করতে পারেনি, সে মোজা পরিধান করবে, তবে মোজার উপরিভাগ গোছার নিচে থেকে কেটে ফেলবে।

٤٢٤-عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لاَ تَتَنَقَّبِ الْمَرْاَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ.

৪২৪। ইবনে উমার (রা) বলতেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা মুখ ঢাকবে না এবং হস্তাবরণীও পরবে না।[৯]

٤٢٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى عَلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ثَوْبًا مَّصْبُوْغًا وَّهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ عُمَرُ مَا هٰذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوْغُ يَا طَلْحَةُ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّمَا هُوَ مِنْ مَّدَرٍ قَالَ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الرَّهْطُ اَئِمَّةٌ يَّقْتَدِىْ بِكُمُ النَّاسُ وَلَوْ اَنَّ رَجُلاً جَاهِلاً رَاٰى هٰذَا الثَّوْبَ يَقَالَ اِنَّ طَلْحَةَ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ فِى الْاِحْرَامِ .

৪২৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-র পরিধানে রংগিন কাপড় দেখতে পেলেন। অথচ তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। উমার (রা) বলেন, হে তালহা! এটা তো রঞ্জিত কাপড়। তিনি বলেন, হে আমীরুল

৯. ইবনুল মুনযির বলেন, এ ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মহিলারা ইহ্‌রাম অবস্থায় সেলাই করা রঙ্গিন পাকড় ও মোজা পরিধান করতে পারবে। তারা মাথা এবং চুল ঢেকে রাখবে, কিন্তু মুখমণ্ডল ঢাকবে না। তবে পুরুষ লোকের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য মাথার উপর দিয়ে চেহারার উপর হালকা কাপড় ঝুলিয়ে দিতে পারবে, কিন্তু ওড়না ঝুলাতে পারবে না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "আমাদের সামনে দিয়ে লোকেরা সওয়ার অবস্থায় অতিক্রম করতো। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলাম। অতএব সওয়ারী যখন আমাদের সামনে এসে যেতো, তখন আমরা মুখের উপর নেকাব টেনে দিতাম। সওয়ারী অতিক্রম করে চলে গেলে আমরা চেহারা থেকে নেকাব তুলে নিতাম" (আবু দাউদ)। ফাতিমা বিনতুল মুনযির (রা) বলেন, "আমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকতাম, আমরা ছিলাম আবু বাক্‌র কন্যা আসমা (রা)-র সাথে। কিন্তু তিনি আমাদের মুখ ঢাকতে নিষেধ করেননি" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক) (অনুবাদক)।

মুমিনীন! এটা মেটে রং। উমার (রা) বলেন, তোমরা হচ্ছো পথপ্রদর্শক। লোকজন তোমাদের অনুসরণ করে থাকে। কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যে এই রং-এর সাথে পরিচিত নয়, সে এই কাপড় তোমার পরিধানে দেখলে অবশ্যই বলবে, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) ইহ্‌রাম অবস্থায় রংগিন কাপড় পরিধান করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় রংগিন কাপড় পরিধান করা মাকরূহ, তা সুগন্ধ ঘাসের মাধ্যমেই হোক অথবা জাফরান দ্বারা রঞ্জিত হোক। তবে যদি এমন ধরনের রং হয় যা ধুইলে সুগন্ধি দূর হয়ে যায়, তাহলে এধরনের কাপড় পরিধান করায় কোন দোষ নেই। অনন্তর ইহ্‌রাম অবস্থায় মহিলাদের মুখ ঢাকা নিষেধ। তবে সে যদি মুখ ঢাকতে চায়, তাহলে মাথার ওড়নার উপর দিয়ে একটি কাপড় (নেকাব) এমনভাবে ঝুলিয়ে দিবে যাতে তা তার মুখমণ্ডল স্পর্শ না করে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হ্‌বিদের এই মত।

٤٢٦- عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ وَعَلَى اَعْرَابِىٍّ قَمِيْصٌ بِهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِىْ اَصْنَعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْزِعْ قَمِيْصَكَ وَاغْسِلْ هٰذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ وَافْعَلْ فِىْ عُمْرَتِكَ مِثْلَ مَا تَفْعَلُ فِىْ حَجِّكَ .

৪২৬। আতা ইবনে আবু রাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক বেদুইন আসলো। তিনি তখন হুনাইনে ছিলেন। লোকটির পরিহিত জামায় হলুদ রং-এর চিহ্ন ছিল। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি উমরার জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছি, আপনি আমাকে এখন কিভাবে তা পালন করার নির্দেশ দেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমার পরিধানের জামা খুলে এই রং ধুয়ে ফেলো, অতঃপর যে নিয়মে হজ্জ করো ঠিক সেই নিয়মে উমরা করো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। জামা খুলে নিয়ে তার হলুদ রং ধুয়ে ফেলতে হবে।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় কোন্ ধরনের প্রাণী হত্যা করা জায়েয।

٤٢٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِىْ قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَاَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ .

৪২৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ পাঁচ প্রকারের প্রাণী হত্যা করা মুহরিম ব্যক্তির জন্য বৈধ ঃ কাক, ইঁদুর, বিছা, চিল ও পাগলা কুকুর।

٤٢٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ .

৪২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এমন পাঁচটি প্রাণী আছে, কোন ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় তা হত্যা করলে তার কোন অপরাধ হবে না। সেগুলো হচ্ছে ঃ বিছা, ইঁদুর, মস্তিষ্ক বিকৃত কুকুর, কাক ও চিল।

٤٢٩-اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ اَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِى الْحَرَمِ.

৪২৯। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) হেরেমের মধ্যে সাপ মারার নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٣٠- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِى اَنَّ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ كَانَ يَقُوْلُ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْوَزَاغِ .

৪৩০। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গিরগিটি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উল্লেখিত সমুদয় হাদীসের উপর আমরা আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার পর কেউ যদি হজ্জ করতে সক্ষম না হয়।

٤٣١-عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ هَبَّارَبْنَ الْاَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ يَنْحَرُ بُدْنَهُ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْطَاْنَا فِى الْعِدَّةِ كُنَّا نَرٰى اَنَّ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِذْهَبْ اِلٰى مَكَّةَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَّبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ وَانْحَرْ هَدْيًا اِنْ كَانَ مَعَكَ ثُمَّ اَحْلِقُوْا اَوْ قَصِّرُوْا وَارْجِعُوْا فَاِذَا كَانَ قَابِلٌ فَحُجُّوْا وَاَهْدُوْا فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعْتُمْ.

৪৩১। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ (রা) কোরবানীর দিন উমার (রা)-র কাছে আসলেন। হযরত উমার (রা) তখন নিজের উট কোরবানী করছিলেন। তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা তারিখ গণনায় ভুল করেছি। আমরা মনে করেছিলাম, আজ আরাফাতের দিন। উমার (রা) তাকে বলেন, তুমি তোমার সাথের লোকদের নিয়ে মক্কায় যাও এবং সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করো, সাতবার সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করো এবং তোমার সাথে কোরবানীর পশু থাকলে

তা কোরবানী করো, অতঃপর মাথা কামাও বা চুল খাট করো এবং বাড়ি ফিরে যাও। অতঃপর আগামী বছর হজ্জের জন্য আসো এবং কোরবানী করো। যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সংগ্রহ করতে না পারবে, সে যেন হজ্জ চলাকালে তিন দিন এবং বাড়ি ফেরার পর সাত দিন রোযা রাখে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে ভিন্নমত রয়েছে। তা হচ্ছে, আগামী বছর তাদের জন্য কোরবানী করা এবং রোযা রাখা বাধ্যতামূলক নয়। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে হজ্জ ছুটে যাওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, "সে উমরা করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছর তাকে হজ্জ করতে হবে।" তিনি কোরবানীর উল্লেখ করেননি। অতএব আমি একই বিষয় সম্পর্কে যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-র কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও উমার (রা)-র অনুরূপ জওয়াব দিলেন। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। আর কেমন করেই বা তার উপর কোরবানী ওয়াজিব হতে পারে অথবা কোরবানীর পশু না পাওয়া গেলে রোযা বাধ্যতামূলক হতে পারে? কেননা সে তো হজ্জের মাসে তামাত্তু হজ্জ করেনি।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় পশুর দেহ থেকে উকুন এবং রক্তপায়ী কীট বেছে ফেলে দেয়া।

٤٣٢- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيْرِهِ .

৪৩২। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) ইহ্‌রাম অবস্থায় তার উটের শরীর থেকে উকুন এবং রক্তপায়ী কীট বেছে ফেলে দেয়া মাকরূহ মনে করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, পশুর দেহ থেকে উকুন এবং রক্তপায়ী কীট বেছে পরিষ্কার করায় কোন দোষ নেই। এক্ষেত্রে আমাদের কাছে ইবনে উমার (রা)-র মতের চেয়ে উমার (রা)-র মত অধিক পছন্দনীয়।

٤٣٣- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيْرَهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَيَجْعَلُهُ فِيْ طِيْنٍ .

৪৩৩। রবীআ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুদাইর (র) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে ইহ্‌রাম অবস্থায় তার উটের শরীরের উকুন বেছে মাটিতে ফেলে দিতে দেখেছি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইহ্‌রাম অবস্থায় পশুর দেহ থেকে রক্তপায়ী কীট বেছে ফেলে দেয়ায় কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির কোমরে পেটি বা থলে বাঁধা।

٤٣٤- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ .

৪৩৪। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) মুহরিম ব্যক্তির কোমরে পেটি বাঁধা মাকরূহ মনে করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোমরে থলে বা পেটি বাঁধায় কোন দোষ নেই। একাধিক ফিক্‌হবিদ তার অনুমতি ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, তোমার খরচপাতির অর্থ সাবধানে এবং শক্তভাবে সংরক্ষণ করো।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় নিজের শরীর চুলকানো।

٤٣٥- عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُسْئَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جِلْدَهُ فَتَقُوْلُ نَعَمْ فَلْيَحْكُكْ وَلْيَشْدُدْ وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَاىَ وَاحْتَجْتُ ثُمَّ لَمْ اَجِدْ اِلاَّ اَنْ اَحُكَّ بِرِجْلِي لَاَحْتَكَكْتُ .

৪৩৫। আলকামা (র) থেকে তার মা মারজানার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহরিম ব্যক্তির শরীর চুলকানোর ব্যাপারে আমি আয়েশা (রা)-র কাছে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, হাঁ, চুলকানো যেতে পারে এবং ভালোভাবে চুলকানো যেতে পারে। যদি আমার হস্তদ্বয় বেঁধে দেয়া হয় এবং পদদ্বয় খোলা রাখা হয়, তবে আমি প্রয়োজনবোধে অবশ্যই পায়ের সাহায্যে আমার শরীর চুলকাবো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের এবং ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করার বর্ণনা।

٤٣٦- عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَرْسَلَ اِلَى اَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَاَبَانُ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ اَرَدْتُ اَنْ اُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ وَاَرَدْتُ اَنْ تَحْضُرَ ذٰلِكَ فَاَنْكَرَ عَلَيْهِ اَبَانُ وَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَخْطُبُ وَلاَ يُنْكِحُ .

৪৩৬। নুবাইহ্ ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ তাকে আবান ইবনে উছমানের কাছে পাঠালেন। আবান তখন মদীনার গভর্নর ছিলেন। তারা উভয়ে ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। উমার বললেন, তাকে গিয়ে বলো, আমি তালহার সাথে শাইবা ইবনে জুবায়েরের কন্যার বিবাহ দিতে চাই এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কামনা করি। আবান ইবনে উছমান দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন, আমি উছমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করবে না, বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না এবং অন্যকেও বিবাহ করাবে না।

٤٣٧- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ .

৪৩৭। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, মুহরিম ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করবে না এবং নিজের বা অন্যের জন্য বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।

٤٣٨- حَدَّثَنَا غَطَفَانُ بْنُ طَرِيْفٍ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيْفًا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ .

৪৩৮। গাতাফান ইবনে তারীফ (র) বলেন যে, তার পিতা তারীফ ইহ্রাম অবস্থায় এক মহিলাকে বিবাহ করেন। উমার (রা) তার এই বিবাহ রদ করে দেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ প্রসংগে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। মদীনার আলেমগণের মতে ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ করলে তা বাতিল গণ্য হবে। মক্কার আলেমদের মতে ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ করা জায়েয। ইরাকের আলেমদেরও এই মত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্রাম অবস্থায় মাইমূনা (রা)-কে বিবাহ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মাইমূনা (র)-র বিবাহের ব্যাপারটি কোন ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (র)-র চেয়ে অধিক বেশী অবহিত বলে আমাদের জানা নেই। কেননা তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমূনা (রা)-র বোনপুত ছিলেন। আমাদের মতে ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ করাতে দোষের কিছু নেই। অবশ্য ইহ্রাম অবস্থায় স্ত্রীকে চুমা দিবে না, শৃংগার করবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।[১০]

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ ফজর এবং আসর নামাযের পর তাওয়াফ করা।

٤٣٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ كَانَ يَرَى الْبَيْتَ يَخْلُوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ مَا يَطُوْفُ بِهِ أَحَدٌ .

৪৩৯। ইমাম মালেক (র) বলেন, আবু যুবায়ের আল-মক্কী ফজর ও আসরের নামাযের পর খানায়ে কাবা তাওয়াফকারীদের থেকে শূন্য দেখতেন। অর্থাৎ এই দুই নামাযের পর কেউ তাওয়াফ করতো না।

---

১০. স্বয়ং মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হালাল (ইহ্রামমুক্ত) অবস্থায় বিবাহ করেছেন (মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)। ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটিও সিহাহ সিত্তায় উল্লেখ আছে। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের মতে, ইহ্রাম অবস্থায় বিবাহ করলে তা বাতিল গণ্য হবে। তাদের মতে মাইমূনা (রা)-র বর্ণনাটিই অগ্রাধিকারযোগ্য। কেননা বিবাহের ঘটনাটি সরাসরি তার সাথে জড়িত এবং তিনি বলছেন, হালাল অবস্থায় বিবাহ হয়েছে (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এই দুই সময় এজন্য তাওয়াফ করা হতো না যে, উল্লেখিত সময়ে নামায পড়া মাকরূহ মনে করা হতো। আর তাওয়াফের পর দুই রাক্‌আত নামায পড়া জরুরী। আমাদের মতে ঐ দুই সময় তাওয়াফ করায় কোন দোষ নেই। তবে সূর্য না উঠা পর্যন্ত দুই রাক্‌আত নামায পড়বে না, যেমন উমার (রা) করতেন অথবা মাগরিবের নামাযের পর দুই রাক্‌আত নামায পড়বে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٤٤٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ اَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ فَلَمَّا قَضٰى طَوَافَهُ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكِبَ وَلَمْ يُسَبِّحْ حَتّٰى اَنَاخَ بِذِىْ طُوٰى فَسَبَّحَ رَكْعَتَيْنِ .

৪৪০। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) বলেন যে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সাথে ফজরের নামাযের পর কাবাঘর তাওয়াফ করেছেন। উমার (রা) তাওয়াফশেষে তাকিয়ে দেখলেন, তখনো সূর্য উঠেনি। অতঃপর তিনি নিজের উটে আরোহণ করলেন এবং যি-তুয়া নামক স্থানে পৌঁছে নিজের উট বসালেন, অতঃপর দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তাওয়াফের দুই রাক্‌আত নামায পড়বে না, বরং সূর্য উদিত হয়ে তা আলোকিত হওয়ার পর নামায পড়বে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিকহ্‌বিদের এটাই সাধারণ মত।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামহীন ব্যক্তি যদি শিকার ধরে অথবা তা যবেহ করে তবে এটা মুহরিম ব্যক্তি খেতে পারবে কি না।

٤٤١- عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ اَنَّهُ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَّحْشِيًّا وَهُوَ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاٰى مَا فِىْ وَجْهِىْ قَالَ اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ اِلَّا اَنَّا حُرُمٌ .

৪৪১। সাব ইবনে জাসসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বন্য গাধার গোশত পেশ করলেন। তখন তিনি আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ফেরত দিলেন। তিনি আমার চেহারায় বিষণ্ন ভাব লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমি কেবল এই কারণে তা ফেরত দিয়েছি যে, আমি ইহ্‌রাম অবস্থায় আছি।

٤٤٢- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُوْنَ بِالرَّبَذَةِ فَاسْتَفْتَوْهُ فِىْ لَحْمِ صَيْدٍ وَجَدُوْا اَحِلَّةً يَاْكُلُوْنَهُ

فَاَفْتَاهُمْ بِاَكْلِهِ ثُمَّ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَئَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ بِمَ اَفْتَيْتَهُمْ قَالَ اَفْتَيْتُهُمْ بِاَكْلِهِ قَالَ عُمَرُ لَوْ اَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِهِ لَاَوْجَعْتُكَ .

৪৪২। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) রাবাযা নামক স্থানে কিছু সংখ্যক লোককে ইহ্‌রাম অবস্থায় দেখতে পেলেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, হালাল (ইহ্‌রামহীন) লোকেরা শিকার ধরে তার গোশত খাচ্ছে, এখন তারাও তা খেতে পারবে কিনা? তিনি তাদেরকে তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন। অতঃপর তিনি উমার (রা)-র নিকট এসে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উমার (রা) বলেন, তুমি কি ফতোয়া দিয়েছ? ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি তাদেরকে তা খাওয়ার ফতোয়া দিয়েছি। উমার (রা) বলেন, তুমি তাদের ভিন্নরূপ ফতোয়া দিলে আমি তোমাকে শাস্তি দিতাম।

٤٤٣- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَّهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأٰى حِمَارًا وَّحْشِيًّا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهِ فَسَئَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُّنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْهُ فَسَئَلَهُمْ اَنْ يُّنَاوِلُوْهُ رُمْحَهُ فَاَبَوْا فَاَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبٰى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا اَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَئَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ .

৪৪৩। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে তিনি তার কয়েকজন সংগীর সাথে পিছনে রয়ে গেলেন। তারা ছিলো ইহ্‌রাম অবস্থায় আর তিনি (রাবী) ছিলেন ইহ্‌রামমুক্ত অবস্থায়। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। তিনি নিজের ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন এবং নিজের সাথীদের কাছে নিজ চাবুক চাইলেন। তারা তা দিতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তিনি তাদের কাছে নিজের বর্শা তুলে দেয়ার জন্য বললেন, কিন্তু তারা রাজী হলেন না। অতঃপর তিনি নিজে বর্শা তুলে নিয়ে গাধাকে আক্রমণ করলেন এবং তা হত্যা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী এর গোশত খেলেন এবং কতিপয় সাহাবী তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এসে মিলিত হলেন, তখন তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন ঃ এটা তো একটা খাদ্য, আল্লাহ তাআলা তোমাদের তা আহার করিয়েছেন।

٤٤٤- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ كَعْبًا الْاَحْبَارَ اَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِىْ رَكْبٍ مُحْرِمِيْنَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ وَجَدُوْا لَحْمَ صَيْدٍ فَاَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِاَكْلِهِ فَلَمَّا قَدِمُوْا

عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ مَنْ اَفْتَاكُمْ بِهٰذَا فَقَالُوْا كَعْبٌ قَالَ فَانِّىْ اَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتّٰى تَرْجِعُوْا ثُمَّ لَمَّا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ طَرِيْقِ مَكَّةَ مَرَّتْ بِهِمْ رَجْلٌ مِّنْ جَرَادٍ فَاَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِاَنْ يَّاْكُلُوْهُ وَيَاْخُذُوْهُ فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلٰى عُمَرَ ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى اَنْ تُفْتِيَهُمْ بِهٰذَا قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالَّذِيْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنْ هُوَ اِلاَّ نَثْرَةُ حُوْتٍ يَنْثُرُهُ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ .

৪৪৪। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। কাব আল-আহবার (র) তার কতিপয় ইহ্রামধারী সংগীর সাথে সিরিয়া থেকে আসলেন। পথিমধ্যে তারা শিকার করা গোশত দেখতে পেলেন। কাব (র) সংগীদের তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন। তারা মদীনায় পৌঁছে ব্যাপারটি উমার (রা)-র কাছে উত্থাপন করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাদের তা খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে? তারা বলেন, কাব (র)। উমার (রা) বলেন, আমি কাবকে তোমাদের আমীর নিয়োগ করেছিলাম, মক্কায় ফিরে আসা পর্যন্ত। পুনরায় একদিন মক্কায় যাওয়ার পথে টিড্ডি পাওয়া গেলো। কাব (র) তাদের তা ধরে খাওয়ার অনুমতি দিলেন। তারা উমার (রা)-র কাছে ফিরে এসে তার সামনে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। উমার (রা) কাব (র)-কে বলেন, কোন জিনিস তোমাকে এই ফতোয়া দিতে উদ্বুদ্ধ করলো? তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! টিড্ডি তো মাছের হাঁচি থেকে নির্গত। মাছ বছরে দু'বার হাঁচি দিয়ে তা নির্গত করে।

٤٤٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ اَنَّ رَجُلاً سَئَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنِّىْ اَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِىْ فَقَالَ اَطْعِمْ قَبْضَةً مِّنْ طَعَامٍ .

৪৪৫। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি নিজের চাবুকের সাহায্যে কতগুলো টিড্ডি শিকার করেছি, এ সম্পর্কে হুকুম কি? তিনি বলেন, এক মুষ্ঠি খাদ্য দান করে দাও।

٤٤٦- اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيْفَ الظِّبَاءِ فِى الْاِحْرَامِ .

৪৪৬। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) বলেন, তাঁর পিতা যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা) ইহ্রাম অবস্থায় ভাজা গোশত পাথেয় হিসাবে সাথে নিতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা উল্লেখিত সব হাদীসের উপর আমল করি। হালাল ব্যক্তি কোন কিছু শিকারের পর যবেহ করলে তা মুহরিম ব্যক্তিও খেতে পারে। এতে কোন

দোষ নেই, শিকার তার উদ্দেশেই ধরা হোক অথবা অন্য করো উদ্দেশে ধরা হোক। কেননা তা হালাল ব্যক্তি শিকার করেছে এবং যবেহ করেছে। আর এ কাজ তার জন্য হালাল। মুহরিম ব্যক্তির জন্য তা শিকার নয়, বরং গোশত। অতএব তা খেলে তার কোন দোষ হবে না। মুহরিম ব্যক্তির জন্য টিড্ডি শিকার করাও নিষেধ। কোন ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় তা শিকার করলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। কাফ্‌ফারা হিসাবে খেজুর দেয়াই উত্তম। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র এরূপ মতই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের মাসে উমরা করে এবং হজ্জ না করে ফিরে আসা।

٤٤٧- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ اَبِى سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِىُّ اِسْتَاْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَنْ يَّعْتَمِـرَ فِـىْ شَوَّالَ فَاَذِنَ لَهُ فَاعْتَمَرَ فِـىْ شَوَّالَ ثُمَّ قَفَلَ اِلٰى اَهْلِهِ وَلَمْ يَحُجَّ .

৪৪৭। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে আবু সালামা আল-মাখযূমী (র) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে শাওয়াল মাসে উমরা করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। তিনি শাওয়াল মাসে উমরা করলেন এবং হজ্জ না করেই বাড়ী ফিরে এলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। তার উপর তামাত্তো হজ্জের কোরবানী ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٤٤٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ لَاَنْ اَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَاُهْدِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَعْتَمِرَ فِىْ ذِى الْحِجَّةِ بَعْدَ الْحَجِّ .

৪৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, যিলহজ্জ মাসে হজ্জের পর উমরা করার চেয়ে হজ্জের পূর্বে উমরা করা এবং কোরবানী করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এর সকল পদ্ধতিই উত্তম। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ইফরাদ হজ্জও করা যেতে পারে, তামাত্তু হজ্জও করা যেতে পারে এবং কিরান হজ্জও করা যেতে পারে। সাথে কোরবানীর পশু নিয়ে যাওয়া সর্বোত্তম।

٤٤٩- عَنْ هِشَـامِ بْنِ عُـرْوَةَ عَنْ اَبِيْـهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَعْتَمِرْ اِلاَّ ثَلٰثُ عُمَرٍ اِحْدٰهُنَّ فِىْ شَوَّالَ وَاثْنَتَيْنِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ .

৪৪৯। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ মাত্র তিনবার উমরা করেছেন ঃ শাওয়াল মাসে একবার এবং যিলকাদ মাসে দু'বার।[১১]

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে উমরা করার ফযীলাত।

٤٥٠- عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ وَاَرَدْتُهُ فَاعْتَرَضَ لِىْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَمِرِىْ فِىْ رَمَضَانَ فَاِنَّ عُمْرَةً فِيْهِ كَحَجَّةٍ .

৪৫০। আবু বাক্র ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্ত্রীলোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললো, আমি হজ্জের নিয়াত করে তার প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম। কিন্তু একটি বাধার কারণে হজ্জে যেতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেনঃ তুমি রমযান মাসে উমরা করো। কেননা এ মাসের একটি উমরা একটি হজ্জের সমান (মর্যাদাপূর্ণ)।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ তামাত্তু হজ্জকারীর উপর কোরবানী ওয়াজিব।

٤٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ مَنِ اعْتَمَرَ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ فِىْ شَوَّالٍ اَوْ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اَوْ ذِى الْحِجَّةِ فَقَدِ اسْتَمْتَعَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْىُ اَوِ الصِّيَامُ اِنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا .

৪৫১। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি হজ্জের মাসসমূহে অর্থাৎ শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহজ্জ মাসে উমরা করলো, সে তামাত্তু হজ্জকারী হিসাবে গণ্য। তার উপর কোরবানী ওয়াজিব। কোরবানীর পশু না পাওয়া গেলে তাকে রোযা রাখতে হবে।

٤٥٢- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ مِمَّنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا مَّا بَيْنَ اَنْ يُّهِلَّ بِالْحَجِّ اِلٰى يَوْمِ عَرَفَةَ فَاِنْ لَّمْ يَصُمْ صَامَ اَيَّامَ مِنًى .

---

১১. বিভিন্ন বর্ণনায় চারটি উমরার কথা উল্লেখ আছে ঃ হুদায়বিয়ার উমরা, পরবর্তী বছরের উমরাতুল কাযা, জিরানা থেকে উমরা এবং বিদায় হজ্জের সাথে (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)। হুদায়বিয়ার বছর কুরাইশ কাফেরদের প্রতিরোধের কারণে উমরা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সওয়াবের দিক থেকে এটাকেও উমরা হিসাবে গণনা করা হয়েছে (অনুবাদক)।

৪৫২। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি উমরা করে হজ্জের সুযোগ লাভ করে তার উপর রোযা ওয়াজিব, যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরামের সময় থেকে আরাফাতের দিন পর্যন্ত কোরবানীর পশুও সংগ্রহ করতে পারেনি এবং রোযাও রাখতে পারেনি সে মিনার দিনগুলোতে রোযা রাখবে।[১২]

٤٥٣- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৪৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকেও আয়েশা (রা)-র অনুরূপ মত বর্ণিত আছে।

٤٥٤- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ مَنِ اعْتَمَرَ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ فِىْ شَوَّالٍ اَوْ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ اَوْ فِىْ ذِى الْحِجَّةِ ثُمَّ اَقَامَ حَتّٰى يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ اَوِ الصِّيَامِ اِنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا وَمَنْ رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ .

৪৫৪। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন যে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জের মাসসমূহে অর্থাৎ শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহজ্জ মাসে উমরা করলো, অতঃপর (মক্কায়) অবস্থান করে হজ্জ করলো, সে তামাত্তু হজ্জকারী হিসাবে গণ্য হবে। সে যদি কোরবানী করার সামর্থ্য রাখে তবে তাকে অবশ্যই কোরবানী করতে হবে, অন্যথায় রোযা রাখবে। কিন্তু যে ব্যক্তি উমরা করে বাড়ী ফিরে গেলো এবং আবার এসে হজ্জ করলো, সে তামাত্তু হজ্জকারী গণ্য হবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা উল্লেখিত সব মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফের সময় রমল করার বর্ণনা।

٤٥٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَرَامِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ .

৪৫৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত (তিন চক্করে) রমল করেছেন (ঘন ঘন এবং কিছুটা দ্রুত পদক্ষেপে বাহু দুলিয়ে হেঁটেছেন)।

---

১২. 'রোযাও রাখতে পারেনি' অর্থাৎ কোরবানীর দিনের পূর্বেকার তিন দিন (৭, ৮ ও ৯ যিলহজ্জ) রোযা রাখতে পারেনি। 'সে মিনার দিনগুলোতে রোযা রাখবে' অর্থাৎ তাশরীকের তিন দিন (১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ যখন হাজীগণ মিনায় অবস্থান করেন) রোযা রাখবে। হযরত আয়েশা (রা) এবং আরো কতিপয় সাহাবীর এই মত। ইমাম মালেক প্রমুখও এই মত গ্রহণ করেছেন। এ প্রসংগে হানাফী মাযহাবের অভিমত 'রোযা' অধ্যায়ের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। বাইতুল্লাহ প্রদক্ষিণের সময় প্রথম তিন চক্করে রমল করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কার অধিবাসী এবং বাইরের লোক, সকলের উপর কি হজ্জ ও উমরার তাওয়াফে রমল করা ওয়াজিব।

٤٥٦- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيْمِ قَالَ ثُمَّ رَاَيْتُهُ يَسْعٰى حَوْلَ الْبَيْتِ حَتّٰى طَافَ الْاَشْوٰطَ الثَّلاَثَةَ .

৪৫৬। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উরওয়া) আবদুল্লাহ (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি তানঈম থেকে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে এসে কাবাঘর প্রদক্ষিণের সময় তিন চক্করে রমল করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি। মক্কাবাসী এবং মক্কার বাইরের লোক, সকলের হজ্জ ও উমরার তাওয়াফে (প্রথম তিন চক্করে) রমল করা ওয়াজিব। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ উমরার সময় কোরবানী করা ও চুল খাটো করার বর্ণনা।

٤٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ مَوْلاَةً لِّعَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُقَالُ لَهَا رُقَيَّةُ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا كَانَتْ (قَالَتْ) خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ اِلٰى مَكَّةَ قَالَتْ فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَاَنَا مَعَهَا قَالَتْ فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ اَمَعَكِ مِقَصَّانِ فَقُلْتُ لاَ قَالَتْ فَالْتَمِسِيْهِ لِىْ قَالَتْ فَالْتَمَسْتُهُ حَتّٰى جِئْتُ بِهِ فَاَخَذَتْ مِنْ قُرُوْنِ رَاْسِهَا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَتْ شَاةً .

৪৫৭। আবদুর রহমান-কন্যা আমরা (র)-র আযাদকৃত বাঁদী রুকাইয়্যা (র) বলেন যে, তিনি আমরার সাথে উমরা করার জন্য মক্কায় গিয়েছিলেন। রাবী বলেন, তিনি তারবিয়ার দিন[১৩]

---

১৩. 'তারবিয়া' শব্দের অর্থ ঃ দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ইত্যাদি। যিলহজ্জ মাসের আট তারিখকে ইয়াওমুত তারবিয়া (উৎকণ্ঠার দিন) বলা হয়। কেননা এই দিনটি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে। আট তারিখের রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কোরবানী করছেন। তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন, স্বপ্নটি কি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে না শয়তানের কারসাজি? নয় তারিখে তিনি জানতে পারলেন, আল্লাহ তাঁকে এ স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তাই এই দিনটির নাম 'ইয়াওমুল আরাফাহ্' অবগত হওয়ার দিন, পরিচয় লাভ করার দিন (অনুবাদক)।

মক্কায় প্রবেশ করলেন। আমি তার সাথেই ছিলাম। রাবী বলেন, তিনি আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন। অতঃপর মসজিদের আংগিনায় ফিরে এলেন এবং আমাকে বললেন, তোমার সাথে কি কাঁচি আছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, একটি কাঁচি খুঁজে নিয়ে এসো। আমি একটি কাঁচি সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। আমরাহ্ (র) তা দিয়ে নিজের চুলের প্রান্তভাগ কাটলেন, অতঃপর কোরবানীর দিন একটি বকরী কোরবানী করলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই কর্মনীতি গ্রহণ করেছি। পুরুষ-মহিলা যে কেউ উমরা করলে, তাওয়াফ ও সাঈ থেকে অবসর হওয়ার পর কোরবানীর দিন চুল খাটো করবে এবং পশু সংগ্রহ করতে পারলে কোরবানী করবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

٤٥٨- اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُوْلُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ شَاةٌ .

৪৫৮। হযরত আলী (রা) বলতেন, কোরআন মজীদের আয়াত, "ফামাস তাইসারা মিনাল হাদ্ইয়" দ্বারা বকরী বুঝানো হয়েছে।

٤٥٩- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ بَعِيْرٌ اَوْ بَقَرَةٌ .

৪৫৯। ইবনে উমার (রা) বলতেন, "ফামাস তাইসারা মিনাল হাদ্ইয়" দ্বারা উট অথবা গরু বুঝানো হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা আলী (রা)-র মত গ্রহণ করেছি। فما استيسر من الهدى (কোরবানীর জন্য যা সহজলভ্য হয়) আয়াত দ্বারা বকরী বুঝানো হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই মত।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামবিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করা।

٤٦٠- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اعْتَمَرَ ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِقَدِيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِّنَ الْمَدِيْنَةِ فَرَجَعَ فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ اِحْرَامٍ .

৪৬০। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) উমরা করলেন, অতঃপর মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছার পর তার কাছে মদীনা থেকে একটি সংবাদ আসলো এবং তিনি ফিরে এসে বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মত হচ্ছে, যেসব লোক মীকাতের অভ্যন্তরে অথবা মক্কার কাছাকাছি জায়গায় বসবাস করে, যেখানে কোন মীকাত নেই, তাদের জন্য বিনা

ইহরামে মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয। কিন্তু যেসব লোক মীকাতের সীমার বাইরে বসবাস করে তাদের জন্য ইহ্‌রামবিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ মাথা মুড়ানোর ফযীলাত এবং চুল যতোটুকু খাটো করলে যথেষ্ট হবে।

٤٦١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلاَ تَشَبَّهُوْا بِالتَّلْبِيْدِ .

৪৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি চুল খোঁপার মতো জড়িয়ে রাখে বা বিনুনি করে রাখে, সে মাথা ন্যাড়া করবে। তোমরা জটার মতো চুল পাকিয়ে রেখো না।

٤٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ.

৪৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকৃতদের প্রতি অনুগ্রহ করো। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! চুল খাটোকৃতদের উপরও। তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকৃতদের উপর দয়া করো।" সহাবাগণ আবার বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! চুল খাটোকৃতদের উপরও। তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকৃতদের উপর রহম করো।" সাহাবাগণ আবার বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! চুল খাটোকৃতদের উপরও। তিনি বলেন ঃ "চুল খাটোকৃতদের উপরও।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। যে ব্যক্তি চুল খোঁপার মতো জড়িয়ে রাখে সে মাথা ন্যাড়া করবে। আর চুল খাটো করার চেয়ে তা মুড়িয়ে ফেলা উত্তম। চুল খাটো করলেও যথেষ্ট। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

٤٦٣- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا حَلَقَ فِىْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ اَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهٖ وَمِنْ شَارِبِهٖ .

৪৬৩। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) হজ্জ অথবা উমরার সময় যখন মাথা ন্যাড়া করতেন, তখন দাড়ি এবং গোঁফও খাটো করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটা জরুরী নয়। তবে যার ইচ্ছা তা খাটো করতে পারে, আর নাও করতে পারে।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশের পূর্বে অথবা পরে কোন মহিলার মাসিক ঋতু আরম্ভ হলে তার বিধান।

٤٦٤- حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تَهِلُّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ تَهِلُّ بِحَجَّتِهَا أَوْ بِعُمْرَتِهَا اِذَا اَرَادَتْ وَلٰكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتّٰى تَطْهُرَ وَتَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلاَ تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ وَلاَ تَحِلُّ حَتّٰى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

৪৬৪। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, যে মহিলা হায়েয অবস্থায় হজ্জ অথবা উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধে, সে যখন ইচ্ছা তার হজ্জ অথবা তার উমরার জন্য তালবিয়া পাঠ করবে। কিন্তু সে হায়েয থেকে পাক না হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে না। সে তাওয়াফ এবং সাঈ ছাড়া লোকদের সাথে অন্যান্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে। সে মসজিদে হারামের কাছেও যাবে না। হায়েয থেকে পাক হওয়ার পর কাবাঘর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ না করা পর্যন্ত সে ইহ্‌রামমুক্ত হতে পারবে না।

٤٦٥- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِى .

৪৬৫। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপনীত হলাম। ফলে আমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে পারলাম না। আমি এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলাম। তিনি বলেন ঃ বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ব্যতীত হাজীদের সাথে আর সব অনুষ্ঠান পালন করো এবং পাক হওয়ার পর বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে।

٤٦٦- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ

انْقُضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَهِلِّىْ بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ اَرْسَلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ وَطَافَ الَّذِىْ حَلُّوْا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ اَنْ رَّجَعُوْا مِنْ مِّنًى وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَانُوْا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَّاحِدًا .

৪৬৬। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যার সাথে কোরবানীর পশু আছে সে যেন একই সাথে হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধে, অতঃপর হজ্জ ও উমরা উভয়ের অনুষ্ঠান শেষ করার পর ইহ্‌রাম খুলবে।" আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় পৌঁছলাম। তাই আমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে পারলাম না। এ সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালাম। তিনি বলেনঃ তোমার মাথার চুল খুলে ফেলো, তাতে চিরুণি করো এবং হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধো ও উমরা ত্যাগ করো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। যখন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আমার ভাই আবদুর রহমানের সাথে তানঈম পাঠিয়ে দিলেন।[১৪] আমি সেখান থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে এসে উমরা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "তোমার সেই উমরার পরিবর্তে এই উমরা।" কিন্তু যেসব লোক উমরার জন্য ইহ্‌রাম বেঁধেছিল, তারা তাওয়াফ ও সাঈ করার পর ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে গেলো। অতঃপর তারা যখন মিনা থেকে ফিরে এলো, হজ্জের জন্য দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করলো। আর যেসব লোক হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য একত্রে ইহ্‌রাম বেঁধেছিল, তারা একবার মাত্র তাওয়াফ করলো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। হায়েযগ্রস্ত মহিলারা তাওয়াফ ও সাঈ ব্যতীত হজ্জের আর সব অনুষ্ঠান পালন করবে। অতঃপর যখন পাক হবে তখন উল্লেখিত দু'টি অনুষ্ঠান পালন করবে। সে যদি উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে থাকে এবং হজ্জ ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে উমরার ইহ্‌রাম ভংগ করে হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধবে এবং আরাফাতের মাঠে উপস্থিত হবে। অতঃপর হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ করে সে পরিত্যক্ত উমরার কাযা করবে, যেভাবে হযরত আয়েশা (রা) কাযা করেছেন। কোরবানীর জন্য যে পশু পাওয়া যাবে সে তা কোরবানী করবে। আমাদের কাছে এই রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-র পক্ষ থেকে একটি গরু কোরবানী করেছেন। ইমাম আবু

১৪. 'তানঈম' মক্কা থেকে চার মাইল দূরে একটি স্থানের নাম। আইশা (রা)-র নামে এখানে একটি বিরাট মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে (অনুবাদক)।

হানীফা (র)-ও উল্লেখিত সব ব্যাপারে একই মত পোষণ করেন। কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কিরান হজ্জ করবে সে দুই তাওয়াফ ও দুই সাঈ করবে।[১৫]

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে যিয়ারত করার পূর্বে কোন মহিলার মাসিক ঋতু আরম্ভ হলে তার বিধান।

٤٦٧- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ اِذَا حَجَّتْ وَمَعَهَا نِسَاءٌ خَافَتْ اَنْ يَحِضْنَ قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فَاَفَضْنَ فَاِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْ تَنْفِرُ بِهِنَّ وَهُنَّ حُيَّضٌ اِذَا كُنَّ قَدْ اَفَضْنَ .

৪৬৭। আবদুর রহমান-কন্যা আমরাহ (র) বলেন, আয়েশা (রা) যখন মহিলাদের নিয়ে হজ্জ করতেন, তখন তাদের কারও মাসিক ঋতু শুরু হওয়ার আশংকা হলে তিনি তাদেরকে কোরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাদা (তাওয়াফে যিয়ারত) করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং তারা তাওয়াফ সেরে নিতো। অতঃপর তাদের মাসিক ঋতু শুরু হয়ে গেলে তিনি তাদের পাক হওয়া পর্যন্ত (বিদায়ী তাওয়াফের জন্য) অপেক্ষা করতেন না, বরং তাদের নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হতেন।

٤٦٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا قَالَ اَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ قُلْنَ بَلٰى اِلاَّ اَنَّهَا لَمْ تَطُفْ طَوَافَ الْوِدَاعِ قَالَ فَاخْرُجْنَ .

৪৬৮। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইর হায়েয শুরু হয়েছে। তার কারণে আমরা হয়তো অবরুদ্ধ হয়ে থাকবো। তিনি বলেনঃ "সে কি তোমাদের সাথে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেনি?" আমরা বললাম, হাঁ, করেছে। তিনি বলেনঃ "তাহলে রওয়ানা হও"।

٤٦٩- عَنْ اُمِّ سُلَيْمٍ ابْنَةِ مِلْحَانَ قَالَتْ اسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَنْ حَاضَتْ اَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ مَا اَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَاذِنَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَتْ .

৪৬৯। মিলহান-কন্যা উম্মে সুলাইম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, কোন মহিলা কোরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাদা করার পর হায়েযগ্রস্ত হলে অথবা বাচ্চা প্রসব করলে তার বিধান কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ মহিলাকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

---

১৫. অন্যসব ইমামের মতে, কিরান হজ্জে এক তাওয়াফ ও এক সাঈ করতে হবে। সাতবার কাবাঘর প্রদক্ষিণ করলে এক তাওয়াফ হয় এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়ালে এক সাঈ হয় (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমর করি। কোরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করার পূর্বে কোন স্ত্রীলোক হায়েযগ্রস্ত হলে বা বাচ্চা প্রসব করলে, সে পাক হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অতঃপর তাওয়াফে যিয়ারত করে বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করবে। আর যদি তাওয়াফে যিয়ারত করার পর হায়েয শুরু হয় অথবা বাচ্চা প্রসব করে, তবে সে বিদায়ী তাওয়াফ করার পূর্বে বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।[১৬]

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলা হজ্জ এবং উমরা করার নিয়াত করলো, অতঃপর ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বেই হায়েয শুরু হলো অথবা বাচ্চা প্রসব করলো।

٤٧٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ . فَذَكَرَ ذٰلِكَ اَبُوْ بَكْرٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهِلَّ .

৪৭০। আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। বাইদা নামক স্থানে আসমা বিনতে উমাইস (রা) মুহাম্মাদ (র) ইবনে আবু বাক্‌রকে প্রসব করলেন। আবু বাক্‌র (রা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তাকে গোসল করে ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দেশ দাও"।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। হায়েয এবং নিফাসগ্রস্ত মহিলাদের জন্য এটাই নিয়ম। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের মৌসুমে রক্তপ্রদর রোগিণীর বিধান।

٤٧١- عَنْ اَبِىْ مَاعِزٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَّعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَتْهُ امْرَاَةٌ تَسْتَفْتِيْهِ فَقَالَتْ اِنِّىْ اَقْبَلْتُ اُرِيْدُ اَنْ اَطُوْفَ بِالْبَيْتِ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ اَهْرَقْتُ فَرَجَعْتُ حَتّٰى ذَهَبَ ذٰلِكَ عَنِّىْ ثُمَّ اَقْبَلْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ اَهْرَقْتُ فَرَجَعْتُ حَتّٰى ذَهَبَ ذٰلِكَ عَنِّىْ ثُمَّ رَجَعْتُ اِلَى

---

১৬. হাজীদের তিনবার কাবাঘর তাওয়াফ করতে হয়। প্রথমে মক্কায় পৌঁছেই। এটাকে বলে তাওয়াফে কুদূম বা আগমনি তাওয়াফ, এটা সুন্নাত। দ্বিতীয়বার ১০ যিলহজ্জ মিনা থেকে এসে। এটাকে বলা তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাদা। এই তাওয়াফ ফরয। তৃতীয়বার মক্কা থেকে নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানার প্রাক্কালে। এটাকে বলে তাওয়াফে বিদা বা বিদায়ী তাওয়াফ। মক্কার বাইরের লোকদের জন্য এই তাওয়াফ ওয়াজিব। কিন্তু মক্কা ও তার আশেপাশের এলাকার লোকদের জন্য তা বাধ্যতামূলক নয় (অনুবাদক)।

بَابِ الْمَسْجِدِ اَيْضًا فَقَالَ لَهَا ابْنُ عُمَرَ اِنَّهَا ذٰلِكَ رِكْضَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِيْ ثُمَّ اسْتَثْفِرِيْ بِثَوْبٍ ثُمَّ طُوْفِيْ .

৪৭১। আবু মায়েয আবদুল্লাহ ইবনে সুফিয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সাথে বসা ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা তার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে আসলো। সে বললো, আমি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার ইচ্ছা করেছিলাম। আমি যখন মসজিদের দরজায় পৌঁছলাম, তখন রক্তস্রাব শুরু হয়। আমি ফিরে এলাম। রক্তস্রাব বন্ধ হলে আমি পুনরায় তাওয়াফের উদ্দেশে মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলাম। এমন সময় আবার রক্তস্রাব শুরু হয়। আমি পুনরায় ফিরে এলাম। অতঃপর তা বন্ধ হলে আমি আবার মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁলাম। ইবনে উমার (রা) তাকে বলেন, এটা মাসিক ঋতু নয়, বরং শিরাজনিত একটি রোগ, শয়তানের কারসাজি। অতএব তুমি গোসল করো, অতঃপর লজ্জাস্থানে পট্টি বেঁধে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি। রক্ত প্রদরের রোগিণী উযু করবে, অতঃপর লজ্জাস্থানে কাপড় দিয়ে পট্টি বেঁধে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে। অতঃপর পাক মহিলারা যা করে, সেও তাই করবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কায় প্রবেশ করা এবং প্রবেশের পূর্বে গোসল করা।

٤٧٢- حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا دَنٰى مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِيْ طُوٰى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتّٰى يُصْبِحَ ثُمَّ يُصَلِّى الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِيْ بِاَعْلٰى مَكَّةَ وَلاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ اِذَا خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا حَتّٰى يَغْتَسِلَ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ اِذَا دَنٰى مِنْ مَكَّةَ بِذِيْ طُوٰى وَيَاْمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُوْا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلُوْا .

৪৭২। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) যখন মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে যেতেন, তখন যি-তুয়ার দুই উপত্যকার মাঝখানে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন, অতঃপর ফজরের নামায পড়তেন। অতঃপর মক্কার উচ্চ ভূমির দিককার উপত্যকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন। তিনি হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশে আসলে যি-তুয়ায় গোসল না করা পর্যন্ত মক্কায় প্রবেশ করতেন না। তিনি সাথের লোকদেরও মক্কায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করার নির্দেশ দিতেন।

٤٧٣- اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ اَنَّ اَبَاهُ الْقَاسِمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً وَّهُوَ مُعْتَمِرٌ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُؤَخِّرُ الْحَلاَّقَ حَتّٰى يُصْبِحَ وَلٰكِنَّهُ لاَ يَعُوْدُ اِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوْفُ بِهِ حَتّٰى يَحْلِقَ وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاَوْتَرَ فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ .

৪৭৩। আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) থেকে বর্ণিত। তার পিতা কাসিম (র) উমরা করতে আসলে রাতের বেলা মক্কায় প্রবেশ করতেন। অতঃপর তিনি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতেন, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতেন এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত মাথা কামানো বিলম্বিত করতেন, কিন্তু মাথা না কামানো পর্যন্ত দ্বিতীয়বার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতেন না। আবার কখনো রাতের বেলা মসজিদে প্রবেশ করলে তিনি সেখানে বেতের নামায পড়ে ফিরে যেতেন, কিন্তু তাওয়াফও করতেন না(এবং হাজারে আসওয়াদে চুমাও দিতেন না)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, রাতের অথবা দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করায় কোন দোষ নেই, অতঃপর তাওয়াফ করবে এবং সাঈ করবে। কিন্তু মাথা কামানোর পূর্বে দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করা আমাদের কাছে পছন্দনীয় নয়, যেমন কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র) মাথা কামানোর পর দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করেছেন। তবে মক্কায় প্রবেশের আগে গোসল করা মুস্তাহাব, বাধ্যতামূলক নয়।

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা।

٤٧٤- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَدَاَ بِالصَّفَا فَرَقِىَ حَتّٰى يَبْدُوَ لَهُ الْبَيْتُ وَكَانَ يُكَبِّرُ ثَلٰثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ يَفْعَلُ ذٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَذٰلِكَ اِحْدٰى وَعِشْرُوْنَ تَكْبِيْرَةً وَسَبْعُ تَهْلِيْلاَتٍ (تَهْلِيْلَةٍ) وَيَدْعُوْ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَيَسْئَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى ثُمَّ يَهْبِطُ فَيَمْشِىْ حَتّٰى اِذَا جَاءَ بَطْنَ الْمَسِيْلِ سَعٰى حَتّٰى يَظْهَرَ مِنْهُ ثُمَّ يَمْشِىْ حَتّٰى يَاتِىَ الْمَرْوَةَ فَيَرْقٰى وَيَصْنَعُ عَلَيْهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا يَصْنَعُ ذٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ وَسَمِعْتُهُ يَدْعُوْ عَلَى الصَّفَا اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَاِنِّىْ اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِىْ لِلْاِسْلاَمِ اَنْ لاَّ تَنْزِعَهُ مِنِّىْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ .

৪৭৪। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) যখন সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতেন (দৌড়াতেন) তখন সাফা পাহাড় থেকে সাঈ শুরু করতেন। তিনি পাহাড়ের এতোটা উপরে উঠতেন যে, বাইতুল্লাহ শরীফ দেখা যেতো এবং তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। অতঃপর তিনি বলতেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.............. كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ .

"আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁরই এবং যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান"।

তিনি তা সাতবার করতেন। এতে তাকবীর হতো একুশবার এবং দোয়া হতো সাতবার। এর মাঝে দোয়া পড়তেন এবং আল্লাহ্র কাছে আরাধনা করতেন। অতঃপর তিনি নেমে আসতেন। ফের নিচে নেমে এসে ধীরগতিতে হেঁটে উপত্যকার মাঝখানে এসে যেতেন, অতঃপর হাঁটতে হাঁটতে মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে যেতেন এবং তার উপরে উঠতেন। অতঃপর সাফা পাহাড়ের উপর যা করেছিলেন, এখানেও তাই করতেন। এভাবে তিনি সাতবার সাঈ করে অবসর হতেন। আমি তাকে সাফা পাহাড়ের উপর এই দোয়া করতে শুনেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ............وَاَنَا مُسْلِمٌ .

"হে আল্লাহ! তুমি বলেছো, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো'। আর তুমি অবশ্যি ওয়াদা ভংগ করো না। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, যেমন তুমি আমাদের ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছো, এই পথ থেকে আমাকে মৃত্যুদান করা পর্যন্ত বিচ্যুত করো না। আমি যেন মুসলিমরূপে মরতে পারি।"

٤٧٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ حَبَطَ مِنَ الصَّفَا مَشٰى حَتّٰى اِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِىْ بَطْنِ الْمَسِيْلِ سَعٰى حَتّٰى ظَهَرَ مِنْهُ قَالَ وَكَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلٰثًا وَيُهَلِّلُ وَاحِدَةً يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ .

৪৭৫। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাফা পর্বত থেকে নামতেন, তখন স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতেন। কিন্তু যখন সমতল ভূমিতে এসে যেতেন, তখন তা অতিক্রম করা পর্যন্ত দৌড়ে চলতেন। রাবী বলেন, তিনি সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের উপর তিনবার করে তাকবীর ধ্বনি করতেন এবং একবার করে তালবিয়া পাঠ করতেন। তিনি এই নিয়মে তিনবার সাঈ করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা উল্লেখিত সব নিয়ম অনুযায়ী আমল করি। কোন ব্যক্তি যখন সাফা পর্বতে আরোহণ করবে, তখন তাকবীর বলবে, তালবিয়া পাঠ করবে এবং দোয়া করবে। অতঃপর সে হেঁটে হেঁটে সেখান থেকে নেমে আসবে এবং সমতল ভূমিতে পৌঁছা পর্যন্ত এভাবেই চলবে, অতঃপর দৌড়িয়ে মাঠ অতিক্রম করবে, মাঠের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবার স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবে এবং এভাবে মারওয়া পর্যন্ত পৌঁছে যাবে; অতঃপর পর্বতে আরোহণ করবে এবং তাকবীর বলবে, তালবিয়া পাঠ করবে এবং দোয়া করবে। এই নিয়মে দুই পর্বতের মাঝে সাতবার সাঈ করতে হবে এবং প্রত্যেকবার দৌড়ে সমতল ভূমি অতিক্রম করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সকল ফিক্হবিদের এই মত।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ পদব্রজে অথবা বাহনে চড়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা।

٤٧٦- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ اشْتَكَيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ طُوْفِي مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ اِلٰى جَانِبِ الْبَيْتِ وَيَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ .

৪৭৬। নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম এবং তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালাম। তিনি বলেন ঃ "তুমি লোকদের পিছনে পিছনে সওয়ারীতে চড়ে তাওয়াফ করো।" রাবী বলেন, আমি এভাবেই তাওয়াফ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহ্র কাছে দুই রাক্আত নামায পড়লেন। তিনি নামাযে সূরা তূর পাঠ করলেন।[১৭]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। অসুখ অথবা অন্য কোন ওজরের কারণে সওয়ারীতে আরোহণ করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করায় কোন দোষ নেই। এজন্য কোনরূপ কাফফারাও দিতে হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এই মত।

ইমাম আবু হানীফা ও মালেকের মতে পদব্রজে তাওয়াফ করা ওয়াজিব। বিনা ওজরে বাহনে আরোহণ করে তাওয়াফ করলে একটি পশু কোরবানী করতে হবে। ইমাম শাফিঈর একমত অনুযায়ী বিনা ওজরে বাহনে চড়ে তাওয়াফ করা জায়েয। তার অপর মত অনুযায়ী তা জায়েয হলেও মাকরূহ।

---

১৭. বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ বিদায় হজ্জে উটে আরোহণ করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের পিঠে সওয়ার হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। তিনি একটি মাথা বাঁকা লাঠির ইশারায় হাজারে আসওয়াদে চুমা দিতেন" (আবু দাউদ)। সাফিয়্যা বিনতে শায়বা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন উটের পিঠে সওয়ার হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। তিনি তাঁর হাতের লাঠির সাহায্যে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন" (আবু দাউদ)। জাবের (রা) বলেন, "বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহনে চড়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন এবং এই অবস্থায় সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করেছেন, যাতে লোকেরা তাঁকে দেখতে পায়, নিয়ম-কানূন সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে পারে। সেদিন লোকজন তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল" (আবু দাউদ)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অসুস্থতার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারীতে আরোহণ করে কাবাঘর তাওয়াফ করেছেন" (আবু দাউদ) (অনুবাদক)।

٤٧٧- عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ عَلٰى امْرَاَةٍ مَجْذُوْمَةٍ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَا اَمَةَ اللّٰهِ اُقْعُدِىْ فِىْ بَيْتِكِ وَلاَ تُؤْذِى النَّاسَ فَلَمَّا تُوُفِّىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَتَتْ (مَكَّةَ) فَقِيْلَ لَهَا هَلَكَ الَّذِىْ كَانَ يَنْهَاكِ عَنِ الْخُرُوْجِ قَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اُطِيْعُهُ حَيًّا وَّاَعْصِيْهِ مَيِّتًا .

৪৭৭। ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত এক মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিল। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র বাঁদী! তুমি নিজ বাড়িতে অবস্থান করো, লোকদের কষ্ট দিও না। উমার (রা)-র ইন্তেকালের পর সেই মহিলা আবার মক্কায় আসলে তাকে বলা হলো, যে ব্যক্তি তোমাকে বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করেছিল, সে ধ্বংস হয়েছে। স্ত্রীলোকটি বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এমন নারী নই যে, (একটি সঠিক ব্যাপারে) জীবিত অবস্থায় তার আনুগত্য করবো, আর তার মৃত্যুর পর তার অবাধ্যাচরণ করবো।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ রুকনসমূহ চুমা দেয়া বা স্পর্শ করার বর্ণনা।[১৮]

٤٧٨- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَاَيْتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا مَّا رَاَيْتُ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ فَمَاهُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَاَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الْاَرْكَانِ اِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ وَرَاَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَاَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَاَيْتُكَ اِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ اَهَلَّ النَّاسُ اِذَا رَاَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلْ اَنْتَ حَتّٰى يَكُوْنَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَمَّا الْاَرْكَانُ فَاِنِّىْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَلَمَ اِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ وَاَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِىْ لَيْسَ فِيْهَا (لَهَا) شَعْرٌ وَّيَتَوَضَّاُ فِيْهَا فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَلْبَسَهَا وَاَمَّا الصُّفْرَةُ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْبُغُ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَصْبُغَ بِهَا وَاَمَّا الْاِهْلاَلُ فَاِنِّيْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ حَتّٰى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

---

১৮. কাবা ঘরের চারটি কোণকে রুক্‌ন বলা হয়। চারটি রুক্‌ন হচ্ছে হাজারে আসওয়াদ, দুই রুক্‌নে ইয়ামানী, দুই রুক্‌নে শামী (যা হাতীমের দিকে) এবং রুক্‌নে ইরাকী। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সময় হাতীম কাবার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কিন্তু বর্তমানে তা কাবার বাইরে, তবে কাবার সাথে সংলগ্ন (অনুবাদক)।

৪৭৮। উবায়েদ ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র)-কে বলেন, হে আবদুর রহমানের পিতা! আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখেছি, যা আপনার সাথীদের কাউকে করতে দেখিনি। তিনি বলেন, হে জুরাইজ-পুত্র! সেগুলো কি কি? তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে, আপনি হাজারে আসওয়াদ ও রুক্নে ইয়ামানী ছাড়া আর কোন রুক্ন স্পর্শ করেন না। আমি আরো দেখেছি যে, আপনি পশমবিহীন চামড়ার স্যাণ্ডেল পরছেন। আমি আরো দেখেছি যে, আপনি হলুদ বর্ণের কলপ ব্যবহার করছেন। আমি আরো লক্ষ্য করেছি যে, আপনি (যিলহজ্জের) আট তারিখে ইহ্রাম বাঁধেন। অথচ লোকজন মক্কায় নতুন চাঁদ দেখার সাথে সাথে ইহ্রাম বাঁধে। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রুক্নসমূহের ব্যাপারে কথা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাজারে আসওয়াদ ও রুক্নে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোন রুক্ন স্পর্শ করতে বা চুমা দিতে দেখিনি। আর পশমবিহীন স্যাণ্ডেলের ব্যাপারে কথা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন স্যাণ্ডেল পরিধান করতে দেখেছি, যাতে পশম ছিলো না। তিনি তা পায়ে দিয়ে উযূও করতেন। আমিও এ ধরনের স্যাণ্ডেল পরা পছন্দ করছি। হলুদ রং-এর কলপের ব্যাপারে কথা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই ধরনের কলপ ব্যবহার করতে দেখেছি। অতএব আমিও এই কলপ পছন্দ করি। ইহরামের ব্যাপার এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আট তারিখে যখন উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যাত্রা শুরু করতেন, তখন ইহ্রাম বাঁধতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উল্লেখিত সবই ঠিক আছে, কিন্তু তাওয়াফের সময় কেবল হাজারে আসওয়াদ ও রুক্নে ইয়ামানী স্পর্শ করতে বা চুমা দিতে হবে। ইবনে উমার (রা)-ও এই দু'টি রুক্ন স্পর্শ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।

٤٧٩- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَمْ تَرٰى اَنَّ قَوْمَك حِيْنَ بَنَوا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ تَرُدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ فَقَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمَك بِالْكُفْرِ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ الَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ اِلاَّ اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ .

৪৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি দেখছো না, তোমার জাতির লোকেরা যখন কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করে, তখন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর তা নির্মাণ করেনি। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহলে আপনি তা পুনরায় ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর স্থাপন করছেন না কেন? তিনি বলেন ঃ তোমার জাতির লোকেরা যদি নওমুসলিম না হতো তবে (আমি তা ইবরাহীম

(আ)-এর ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করতাম)। (অধস্তন রাবী) আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বললেন, আয়েশা (রা) যদি একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনে থাকেন, তবে এই বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতীম সংলগ্ন রুক্‌নে শামী ও রুক্‌নে ইরাকী স্পর্শ করতেন না বা চুমা দিতেন না। কেননা এ সময় কাবাঘর ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভিতের উপর নির্মিত ছিলো না।[১৯]

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ কাবাঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা এবং নামায পড়া।

٤٨٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحُجُبِىُّ فَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِ فَمَكَثَ فِيْهَا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَسَئَلْتُ بِلاَلاً حِيْنَ خَرَجُوْا مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلٰثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ثُمَّ صَلّٰى وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ .

৪৮০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন উসামা ইবনে যায়েদ (রা), বিলাল (রা) ও উছমান ইবনে তালহা (রা)। তিনি (উছমান) ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং নবী ﷺ কিছুক্ষণ কাবার অভ্যন্তরভাগে অবস্থান করেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তাঁরা যখন বের হয়ে আসলেন, আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভিতরে কি করেছেন? বিলাল বলেন, তিনি একটি থাম নিজের বাঁদিকে, দু'টি থাম ডানদিকে এবং তিনটি থাম পিছনে রেখে নামায পড়েছেন। তখন কাবাঘর ছয়টি থামের উপর নির্মিত ছিলো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়া উত্তম, মুস্তাহাব। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

---

১৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে কুরাইশগণ কাবাঘর ভেংগে পুনর্নির্মাণ করার উদ্যোগ নেয়। এ সময় কাবাঘর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বানানো ভিতের উপর ছিলো। এর গাঁথুনি ছিলো পাথরের, কিন্তু দেয়াল উঁচু ছিলো না। তার দু'টি দরজা ছিলো এবং উপরে ছাদ ছিলো না। কুরাইশরা তার দেয়াল উঁচু করে তৈরি করে, উপরে কাঠ ও পাথর দিয়ে ছাদ নির্মাণ করে এবং একটি মাত্র দরজা রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে খিলাফতের যুগ পর্যন্ত তা এই অবস্থায়ই ছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) তার শাসনামলে কাবাঘর ভেংগে তা পুনরায় ইবরাহীম (আ)-এর ভিতের উপর নির্মাণ করেন। অতঃপর উমাইয়া-রাজ আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তা ভেংগে পুনরায় কুরাইশদের ভিতের উপর এবং তাদের কাঠামোতে নির্মাণ করেন। বর্তমানে কাবাঘর এই কাঠামোতেই আছে (অনুবাদক)।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতদের ও বৃদ্ধদের পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

٤٨١–عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَتَتْ اِمْرَاَةٌ مِّنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيْهِ قَالَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ قَالَ وَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ بِيَدِهِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

৪৮১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল ইবনে আব্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সওয়ারীতে পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় খাছআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে আসে। ফযলও মেয়েলোকটির দিকে তাকাচ্ছিল এবং সেও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে ফযলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মহিলাটি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতার উপর এমন সময় হজ্জ ফরয হলো যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং সওয়ারীর উপর স্থির থাকার সামর্থ্যও তার নেই। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বলেন, 'হাঁ'। (রাবী বলেন) এটা বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।

٤٨٢– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّىْ اِمْرَاَةٌ كَبِيْرَةٌ لَا نَسْتَطِيْعُ اَنْ نَحْمِلَهَا عَلٰى بَعِيْرٍ وَاِنْ رَبَطْنَاهَا خِفْنَا اَنْ تَمُوْتَ اَفَاَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ .

৪৮২। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমার মা অত্যন্ত বৃদ্ধা। তাকে উটের পিঠে উঠাতে আমরা সক্ষম নই। যদি তাকে উটের সাথে বেঁধে নেই তবে তার মারা যাওয়ার আশংকা আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, করতে পারো।

٤٨٣– عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ رَجُلاً كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَبْلُغَ اَحَدٌ مِّنْ وَّلَدِهِ الْحَلَبَ فَيَحْلِبَ فَيَشْرَبَ اِلَّا حَجَّ وَحَجَّ بِهِ قَالَ فَبَلَغَ رَجُلٌ مِّنْ وَّلَدِهِ الَّذِىْ قَالَ وَقَدْ كَبِرَ الشَّيْخُ فَجَاءَ ابْنُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ اِنَّ اَبِىْ قَدْ كَبِرَ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

৪৮৩। ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তির সন্তান যৌবনে উপনীত হওয়ার পূর্বে ছোটবেলায়ই মারা যেতো। সে মানত করলো, যদি তার কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর উটের দুধ দোহন করার এবং তা পান করার উপযুক্ত হওয়ার বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে, তবে সে তার সন্তানকেও হজ্জ করাবে এবং নিজেও হজ্জ করবে। অতএব তার সন্তান জীবিত থেকে যখন ঐ বয়স পর্যন্ত পৌঁছলো, তখন সে বৃদ্ধ হয়ে পড়লো। তার সন্তান নবী ﷺ -এর কাছে এসে সব কথা খুলে বললো। সে বললো, আমার পিতা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। হজ্জ করার সামর্থ্য তার নেই। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এসব হাদীস অনুযায়ী আমল করি। মৃত ব্যক্তি অথবা হজ্জ করতে অক্ষম এ ধরনের বৃদ্ধ নারী-পুরুষের পক্ষ থেকে হজ্জ করা যেতে পারে। এতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত। ইমাম মালেক (র) বলেন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারে না।

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ তারবিয়ার দিন মিনায় নামায পড়ার বর্ণনা।

٤٨٤- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِمِنًى ثُمَّ يَغْدُوْ اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ اِلَى عَرَفَةَ .

৪৮৪। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায পড়তেন। সূর্য উদয়ের পর তিনি আরাফাতের উদ্দেশে রওয়ানা হতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটাই সুন্নাত। এতে কিছুটা বিলম্ব অথবা জলদি করায় কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতে উপস্থিতির দিন গোসল করা।

٤٨٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِعَرَفَةَ حِيْنَ يُرِيْدُ أَنْ يَرُوْحَ .

৪৮৫। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) (জাবালে রহমাতে) রওয়ানা হওয়ার সময় আরাফাতে গোসল করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, গোসল করা উত্তম তবে ওয়াজিব নয়।

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন।

٤٨٦-عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَيْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ فَقَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ حَتّٰى اِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُّ اَرْفَعُ مِنَ الْعَنَقِ.

৪৮৬। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন উটের গতি কিছুটা দ্রুততর করতেন। অতঃপর যখন প্রশস্ত মাঠ পেতেন, তখন উটকে আরো দ্রুত গতিতে হাঁকাতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এও জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَانَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِايْضَاعِ الْابِلِ وَايْجَافِ الْخَيْلِ (اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) .

"উট ও ঘোড়াকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। অতএব তোমরা অবশ্যই ধীরেসুস্থে ও শান্তভাবে অগ্রসর হবে।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুহাস্সার উপত্যকা অতিক্রম করার বর্ণনা।

٤٨٧-عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِىْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ بِقَدْرِ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ.

৪৮৭। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) মুহাস্সার উপত্যকায় নিজের সওয়ারীর গতি পাথর নিক্ষেপের গতির সমান তীব্রতর করে দিতেন।[২০]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এসব ক্ষেত্রে অবকাশ ও প্রশস্ততা রয়েছে। ইচ্ছা করলে দ্রুত গতিতেও চলা যায়, আবার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিক গতিতেও চলা যায়। আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

فِى السَّيْرَيْنِ جَمِيْعًا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ حِيْنَ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَحِيْنَ اَفَاضَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ .

"আরাফাত ও মুযদালিফা উভয় স্থান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় অবশ্যই তোমরা ধীরস্থির ও শান্তভাবে পথ চলবে।"

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফায় নামায পড়ার বর্ণনা।

٤٨٨- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيْعًا .

৪৮৮। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন।

٤٨٩-عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيْعًا.

৪৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়েছেন।

---

২০. মুযদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী একটি নিম্নভূমি। এখানেই আবরাহার হস্তিবাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই স্থানটি দ্রুত অতিক্রম করার নির্দেশ রয়েছে (অনুবাদক)।

٤٩٠- عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيْعًا فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

৪৯০। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়েছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। মুযদালিফায় না পৌঁছা পর্যন্ত মাগরিবের নামায পড়বে না, অর্ধ রাত অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও। মুযদালিফায় পৌঁছে আযান ও ইকামত দিবে। অতঃপর এই এক আযান ও এক ইকামতে একত্রে মাগরিব ও এশার নামায পড়বে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের সকল ফিক্হবিদের এই মত।

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় প্রস্তর নিক্ষেপের পরও হাজীদের জন্য যেসব কাজ নিষিদ্ধ।

٤٩١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ فَعَلَّمَهُمْ اَمْرَ الْحَجِّ وَقَالَ لَهُمْ فِيْمَا قَالَ ثُمَّ اِذَا جِئْتُمْ مِنًى فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ اِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ لاَ يَمُسُّ اَحَدٌ نِسَاءً وَلاَ طِيْبًا حَتّٰى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ .

৪৯১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আরাফাতে হজ্জের খোতবা দিলেন এবং লোকদের হজ্জের নিয়মাবলী শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, তোমরা যখন মিনায় পৌঁছে জামরাতুল আকাবায় প্রস্তর নিক্ষেপ সমাপ্ত করবে তখন ইহ্রামের কারণে তোমাদের উপর যা কিছু নিষিদ্ধ ছিলো তা তোমাদের জন্য হালাল হয়ে যাবে, শুধু স্ত্রীসহবাস ও সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে। বাইতুল্লাহ তাওয়াফের পর তা তোমাদের জন্য হালাল হবে।

٤٩٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ثُمَّ حَلَقَ اَوْ قَصَّرَ وَنَحَرَ هَدْيًا اِنْ كَانَ مَعَهُ حَلَّ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ فِى الْحَجِّ اِلاَّ النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ حَتّٰى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ .

৪৯২। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) উমার (রা)-কে বলতে শুনেছেন,উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামরায় প্রস্তর নিক্ষেপ করলো, অতঃপর মাথা মুণ্ডন করলো অথবা চুল খাটো করলো এবং সাথে কোরবানীর পশু থাকলে তা কোরবানী করলো, এরপর তার জন্য সব কিছুই হালাল হয়ে গেলো যা হজ্জের সময় তার উপর হারাম ছিলো। তবে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত স্ত্রীসহবাস এবং সুগন্ধি ব্যবহার তার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র বক্তব্য। অন্যথায় হযরত আয়েশা (রা) বলেন,

طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ بَعْدَ مَا حَلَقَ قَبْلَ اَنْ يَّزُوْرَ الْبَيْتَ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা কামানোর পর এবং বাইতুল্লাহ শরীফ যিয়ারতের পূর্বে আমার এই দুই হাতে আমি তাঁর দেহে সুগন্ধি মেখে দিয়েছি।"

٤٩٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهِ قَبْلَ اَنْ يُّحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ .

৪৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে ইহ্‌রামের জন্য সুগন্ধি মেখে দিতাম এবং হালাল হওয়ার জন্য বাইতুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বেও সুগন্ধি মেখে দিতাম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে এটাই উত্তম। তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা উমার (রা) ও ইবনে উমার (রা)-র মত পরিত্যাগ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ স্থানে দাঁড়িয়ে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে।

٤٩٤- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ سَئَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ مِنْ اَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ ابْنُ مُحَمَّدٍ يَرْمِىْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَالَ مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ .

৪৯৪। ইমাম মালেক (র) বলেন, আমি আবদুর রহমন ইবনুল কাসিমকে জিজ্ঞেস করলাম, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র) কোন্ স্থানে দাঁড়িয়ে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করতেন? তিনি বলেন, সুবিধাজনক স্থানে দাঁড়িয়ে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, প্রান্তরের মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে পাথর নিক্ষেপ করা সবচেয়ে উত্তম। অবশ্য যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে পাথর নিক্ষেপ করা জায়েয। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সাধারণ ফিক্‌হবিদদেরও এই মত।

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কারণ বশত অথবা বিনা কারণে জামরায় প্রস্তর নিক্ষেপ করতে বিলম্ব করা এবং তা মাকরূহ হওয়া সম্পর্কে।

٤٩٥-عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْاِبِلِ فِى الْبَيْتُوْتَةِ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُوْنَ مِنَ الْغَدِ اَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُوْنَ يَوْمَ النَّفْرِ .

৪৯৫। আসেম ইবনে আদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উট চালকদের মিনা ছাড়া অন্যত্র রাত যাপন করার অনুমতি দিয়েছেন। তারা কোরবানীর দিন প্রস্তর নিক্ষেপ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় (১১তম) বা তৃতীয় দিন এবং প্রস্থানের (১৩তম) দিন প্রস্তর নিক্ষেপ করবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যে ব্যক্তি ওজর বশত অথবা বিনা ওজরে দুই দিনের প্রস্তর নিক্ষেপের কাজ এক দিনে সেরে নিবে তাকে কোনরূপ কাফ্ফারা দিতে হবে না। কিন্তু বিনা ওজরে এরূপ করা মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে পরবর্তী দিনের সকাল পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপে বিলম্ব করবে, তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে।

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ আরোহিত অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করা।

٤٩٦-أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ النَّاسَ كَانُوْا اِذَا رَمُوا الْجِمَارَ مَشَوْا ذَاهِبِيْنَ وَرَاجِعِيْنَ وَاَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِى سُفْيَانَ .

৪৯৬। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, লোকেরা পদব্রজে জামরায় প্রস্তর নিক্ষেপ করতো। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানই সর্বপ্রথম আরোহিত অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, পদব্রজে প্রস্তর নিক্ষেপ করা সর্বোত্তম। তবে আরোহিত অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করাতেও দোষ নেই।

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ জামরায় পাথর নিক্ষেপের সময় যা বলতে হবে এবং উভয় জামরায় দাঁড়ানোর বর্ণনা।

٤٩٧- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى الْجَمْرَةَ بِحَصَاةٍ .

৪৯৭। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) প্রত্যেকবার জামরায় প্রস্তর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি।

٤٩٨- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وُقُوْفًا طَوِيْلاً يُكَبِّرُ اللّٰهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَدْعُو اللّٰهَ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ الْعَقَبَةِ .

৪৯৮। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) প্রথম দুই জামরার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তাকবীর বলতেন, তাছবীহ-তাহলীল পড়তেন এবং দোয়া করতেন, কিন্তু জামরায় আকাবার কাছে অবস্থান করতেন না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুপুরের পূর্বে অথবা পরে জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা।

٤٩٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لاَ تُرْمَى الْجِمَارُ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ فِى الْاَيَّامِ الثَّلٰثَةِ الَّتِى بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ .

৪৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কোরবানীর দিনের পরবর্তী তিন দিন দুপুরের পর পাথর নিক্ষেপ করবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি।

৫৪. অনুচ্ছেদঃ মিনার রাতগুলোতে আকাবার পিছনে রাত যাপন করা মাকরূহ।

٥٠٠- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ قَالَ زَعَمُوْا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُوْنَ النَّاسَ مِنْ وَّرَاءِ الْعَقَبَةِ اِلَى مِنًى .

৫০০। নাফে (র) বলেন, লোকেরা পরস্পর বলাবলি করলো, হযরত উমার (রা) জামরায় আকাবার পিছন থেকে লোকদেরকে মিনায় প্রত্যাবর্তন করানোর জন্য চৌকিদার নিয়োগ করতেন।

٥٠١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ يَبِيْتَنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى وَّرَاءَ الْعَقَبَةِ .

৫০১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, কোন হাজী যেন মিনার রাতগুলো জামরায় আকাবার পিছনে না কাটায়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মতের উপর আমল করি। জামরায় আকাবার পিছনে কোন হাজীর জন্য মিনার রাতগুলো অতিবাহিত করা ঠিক নয়। কেননা জামরায় আকাবায় রাত কাটানো মাকরূহ এবং এজন্য কোনরূপ কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের অনুষ্ঠানে অগ্র-পশ্চাৎ করা।

٥٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ لِلنَّاسِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْئَلُوْنَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ وَقَالَ اٰخَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ شَيْئٍ يَوْمَئِذٍ قُدِّمَ وَلاَ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ .

৫০২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় লোকদের উদ্দেশে দাঁড়ালেন। লোকজন তাঁর নিকট প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকলো। এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি অজ্ঞতাবশত পাথর নিক্ষেপের পূর্বে কোরবানী করে ফেলেছি। তিনি বলেন ঃ "পাথর নিক্ষেপ করো, এতে কোন দোষ নেই"। আরেক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি অজ্ঞতাবশত কোরবানীর পূর্বে মাথা কামিয়ে ফেলেছি। তিনি বলেন ঃ "কোরবানী করো, তাতে কোন

দোষ নেই"। রাবী বলেন, সেদিন কোন অনুষ্ঠান আগে বা পরে হয়ে যাওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেছেন ঃ "এখন তা করো, এতে কোন দোষ নেই"।

٥٠٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ نَسِىَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا اَوْ تَرَكَ فَلْيُهْرِقْ دَمًا قَالَ اَيُّوْبُ لاَ اَدْرِىْ اَقَالَ تَرَكَ اَمْ نَسِىَ .

৫০৩। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, ভুলবশত কারো হজ্জের কোন অনুষ্ঠান বাদ পড়লে অথবা ত্যাগ করলে সে যেন একটি পশু যবেহ করে। অধস্তন রাবী আইউব সুখতিয়ানী বলেন, সাঈদ ইবনে জুবায়ের "পরিত্যাগ করেছে" না "ভুলে গেছে" এর কোন কথাটি বলেছেন তা আমি মনে রাখতে পারিনি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের উপর আমল করি। তিনি বলেছেন ঃ "এসব অনুষ্ঠানে অগ্র-পশ্চাৎ হওয়াতে কোন দোষ নেই"। এজন্য কোন কাফ্ফারাও দিতে হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-ও মত প্রকাশ করেছেন যে, এসব ব্যাপারে অগ্র-পশ্চাৎ হয়ে গেলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। তিনি এজন্য কাফ্ফারা দেয়ার কথাও বলেননি। কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে, তামাত্তু বা কিরান হজ্জকারী যদি কোরবানী করার পূর্বে মাথা কামায় তবে তাদের একটি করে পশু যবেহ করতে হবে। কিন্তু আমাদের মতে এক্ষেত্রেও কাফ্ফারার প্রয়োজন নেই।

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রাম অবস্থায় শিকার করলে তার প্রতিবিধান।

٥٠٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضٰى فِى الضَّبُعِ بِكَبْشٍ وَّفِى الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَّفِى الْاَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَّفِى الْيَرْبُوْعِ بِجَفْرَةٍ .

৫০৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইহ্রাম অবস্থায় গুইসাপ শিকার করলে একটি মেষ, হরিণ শিকার করলে একটি ছাগল, খরগোশ শিকার করলে এক বছর বয়সের একটি ছাগল এবং বন্য ইঁদুর মারলে চার মাস বয়সের একটি ছাগলের বাচ্চা যবেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা উল্লেখিত সকল নিয়ম মেনে নিয়েছি। এই পশু একে অপরের সমতুল্য।

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থতার কারণে মাথা কামালে তার প্রতিবিধান।

٥٠٥- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحْرِمًا فَاٰذَاهُ الْقُمَّلُ فِىْ رَاْسِهِ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّحْلِقَ رَاْسَهُ وَقَالَ صُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ اَوِ انْسُكْ شَاةً اَىَّ ذٰلِكَ فَعَلْتَ اَجْزَاَ عَنْكَ .

৫০৫। কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন। মাথার উঁকুন তাকে কষ্ট দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মাথা কামানোর নির্দেশ দেন এবং বলেন ঃ "তিন দিন রোযা রাখো অথবা ছয়জন মিসকীনকে মাথাপিছু দুই মুদ্দ করে খাবার দাও অথবা একটি বকরী কোরবানী করো। এর যে কোন একটি কাজ তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[২১]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সকল ফিক্হবিদের এই মত।

৫৮. অনুচ্ছেদঃ দুর্বলদের মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে আগেই পাঠাতে হবে।

٥٠٦ - عَنْ سَالِمٍ وَّعُبَيْدِ اللهِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ صِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلَى مِنًى حَتَّى يُصَلُّوْنَ الصُّبْحَ بِمِنًى .

৫০৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ছোটদেরকে মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে আগেই পাঠিয়ে দিতেন। তারা মিনায় পৌঁছে ফজরের নামায পড়তো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দুর্বলদের আগেভাগেই মিনার উদ্দেশে পাঠিয়ে দেয়ায় কোন দোষ নেই। তবে তাদের তাকিদ করে বলতে হবে যে, তারা যেন সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে জামরায় পাথর নিক্ষেপ না করে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এই মত।

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুকে কাপড়ের ঝুল পরানো।

٥٠٧ - اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشُقُّ جِلاَلَ بُدْنِهِ وَكَانَ لاَ يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ بِهَا مِنْ مِنًى اِلَى عَرَفَةَ وَكَانَ يُجَلِّلُهَا بِالْحُلَلِ وَالْقُبَاطِىِّ وَالْاَنْمَاطِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِجِلاَلِهَا فَيَكْسُوْهَا الْكَعْبَةَ قَالَ فَلَمَّا كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هٰذِهِ الْكِسْوَةَ اَقْصَرَ مِنَ الْجِلاَلِ .

৫০৭। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার কোরবানীর উটের ঝুল কাটতেন না। মিনা থেকে রওয়ানা হয়ে ভোরে আরাফাতে না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি তার কোরবানীর পশুকে ঝুল পরাতেন না। তিনি মিসরীয় কাপড়েরর তৈরী চারটি ঝুল পরাতেন। অতঃপর তা কাবার গেলাফের কাজে ব্যবহারের জন্য মক্কায় পাঠিয়ে দিতেন। নাফে (র) বলেন, কাবা ঘরের গেলাফ তৈরীর রীতি শুরু হওয়ার পর ঝুল পরানোর রীতি বন্ধ হয়ে যায়।

---

২১. দুই মুদ্দে অর্ধ সা' হয়। অর্থাৎ এক সের সাড়ে বারো ছটাক (অনুবাদক)।

٥٠٨ – اَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ سَئَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِيْنَارٍ مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلاَلِ بُدْنِهِ حَتّٰى اَقْصَرَ عَنْ تِلْكَ الْكِسْوَةِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ كَانَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا .

৫০৮। ইমাম মালেক (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে দীনারকে জিজ্ঞেস করলাম, কাবা ঘরের গেলাফ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর ইবনে উমার (রা) তার কোরবানীর উটের ঝুলগুলো কি করতেন? আবদুল্লাহ ইবনে দীনার বলেন, ইবনে উমার (রা) তা দান করে দিতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। কোরবানীর পশুর ঝুল (পশুকে সুসজ্জিত করার কাপড়), নাসারন্ধ্রের রশি, বাঁধার দড়ি ইত্যাদি সব দান-খয়রাত করে দিতে হবে। এসব জিনিস এবং গোশত কসাইকে মজুরী হিসাবে দেয়া জায়েয নয়। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মনীতি সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে,

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ بِهَدْيٍ فَاَمَرَ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِجِلاَلِهٖ وَبِخُطُمِهٖ وَاَنْ لاَّ يُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْ خُطُمِهٖ وَجِلاَلِهٖ شَيْئًا .

"নবী ﷺ আলী (রা)-কে কোরবানীর পশুসহ মক্কায় পাঠান। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন এর ঝুল, নাসারন্ধ্রের রশি সবকিছু দান করেন এবং এর কোন জিনিসই কসাইকে মজুরী হিসাবে না দেন।"

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ পথিমধ্যে কোন কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে।

٥٠٩ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ اُحْصِرَ دُوْنَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَتَدَاوٰى مِمَّا اضْطُرَّ اِلَيْهِ وَيَفْدِيْ .

৫০৯। ইবনে উমার (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি রোগের কারণে কাবাঘর পর্যন্ত পৌঁছার পথে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে সে তাওয়াফ না করা পর্যন্ত ইহ্‌রাম খুলবে না। সে রোগের চিকিৎসা করাবে এবং ফিদিয়া দিবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়া ব্যক্তির যে হুকুম, রোগের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়া ব্যক্তিরও সেই একই হুকুম। এক ব্যক্তিকে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার পর সাপে কামড়ালে সে আর বাইতুল্লায় আসতে পারেনি। তার সম্পর্কে ইবনে মাসউদ (রা)–কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সে নিজের কোরবানীর পশু পাঠিয়ে দিবে এবং তার সাথীদের সাথে কোরবানীর সময় নির্দিষ্ট করে নিবে। অতঃপর কোরবানী হয়ে গেলে সে ইহ্‌রাম খুলে ফেলবে। আর পরবর্তী বছর উমরার কাযা করবে। আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্রাম অবস্থায় মারা যাওয়া ব্যক্তির কাফন।

٥١٠- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَفَّنَ ابْنَهُ وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَمَاتَ مُحْرِمًا بِالْجُحْفَةِ وَخَمَّرَ رَأْسَهُ .

৫১০। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) তার পুত্র ওয়াকিদকে কাফন পরালেন এবং তার মাথা ঢেকে দিলেন। তিনি জুহফা নামক স্থানে ইহরামের অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।[২২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত। কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার ইহ্রামও শেষ হয়ে যায়।

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফার রাতে আরাফাতে অবস্থান করা।

٥١١- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلَعَ الْفَجْرُ أَدْرَكَ الْحَجَّ .

৫১১। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলতেন, কোন ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে ভোর হওয়ার পূর্বেও আরাফাতে অবস্থান করতে পারলে সে হজ্জ পেয়ে গেলো।[২৩]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সকল ফিক্হবিদেরও এই মত।

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় সূর্য অস্ত যাওয়ার বর্ণনা।

٥١٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى لاَ يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ .

---

২২. ইমাম আবু হানীফা (র) ও মালেকের মতে ইহ্রাম অবস্থায় মারা যাওয়া ব্যক্তিকে সাধারণ মৃতদের নিয়মেই কাফন দিতে হবে। কারণ মৃত্যুর সাথে সাথে ইহ্রামের অবস্থাও শেষ হয়ে যায়। ইমাম মালেক বলেন, মানুষ যতোক্ষণ জীবিত থাকে, ততোক্ষণই তার কাজ করার সামর্থ্য থাকে। মৃত্যুর সাথে সাথে তার কর্মশক্তিও রহিত হয়ে যায়। একারণে মুহরিম ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর সাধারণ মৃতদের মতোই হয়ে যায়। অপরদিকে ইমাম শাফিঈ, আহমাদ, সুফিয়ান সাওরী ও ইসহাকের মতে, মুহরিম ব্যক্তিকে তার ইহরামের কাপড়েই কাফন দিতে হবে এবং তার মাথা ও মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "মুহরিম ব্যক্তিকে তার পরনের দুই কাপড়েই কাফন দাও এবং তার মাথা ঢেকো না। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে ইহ্রাম ও তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে" (তিরমিযী, মুসলিম)। মাওলানা আবদুল হাই লাখনাবীর মতে শাফিঈ মাযহাবের মতই দলীলের দিক থেকে অগ্রগণ্য (অনুবাদক)।

২৩. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ৯ম যিলহজ্জ দুপুরের পর থেকে পরবর্তী রাতের ফজর হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ও যদি আরাফাতে উপস্থিত হতে পারে, তবে সে হজ্জ পেয়ে গেলো (অনুবাদক)।

৫১২। ইবনে উমার (রা) বলতেন, বারো যিলহজ্জ সূর্যাস্তের সময় যে ব্যক্তি মিনায় থাকবে, সে ১৩ তারিখে প্রস্তর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত প্রস্থান করবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সকল ফিক্‌হবিদেরও এটাই সাধারণ মত।

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ মাথা কামানোর পূর্বে রওয়ানা হওয়া।

٥١٣- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَقِىَ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِه يَقَالُ لَهُ الْمُجَبَّرُ وَقَدْ اَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ رَاْسَهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ جَهِلَ ذٰلِكَ فَاَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ اَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ رَاْسَهُ اَوْ يُقَصِّرَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى الْبَيْتِ فَيَفِيْضُ .

৫১৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার কোন এক নিকটাত্মীয়ের সাথে সাক্ষাত করলেন। তার নাম ছিলো মুজাব্বার। সে ভুলবশত মাথা কামানো অথবা চুল খাটো করার পূর্বেই তাওয়াফে ইফাদা করেছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে ফিরে গিয়ে মাথা কামাতে বা চুল খাটো করতে এবং অতঃপর ফিরে এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে নির্দেশ দিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই নীতি গ্রহণ করেছি।

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে ইফাদার পূর্বে আরাফাতে অবস্থানের পর স্ত্রীসহবাস করলে।

٥١٤- عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وُقَعَ عَلٰى امْرَاَتِه قَبْلَ اَنْ يُّفِيْضَ فَاَمَرَهُ اَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً .

৫১৪। আতা ইবনে আবু রবাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করেছে। তিনি তাকে একটি উট কোরবানী করার নির্দেশ দিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ اَدْرَكَ حَجَّهُ فَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ لَمْ يُفْسِدْ حَجُّهُ وَلٰكِنْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ بِجِمَاعِهِ وَحَجُّهُ تَامٌّ وَاِذَا جَامَعَ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ لاَ يُفْسِدُ .

"যে ব্যক্তি আরাফাতে অবস্থান করলো, সে হজ্জ পেয়ে গেলো। যে ব্যক্তি আরাফাতে অবস্থানের পর স্ত্রীসহবাস করলো, তার হজ্জ নষ্ট হবে না। কিন্তু স্ত্রীসহবাস করার কারণে তাকে একটি উট কোরবানী করতে হবে এবং তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে। তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে স্ত্রীসহবাস করলে সে ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম।"

ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার ব্যাপারে জলদি করা।

٥١٥- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ مَا شَاْنُ النَّاسِ يَاْتُوْنَ شُعْثًا وَاَنْتُمْ مُدَّهِنُوْنَ اَهِلُّوْا اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلاَلَ .

৫১৫। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, হে মক্কাবাসীগণ! লোকদের কি হয়েছে যে, তারা উস্কখুস্ক চুল নিয়ে আসছে, অথচ তোমরা মাথায় তৈল মাখছো? তোমরা চাঁদ দেখে ইহ্‌রাম বাঁধো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বিলম্ব করে ইহ্‌রাম বাঁধার চেয়ে জলদি বাঁধা ভালো। যতোদূর সম্ভব বিলম্ব না করে ইহ্‌রাম বাঁধো। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ অথবা উমরা সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তনের পালা।

٥١٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ اَوْ غَزْوَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِّنَ الْاَرْضِ ثَلٰثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ .

৫১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হজ্জ, উমরা অথবা জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন প্রত্যেক উঁচু জায়গায় তিনবার তাকবীর ধ্বনি করতেন, অতঃপর এই দোয়া পড়তেন ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। তিনিই জীবিত করেন এবং মারেন। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আমরা আমাদের রবের কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, তাঁর ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন"।

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে।

٥١٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّذِىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّىْ بِهَا وَيُهَلِّلُ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

৫১৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হজ্জ অথবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, যুল-হুলাইফার বাতহা নামক স্থানে নিজের উট বসিয়ে নামায পড়তেন এবং দোয়া-কালাম পড়তেন। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন।

٥١٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ يَصْدُرَنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْحَاجِّ حَتّٰى يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ فَاِنَّ اٰخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ .

৫১৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বলেন, কেউ যেন বিদায়ী তাওয়াফ না করে বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা না হয়। কেননা হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিদায়ী তাওয়াফই হচ্ছে সর্বশেষ অনুষ্ঠান।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। প্রত্যেক হাজীর উপর তাওয়াফে সুদূর (বিদায়ী তাওয়াফ) ওয়াজিব। যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করবে, তাকে একটি পশু যবেহ করতে হবে। কিন্তু হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলারা এই নির্দেশের ব্যক্তিক্রম, তাদের বাড়ি চলে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। তাদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ জরুরী নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার পর কোন মহিলার জন্য চুল খাটো করার পূর্ব পর্যন্ত চিরুণী করা মাকরূহ।

٥١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الْمَرْاَةُ الْمُحْرِمَةُ اِذَا حَلَّتْ لاَ تَمْتَشِطُ حَتّٰى تَاْخُذَ مِنْ شَعْرِهَا شَعْرَ رَاْسِهَا وَاِنْ كَانَ لَهَا هَدْىٌ لَمْ تَاْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتّٰى تَنْحَرَ .

৫১৯। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, মুহরিম মহিলা ইহ্‌রামমুক্ত হয়ে যাওয়ার পরও চুল খাটো না করা পর্যন্ত তাতে চিরুণী করবে না। তার সাথে যদি কোরবানীর পশু থাকে, তবে সে তা যবেহ না করা পর্যন্ত চুল কাটতে পারবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদেরও এই মত।

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ মুহাস্‌সাবে যাত্রাবিরতি করে নামায পড়া।[২৪]

٥٢٠- حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ .

---

২৪. 'মুহাস্‌সাব' মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী তবে মিনার নিকটতর একটি উপত্যকা। এর অপর নাম 'বাহ্‌তা মক্কা' ও 'খায়েফে বনূ কিনানা' (অনুবাদক)।

৫২০। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) আল-মুহাস্‌সাব নামক স্থানে যুহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়তেন। অতঃপর রাতের বেলা মক্কায় প্রবেশ করে তিনি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটাই উত্তম। কিন্তু কোন ব্যক্তি মুহাস্‌সাবে যাত্রাবিরতি না করলে তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৭১. অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি মক্কায় ইহ্‌রাম বাঁধে সে কি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করবে?

٥٢١- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتّٰى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى وَلاَ يَسْعٰى اِلاَّ اِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ.

৫২১। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) যখন মক্কায় ইহ্‌রাম বাঁধতেন, তখন মিনা থেকে ফিরে আসার পূর্বে বাইতুল্লাহও তাওয়াফ করতেন না এবং সাফা-মারওয়ার মাঝেও সাঈ করতেন না। আর তিনি-তাওয়াফ করার পরই সাঈ করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উল্লেখিত নিয়ম অনুসরণ করাও জায়েয। আবার মিনায় যাওয়ার পূর্বে যদি তাওয়াফ এবং সাঈ করে, তবে তাও জায়েয়। মোটকথা উভয় পদ্ধতিই উত্তম। কিন্তু আমাদের পছন্দনীয় পদ্ধতি এই যে, তাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্করে রমল পরিত্যাগ করবে না, তা মিনায় যাওয়ার পূর্বে অথবা পরেই তাওয়াফ করুক না কেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো জায়েয।

٥٢٢- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ فَوْقَ رَأْسِهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمٌ بِمَكَانٍ مِّنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ يُقَالُ لَهُ لَحْيُ جَمَلٍ .

৫২২। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহ্‌রাম অবস্থায় তাঁর মাথায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন। এ সময় তিনি মক্কার পথে 'লাহ্‌ইয়ু জামাল' নামক স্থানে ছিলেন।[২৫]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস গ্রহণ করেছি। ইহ্‌রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানোয় কোন দোষ নেই, তা প্রয়োজন বশতই করা হোক বা অপ্রয়োজনে। কিন্তু শিংগা লাগানোর স্থানের চুল কামানো যাবে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

٥٢٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ اِلاَّ اَنْ يُّضْطَرَّ اِلَيْهِ .

---

২৫. 'লাহ্‌ইয়ু জামাল' ঃ মক্কা ও মদীনার মাঝপথে এক স্থানের নাম (অনুবাদক)।

৫২৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, একান্ত প্রয়োজন না দেখা দিলে ইহ্রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করাবে না।

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ সশস্ত্র অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ।

٥٢٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ قَالَ اقْتُلُوْهُ .

৫২৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। তিনি যখন শিরস্ত্রাণ খুলে রাখেন তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি (আবু বারযা আল-আসলামী) এসে বলেন, ইবনে খাতাল কাবার গেলাফ ধরে আছে। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাকে হত্যা করো।[২৬]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় নবী ﷺ ইহ্রামবিহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। এজন্যই তাঁর মাথায় শিরস্ত্রান ছিলো। আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হুনাইন থেকে ইহ্রাম বাঁধেন তখন বলেন ঃ "হেরেম শরীফে প্রবেশ করার জন্য এই উমরা। কেননা মক্কা বিজয়ের দিন আমরা ইহ্রামবিহীন অবস্থায় হেরেমে প্রবেশ করেছিলাম।"

এ কারণে আমাদের মতে কোন ব্যক্তি ইহ্রাম না বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করলে তাকে অবশ্যই মক্কার বাইরে গিয়ে হজ্জ অথবা উমরার জন্য ইহ্রাম বেঁধে পুনরায় মক্কায় প্রবেশ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।

---

২৬. ইবনে খাতালের কয়েকটি নাম উল্লেখ আছে। যেমন আবদুল্লাহ, আবদুল উয্যা, আবদুল্লাহ ইবনে হিলাল ইবনে খাতাল, গাবিল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল ইত্যাদি। সে ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায় এবং হত্যার অপরাধ করে মক্কার কুরাইশ কাফেরদের সাথে যোগ দেয়। মহানবী ﷺ-কে উপহাস ও তিরস্কার করে গান-বাজনা করার জন্য সে দু'টি গায়িকা বাঁদীও রেখেছিলো। এসব কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হত্যার নির্দেশ দেন (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ৭

كِتَابُ النِّكَاحِ

(বিবাহ-শাদী)

১. অনুচ্ছেদ ঃ একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধান ও পালা বন্টন।

٥٢٥-عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ بَنٰى بِاُمِّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا حِيْنَ اَصْبَحَتْ عِنْدَهُ لَيْسَ بِكِ عَلٰى اَهْلِكِ هَوَانٌ اِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ وَاِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ قَالَتْ ثَلِّثْ .

৫২৫। আবদুল মালেক ইবনে আবু বাক্র ইবনুল হারিছ ইবনে হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বাসররাত অতিবাহিত করে ভোরবেলা স্ত্রী উম্মে সালামা (রা)-কে বলেন ঃ "আমি এমন কাজ করবো না যার কারণে তোমাকে তোমার লোকদের মধ্যে অপমানিত হতে হবে। যদি তোমার পছন্দ হয় তবে সাত দিন আমি তোমার কাছে কাটাবো এবং সাত দিন অপর স্ত্রীদের কাছে কাটাবো। আর যদি তুমি চাও তবে তিন দিন তোমার কাছে কাটাবো এবং একদিন করে অপর স্ত্রীদের কাছে কাটাবো।" উম্মে সালামা (রা) বলেন, তিন দিনের পালা বন্টন করুন।[১]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। নতুন স্ত্রীর কাছে সাত দিন কাটাবে এবং অপর স্ত্রীদের কাছে সাত দিন। আর নতুন স্ত্রীর কাছে তিন দিন অবস্থান করলে অন্য স্ত্রীদের কাছেও তিন দিন অবস্থান করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।

---

১. ইসলাম চারের সীমা পর্যন্ত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে সত্য, কিন্তু সাথে সাথে কঠোর শর্তও আরোপ করেছে। বাসস্থান, খোরপোষ, রাত যাপন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সবদিক থেকেই স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধান করতে হবে। যদি কেউ আশংকা করে যে, সে একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধান করতে সক্ষম হবে না, তবে তার পক্ষে এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকা উত্তম। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "যদি তোমরা আশংকা করো যে, তোমরা একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধান করতে পারবে না, তাহলে এক স্ত্রীতেই সীমাবদ্ধ থাকো" (সূরা নিসা ঃ ৩)। আমাদের সমাজে যেভাবে একাধিক বিবাহের মহড়া চলছে এবং স্ত্রীদের সাথে ইতরের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে, তা আল্লাহ্র বিধান এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ সম্পর্কে অজ্ঞতারই ফল। আইন করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সুশিক্ষার মাধ্যমে জনগণের নৈতিক চেতনা ও বিবেককে জাগ্রত করতে পারলে এর সামাধান সহজ হবে এবং স্থায়ী ফল পাওয়া যাবে।

ইবনে আবদুল বার বলেন, হাদীসটি দৃশ্যত সনদসূত্র কর্তিত বলে মনে হয়। আসলে এর সনদ পরম্পর সংযুক্ত (মুত্তাসিল) আছে। আবু বাক্র সরাসরি উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট হাদীসটি শুনেছেন। যেমন মুসলিম, আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় তা মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে (অনুবাদক)।

২. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরের নিম্নতম পরিমাণ।[২]

٥٢٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنَ الذَّهَبِ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৫২৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) নবী ﷺ এর কাছে এলেন তখন তাঁর দেহে হলুদের চিহ্ন ছিলো। তিনি তাঁকে জানান যে, তিনি এক নসারী মহিলাকে বিবাহ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন ঃ তাকে কতো মুহর (মাহর) দিয়েছো? তিনি বলেন, একটি খেজুর বিচির সম-পরিমাণ সোনা। তিনি বলেনঃ বিবাহ-ভোজের আয়োজন করো, একটি বকরী দিয়ে হলেও।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। মুহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে দশ দিরহাম, যে পরিমাণ অর্থ চুরি করলে হাত কাটা যায়। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অধিকাংশ হানাফী ফিকহ্‌বিদের এটাই সাধারণ মত।

---

২. যে অর্থের বিনিময়ে একজন পুরুষ বিবাহের মাধ্যমে একজন স্ত্রীলোককে নিজের জন্য হালাল করে, তাকে মুহর বলে। বিবাহ-বন্ধন শুদ্ধ হওয়ার জন্য মুহর নির্ধারণ একটি অন্যতম শর্ত। বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারিত মুহর স্ত্রীর হাতে অর্পণ করা স্বামীর উপর ফরয। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "যেসব মহিলাকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হালাল করা হলো, তাদের তোমরা নিজেদের মালের বিনিময়ে গ্রহণ করো" (সূরা নিসা ঃ ২৪)। "তোমরা খুশিমনে নারীদের মুহর পরিশোধ করো" (সূরা নিসা ঃ ৪)। এসব আয়াতের ভিত্তিতে ইমামগণ বলেছেন, মুহর প্রদান ব্যতীত বিবাহ জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি বিবাহ করে নিয়াত করলো যে, সে মুহর আদায় করবে না, সে যেনাকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করবে" (তাবারানী)। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তি মুহরের বিনিময়ে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, কিন্তু মুহর পরিশোধ করার নিয়াত রাখে না, সে ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে তা ফেরত দেয়ার নিয়াত রাখে না সে আসলে চোর" (স্বামী-স্ত্রীর অধিকার গ্রন্থ থেকে নেয়া)।

মুহরের উচ্চতম পরিমাণ নির্ধারিত নেই। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ "স্ত্রীদের কাউকে অঢেল সম্পদ দান করে থাকলেও তোমরা তা ফেরত নিতে পারবে না" (সূরা নিসা ঃ ২০)। ইমাম শাফিঈর মতে মুহরের নিম্নতম পরিমাণ যতো কমই হোক বিবাহ জায়েয হবে। ইমাম মালেকের মতে এর নিম্নতম পরিমাণ তিন দিরহাম এবং ইমাম আবু হানীফার মতে দশ দিরহাম।

বিবাহ-ভোজের আয়োজন করা সুন্নাত, তবে বাহুল্য প্রদর্শন নাজায়েয। এ অনুষ্ঠান করার সামর্থ্য না থাকলে তা করবে না। কারণ তা করতে গিয়ে অনেক পরিবারকে আর্থিক দিক থেকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখা গেছে। বিবাহ-ভোজে ধনীদের দাওয়াত করা এবং গরীবদের উপেক্ষা করা আপত্তিকর। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবাহ-ভোজ হচ্ছে, যেখানে ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় এবং দরিদ্রদের বাদ দেয়া হয়" (বুখারী, মুসলিম)। দাওয়াত না পেয়েও বিবাহ-ভোজে যাওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি দাওয়াত না পেয়েও বিবাহ-ভোজে উপস্থিত হয়েছে, সে চোররূপে ঢুকেছে এবং ডাকাতরূপে বের হয়ে এসেছে" (আবু দাউদ) (অনুবাদক)।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি ফুফু-ভাইঝিকে একত্রে বিবাহ করবে না।

٥٢٧– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْاَةِ وَخَالَتِهَا .

৫২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ফুফু-ভাইঝিকে এবং খালা-বোনঝিকে একত্রে বিবাহ করবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সকল ফিক্‌হবিদেরও এই মত

٥٢٨–اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَنْهٰى اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْاَةُ عَلٰى خَالَتِهَا اَوْ عَلٰى عَمَّتِهَا وَاَنْ يَّطَاَ الرَّجُلُ وَلِيْدَةً فِىْ بَطْنِهَا جَنِيْنٌ لِغَيْرِهِ .

৫২৮। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) কোন মেয়ের ফুফু অথবা খালা কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকলে, তাকে ঐ মেয়ে বিবাহ করতে নিষেধ করতেন। তিনি এমন বাঁদীর সাথে সহবাস করতেও নিষেধ করতেন, যে অন্যের দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সকল ফিক্‌হবিদেরও এই মত।

৪. অনুচ্ছেদঃ একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব দেয়া ঠিক নয়।

٥٢٩–عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ.

৫২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর (বিবাহের) প্রস্তাব না দেয়।[৩]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের এবং ইমাম আবু হানীফা (র) ও হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা নারী নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবকের তুলনায় অধিক কর্তৃত্বশীল।

٥٣٠– عَنْ خَنْسَاءَ ابْنَةِ خِذَامٍ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ .

৫৩০। খিযাম-কন্যা খানসা (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বিবাহ দিলেন, অথচ তিনি ছিলেন সাইয়্যেবা। তিনি এ বিবাহ অপছন্দ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পিতার দেয়া বিবাহ রদ করে দিলেন (বুখারী, ইবনে মাজা)।

---

৩. ইমাম মালেক (র) বলেন, "উভয় পক্ষ বিবাহে সম্মত হয়ে গেলে সেখানে অন্যের বিবাহের প্রস্তাব দেয়া নিষেধ।" অন্যথায় একই পাত্রীর জন্য একাধিক প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে। এতে উপযুক্ত পাত্র বাছাই করা সহজ হয় (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সাইয়্যেবা এবং প্রাপ্তবয়স্কা বাকেরাকে তার অনুমতি না নিয়ে বিবাহ দেয়া উচিৎ নয়। বাকেরার নীরবতাই তার সম্মতি বলে গণ্য হবে এবং সাইয়্যেবার ক্ষেত্রে তার মৌখিক সম্মতি নিতে হবে, তাকে তার পিতা অথবা অন্য কেউ বিবাহ দিক না কেন। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।[৪]

---

৪. বাকেরা (بكرة) শব্দের অর্থ প্রাপ্তবয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা। সাইয়্যেব্যা (ثيبة) ও আইয়্যেম (الايم) অর্থ প্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা নারী কিন্তু বিধবা; তা তালাকের কারণেও হতে পারে বা স্বামী মারা যাওয়ার কারণেও হতে পারে। শেষোক্ত শব্দটি স্ত্রীহীন পুরুষকেও বুঝায়।

প্রাপ্তবয়স্কা নারী অভিভাবক ছাড়াই বিবাহ বসতে পারে কিনা এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম শাফিঈ, মালেক ও আহমাদের মতে অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া শুধু পাত্রীর অনুমতি ও বাক্য দ্বারা বিবাহ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে প্রাপ্তবয়স্কা নারী অভিভাবক ছাড়াই বিবাহ বসতে পারে। এ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত হাদীসের ভিত্তিতেই এই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

"তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় এবং তাদের স্ত্রীগণ যদি জীবিত থাকে, তবে তারা নিজেদের চার মাস দশ দিন (পুনর্বিবাহ থেকে) বিরত রাখবে। যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবে, তখন তারা নিজেদের সম্পর্কে সঠিক পথে যা করতে চাইবে, তা করার অধিকার থাকবে। তোমাদের উপর তাদের কোন দায়িত্ব অর্পিত হবে না। আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেকের কাজ সম্পর্কে আবহিত" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৪)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আয়্যিম তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নিজের অভিভাবকের চেয়ে অধিক হকদার। বাকেরাকে বিয়ে দিতে হলে তার অনুমতি নিতে হবে। তার নীরবতাই তার সম্মতি বলে বিবেচিত হবে।" অপর বর্ণনায় আছে, "সায়্যিবা তার নিজের ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে অধিক কর্তৃত্ব সম্পন্ন" (মুসলিম)।

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা) বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমার পিতা এমন এক ব্যক্তির সাথে আমার বিবাহ দিয়েছেন, যাকে আমি পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পিতাকে বলেন ঃ তাকে বিবাহ দেওয়ার অধিকার তোমার নেই।" তিনি মেয়েলোকটিকে বলেন ঃ "যাও! তুমি যাকে পছন্দ করো তাকে বিবাহ করো" (নাসাবুর রায়াহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২)।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "সায়্যেবার উপর অভিভাবকের কোন কর্তৃত্ব নেই" (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

আয়েশা (রা) বলেন, এক যুবতী মেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আমাকে তার ভাইয়ের ছেলের সাথে এই উদ্দেশ্যে বিবাহ দিয়েছেন যে, তিনি আমার সাহায্যে তাকে দুর্দশা থেকে উদ্ধার করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বিবাহ ঠিক রাখা বা না রাখার এখতিয়ার তাকে দান করলেন। অতঃপর যুবতী বললো, আমার পিতা যা কিছু করেছেন, আমি তা ঠিক রাখলাম। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো, 'মেয়েরা জেনে নিক যে, তাদের উপর তাদের পিতাদের কোন কর্তৃত্ব নেই' (নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েরা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই নিজের পছন্দসই পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। অপরদিকে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন নারীর জন্য অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করা জায়েয নয় ঃ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যে নারী নিজ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলো, তার বিবাহ বাতিল গণ্য হবে, তার বিবাহ বাতিল গণ্য হবে, তার বিবাহ বাতিল

গণ্য হবে। কিন্তু স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে, তবে এই সহবাসের কারণে সে মুহরের অধিকারী হবে। অভিভাবকগণ যদি বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে যার অভিভাবক নেই, দেশের সরকার হবে তার অভিভাবক" (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, দারিমী)।

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ "অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হতে পারে না" (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, দারিমী)।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "কোন স্ত্রীলোক অপর স্ত্রীলোককে বিবাহ দিতে পারে না এবং সে নিজকেও বিবাহ দিতে পারে না। যে নারী নিজেই নিজকে বিবাহ দেয় সে যেনাকারিণী" (ইবনে মাজা, বায়হাকীর সুনানুল কুবরা)।

হযরত উমার (রা) বলেন, "অভিভাবক অথবা সরকারী কর্মকর্তা যে নারীর বিবাহ দেয়নি, তার বিবাহ বাতিল" (বায়হাকীর সুনানুল কুবরা)।

ইকরিমা ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। এক বিধবা মহিলা তার পুনর্বিবাহের ব্যাপারটি এমন এক ব্যক্তির উপর অর্পণ করে, যে তার বৈধ অভিভাবক ছিলো না। সে তাকে বিবাহ দিলো। তা হযরত উমার (রা)-র কানে গেলে তিনি উভয়কে শাস্তি দেন এবং বিবাহ বাতিল ঘোষণা করেন (সুনানুল কুবরা)।

হযরত আলী (রা) বলেন, যে স্ত্রীলোক অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করলো, তার বিবাহ বাতিল। অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ জায়েয নয় (সুনানুল কুবরা)।

শাবী (র) থেকে বর্ণিত। হযরত উমার (রা), আলী (রা), শুরাইহ এবং মাসরূক (র) বলেন, অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হতে পারে না (সুনানুল কুবরা)।

উল্লেখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে ইমাম শাফিয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল ও যাহেরী (আহলে হাদীস) মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, কোন মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে তা বাতিল গণ্য হবে।

উল্লেখিত দলীল-প্রমাণের দিকে লক্ষ্য করলে প্রতিভাত হয় যে, উভয় মতের সমর্থনেই শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে। এক পক্ষের সিদ্ধান্ত ভুল, তা বলার কোন সুযোগ নেই। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে আইন প্রণেতা কি বাস্তবে পরস্পর বিরোধী নির্দেশ দিয়েছেন? অথবা তিনি কি এক হুকুমের দ্বারা অপর হুকুম রহিত করেছেন? অথবা দু'টি হুকুমকে পাশাপাশি বহাল রেখে আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব?

প্রথম সন্দেহ সুস্পষ্টভাবেই বাতিল। কেননা শরীআতের সার্বিক ব্যবস্থা শরীআত প্রণেতার পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর কাছ থেকে পরস্পর বিরোধী হুকুম পাওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় সন্দেহও বাতিল। কেননা এক হুকুম দ্বারা অন্য হুকুম রহিত করার কোন প্রমাণ নেই। এখন তৃতীয় অবস্থাটি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। উভয় মতের দলীলসমূহ একত্রে সামনে রেখে চিন্তা করলে আইন প্রণেতার যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (منشا) অনুধাবন করা যায় তা হলো ঃ

(ক) বিবাহ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে দুই পক্ষ হলো নারী (পাত্রী) এবং পুরুষ (পাত্র), তাদের উভয়ের অভিভাবক নয়। এরই ভিত্তিতে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে ঈজাব-কবুল (Proposal & acceptance) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

(খ) প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাকে (বিধবা হোক অথবা কুমারী) তার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত এবং তার মর্জির বিরুদ্ধে বিবাহ দেয়া যেতে পারে না, তা পাত্রীর পিতাই হোক না কেন। যে বিবাহে পাত্রী রাজী নয়, সেখানে ঈজাবই (Proposal) তো অনুপস্থিত। বিবাহ কেমন করে বিধিবদ্ধ হতে পারে?

(গ) কিন্তু আইন প্রণেতা এটাও জায়েয রাখেন না যে, কোন মহিলা তার বিবাহের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে যাবে এবং যে ধরনের পুরুষকেই সে পছন্দ করবে, নিজের অভিভাবকের তোয়াক্কা না করে তাকে জামাতার মর্যাদা দিয়ে নিজের বংশে অনুপ্রবেশ করাবে। এজন্য আইন প্রণেতা কোন নারীর বিবাহের ব্যাপারে তার নিজের সম্মতির সাথে সাথে অভিভাবকের

৬. অনুচ্ছেদ ঃ চারের অধিক স্ত্রীর বর্তমানে নতুন স্ত্রী গ্রহণ।

٥٣١-أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِّنْ ثَقِيْفٍ وَكَانَ عِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِيْنَ اَسْلَمَ الثَّقَفِىُّ فَقَالَ لَهُ اَمْسِكْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا وَّفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

৫৩১। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছাকীফ গোত্রের লোকেরা যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তাদের এক ব্যক্তির অধীনে দশজন স্ত্রী ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ "তাদের মধ্যে চারজনকে রেখে বাকীদের তালাক দাও।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। তাদের মধ্যে যে চারজনকে ইচ্ছা রেখে দিয়ে অবশিষ্টদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, প্রথম চার স্ত্রীর বিবাহ জায়েয হয়েছে এবং অবশিষ্টদের বিবাহ বাতিল গণ্য হবে। ইবরাহীম নাখঈর বক্তব্যও তাই।

٥٣٢- حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ الْوَلِيْدَ سَئَلَ الْقَاسِمَ وَعُرْوَةَ وَكَانَتْ عِنْدَهُ اَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَاَرَادَ اَنْ يَّبِتَّ وَاحِدَةً وَّيَتَزَوَّجَ اُخْرٰى فَقَالاَ نَعَمْ فَارِقْ امْرَاَتَكَ ثَلْثًا وَّتَزَوَّجْ فَقَالَ الْقَاسِمُ فِىْ مَجَالِسٍ مُّخْتَلِفَةٍ .

৫৩২। রবীআ ইবনে আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। ওয়ালীদ (ইবনে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান যখন মদীনায় আসেন, তখন) কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) এবং উরওয়া ইবনুয যুবায়েরের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তার চার স্ত্রীর একজনকে বিদায় দিয়ে অপর এক মহিলাকে বিবাহ করতে চান, তা জায়েয কি না? তারা উভয়ে বলেন, হাঁ, তোমার স্ত্রীকে তিন তালাক দাও, অতঃপর বিবাহ করো। কিন্তু কাসেম বলেন, ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে তালাক দাও।

সম্মতিকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। কোন নারীর জন্য এটা মোটেই সমীচীন নয় যে, সে অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে যেখানে ইচ্ছা নিজকে বিবাহ দিবে। অভিভাবকের জন্যও এটা জায়েয হবে না যে, সে পাত্রীর সম্মতি ব্যতীত যেখানে ইচ্ছা তাকে বিবাহ দিবে।

(ঘ) যদি কোন অভিভাবক নিজের ইচ্ছামত তার অধীনস্ত কোন মহিলাকে বিবাহ দেয়, তবে তা স্ত্রীলোকটির ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। যদি সে তা গ্রহণ করে নেয়, তবে তো কোন কথাই নেই। আর যদি সে বিবাহ মেনে না নেয়, তবে ব্যাপারটি আদালতে সোপর্দ হবে। সঠিক অনুসন্ধানের পর আদালত যে রায় দিবে তাই কার্যকর হবে।

অপরদিকে যদি কোন মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নিজের বিবাহ নিজেই করে নেয়, তাহলে এ ব্যাপারটি অভিভাবকের সম্মতির উপর নির্ভর করবে। সে এ বিবাহ সহজভাবে মেনে নিলে কোন কথা নেই। অন্যথায় তা আদালত পর্যন্ত যাবে। আদালত অনুসন্ধান করে দেখবে, অভিভাবকের আপত্তি ও অসম্মতির ভিত্তি কি? যদি প্রকৃতই যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য কারণে সে কোন ব্যক্তিকে তার কন্যার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী না হয়, তবে আদালত এ বিবাহ ভেংগে দিতে পারে। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, সে অকারণে এরূপ করছে অথবা কোন অবৈধ উদ্দেশ্য তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ফলে স্ত্রীলোকটি অস্থির হয়ে নিজের বিবাহ নিজেই করে নিয়েছে, তাহলে আদালত এ বিবাহ বহাল রাখবে (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে পঞ্চম মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া পছন্দনীয় নয়। কেননা পাঁচজন আযাদ মহিলার জরায়ুতে তার বীর্য জমা হওয়া ভালো নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত (অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর সে পঞ্চম মহিলাকে বিবাহ করবে)।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে জিনিস মুহর প্রদান বাধ্যতামূলক করে।

٥٣٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَاَتِهِ وَاُرْخِيَتِ السُّتُوْرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

৫৩৩। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর কাছে যায় এবং সতর খুলে দেয়া হয় (নির্জনবাস হয়), তখন মুহর ওয়াজিব হয়ে যায়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদেরও এই মত। ইমাম মালেক (র) বলেন, এরপর যদি তাকে তালাক দেয়া হয়, তাহলে স্ত্রী অর্ধ-মুহর পাবে। অবশ্য সে যদি স্বামীর কাছে অনেকক্ষণ অবস্থান করে অথবা স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে তবে সে পূর্ণ মুহর পাবে।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ শিগার বিবাহের বর্ণনা।

٥٣٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلٰى اَنْ يُّنْكِحَهُ الْاٰخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

৫৩৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'শিগার' পদ্ধতির বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন। শিগার হচ্ছে, কোন ব্যক্তি তার মেয়েকে অপর ব্যক্তির নিকট এই শর্তে বিবাহ দেয় যে, শেষোক্ত ব্যক্তি তার মেয়েকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিবে এবং এদের মধ্যে মুহরের বিনিময় হবে না।[৫]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। কোন নারীর বিবাহ মুহর হিসাবে গণ্য হতে পারে না। যদি কেউ এই শর্তে বিবাহ করে যে, স্ত্রীর মুহর হবে নিজের কন্যাকে তার পিতার সাথে বিবাহ দেয়া, তবে বিবাহ জায়েয হবে। কিন্তু স্ত্রী মুহরে মিছাল লাভ করবে, এতে কম বেশী হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের মাযহাবের ফিক্‌হবিদদের এই মত।

---

৫. ইবনে উমার (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, শিগার-এর যে ব্যাখ্যা উল্লেখ আছে, তা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়েছেন, না ইবনে উমার (রা) অথবা নাফে (র) অথবা ইমাম মালেক (র) দিয়েছেন? খতীব বাগদাদী বলেছেন, এ ব্যাখ্যা ইমাম মালেকের। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় দেখা যায়, নাফে (র) এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ কারণে ইমাম কুরতুবী বলেছেন, ইবনে উমার (রা)-র হাদীসে উল্লেখিত ব্যাখ্যা নাফে (র) এবং ইমাম মালেক দিয়েছেন। কিন্তু আবু হুরায়রা (রা)-র হাদীসে উল্লেখিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। বাহ্যিক দিক থেকে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য বলেই মনে হয়। তাবারানীতে উল্লেখিত উবাই ইবনে কাব (রা)-র হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই শিগার-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন, যদিও হাদীসের সনদ দুর্বল (অনুবাদক)।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ গোপনে বিবাহ করা।

৫৩৫- عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ اَنَّ عُمَرَ اُتِىَ بِرَجُلٍ فِىْ نِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ الاَّ رَجُلٌ وَّامْرَاَةٌ فَقَالَ عُمَرُ هٰذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلاَ نُجِيْزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيْهِ لَرَجَمْتُ .

৫৩৫। আবুয্ যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। হযরত উমার (রা)-র নিকট এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো। তার বিবাহে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক ছাড়া আর কোন সাক্ষী ছিলো না। উমার (রা) বলেন, এতো গোপনে বিবাহ, আমি তা জায়েয মনে করি না। এ প্রসংগে যদি আমি আগেই প্রকাশ্যভাবে বলে থাকতাম, তবে আমি রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করতাম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। কেননা কমপক্ষে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়া বিবাহ জায়েয নয়। হযরত উমার (রা) যে বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করলেন, তাতে সাক্ষী ছিলো একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক। এজন্য তা গোপন বিবাহ ছিলো। কেননা একজন মহিলার সাক্ষ্য পূর্ণাংগ নয়। যদি দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক সাক্ষী থাকতো তবে সাক্ষ্য পূর্ণাঙ্গ হতো এবং বিবাহও জায়েয হতো, তা গোপনে হয়ে থাকলেও। সাক্ষীবিহীন বিবাহকে গোপন বিবাহ বলা হয়েছে। সাক্ষ্যের দিকটি পূর্ণাংগ হলে, বিবাহ প্রকাশ্যে হয়েছে বলে ধরা হয়, তা গোপন রাখা হলেও।

৫৩৬- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَّامْرَاَتَيْنِ فِى النِّكَاحِ وَالْفُرْقَةِ .

৫৩৬। ইবরাহীম নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত। হযরত উমার (রা) বিবাহ অনুষ্ঠান এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যকে বৈধ বলেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ একত্রে দুই বোন অথবা মা ও মেয়েকে বাঁদী হিসাবে নিজ মালিকানায় রাখা।

৫৩৭- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْاَةِ وَابْنَتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِيْنُ اَتُوْطَاُ اِحْدٰهُمَا بَعْدَ الْاُخْرٰى قَالَ لاَ اُحِبُّ اَنْ اُجِيْزَهُمَا جَمِيْعًا وَنَهَاهُ .

৫৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (র) থেকে বর্ণিত। হযরত উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, একটি স্ত্রীলোক ও তার মেয়ে ক্রীতদাসী হিসাবে একই ব্যক্তির মালিকানায় রয়েছে। তাদের একজনের সাথে সহবাস করার পর অপরজনের সাথেও সহবাস করা যাবে কি? তিনি বলেন, আমি তা জায়েয করা পছন্দ করি না। অতঃপর তিনি এধরনের একত্রীকরণ নিষিদ্ধ করেন।

٥٣٨- عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ اَنَّ رَجُلاً سَئَلَ عُثْمَانَ عَنِ الْاُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَت الْيَمِيْنُ هَلْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ اَحَلَّتْهُمَا اٰيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا اٰيَةٌ مَا كُنْتُ لَاَصْنَعُ ذٰلِكَ ثُمَّ خَرَجَ فَلَقِىَ رَجُلاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَئَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِىْ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ ثُمَّ اُتِيْتُ بِاَحَدٍ فَعَلَ ذٰلِكَ جَعَلْتُهُ نَكَالاً قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اُرَاهُ عَلِيًّا.

৫৩৮। কাবীসা ইবনে যুয়াইব (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি হযরত উছমান (রা)-র কাছে জিজ্ঞেস করলো, দুই বোন একত্রে এক ব্যক্তির মালিকানায় এসেছে। তাদের উভয়ের সাথে সহবাস করা যাবে কি? তিনি বলেন, তাদেরকে একটি আয়াত জায়েয সাব্যস্ত করছে, কিন্তু অপর একটি আয়াত হারাম সাব্যস্ত করছে। কিন্তু আমি দুই বোন একত্র করা পছন্দ করি না। অতঃপর লোকটি চলে গেলো এবং নবী ﷺ-এর অপর একজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করলো। সে তার কাছেও এসম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন, আমার যদি কোনরূপ কর্তৃত্ব থাকতো এবং কাউকে এরূপ করতে দেখতাম, তবে আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতাম। ইবনে শিহাব (র) বলেন, আমার ধারণামতে এই সাহাবী ছিলেন হযরত আলী (রা)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা উল্লেখিত অভিমতগুলো গ্রহণ করেছি। একই ব্যক্তির মালিকানাধীন মা ও তার কন্যাকে এবং দুই বোনকে একত্র করা জায়েয নয়। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা স্বাধীন মেয়েদের (বৈবাহিক সম্পর্কের) ক্ষেত্রে যা কিছু হারাম করেছেন, বাঁদীদের ক্ষেত্রেও তা হারাম করেছেন। তবে তাদের একই ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত করা যেতে পারে অর্থাৎ যে ক'জন বাঁদী ইচ্ছা জমা করতে পারে। কিন্তু স্বাধীন মহিলাদের চারজনের অধিক একত্রে জমা করা যাবে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের পর স্বামী অথবা স্ত্রীর অসুখের কারণে স্ত্রীর কাছে না যাওয়া।

٥٣٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَاَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَّمَسَّهَا فَاِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ اَجَلُ سَنَةٍ فَاِنْ مَسَّهَا وَاِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .

৫৩৯। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলতেন, কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করলো, কিন্তু সে তার সাথে সহবাস করতে সক্ষম নয়। এ অবস্থায় তাকে এক বছরের সময় দিতে হবে। এরপর যদি সে সহবাস করতে সক্ষম হয় তবে তো ভালো, অন্যথায় তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দিতে হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের এই মত এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-র বক্তব্যও তাই। এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও স্বামী যদি সহবাস করতে সক্ষম না হয়, তবে স্ত্রীকে এখতিয়ার দিতে হবে। সে যদি এই স্বামীর ঘর-সংসার করতে রাজী হয়, তবে সে তার স্ত্রী হিসাবেই থেকে গেলো। এরপর তার আর এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে না।

আর সে যদি নিজকে বেছে নেয় (স্বামীকে পরিত্যাগ করে) তবে সে এক বায়েন তালাক হবে। আর স্বামী যদি দাবি করে যে, সে এক বছরের মধ্যে সহবাস করেছে এবং স্ত্রী যদি সায়্যিবা হয় তাহলে স্বামীর বক্তব্য শপথ সহকারে গ্রহণযোগ্য হবে। আর স্ত্রী যদি নিজকে বাকেরা বলে দাবি করে, তবে মহিলারা তাকে পরীক্ষা করে দেখবে এবং তারা যদি বলে যে, সে বাকেরা তবে সে বলবে, আল্লাহর শপথ! সে আমার সাথে সঙ্গম করেনি। অতঃপর তাকে স্বামীর সাথে থাকতে অথবা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার এখতিয়ার দেয়া হবে। কিন্তু মহিলারা যদি বলে যে, সে সায়্যিবা, তাহলে স্বামীর দাবি গ্রহণযোগ্য হবে এই কথা বলার পর যে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তার সাথে সংগম করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

٥٤٠- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُوْنٌ أَوْ ضَرٌّ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ إِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ .

৫৪০। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করলো এবং পুরুষলোকটির মস্তিষ্ক বিকৃতি অথবা অন্য কোন রোগ আছে, এক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটির এখতিয়ার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে তার সাথে ঘর-সংসারও করতে পারে অথবা বিচ্ছিন্নও হয়ে যেতে পারে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, অবস্থা যদি এমন হয় যে, স্ত্রীর সাথে পুরুষলোকটির বসবাস সম্ভব নয়, তাহলে স্ত্রীলোকটির এখতিয়ার থাকবে যে, সে যদি চায় স্বামীর সাথেও থাকতে পারে অথবা বিচ্ছিন্ন হয়েও যেতে পারে। অন্যথায় নপুংসক ও মস্তিষ্ক বিকৃতির ক্ষেত্র ছাড়া কোন অবস্থায় স্ত্রীর (বিবাহ বন্ধন সম্পর্কে) কোন এখতিয়ার থাকবে না।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ বাকেরা মেয়ের কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার বর্ণনা।

٥٤١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا .

৫৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আয়্যিম তার নিজের বিবাহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নিজের অভিভাবকের চেয়ে অধিক হকদার। বাকেরাকে বিবাহ দিতে হলে তার অনুমতি নিতে হবে। তার নীরবতাই তার সম্মতি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত। এক্ষেত্রে পিতা বর্তমান থাক বা না থাক, সব মেয়েই সমান।

٥٤٢- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُسْتَأْذَنُ الْأَبْكَارُ فِي أَنْفُسِهِنَّ ذَوَاتُ الْأَبِ وَغَيْرُ الْأَبِ .

৫৪২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বাকেরা মেয়েদের বিবাহ দিতে হলে এ ব্যাপারে তাদের সম্মতি নিতে হবে, তাদের পিতা বর্তমান থাক বা না থাক।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবক ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠান।

٥٤٣- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ يُصْلِحُ لاِمْرَاَةٍ اَنْ تُنْكَحَ اِلاَّ بِاِذْنِ وَلِيِّهَا اَوْذِى الرَّاْىِ مِنْ اَهْلِهَا اَوِ السُّلْطَانِ .

৫৪৩। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, অভিভাবক অথবা বংশের প্রতিভাবান ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া কোন মহিলার বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া ভালো কাজ নয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। কোন স্ত্রীলোক ও তার অভিভাবকের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে রাষ্ট্রপ্রধান হবে তার অভিভাবক, যদি তার নিকটতম অভিভাবক না থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, যদি কোন স্ত্রীলোক সম-মর্যাদা সম্পন্ন (কুফূ) ব্যক্তির নিকট বিবাহ বসে এবং মুহরও মুহরে মিসালের কম না করে থাকে, তবে বিবাহ জায়েয হবে। এর সমর্থনে দলীল হচ্ছে হযরত উমার (রা)-র বক্তব্য ঃ اَوْ ذِى الرَّاْىِ مِنْ اَهْلِهَا (অথবা তার বংশের প্রতিভাবান ব্যক্তি তার অভিভাবক)। অথচ সে অভিভাবক নয়। কিন্তু তিনি তার দেয়া বিবাহকে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিলো, স্ত্রীলোকটি মুহরের পরিমাণ যেন মুহরে মিসালের চেয়ে কম না করে। সে তাই করলে বিবাহবন্ধন জায়েয হবে।[৬]

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুহর নির্ধারণ না করে বিবাহ দেয়া।

٥٤٤-حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ بِنْتًا لَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَاُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَتْ وَلَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقًا فَقَامَتْ اُمُّهَا تَطْلُبُ صَدَاقَهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا فَاَبَتْ اَنْ تَقْبَلَ ذٰلِكَ فَجَعَلُوْا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضٰى اَنْ لاَّ صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيْرَاثُ .

৫৪৪। নাফে (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র কন্যা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র পুত্রের বিবাহাধীন ছিলো। যায়েদ ইবনুল খাত্তাবের কন্যা ছিলেন মেয়েটির মা। ছেলেটি মারা গেলো, কিন্তু স্ত্রীর মুহরও নির্ধারিত হয়নি এবং তার সাথে নির্জনবাসও হয়নি।

৬.'সম-পরিমাণ মুহর' বা 'মুহরে মিসাল' বলতে কোন স্ত্রীলোকের বোন অথবা তার ফুফুর অথবা তার বংশের মেয়েদের যে পরিমাণ মুহর নির্ধারিত হয়েছে তা বুঝায় (অনুবাদক)।

তার মা এসে তার মুহর দাবি করলো। ইবনে উমার (রা) বলেন, সে মুহর পাবে না। সে যদি মুহরের হকদার হতো তবে আমি তা দেয়া বন্ধ রাখতাম না এবং তার উপর অবিচার করতাম না। কিন্তু মেয়েটির মা ইবনে উমার (রা)-র কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। উভয় পক্ষ যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-কে সালিশ মানলেন। তিনি ফয়সালা দিলেন, সে মুহর পাবে না, কিন্তু পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করিনি।

٥٤٥- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ اَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَاَةً وَلَمْ يُفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِّنْ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ فَلَمَّا قَضٰى قَالَ فَاِنْ يَّكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللّٰهِ وَاِنْ يَّكُنْ خَطأً فَمِنِّىْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ بَرِيَانِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ جُلَسَائِهِ بَلَغَنَا اَنَّهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْاَشْجَعِيُّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَضَيْتَ وَالَّذِىْ يُحْلَفُ بِهِ بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الْاَشْجَعِيَّةِ قَالَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللّٰهِ فَرْحَةً مَّا فَرِحَ قَبْلَهَا مِثْلَهَا لِمُوَافَقَةِ قَوْلِهِ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ مَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ لاَ يَكُوْنُ مِيْرَاثٌ حَتّٰى يَكُوْنَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ .

৫৫৫। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে বিবাহ করলো এবং তার জন্য মুহর নির্ধারণ করেনি। অতঃপর সে তার সাথে সহবাস করার পূর্বেই মারা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, স্ত্রীলোকটি তার বংশের মহিলাদের সম-পরিমাণ মুহর পাবে, এর কমও নয় বেশীও নয়। এই ফয়সালা দেয়ার পর তিনি বলেন, এই রায় যদি সঠিক হয় তবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আর যদি ভুল হয়ে থাকে তবে তা আমারই ত্রুটি এবং শয়তানের কারসাজি। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এথেকে মুক্ত। মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি যার সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী মাকিল ইবনে সিনান আল-আশজাঈ (রা), তিনি বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর নামে শপথ করা হয়ে থাকে! বিরওয়া বিনতে ওয়াশিক আল-আশজাঈর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ফয়সালা দিয়েছিলেন, আপনি ঠিক তদ্রূপ ফয়সালা দিয়েছেন। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র সিদ্ধান্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্তের অনুরূপ হওয়ায় তিনি এতো আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি আর কখনো অনুরূপ আনন্দিত হননি। মাসরূক ইবনুল আজদা (র) বলেন, মীরাস নির্ধারিত হতে পারে না, তার পূর্বে যাবত মুহর নির্ধারিত না হয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলা ইদ্দাত চলাকালে বিবাহ করলে।

٥٤٦- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَا أَنَّ ابْنَةَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِيْ عِدَّتِهَا أَبَا سَعِيْدِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَوْ أَبَا الْجَلَّاسِ بْنِ مُنَبِّهٍ فَضَرَبَهَا عُمَرُ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمَخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ عُمَرُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِيْ عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِيْ تَزَوَّجَ بِهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَاعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ثُمَّ كَانَ خَاطِبًا مِّنَ الْخُطَّابِ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ عِدَّتَهَا مِنَ الْآخِرِ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .

৫৪৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব এবং সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-র কন্যা রুশাইদ আস-ছাকাফীর বিবাহাধীন ছিলো। তিনি তাকে তালাক দিলেন। সে তার ইদ্দাত চলাকালে আবু সাঈদ ইবনে মুনাব্বিহ্ অথবা আবুল জাল্লাস ইবনে মুনাব্বিহ্‌র নিকট বিবাহ বসে। এজন্য হযরত উমার (রা) তাকে এবং তার স্বামীকে দৃষ্টান্তমূলক বেত্রাঘাত করেন এবং তাদের বিবাহ ভেংগে দেন। হযরত উমার (রা) বলেন, কোন নারী তার ইদ্দাত চলাকালে বিবাহ বসলে এবং (নতুন) স্বামী তার সাথে সহবাস না করে থাকলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিতে হবে এবং সে প্রথম স্বামীর অবশিষ্ট ইদ্দাতকাল পূর্ণ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী সম্পূর্ণ নতুনভাবে তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিবে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে থাকে, তবে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিতে হবে। অতঃপর স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর অবশিষ্ট ইদ্দাতকাল পূর্ণ করার পর দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দাতকাল পূর্ণ করবে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর কাছে সে আর কখনো বিবাহ বসতে পারবে না। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, এই স্ত্রীলোকটি মুহরের অধিকারী হবে। কেননা দ্বিতীয় স্বামী তার লজ্জাস্থানকে ব্যবহার করেছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, হযরত উমার (রা) তার এই মত প্রত্যাহার করে হযরত আলী (রা)-র মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

٥٤٧- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ رَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّتِيْ تَتَزَوَّجُ فِيْ عِدَّتِهَا إِلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَذٰلِكَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ

يَجْتَمِعَا اَبَدًا وَاَخَذَ صَدَاقَهَا فَجَعَلَ فِىْ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ عَلِىٌّ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَاِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنَ الْاَوَّلِ تَزَوَّجُهَا الْاٰخَرُ اِنْ شَاءَ فَرَجَعَ عُمَرُ اِلٰى قَوْلِ عَلِىٍّ .

৫৪৭। মুজাহিদ (র) বলেন, ইদ্দাত চলাকালে পুনর্বিবাহকারিণী নারী সম্পর্কে হযরত উমার (রা) যে কথা বলেছিলেন তা প্রত্যাহার করে তিনি হযরত আলী (রা)-র মত গ্রহণ করেছেন। উমার (রা) বলেছেন, দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করে থাকলে তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিতে হবে এবং তারা আর কখনো পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। তিনি মেয়েলোকটির মুহর আদায় করে তা বাইতুল মালে রেখে দিয়েছিলেন। তখন হযরত আলী (রা) বলেন, স্ত্রীলোকটি মুহরের অধিকারী হবে। কেননা সে (দ্বিতীয় স্বামী) তার লজ্জাস্থানকে ব্যবহার করেছে। অতঃপর সে প্রথম স্বামীর অবশিষ্ট ইদ্দতকাল পূর্ণ করলে, তখন দ্বিতীয় স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে বিবাহ করতে পারে। অতএব উমার (রা) আলী (রা)-র মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

٥٤٨– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ اَنَّ امْرَاَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِيْنَ حَلَّتْ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّنِصْفًا ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا فَجَاءَ زَوْجُهَا اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَدَعَا عُمَرُ نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءِ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ قُدَمَاءَ فَسَئَلَهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ مِّنْهُنَّ اَنَا اُخْبِرُكَ اَمَّا هٰذِهِ الْمَرْاَةُ هَلَكَ زَوْجُهَا حِيْنَ حَمَلَتْ فَاُهْرِيْقَتِ الدِّمَاءُ فَحَشَفَ وَلَدُهَا فِىْ بَطْنِهَا فَلَمَّا اَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِىْ نَكَحَتْهُ وَاَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِىْ بَطْنِهَا وَكَبُرَ فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بِذٰلِكَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ اَمَا اِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِىْ عَنْكُمَا اِلاَّ خَيْرًا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْاَوَّلِ .

৫৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। এক মহিলার স্বামী মারা গেলো। সে চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পূর্ণ করলো। হালাল হওয়ার পর সে অন্য পুরুষের কাছে বিবাহ বসলো। এই স্বামীর কাছে সাড়ে চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সে একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা প্রসব করে। তার স্বামী হযরত উমার (রা)-র কাছে এলে তিনি জাহিলী যুগের কয়েকজন প্রবীণ স্ত্রীলোককে ডেকে তাদের কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাদের মধ্যকার এক

প্রবীণ মহিলা বললো, আমি আপনাকে বলে দিতে পারি। তার স্বামী যখন মারা যায় তখন সে গর্ভবতী ছিলো। অতঃপর রক্তস্রাবের কারণে তার পেটের মধ্যে সন্তান শুকিয়ে যায়। অতঃপর সে যখন তার নতুন স্বামীর সাথে সংগমে লিপ্ত হয় এবং বাচ্চাকে তার বীর্য স্পর্শ করে, তখন তার মধ্যে স্পন্দন ফিরে আসে এবং তা বড়ো হতে থাকে।[৭] উমার (রা) এই স্ত্রীলোকটির কথা বিশ্বাস করলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের উভয়ের কোন দোষ নেই। তিনি বাচ্চাকে পূর্ব-স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত করলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। সন্তান প্রথম স্বামীর ঔরসজাত। কেননা স্ত্রীলোকটি দ্বিতীয় স্বামীর কাছে এসেছে, তার সময় ছয় মাসেরও কম। কোন স্ত্রীলোক ছয় মাসের কম সময়ে পূর্ণাংগ বাচ্চা প্রসব করতে পারে না। এজন্য ভূমিষ্ঠ শিশুটি প্রথম স্বামীর ঔরসজাত। অতঃপর এই দ্বিতীয় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিতে হবে। স্ত্রীলোকটির নির্ধারিত মুহর অথবা মুহরে মিসালের মধ্যে যেটির পরিমাণ কম হবে, সে তা পাবে। কেননা দ্বিতীয় স্বামী তার লজ্জাস্থানকে ব্যবহার করেছে।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আযল (স্ত্রীর যৌনাংগের বাইরে বীর্য স্খলন)।

٥٤٩- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ .

৫৪৯। আমের ইবনে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সাদ) আযল করতেন।

٥٥٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَفْلَحَ مَوْلٰى اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اُمِّ وَلَدِ اَبِىْ اَيُّوْبَ اَنَّ اَبَا اَيُّوْبَ كَانَ يَعْزِلُ .

৫৫০। আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-র উম্মে ওয়ালাদ থেকে বর্ণিত। আবু আইউব (রা) আযল করতেন।

٥٥١- عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَجَاءَهُ ابْنُ فَهْدٍ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا اَبَا سَعِيْدٍ اِنَّ عِنْدِىْ جَوَارِىْ لَيْسَ نِسَاءَ اللاَّتِي كُنَّ بِاَعْجَبَ اِلَىَّ مِنْهُنَّ وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِىْ اَنْ تَحْمِلَ مِنِّىْ اَفَاَعْزِلُ قَالَ قَالَ اَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ قَالَ قُلْتُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ اِنَّمَا نَجْلِسُ اِلَيْكَ لِنَتَعَلَّمَ

---

৭. উল্লেখিত বক্তব্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ গর্ভ সঞ্চারের পর স্বামীর স্খলিত বীর্য গর্ভস্থ সন্তানের কোন উপকারে আসে না। বীর্য জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারলেও বাচ্চাকে স্পর্শ করতে পারে না। কেননা বাচ্চা জরায়ুর অভ্যন্তরে একটি শক্ত আবরণের মধ্যে অবস্থান করে, যা বীর্য কখনো ভেদ করতে পারে না, বরং বীর্য পরে যোনীমুখ দিয়ে বাইরে বের হয়ে যায়। অন্তঃসত্তা নির্ণিত না হওয়ার অন্য কোন দৈহিক কারণ থাকতে পারে (অনুবাদক)।

مِنْكَ قَالَ اَفْتِهْ قَالَ قُلْتُ هُوَ حَرْثُكَ اِنْ شِئْتَ اَعْطَشْتَهُ وَاِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ قَالَ وَقَدْ كُنْتُ اَسْمَعُ ذٰلِكَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ زَيْدٌ صَدَقَ .

৫৫১। হাজ্জাজ ইবনে আমর ইবনে গাযিয়াহ (র) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-র কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় ইবনে ফাহ্দ নামে ইয়ামানের একটি লোক এলো। সে বললো, হে সাঈদের পিতা! আমার কাছে কয়েকটি বাঁদী আছে। তারা আমার স্ত্রীদের চেয়েও অধিক সুন্দরী। কিন্তু আমি চাই না যে, তারা গর্ভবতী হোক। আমি কি আযল করতে পারি? রাবী বলেন, যায়েদ (রা) বললেন, হে হাজ্জাজ! তুমি মাসআলা বলে দাও। হাজ্জাজ বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আমি এই মাসয়ালা জানার জন্যই তো আপনার কাছে বসে আছি। যায়েদ (রা) বললেন, হে হাজ্জাজ! তাকে মাসআলা বলে দাও। হাজ্জাজ বলেন, আমি বললাম, তা তোমার কৃষিক্ষেত। তুমি ইচ্ছা করলে তা শুষ্ক রাখো আর ইচ্ছা করলে তাতে পানি সিঞ্চন করো। হাজ্জাজ আরো বলেন, একথা প্রায়ই আমি যায়েদ (রা)-র মুখে শুনতাম। অবশেষে যায়েদ (রা) বললেন, সে সত্য বলেছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। বাঁদীদের সাথে আযল করায় আমরা কোন দোষ দেখছি না। কিন্তু স্বাধীন স্ত্রীর সাথে তার অনুমতি ছাড়া আযল করা উচিত নয়। বাঁদী যদি অন্য কারো বিবাহাধীন থাকে, তবে তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত তার সাথে আযল করা উচিত নয়। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

٥٥٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْزِلُوْنَ عَنْ وَلَائِدِهِمْ لَا تَأْتِيْنِىْ وَلِيْدَةٌ فَيَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا اَنَّهُ قَدْ اَلَمَّ بِهَا اِلاَّ اَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاَعْزِلُوْا (فَاعْتَزِلُوْا) بَعْدُ اَوِ اتْرُكُوْا .

৫৫২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, লোকদের কি হলো যে, তারা নিজেদের বাঁদীদের সাথে আযল করে! আমার কাছে যদি কোন বাঁদী আসে, যার সাথে তার মালিক সহবাসের কথা স্বীকার করে, তাহলে আমি ভূমিষ্ঠ সন্তানকে তার মালিকের সাথে সংযুক্ত করবো। এই নির্দেশের পর তোমরা চাইলে আযলও করতে পারো, নাও করতে পারো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, হযরত উমার (রা) একথা বলে লোকদের ভয় প্রদর্শন করেছেন যে, তারা যেন অযথা নিজেদের বীর্য নষ্ট না করে, অথচ তারা নিজেদের বাঁদীদের সাথে সংগম করতো। আমরা জানতে পেরেছি যে, যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) নিজের বাঁদীর সাথে সংগম করেছেন। সে যখন বাচ্চা প্রসব করলো, তিনি ভূমিষ্ঠ সন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। উমার (রা) তার এক বাঁদীর সাথে সংগম করেন। সে গর্ভবতী হলে তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ! যে সন্তান উমারের ঔরসজাত নয়, তাকে তুমি তার বংশের সাথে সংযুক্ত করো না।' বাঁদী একটি কালো সন্তান প্রসব করলো এবং স্বীকার করলো যে, সন্তানটি

এক রাখালের ঔরসজাত। অতএব উমার (রা) এই সন্তান গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ইমাম আবু হানীফা (র) বলতেন, বাঁদীকে যদি পর্দার মধ্যে রাখা হয় এবং তাকে কখনো বাড়ীর বাইরে না যেতে দেয়া হয়, অতঃপর সে যদি সন্তান প্রসব করে, তবে এই সন্তান এবং তার মহান প্রতিপালকের মাঝে অস্বীকার করার কোন পথ নেই। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি।

৫৫৩- عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِى عُبَيْدٍ قَالَتْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُنَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَدْعُونَهُنَّ فَيَخْرُجْنَ وَاللّٰهِ لاَ يَاْتِيْنِى وَلِيْدَةٌ فَيَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا اَنَّهُ قَدْ وَطِئَهَا اِلاَّ اَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَاَرْسِلُوْهُنَّ بَعْدُ اَوْ اَمْسِكُوْهُنَّ .

৫৫৩। আবু উবায়েদ-কন্যা সাফিয়্যা (র) বলেন, উমার (রা) বললেন, লোকদের কি হলো যে, তারা নিজেদের বাঁদীদের সাথে সংগম করে, আবার তাদের বাড়ীর বাইরে যাওয়ার জন্যও ছেড়ে দেয়। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার কাছে যদি কোন বাঁদী আসে এবং তার মালিক তার সাথে সংগম করেছে বলে স্বীকার করে, তাহলে ভূমিষ্ঠ সন্তানকে আমি তার সাথে যুক্ত করবো। অতএব এই নির্দেশের পর তোমরা তাদের বাইরেও যেতে দিতে পারো অথবা বাড়ীতে আবদ্ধও রাখতে পারো (কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব তোমাদেরই নিতে হবে)।[৮]

৮. স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে আযল করা জায়েয। তবে চির বন্ধাকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হারাম। অনুরূপভাবে নারী অন্তঃসত্তা হওয়ার পর কোন পর্যায়েই গর্ভপাত করানো জায়েয নয় (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ৮

كِتَابُ الطَّلَاقِ

(তালাক)

১. অনুচ্ছেদ ঃ সুন্নাত তালাকের বর্ণনা।

٥٥٤ – عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْرَأُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ .

৫৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে পাঠ করতে শুনেছিঃ "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও, তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দাত সামনে রেখে কিছু পূর্বে তালাক দাও।"[১]

---

১. আয়াতের মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .

"হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দাতের জন্য তালাক দাও" (সূরা তালাক ঃ ১)।

কিন্তু সহীহ মুসলিমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপর কিরাআতে لعدتهن স্থলে لقبل عدتهن উল্লেখ আছে। আর يايها النبى বলে এখানে মুমিনদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাই ইবনে উমার (রা) يايها النبى স্থলে يايها الذين امنوا পড়েছেন।

'ইদ্দাতের জন্য তালাক দাও' কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একঃ ইদ্দাত শুরু করার জন্য তালাক দাও। অন্য কথায়, এমন সময় তালাক দিবে যখন থেকে তাদের ইদ্দাত গণনা শুরু হতে পারে। সূরা বাকারার ২২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর তালাকের পর তিনটি মাসিক ঋতু অতিক্রান্ত হওয়ার সময়টাই হলো তার ইদ্দাত। একথাটি সামনে রেখে চিন্তা করলে সহজেই বুঝা যায়, 'ইদ্দাত শুরু করার জন্য তালাক দেয়ার' অর্থ এটাই হতে পারে যে, 'স্ত্রীকে তার মাসিক ঋতু চলাকালে কখনো তালাক দিও না। কেননা যে ঋতুতে তাকে তালাক দেয়া হয়েছে সেই ঋতু থেকে তার ইদ্দাত গণনা শুরু হতে পারে না। কারণ এই ঋতুর পরও তাকে তিনটি পূর্ণ ঋতুকাল ইদ্দাত পালন করতে হলে ইদ্দাতের সময়সীমা দাঁড়ায় চারটি ঋতুকাল। আর তা আল্লাহ্র বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

দুই ঃ যে তুহরে স্ত্রী-সহবাস হবে সে তুহরে তালাক দিও না। কারণ এক্ষেত্রে সংগমের ফলে স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিনা নিশ্চিতভাবে কারো জানা থাকে না। এ সময় তালাক দিলে ইদ্দাত পালন কোন নিয়মে শুরু করা হবে, তা স্থির করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন এটা ঠিক করা যায় না যে, স্ত্রীলোকটি কি তিন হায়েযকাল ইদ্দাত পালন করবে, না ধরে নেয়া হবে যে, তার গর্ভসঞ্চার হয়েছে, তাই সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দাত পালন করবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সুন্নাত পন্থার তালাক এই যে, ইদ্দাতকে সামনে রেখে তালাক দিবে। অর্থাৎ হায়েয হওয়ার পর এবং সংগমের পূর্বে তুহর (পাক) অবস্থায় এক তালাক দিবে। অতঃপর আর সংগম করবে না। অতঃপর দ্বিতীয় তুহরে দ্বিতীয় তালাক দিবে এবং তৃতীয় তুহরে তৃতীয় তালাক দিবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৫৫৫ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَئَلَ عُمَرُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ بَعْدُ اَمْسَكَهَا وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

৫৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নিজ স্ত্রীকে হায়েয চলাকালে এক তালাক দেন। উমার (রা) এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন ঃ "তুমি তাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তার স্ত্রীকে ফেরত নেয় এবং হায়েয থেকে পাক হওয়া পর্যন্ত তাকে রেখে দেয়। অতঃপর পুনরায় হায়েয আসার পর তা থেকে পাক হবে। অতঃপর সে ইচ্ছা করলে তাকে স্ত্রী হিসাবে রাখবে অথবা সংগম করার পূর্বে তালাক দিবে। এভাবে ইদ্দাত পালনের সুযোগ রেখে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীদের তালাক দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।"[২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি।

অতএব আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের একইসংগে দু'টি তাৎপর্য হতে পারে। (এক) স্ত্রীকে তার হায়েয অবস্থায় তালাক দিবে না। (দুই) তালাক হয় সেই তুহরে দিবে, যে তুহরে সহবাস হয়নি অথবা সেই অবস্থায় তালাক দিবে, যখন নিশ্চিত জানা যাবে যে, স্ত্রী গর্ভবতী।

প্রসিদ্ধ তাফসীরকারগণ আয়াতটির এ অর্থই করেছেন। ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, 'ইদ্দাতের জন্য তালাক দেয়া' বলতে বুঝায় তুহর অবস্থায় স্ত্রী-সংগম না করে তালাক দেয়া। ইবনে উমার (রা), আতা, মুজাহিদ, মুকাতিল, দাহ্‌হাক প্রমুখ তাফসীরকারদেরও এই মত বর্ণিত হয়েছে (ইবনে কাছীর)। ইকরিমা এর তাৎপর্য বলেছেন, তালাক এমন অবস্থায় দিতে হবে যখন নিশ্চিত জানা যাবে যে, স্ত্রী গর্ভবতী, এমন অবস্থায় দিবে না যখন তার সাথে সংগম করা হয়েছে এবং তার গর্ভসঞ্চার হয়েছে কি না তা নিশ্চিত জানা যায়নি (ইবনে কাছীর)। হাসান বসরী ও ইবনে সীরীন বলেছেন, যে তুহরে স্ত্রী-সংগম হয়নি সেই তুহরে তালাক দিতে হবে অথবা স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ার কথা প্রকাশ পাবার পর তালাক দিবে (ইবনে জারীর)। গর্ভাবস্থায় তালাক দেয়া হলে সন্তান প্রসবের সাথে সাথে ইদ্দাত শেষ হয়ে যায়। তা মাত্র দুই-তিন ঘণ্টাই হোক না কেন (অনুবাদক)।

২. 'তালাক' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ছেড়ে দেয়া', 'বন্ধনমুক্ত করা।' ইসলামী আইনের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে 'স্ত্রীকে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়া।' আল্লাহ তাআলা যেসব জিনিস বৈধ করেছেন, তালাক হলো তার মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য বৈধ বিষয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ

তাআলা তালাকের তুলনায় অধিক ঘৃণ্য কোন জিনিস হালাল করেননি" (আবু দাউদ)। "সমস্ত হালাল জিনিসের মধ্যে মহান আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য জিনিস হচ্ছে তালাক" (আবু দাউদ)।

ইসলামী শরীআতে তালাক দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে একটি অপরিহার্য ও নিরুপায়ের উপায় হিসাবে। তাই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনার পর এর প্রয়োগ করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হলে বিভিন্ন পন্থায় তার সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। এমনকি উভয়ের পক্ষ থেকে প্রয়োজনবোধে সালিশও নিযুক্ত করা যেতে পারে, কুরআনে যার সরাসরি প্রস্তাব রয়েছে (সূরা নিসা ঃ ৩৫)। তারাও যদি দেখে যে, উভয়ের একত্রে বসবাসের আর কোন সুযোগ নেই, কেবল তখনই তালাকের পথ বেছে নেয়া যেতে পারে। তাও একই সময় তিন তালাক দিয়ে একই আয়াতে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তিন মাসে তিন তালাক অথবা মাত্র এক তালাক দিয়ে ইদ্দাত পালনের জন্য রেখে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এর মধ্যেও যদি মিলমিশের একটা পথ সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ লোক তালাকের সুষ্ঠু পন্থা সম্পর্কে অবহিত নয়। অনেকেই রাগের মাথায় স্ত্রীর মুখে একই সময় তিন তালাক ছুড়ে মেরে সর্বশেষ সুযোগটুকুও হাতছাড়া করে ফেলে। অতঃপর এর মারাত্মক পরিণতি সামনে উপস্থিত দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুফতীদের কাছে গিয়ে মিথ্যা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয় এবং বৈধ স্ত্রীকে অবৈধ করে হারাম পন্থায় ঘর-সংসার করে। এজন্য বিষয়টির একটি বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

হানাফী মাযহাবমতে তালাক তিন প্রকার। যথা আহসান (احسن), হাসান (حسن) ও বিদঈ (بدعى) সর্বোত্তম, উত্তম এবং গর্হিত। সর্বোত্তম পন্থায় তালাক এই যে, স্বামী তার স্ত্রীকে এমন তুহরে এক তালাক দিবে যাতে সহবাস হয়নি, অতঃপর ইদ্দাত অতিবাহিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে। উত্তম পন্থার তালাক এই যে, প্রতি তুহরে এক তালাক দিবে। তিন তুহরে তিন তালাক দেয়াও সুন্নাতের পরিপন্থী নয়। কিন্তু মাত্র এক তালাক দিয়ে ইদ্দাত পূর্ণ করার সুযোগ দেয়াই উত্তম। বিদঈ বা বিদআতী তালাক হচ্ছে, একই সময় তিন তালাক দেয়া অথবা একই তুহরে আলাদা আলাদা সময়ে তিন তালাক দেয়া অথবা হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া। যে স্ত্রীর সাথে সংগম করা হয়েছে এবং যার মাসিক ঋতু হয়, তার সম্পর্কে এই বিধান।

এই তিন প্রকারের তালাক আবার ভিন্ন ভিন্ন তিন নামে অভিহিত ঃ রিজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক, বায়েন তালাক ও মুগাল্লাযা তালাক। যে পন্থায় তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে পুনর্বিবাহ ছাড়াই ফিরিয়ে নেয়া যায় তাকে রিজঈ তালাক বলে। যে তালাকের পর স্ত্রীকে পুনর্বিবাহ না করে ফেরত নেয়া যায় না তাকে বায়েন তালাক বলে। যে পন্থায় তালাক দেয়ার পর স্ত্রীর অন্য স্বামী গ্রহণ ছাড়া প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারে না তাকে মুগাল্লাযা তালাক বলে। বিদঈ ও মুগাল্লাযা প্রায় একই ধরনের তালাক। তিন তালাকের মাধ্যমেই এরূপ তালাক হয়ে থাকে, তা একসাথে দেয়া হোক অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে।

যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়নি তাকে তুহর অথবা হায়েয, যে কোন অবস্থায় তালাক দেয়া সুন্নাত বিরোধী নয়।

যে স্ত্রীর সাথে সহবাস হয়েছে কিন্তু হায়েয হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, তাকে সহবাস করার পরও তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা তার গর্ভবতী হওয়ার আশংকা নাই।

অনুরূপভাবে যে স্ত্রীর এখনো মাসিক ঋতু শুরু হয়নি, তাকেও সংগম করার পর তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা তারও গর্ভবতী হওয়ার আশংকা নেই।

অনুরূপভাবে যে স্ত্রী গর্ভাবস্থায় আছে তাকেও সংগম করার পর তালাক দেয়া যেতে পারে। কেননা সে যে গর্ভবতী তা পূর্বেই জানা গেছে।

কিন্তু এই চার প্রকার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সুন্নাত নিয়ম হচ্ছে, এক মাস পর পর এক তালাক দেয়া। আরও সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, কেবলমাত্র এক তালাক দিয়ে রেখে দেয়া এবং ইদ্দাত অতিবাহিত হওয়ার অপেক্ষা করা (হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, উমদাতুল কারী, আহকামুল কুরআন- আবু বাক্‌র জাস্‌সাস)।

এই তিন প্রকার তালাকের মধ্যে ফলাফল ও পরিণতির দিক থেকেও পার্থক্য আছে। সর্বোত্তম বা উত্তম পন্থায় তালাক দিলে ইদ্দাতকালের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়। ফিরিয়ে নেয়ার নিয়মও খুব সহজ। ফিরিয়ে নেয়ার নিয়াতে ইদ্দাতকালের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে বা তাকে চুমা দিলে অথবা 'তোমাকে ফেরত নিলাম' বললেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, পুনর্বিবাহের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ইদ্দাত শেষ হয়ে যাবার পর পুনর্বিবাহের প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ এক তালাক অথবা দুই তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দাত শেষ হয়ে যাবার পর তালাকদাতা স্বামী এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্মতির ভিত্তিতে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এজন্য মাঝখানে স্ত্রীলোকটির দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণেরও (তাহলীল) প্রয়োজন নেই এবং বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য মৌলভী ডাকারও দরকার নাই। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ঈজাব-কবুলের মাধ্যমে সহজেই পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারে।

কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তাহলে তাকে ইদ্দাতকালের মধ্যেও ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে না এবং তাদের পুনর্বিবাহের ব্যাপারটিও অত্যন্ত জটিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে হয়। এই দ্বিতীয় স্বামীও যদি কোন কারণে তাকে তালাক দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে, তাহলে (এই দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সম্পর্কিত) ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর সে সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম স্বামীর ঘরে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক না দেয়, তাহলে এই স্ত্রী আর প্রথম স্বামীর ঘরে ফিরে আসতে পারবে না।

আমাদের দেশের লোকেরা কেবল তালাকের এই তৃতীয় এবং জটিলতম নিয়মটিই জানে। তাদের ধারণা, কেবল তিন তালাকের মাধ্যমেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা যেতে পারে। তারা এটা জানে না যে, তিন তালাকের মাধ্যমে তারা যে উদ্দেশ্য সাধন করতে চাচ্ছে, তা এক অথবা দুই তালাকের মাধ্যমেও অর্জিত হতে পারে। অর্থাৎ এক অথবা দুই তালাকের পর ইদ্দাত অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, যেভাবে তিন তালাক দেয়ার সাথে সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। বরং এক অথবা দুই তালাকের ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে যতো সহজে বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে আনার সুযোগ অবশিষ্ট থাকে, তিন তালাকের ক্ষেত্রে সেই সর্বশেষ সুযোগটুকুও হাতছাড়া হয়ে যায়।

একই সময় তিন তালাক দিলে চার মাযহাবের ইমামদের মত অনুযায়ী স্ত্রী তিন তালাকই হয়ে যাবে এবং বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানানো হলো, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একই সময় তিন তালাক দিয়েছে। তিনি একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ

اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَاَنَا بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ .

"আমি তোমাদের মাঝে বর্তমান থাকা অবস্থায়ই কি এই লোকটি আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে তামাশা করছে!"

তাঁর অসন্তোষের মাত্রা দেখে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি তাকে হত্যা করবো না (নাসাঈ)?

হযরত উবাদা (রা)-র পিতা নিজ স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে একথা জানান। নবী ﷺ বলেন ঃ "মাত্র তিন তালাকেই তার স্ত্রী তার থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার সাথে সাথে হয়েছে আল্লাহ্‌র অবাধ্যাচরণ। অবশিষ্ট ৯৯৭ টি তালাক যুলুম ও সীমা লংঘনের নিদর্শন হিসেবে রয়ে গেছে। আল্লাহ চাইলে এজন্য তাকে শাস্তিও দিতে পারেন অথবা ক্ষমাও করতে পারেন" (মুসনাদে আবদুর রায্‌যাক)।

দারু কুতনী ও ইবনে আবু শাইবার গ্রন্থে ইবনে উমার (রা)-র ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকে নিজের স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমি যদি তাকে তিন তালাক দিতাম, তবুও কি তাকে ফিরিয়ে নিতে পারতাম? জবাবে নবী ﷺ বলেন ঃ "না, তা পারতে না। সে তোমার থেকে বায়েন তালাক হয়ে যেতো এবং একাজে গুনাহ হতো।" অপর এক বর্ণনায় এর ভাষা হচ্ছে ঃ "তুমি যদি তাই করতে তাহলে তুমি তোমার প্রভুর নাফরমানী করে বসতে এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।"

এ পর্যায়ে সাহাবীদের থেকে যেসব ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে, তাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বললো, আমি আমার স্ত্রীকে আট তালাক দিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এব্যাপারে তোমাকে কি ফতোয়া দেয়া হয়েছে? সে বললো, আমাকে ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে, আমার স্ত্রী আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি বলেন, তারা সত্যই বলেছেন, ব্যাপারটা এরকমই যেমন তারা বলেছেন (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)। আলকামা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ইবনে মাসউদ (রা)-কে বললো, আমি আমার স্ত্রীকে ৯৯টি তালাক দিয়েছি। তিনি বলেন, মাত্র তিনটি তালাকই স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অবশিষ্ট তালাকগুলো সবই সীমালংঘনমূলক কাজের নিদর্শন (মুসনাদে আবদুর রায্‌যাক)। ওয়াকী ইবনুল জার্‌রাহ (র) নিজের সুনান গ্রন্থে হযরত উছমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-র এই মত উল্লেখ করেছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাকে বললো, আমি আমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে বসেছি। তা শুনে তিনি নীরব রইলেন। আমি মনে করলাম, তিনি হয়ত তার স্ত্রীকে ফেরত দিতে চাইবেন। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি তোমার প্রভুর নাফরমানী করেছো এবং তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে (আবু দাউদ, ইবনে জারীর)। এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে এক শত তালাক দেয়ার পর ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন, তিন তালাকেই তোমার স্ত্রী তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অবশিষ্ট ৯৭টি তালাক দ্বারা তুমি আল্লাহ্‌র আয়াতের সাথে তামাশা করেছো (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, তাফসীরে ইবনে জারীর)। এক ব্যক্তি সংগমের পূর্বেই নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে বসে, অতঃপর তাকে পুনরায় ফেরত নিতে চায়। সে ফতোয়া জানার জন্য ইবনে আব্বাস (রা) এবং আবু হুরায়রা (রা)-র কাছে আসে। তারা উভয়ে বলেন, তোমার জন্য যে সুযোগ ছিলো তা তুমি নিজেই হাতছাড়া করে ফেলেছো (আবু দাউদ, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

আল্লামা যামাখশারী (র) লিখেছেন, নিজ স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিয়ে যে ব্যক্তিই হযরত উমার (রা)-র কাছে আসতো, তিনি তাকে বেত্রাঘাত করতেন এবং তার দেয়া তালাকগুলো কার্যকর করতেন (তাফসীরে কাশ্‌শাফ)।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) এবং অপর কয়েকজন তাবিঈ বলেন, যে ব্যক্তি সুন্নাত বিরোধী নিয়মে হায়েয অবস্থায় তালাক দিবে অথবা একই সাথে তিন তালাক দিবে তার তালাক আদৌ কার্যকর হবে না। ইমামিয়া (শিয়া) মাযহাব এই মত পোষণ করে।

তাঊস ও ইকরিমা (র) বলেন, একই সময় তিন তালাক দেয়া হলে কেবলমাত্র এক তালাক কার্যকর হবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) এই মত সমর্থন করেছেন। যাহিরী (আহলে হাদীস) মাযহাবেরও এই মত। তাদের মতের ভিত্তি হচ্ছে নিম্নোক্ত বর্ণনা ঃ "আবুস সাহ্‌বাআ হযরত

২. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসের আযাদ স্ত্রীর তালাক।

٥٥٦- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبُ اُمِّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ .

৫৫৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। উম্মে সালামা (রা)-র মুকাতাব গোলাম নুফাই-এর বিবাহাধীনে আযাদ স্ত্রীলোক ছিলো। সে তাকে দুই তালাক দিলো। অতঃপর সে উছমান ইবনে আফ্ফান (রা)-র কাছে এসম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন, সে তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেন, আপনি কি জানেন না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে, আবু বাক্‌র (রা)-র খেলাফতকালে এবং উমার (রা)-র খেলাফতের প্রথমভাগে একত্রে তিন তালাক দেয়া হলে তা এক তালাক গণ্য হতো? তিনি জবাবে বলেন, হাঁ" (বুখারী, মুসলিম)। অপর এক বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রা)-র কথাটি এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে, আবু বাক্‌র (রা)-র যুগে এবং উমার (রা)-র খেলাফতের প্রথম দু'বছর একত্রে তিন তালাক দেয়া হলে তাকে এক তালাক গণ্য করা হতো। পরে হযরত উমার (রা) বলেন, লোকেরা এমন একটি ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে লাগছে যে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ তাদের জন্য রাখা হয়েছিলো। অতএব আমরা এখন তাদের এ পদক্ষেপকে কার্যকর করবো না কেন? সুতরাং তিনি তা কার্যকর করেন"(মুসলিম, আবু দাউদ, মুসনাদে আহ্‌মাদ)।

কিন্তু আমাদের কাছে এই মতটি কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয় ঃ

(এক) আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইবনে আব্বাস (রা)-র নিজের ফতোয়া তার এই বর্ণনার পরিপন্থী। একই বিষয়ে কোন সাহাবীর মত এবং কর্মনীতির মধ্যে বৈপরীত্য দেখা গেলে তার কর্মনীতি গৃহীত হয়।

(দুই) এই মতটি নবী ﷺ এবং বিশিষ্ট সাহাবাদের সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহের পরিপন্থী। এসব হাদীসে উল্লেখ আছে যে, একই সময় তিন তালাক দিলে তা তিন তালাকই গণ্য হবে এবং বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে।

(তিন) স্বয়ং ইবনে আব্বাস (রা)-র বক্তব্য থেকেও জানা যায়, হযরত উমার (রা) সাহাবীদের মিলিত বৈঠকেই একত্রে দেয়া তিন তালাককে তিন তালাক হিসাবেই কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেছেন। কোন সাহাবী এর বিরোধিতা করেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখন এটা কি ধারণা করা যায় যে, হযরত উমার (রা) কোন ব্যাপারে সুন্নাতের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত করে থাকবেন? আর সমস্ত সাহাবা (রা) নীরবে তা মেনে নিয়ে থাকবেন?

ইদ্দাত ঃ স্বামী তালাক দিবার পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর জন্য যে সময়সীমা পর্যন্ত অন্য লোককে পুনর্বিবাহ করা নিষিদ্ধ তাকে ইদ্দাত বলে। যে স্ত্রীলোকের নিয়মিত হায়েয হয়, তার ইদ্দাত তিনটি মাসিক ঋতু শেষ হওয়া পর্যন্ত (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)। যে নারীর এখনো হায়েয শুরু হয়নি অথবা বয়োবৃদ্ধির কারণে হায়েয হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে তার ইদ্দাত তিন মাস এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দাত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত (সূরা তালাকের ৪ নম্বর আয়াত দ্রষ্টব্য)। এক বা দুই তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া ইদ্দাত চলাকালে তার সাথে সংগম করা নিষিদ্ধ। আর তিন তালাকের ক্ষেত্রে তো বিবাহ বন্ধনই একবারে ছিন্ন হয়ে যায়। অতএব সহবাসের প্রশ্নই উঠে না। বিবাহের পর সহবাসের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দিলে তাকে কোনরূপ ইদ্দাত পালন করতে হয় না (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৪৯)। বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পরপরই সে স্বামী গ্রহণ করতে পারে (অনুবাদক)।

٥٥٧- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ نُفَيْعًا كَانَ عَبْدًا لِاُمِّ سَلَمَةَ اَوْ مُكَاتَبًا وَكَانَتْ تَحْتَهُ امْرَاَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُرَاجِعَهَا فَاَمَرَهُ اَزْوَاجُ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يَّاْتِىَ عُثْمَانَ فَيَسْئَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَئَلَهُ (فَسَئَلَهُمَا) فَابْتَدَرَاهُ جَمِيْعًا فَقَالاَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ .

৫৫৭। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। নুফাই নামে উম্মে সালামা (রা)-র একটি ক্রীতদাস অথবা চুক্তিবদ্ধ দাস ছিলো। তার বিবাহাধীনে ছিলো একটি স্বাধীন স্ত্রীলোক। সে তাকে দুই তালাক দিলো। অতঃপর সে তাকে পুনরায় ফেরত নিতে চাইলো। নবী ﷺ -এর কোন স্ত্রী তাকে এ সম্পর্কে হযরত উছমান (রা)-র কাছে গিয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দিলেন। সে দারাজ নামক স্থানে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করলো। তিনি তখন যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-র হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। সে তাদের উভয়ের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। তারা উভয়ে তার দিকে মুখ করে সাথে সাথে জওয়াব দিলেন, সে তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে, হারাম হয়ে গেছে।

٥٥٨- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَاَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ اَوْ اَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلٰثَةُ قُرُوْءٍ وَعِدَّةُ الْاَمَةِ حَيْضَتَانِ .

৫৫৮। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলেন, কোন ক্রীতদাস তার স্ত্রীকে দুই তালাক দিলে সে তার জন্য হারাম হয়ে যায়, স্বাধীন স্ত্রীই হোক অথবা ক্রীতদাসী। অন্য লোকের সাথে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সে তার জন্য হালাল হবে না। স্বাধীন স্ত্রীর ইদ্দাত তিনটি মাসিক ঋতুচক্র এবং ক্রীতদাসীর ইদ্দাত দুইটি মাসিক ঋতুচক্র।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ মাসআলাটি নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। আমাদের ফিক্‌হবিদদের মতে তালাক এবং ইদ্দাতের ব্যাপারে স্ত্রীলোকদের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "তাদেরকে তাদের ইদ্দাতের জন্য তালাক দাও।" তালাক ইদ্দাতের জন্য। তাই স্বামী যদি গোলাম হয় এবং স্ত্রী যদি আযাদ হয় তবে তার ইদ্দাতও হবে তিনটি মাসিক ঋতুচক্র এবং ইদ্দাতের জন্য তালাকের সংখ্যাও হবে তিনটি, যেমন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। আর স্বামী আযাদ হলে এবং স্ত্রী বাঁদী হলে তার ইদ্দাত হবে দুই হায়েযকাল এবং ইদ্দাতের জন্য তালাকের সংখ্যাও হবে দু'টি। যেমন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন।

٥٥٩- عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ الطَّلاَقُ بِالنِّسَاءِ وَالْعِدَّةُ بِهِنَّ .

৫৫৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, তালাক ও ইদ্দাত নারীদের সাথে সম্পৃক্ত (তাদের গণনাই নির্ভরযোগ্য)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা), আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা স্ত্রীলোকের অন্যের বাড়ীতে অবস্থান করে ইদ্দাত পালন করা মাকরূহ।

٥٦٠- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ لاَ تَبِيْتُ الْمَبْتُوْتَةُ وَلاَ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا اِلاَّ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا .

৫৬০। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলতেন, যে নারীর স্বামী মারা গেছে অথবা যাকে চূড়ান্ত তালাক দেয়া হয়েছে, তাকে স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দাত পালন করতে হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেছে ইদ্দাত চলাকালে সে দিনের বেলা প্রয়োজন বশত বাড়ির বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু তাকে স্বামীর বাড়িতেই রাত কাটাতে হবে। আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী, তা দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্নকারী তালাকই হোক অথবা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হোক, উভয় অবস্থায় ইদ্দাত চলাকালে দিনের বেলা অথবা রাতের বেলা বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ গোলামকে বিবাহ করার অনুমতি দেয়ার কারণে তালাক দেয়ার অধিকারও কি মনিবের হাতে থাকবে?

٥٦١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ اَذِنَ لِعَبْدِهِ فِىْ اَنْ يَّنْكِحَ فَاِنَّهُ لاَ يَجُوْزُ لاِمْرَاَتِهِ طَلاَقٌ اِلاَّ اَنْ يُّطَلِّقَهَا الْعَبْدُ فَاَمَّا اَنْ يَّاْخُذَ الرَّجُلُ اَمَةَ غُلاَمِهِ اَوْ اَمَةَ وَلِيْدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ .

৫৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কোন ব্যক্তি তার গোলামকে বিবাহ করার অনুমতি দেয়ার অধিকারে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ারও অধিকারী হয় না। তালাকের অধিকার গোলামেরই থাকে। তবে মনিব যদি গোলামের বাঁদীকে অথবা বাঁদীর বাঁদীকে নিয়ে নেয় তাহলে কোন দোষ নেই। (এ কথাটুকু বলে গোলামের স্ত্রী এবং তার বাঁদীর মধ্যকার আইনগত পার্থক্যের দিকে ইংগিত করা হয়েছে)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

٥٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَبْداً لِّبَعْضِ ثَقِيْفٍ جَاءَ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنَّ سَيِّدِيْ اَنْكَحَنِيْ جَارِيَتَهُ فُلاَنَةَ وَكَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ الْجَارِيَةَ وَهُوَ يَطَاهَا فَاَرْسَلَ عُمَرُ اِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ مَا فَعَلَتْ جَارِيَتُكَ قَالَ هِيَ عِنْدِيْ قَالَ هَلْ تَطَاهَا فَاَشَارَ اِلَيْهِ بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ لاَ فَقَالَ عُمَرُ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْ اعْتَرَفْتَ فَجَعَلْتُكَ نَكَالاً .

৫৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ছাকীফ গোত্রের একটি ক্রীতদাস উমার (রা)-র কাছে এসে বললো, আমার মনিব তার অমুক ক্রীতদাসীকে আমার সাথে বিবাহ দিয়েছে। কিন্তু সে এখনো তার সাথে সহবাস করে। উমার (রা) দাসীটিকে চিনতেন। তিনি তার মনিবকে ডেকে পাঠালেন। সে উপস্থিত হলে তিনি বলেন, তোমার ক্রীতদাসীটি কি করে? সে বললো, সে আমার কাছে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তার সাথে সহবাস করো? উমার (রা)-র নিকট উপস্থিত কতিপয় লোক তাকে ইশারা করলে সে বললো, না। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি যদি স্বীকারোক্তি করতে তবে আমি অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দিতাম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। কোন ব্যক্তি তার বাঁদীকে নিজের গোলামের সাথে বিবাহ দেয়ার পর তার সাথে সহবাস করা তার উচিত নয়। কেননা মালিক বিবাহ দেয়ার পর তালাক ও বিচ্ছেদের অধিকার গোলামের হাতে চলে গেছে। তালাক দেয়ার অধিকার মালিকের নেই। সে যদি তার সাথে সহবাস করে তবে প্রথমবারের মতো তাকে সতর্ক করে শাসিয়ে দিতে হবে। এরপরও সে যদি তার সাথে সহবাস করে তবে বিচারক তাকে যতো দিন কারাদণ্ড এবং বেত্রাঘাত প্রদান উপযুক্ত মনে করবেন, তাই শাস্তি দিবেন। কিন্তু বেত্রাঘাতের সংখ্যা চল্লিশের বেশী হবে না।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ প্রদত্ত মুহরের কম বা বেশী প্রদানের ভিত্তিতে খোলা করা।

٥٦٣- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ مَوْلاَةً لِّصَفِيَّةَ اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْئٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْهُ ابْنُ عُمَرَ .

৫৬৩। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবু উবাইদের কন্যা সাফিয়্যার ক্রীতদাসী নিজের মালিকানাধীন সমস্ত মালের বিনিময়ে স্বামীর সাথে খোলা করেছিলো। কিন্তু ইবনে উমার (রা) এটাকে খারাপ মনে করেননি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন স্ত্রীলোক যে কোন জিনিসের বিনিময়ে নিজের স্বামীর সাথে খোলা করলে, তা আইনত জায়েয হবে। কিন্তু স্বামী যে পরিমাণ মুহর তার স্ত্রীকে দিয়েছে, খোলার বিনিময়ে তার অধিক মাল গ্রহণ আমরা পছন্দ করি না, বিবাদ স্ত্রীর দিক থেকেই সৃষ্টি হোক না কেন। আর বিবাদের সৃষ্টি যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে আমরা খোলার বিনিময়ে স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করাই পছন্দ করি না, তা পরিমাণে কম

অথবা বেশীই হোক না কেন। কিন্তু স্বামী কিছু গ্রহণ করলে তা আইনত জায়েয হবে। তবে তার এবং তার প্রতিপালকের মধ্যকার সম্পর্কের দিক থেকে অর্থাৎ সততা, সুবিবেচনা ও ন্যায়-ইনসাফের দিক থেকে তা জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ খোলার মাধ্যমে কতো তালাক হয়?

٥٦٤- عَنْ أُمِّ بَكْرٍ الْأَسْلَامِيَّةِ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُسَيْدٍ ثُمَّ أَتَيَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ هِيَ تَطْلِيْقَةٌ الاَّ أَنْ تَكُوْنَ سَمَّتْ شَيْئًا فَهُوَ عَلٰى مَا سَمَّتْ .

৫৬৪। আসলাম গোত্রের উম্মে বাক্‌র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে উসাইদ (রা)-র সাথে খোলা করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উসাইদ (রা) বলেন যে, অতঃপর তারা উভয়ে এ সম্পর্কিত মাসআলা জানার জন্য উছমান ইবনে আফফান (রা)-র কাছে আসেন। তিনি বলেন, তা এক তালাক। কিন্তু খোলাকারিণী সংখ্যা উল্লেখ করলে ততো সংখ্যক তালাক হবে।[৩]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। খোলা হচ্ছে এক বায়েন তালাক। তবে তিন তালাকের সংখ্যা বললে বা নিয়াত করলে তিন তালাকই হবে।

---

৩. খোলা (خلع) শব্দের অর্থ খসিয়ে নেয়া, টেনে নেয়া। এর পারিভাষিক অর্থ স্বামীকে মাল দিয়ে 'খোলা' শব্দের মাধ্যমে নিজকে তার বিবাহ বন্ধন থেকে খসিয়ে নেয়া, মুক্ত করে নেয়া। ইসলামী শরীআত পুরুষকে যেভাবে অধিকার দিয়েছে যে, সে যে স্ত্রীকে পছন্দ করে না অথবা যার সাথে কোন রকমেই দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করা সম্ভব নয়, তাকে তালাক দিতে পারে। অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও এ অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে যে স্বামীকে পছন্দ করে না অথবা যার সাথে তার ঘরসংসার করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়–তার কাছ থেকে নিজকে খোলা করে নিতে পারে (সূরা বাকারা ঃ ২২৯ আয়াত দ্র.)। এ পর্যায়ে শরীআতের বিধানের দু'টি দিক রয়েছে। এর নৈতিক দিক এই যে, স্বামী অথবা স্ত্রী তালাক অথবা খোলার ক্ষমতা কেবল অনন্যোপায় অবস্থায় প্রয়োগ বা ব্যবহার করবে। শুধু মানসিক তৃপ্তির জন্য তালাক অথবা খোলাকে যেন তামাশার বস্তুতে পরিণত না করা হয়। এর আইনগত দিকের কাজ হচ্ছে, ব্যক্তির অধিকার নির্ধারণ ও তা সংরক্ষণ করা। তা পুরুষকে যেমন তালাকের অধিকার দেয়, নারীকেও তেমন খোলার অধিকার দেয়, যেন প্রয়োজনবোধে উভয়ের জন্য বিবাহ বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা সম্ভব হয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) ও মালেক (র)-র মতে খোলা আসলে তালাক। খোলা করার সাথে সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। প্রথমবার অথবা দ্বিতীয়বার খোলা করার পর স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতি ও সমঝোতার ভিত্তিতে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু তৃতীয়বার খোলা করার পর আর এ সুযোগ থাকে না। তিন তালাক দেয়া স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে আনা যেরূপ জটিল, এ ক্ষেত্রেও সেই একই জটিলতার সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদের মতে, খোলা কোন তালাক (বিচ্ছেদ) নয়; বরং ফাস্‌খ (রদকরণ)। অতএব যতোবারই খোলা করা হোক, স্ত্রী নতুন স্বামী গ্রহণ ছাড়াই প্রথম স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে (অনুবাদক)।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বলে, আমি যখন অমুক মহিলাকে বিবাহ করবো তখন সে তালাক হয়ে যাবে।

٥٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ اِذَا اَنْكَحْتُ فُلاَنَةَ فَهِىَ طَالِقٌ فَهِىَ كَذٰلِكَ اِذَا اَنْكَحَهَا وَاِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً اَوِ اثْنَتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا فَهُوَ كَمَا قَالَ .

৫৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি যখন অমুক মহিলাকে বিবাহ করবো, তখন সে তালাক হয়ে যাবে, তাহলে বিবাহ করার সাথে সাথে তার বক্তব্য অনুযায়ী তালাক অবতীর্ণ হবে। অর্থাৎ সে যদি এক অথবা দুই অথবা তিন তালাকের নিয়াত করে তবে তাই হবে।[৪]

---

৪. ইমাম আবু হানীফা ও মালেকের মতে বিবাহের পূর্বে তালাক দিয়ে রাখলে বিবাহ করার সাথে সাথে তালাক হয়ে যায়। প্রাচীনপন্থী আলেমদের একদলেরও এই মত। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, উমার ইবনে আবদুল আযীয, আমের আশ-শাবী, ইবরাহীম নাখঈ, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আবু বাক্র ইবনে আবদুর রহমান, আবু বাক্র ইবনে আমর ইবনে হাযম, যুহরী, মাকহূল শামী প্রমুখ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি বলে, "আমি অমুক স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ করলে সে তালাক" অথবা "যেদিন আমি তাকে বিবাহ করবো, সে তালাক" অথবা "যে স্ত্রীলোককেই আমি বিবাহ করবো সে তালাক", তাহলে সে যেরূপ বলেছে তদ্রূপই হবে। অর্থাৎ বিবাহ করার সাথে সাথে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

কিন্তু ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, হাসান বসরী, আলী ইবনুল হুসাইন, যয়নুল আবেদীন এবং জমহূরের মতে, বিবাহের পূর্বে তালাক দেয়া অর্থহীন। অতএব যদি কেউ বলে, "আমি অমুক স্ত্রীলোককে বা অমুক বংশের অমুক ঘরের কোন মহিলাকে বা যে কোন মহিলাকে বিবাহ করলে সে তালাক হয়ে যাবে", তবে এটা একটা অর্থহীন কথা। এতে কারো উপর তালাক হবে না। কেননা নবী ﷺ বলেছেন ঃ "আদম সন্তান যার মালিক নয় সে বিষয়ে তালাক দেয়ার অধিকারও তার নেই" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নং ২০৪৮, মুসনাদে আহমাদ)। তিনি আরো বলেছেন ঃ "বিবাহের পূর্বে কোন তালাক নেই" (ইবনে মাজা, নং ২০৪৮)।

ভিন্নমত পোষণকারীগণ এই হাদীস দু'টির জবাবে বলেছেন, এই হাদীসের নির্দেশ কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী নয় এমন কোন মহিলাকে বলে, 'তোমাকে তালাক' অথবা 'আমি তোমাকে তালাক দিলাম'। এরূপ ক্ষেত্রে এ ধরনের কথা অবশ্যই অর্থহীন হবে এবং এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই। কিন্তু কেউ যদি বলে, 'আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি তালাক হয়ে যাবে'–এটা বিবাহের পূর্বে তালাক দেয়া নয়, বরং সেই নারী যখন তার বিবাহিতা স্ত্রী হবে তখন তার উপর তালাক হওয়ার কথা এতে ঘোষিত হয়েছে বলে মনে করতে হবে। কাজেই এ ধরনের কথা অর্থহীন নয়। যখনই সে ঐ নারীকে বিবাহ করবে তখনই সে তালাক হয়ে যাবে।

তবে দারু কুতনীর দু'টি হাদীস ইমাম শাফিঈ ও আহমাদের মত সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করে। ইবনে উমার (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে বলেছে, "আমি যেদিন অমুক মহিলাকে বিবাহ করবো সে তিন তালাক হয়ে যাবে"। রাসূলুল্লাহ

٥٦٦- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ رَجُلاً سَئَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ انِّى قُلْتُ اِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِىَ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ قَالَ اِنْ تَزَوَّجْتَهَا فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتّٰى تُكَفِّرَ .

৫৬৬। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, নিশ্চয় আমি বলেছি, আমি অমুক স্ত্রীলোককে বিবাহ করলে সে আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের সমান (তাহলে এর ফল কি দাঁড়াবে)? তিনি বলেন, তুমি যদি তাকে বিবাহ করো তবে কাফফারা না দেয়া পর্যন্ত তার কাছে যাবে না।[৫]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। অর্থাৎ সে যখন ঐ নির্দিষ্ট মহিলাকে বিবাহ করবে—তখন সে তার সাথে যিহারকারী সাব্যস্ত হবে। অতএব যিহারের কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত সে তার কাছে যেতে পারবে না।

ﷺ বললেন ঃ "যে বিষয়ে মালিকানা নেই তাতে তালাকও নেই।" দ্বিতীয় হাদীসটি এই যে, আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) বলেন, আমার এক চাচা আমাকে বললেন, আমাকে একটা কাজ করে দাও, তাহলে আমার কন্যাকে তোমার সাথে বিবাহ দিবো। আমি জবাবে বললাম, আমি যদি তাকে বিবাহ করি তাহলে সে তালাক। ঘটনাচক্রে সেই মেয়ের সাথে আমার বিবাহের কথা ঠিক হলো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ব্যাপারটি জানালে তিনি বলেন ঃ "তুমি তাকে বিবাহ করো, কেননা বিবাহের পরই তালাক দেয়া যেতে পারে" (লা তালাকা ইল্লা বাদান-নিকাহ)।

এ সম্পর্কে প্রতিপক্ষের জবাব হচ্ছে, যদি হাদীস দু'টি সহীহ হতো তাহলে কোন কথাই ছিলো না এবং মহানবী ﷺ-এর নির্দেশের উপর কারো নির্দেশ চলতে পারে না। কিন্তু হাদীস দু'টি সহীহ নয়। প্রথম হাদীসটির একজন রাবী হচ্ছেন আবু খালিদ ওয়াসিতী উমার ইবনে খালিদ। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন এবং দারু কুতনী বলেছেন, সে চরম মিথ্যাবাদী (كذاب)। ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়ায়হ ও আবু যুরআ বলেছেন, সে মিথ্যা হাদীস প্রণয়নকারী। দ্বিতীয় হাদীসটির একজন রাবী হচ্ছেন আলী ইবনে কারীন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন প্রমুখ তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম যায়লাঈ তার 'তাখরীজ আহাদীসিল হিদায়া' গ্রন্থে এবং কাসিম ইবনে কুতলুবুগা তার ফাতোয়ায় এই অলোচনা করেছেন। অতএব হাদীস দু'টি দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় (অনুবাদক)।

৫. 'যিহার' (ظهار) শব্দটি যাহ্র (ظهر) শব্দ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ সওয়ারী–যার উপর সওয়ার হওয়া যায়। জন্তুযানকে আরবী ভাষায় যাহ্র বলা হয়। কেননা এর পিঠের উপর সওয়ার হওয়া যায়, আরোহণ করা হয়। আইনের পরিভাষায় কোন মাহরাম স্ত্রীলোকের বা তার দেহের বিশেষ অংশের সাথে নিজের স্ত্রীকে তুলনা করাকে যিহার বলে। যেমন, 'তুমি আমার মায়ের মতো' বা 'কন্যার মতো' বা 'তুমি আমার জন্য এমন–যেমন আমার মায়ের পিঠ' ইত্যাদি। এর অর্থ হচ্ছে, তোমার সাথে সহবাস করা আমার জন্য হারাম। যিহার করা সুস্পষ্টভাবে কবীরা গুনাহ।

যিহারের আইনগত অবস্থা এই যে, যিহার করার সাথে সাথেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না। স্ত্রী পূর্বের মতো স্ত্রীই থাকে, তবে সাময়িকভাবে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। যতোক্ষণ পর্যন্ত যিহারের কাফ্ফারা আদায় না করা হবে, ততোক্ষণ সে তার জন্য হারাম থাকবে এবং সে তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। যিহারের কাফ্ফারা হিসাবে একটি দাস মুক্ত করতে হবে। এই সামর্থ্য না থাকলে বা দাস না পাওয়া গেলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। এই সামর্থ্যও না থাকলে ষাটজন মিসকীনকে (দুই বেলা) আহার করাতে হবে (সূরা মুজাদালা ঃ ৩ ও ৪; আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনে আবু হাতিম) (অনুবাদক)।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলাকে তার স্বামী এক অথবা দুই তালাক দিলো, অতঃপর সে অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করলো, অতঃপর তাকে পূর্বের স্বামী বিবাহ করলো।

٥٦٧-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ثُمَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ عَلَى كَمْ هِيَ قَالَ عُمَرُ هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا .

৫৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার (রা)-র কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক অথবা দুই তালাক দিলো। সে ইদ্দাত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তাকে ত্যাগ করলো। অতঃপর সে অন্য পুরুষকে বিবাহ করলো। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী মারা গেলো অথবা তাকে তালাক দিলো। অতঃপর (ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর) প্রথম স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করলো। এখন সে কতো তালাকের অধিকারী হবে? তিনি বলেন, সে অবশিষ্ট এক অথবা দুই তালাকের অধিকারী হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন, স্ত্রীলোকটির সাথে দ্বিতীয় স্বামী সহবাস করে থাকলে প্রথম স্বামী আবার নতুন করে তিন তালাকের অধিকারী হবে। ইবনে সাওয়াফের 'আল-আসল' গ্রন্থে আছে যে, ইবনে আব্বাস (রা) এবং ইবনে উমার (রা)-রও এই মত।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী অথবা অপর কারো হাতে তালাকের অধিকার অর্পণ করা।

٥٦٨- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَهُ فَأَتَاهُ بَعْضُ بَنِي أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ فَقَالَ لَهُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَفَارَقَتْنِي فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ الْقَدَرُ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا .

৫৬৮। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তার পুত্র খারিজা (র) তার কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় আতীক গোত্রের এক ব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে এলো। যায়েদ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে, তুমি কাঁদছো কেন? সে বললো, আমি আমার স্ত্রীর হাতে তালাকদানের এখতিয়ার অর্পণ করেছিলাম। সে আমার থেকে পৃথক হয়ে গেছে। যায়েদ (রা) বলেন, কোন জিনিস তোমাকে একাজ করতে উদ্বুদ্ধ করলো? সে জবাব দিলো, তাকদীর। তিনি বলেন, তুমি চাইলে তাকে ফেরত নিতে পারো। কেননা এটা এক তালাক এবং তুমি তাকে রুজু করার অধিকারী।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে ব্যাপারটি স্বামীর নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। যদি সে এক তালাকের নিয়াত করে থাকে, তাহলে এক বায়েন তালাক হবে এবং সে পুনর্বিবাহের প্রস্তাবকারী হিসাবে গণ্য হবে। আর সে যদি তিন তালাকের নিয়াত করে থাকে,

তাহলে তিন তালাকই হবে। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এই মত। কিন্তু উছমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) ও আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, স্ত্রী যতো তালাকের নিয়াত করবে তদনুযায়ী ফয়সালা হবে (অর্থাৎ স্ত্রী প্রত্যাহারযোগ্য অথবা প্রত্যাহার অযোগ্য এক অথবা একাধিক তালাকের নিয়াত করলে ফয়সালাও তদনুযায়ী হবে)।

٥٦٩ – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ قُرَيْبَةَ بِنْتَ أَبِىْ أُمَيَّةَ فَزَوَّجَتْهُ ثُمَّ أَنَّهُمْ عَتَبُوْا عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ وَقَالُوْا مَا زَوَّجْنَا اِلاَّ عَائِشَةُ فَأَرْسَلَتْ اِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَذَكَرَتْ لَهُ ذٰلِكَ فَجَعَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ أَمْرَ قُرَيْبَةَ بِيَدِهَا فَاخْتَارَتْهُ وَقَالَتْ مَا كُنْتُ لاَخْتَارَ عَلَيْكَ أَحَدًا فَقَرَّتْ تَحْتَهُ فَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ طَلاَقًا .

৫৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার ভাই আবদুর রহমানের জন্য আবু উমাইয়্যার কন্যা কারীবার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেন। অতএব তাকে আবদুর রহমানের সাথে বিবাহ দেয়া হলো। পরে কোন কারণে কারীবার পরিবারের লোকজন আবদুর রহমানের উপর অসন্তুষ্ট হয়। অতএব তারা বলে, আমরা তাকে আবদুর রহমানের কাছে বিবাহ দেইনি, বরং আয়েশা (রা) দিয়েছেন। আয়েশা (রা) বিষয়টি আবদুর রহমানকে জানালেন। আবদুর রহমান নিজের স্ত্রীকে (তার কাছে থাকার অথবা তাকে তালাক দিয়ে চলে যাবার) এখতিয়ার দিলেন। কারীবা স্বামীর সাথে বসবাস করাই বেছে নিলেন এবং বললেন, আমি আপনাকে ছাড়া আর কাউকে পছন্দ করতে পারি না। অতএব এই মহিলা তার অধীনে থেকে গেলেন এবং এটা তালাক হিসাবে গণ্য হয়নি।

٥٧٠ – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ وَمِثْلِىْ يُصْنَعُ بِهِ هٰذَا وَيُفْتَاتُ عَلَيْهِ بِبَنَاتِهِ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ فَإِنَّ ذٰلِكَ فِىْ يَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مَا لِىْ رَغْبَةٌ عَنْهُ وَلٰكِنْ مِثْلِىْ لَيْسَ يُفْتَاتُ عَلَيْهِ بِبَنَاتِهِ وَمَا كُنْتُ لاَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ فَقَرَّتْ امْرَأَتُهُ تَحْتَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ طَلاَقًا .

৫৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার ভাই আবদুর রহমানের কন্যা হাফসাকে যুবায়ের (রা)-র পুত্র মুনযিরের সাথে বিবাহ দিলেন। আবদুর রহমান তখন সিরিয়ায় ছিলেন। তিনি ফিরে এসে বলেন যে, তার সাথে এরূপ ব্যবহার করা হলো এবং তার কন্যার ব্যাপারে তার মতামত নেয়া হলো না! আয়েশা (রা) বিষয়টি মুনযিরকে জানালেন। মুনযির বলেন, (বিবাহের ব্যাপারটি ঠিক রাখা বা না রাখার এখতিয়ার) আবদুর রহমানের উপর ন্যস্ত করা

হলো। আবদুর রহমান বলেন, মুনযিরের প্রতি আমার কোন অনিহা নেই। বরং আমার কথা হলো, আমার কন্যার ব্যাপারে আমার মতামত গ্রহণ করা হয়নি। তুমি (আয়েশা) যে বিবাহ দিয়েছো তা আমি প্রত্যাখ্যান করছি না। এই এখতিয়ার তালাক হিসাবে গণ্য হয়নি।

৫৭১- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ الاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا فَيَقُولُ لَمْ أُرِدْ الاَّ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذٰلِكَ وَيَكُونُ (فَيَكُونُ) أَمْلَكَ بِهَا فِي عِدَّتِهَا .

৫৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর হাতে তালাকের এখতিয়ার ন্যস্ত করে তখন স্ত্রীর ইচ্ছার উপর বিষয়টি নির্ভর করবে। কিন্তু স্বামী যদি (তার দেয়া তালাক) অস্বীকার করে বলে যে, সে তাকে কেবল এক তালাকের (এখতিয়ার দেয়ার) নিয়াত করেছে, তবে তাকে একথা শপথ করেও বলতে হবে (যে, সে এক তালাকেরই নিয়াত করেছিল)। এক্ষেত্রে স্বামী তাকে ইদ্দাত চলাকালে রুজু করার অধিকারী থাকবে।

৫৭২- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ اِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَلَمْ تُفَارِقْهُ وَقَرَّتْ عِنْدَهُ فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِطَلاَقٍ .

৫৭২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি নিজের তালাকের এখতিয়ার স্ত্রীর উপর ন্যস্ত করে এবং সে যদি তার সাথে থেকে যায় এবং নিজকে তালাক না দেয়, তবে তালাক হবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। স্ত্রী স্বামীর সাথে থেকে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দিলে তালাক হবে না। আর সে যদি নিজকে বেছে নেয় (স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়), তাহলে ব্যাপারটি স্বামীর নিয়াতের উপর নির্ভর করবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে এই এখতিয়ার দেয়ার সময় এক তালাকের নিয়াত করে থাকে তবে এক বায়েন তালাক হবে। আর সে যদি তিন তালাকের নিয়াত করে তাহলে তিন তালাক হবে। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।[৬]

---

৬. স্বামী যদি নিজের তালাকের এখতিয়ার স্ত্রীর উপর ন্যস্ত করে এবং স্ত্রী যদি এই এখতিয়ার প্রয়োগ করে, তবে এ ধরনের তালাককে আইনের পরিভাষায় 'তালাকে তাফবীয' الطلاق التفويض বলে। ইমাম মালেকের মতে, তাফবীয তালাকের মাধ্যমে তিন তালাক অবতীর্ণ হয় এবং ইমাম শাফিঈর মতে এক রিজঈ (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক হয়। ইমাম আহমাদও ইমাম শাফিঈর অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। হানাফী মাযহাবের ফিক্হ গ্রন্থ হিদায়ায় উল্লেখ আছে, তাফবীয তালাকের মাধ্যমে এক রিজঈ তালাক অবতীর্ণ হয়। কেউ বলেছেন, এটা ভুলবশত বলা হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, এ সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে। একটি মত হচ্ছে, তাতে রিজঈ তালাক হয়। আর দ্বিতীয় মত হচ্ছে, এক বায়েন তালাক হয়। এই শেষোক্ত মতটিই নির্ভুল। কেননা 'শারহুল বিকায়া' নামক ফিক্হ গ্রন্থে এক বায়েন তালাকের কথা উল্লেখ আছে (অনুবাদক)।

٥٧٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيْدَةٌ فَأَبَتَّ طَلاَقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَّمَسَّهَا فَقَالَ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

৫৭৩। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তার কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তির বিবাহাধীনে একটি বাঁদী রয়েছে। সে তাকে চূড়ান্তভাবে তালাক দিলো, অতঃপর তাকে খরিদ করলো। সে কি তার সাথে সংগম করতে পারবে? তিনি জবাবে বলেন, অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে তার সাথে সহবাস করতে পারবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের বিবাহাধীন বাঁদীকে দাসত্বমুক্ত করা হলে।

٥٧٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِي الْأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا .

৫৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, গোলামের বিবাহাধীন বাঁদীকে আযাদ করা হলে, তার সাথে সংগম না করা পর্যন্ত তার (স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার) এখতিয়ার বহাল থাকবে।

٥٧٥- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَبْرَاءَ مَوْلاَةً لِبَنِيْ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَكَانَتْ أَمَةً فَأُعْتِقَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا حَفْصَةُ وَقَالَتْ إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا وَمَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ فَإِذَا مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنْ أَمْرِكِ شَيْئًا قَالَتْ وَفَارَقْتُهُ .

৫৭৫। আদী ইবনে কাব গোত্রের যাবরাআ নামী ক্রীতদাসী থেকে বর্ণিত। সে এক দাসের বিবাহাধীন ছিল। তাকে আযাদ করা হলো। উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, আমি তোমাকে একটি বিষয় অবহিত করবো। তবে আমি পছন্দ করি না যে, তুমি কিছু করো। তুমি তোমার স্বামীর বিবাহ বন্ধনে থাকা বা না থাকার এখতিয়ার লাভ করেছো। সে তোমার সাথে সংগম না করা পর্যন্ত এই এখতিয়ার বহাল থাকবে। সে তোমার সাথে সহবাস করলে, তোমার আর এই এখতিয়ার থাকবে না। যাবরাআ তখন বললো, আমি তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সে যখন জানতে পারবে যে, বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখা বা না রাখার এখতিয়ার সে লাভ করেছে, তখন যে মজলিসে বসে সে তা জানতে পেরেছে, সেখান থেকে উঠে না দাঁড়ানো পর্যন্ত অথবা অন্য কোন কাজে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অথবা স্বামীর সাথে সংগম না হওয়া পর্যন্ত এই এখতিয়ার বলবৎ থাকবে। উল্লেখিত তিনটি কাজের

কোন একটি সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে এখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি জানতে না পারে যে, তাকে আযাদ করা হয়েছে অথবা তার যদি জানা না থাকে যে, আযাদ করার সাথে সাথে সে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার এখতিয়ার লাভ করেছে, তাহলে সংগম করার পরও এই এখতিয়ার বহাল থাকবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থ অবস্থায় তালাক দেয়া।

৫৭৬- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا .

৫৭৬। তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) অসুস্থ অবস্থায় নিজ স্ত্রীকে তালাক দেন। উছমান (রা) তার স্ত্রীকে ইদ্দাত পালনশেষে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেন।

৫৭৭- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّهُ وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكَمِّلٍ مِنْهُ كَانَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ .

৫৭৭। উছমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে মুকাম্মিলের স্ত্রীদের তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী বানান। রোগগ্রস্ত অবস্থায় তিনি তার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ইদ্দাত পালনের সময়ের মধ্যে স্বামী মারা গেলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিস হবে। কিন্তু ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর তালাকদাতা স্বামী মারা গেলে সে তার ওয়ারিস হবে না। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে এ ধরনের রিওয়ায়াত এসেছে। তিনি কাযী শুরায়হকে লিখে পাঠান যে, কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে এবং স্বামী তার ইদ্দাত চলাকালে মারা গেলে তাকে তার ওয়ারিস বানাও। কিন্তু স্বামী ইদ্দাতের পর মারা গেলে সে তার উত্তরাধিকারী হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

১৩. অনুচ্ছেদঃ গর্ভবতী স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হলে বা স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দাত।

৫৭৮- اَخْبَرَنَا الزُّهْرِىُّ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ امْرَاَةٍ يَتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ اِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَوْ وَضَعَتْ مَا فِىْ بَطْنِهَا وَهُوَ عَلٰى سَرِيْرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ حَلَّتْ .

৫৭৮। যুহরী (র) বলেন, ইবনে উমার (রা)-কে এমন এক (গর্ভবতী) মহিলার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যার স্বামী মারা গেছে। তিনি বলেন, সে বাচ্চা প্রসব করার সাথে সাথে

হালাল হয়ে যাবে (ইদ্দাত শেষ হয়ে যাবে)। তার কাছে বসা এক আনসার ব্যক্তি বললো, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, সে যদি এমন অবস্থায় বাচ্চা প্রসব করে যে, তার স্বামীর লাশ খাটিয়ার উপর দাফনের অপেক্ষায় আছে, তবুও সে হালাল হয়ে যাবে (তার ইদ্দাত শেষ হয়ে যাবে)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

৫৭৯- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِذَا وَضَعَتْ مَا فِىْ بَطْنِهَا حَلَّتْ .

৫৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন স্ত্রীলোক তার পেটের বাচ্চা প্রসব করার সাথে সাথে হালাল হয়ে যায় (ইদ্দাত শেষ হয়ে যায় এবং নতুন স্বামী গ্রহণ করতে পারে)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। স্বামী তালাক দিক অথবা মারা যাক, উভয় অবস্থায় বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রীর ইদ্দাত শেষ হয়ে যায়। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।[৭]

৫৮০- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اِذَا اٰلٰى الرَّجُلُ مِنْ اِمْرَاَتِهٖ ثُمَّ فَاءَ قَبْلَ اَنْ تَمْضِىَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ فَهِىَ اِمْرَاَتُهٗ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ طَلَاقِهَا شَيْئٌ فَاِنْ مَضَتِ الْاَرْبَعَةُ الْاَشْهُرُ قَبْلَ اَنْ يَفِىْءَ فَهِىَ تَطْلِيْقَةٌ وَهُوَ اَمْلَكُ بِالرَّجْعَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا قَالَ وَكَانَ مَرْوَانُ يَقْضِ بِهٖ .

৫৮০। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করে এবং চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ঈলা ভংগ করে, সে তার স্ত্রীই থাকবে, তালাক হবে না। কিন্তু ঈলা ভংগ করার পূর্বেই যদি চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে স্ত্রী এক তালাক হয়ে যাবে এবং সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিক হকদার, যতোক্ষণ তার ইদ্দাত শেষ না হবে। সাঈদ (র) বলেন, মারওয়ান এই ফতোয়াই দিতেন।

---

৭. গর্ভাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া হলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ইদ্দাত শেষ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেম একমত। কিন্তু গর্ভাবস্থায় স্বামী মারা গেলে তার ইদ্দাতের সময়সীমা নিয়ে মতভেদ আছে। স্বামী মারা গেলে ইদ্দাতের সময়সীমা সাধারণত চার মাস দশ দিন (সূরা বাকারা ঃ ২৩৪)। হযরত আলী (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা)-র মতে বিধবা গর্ভবতীর ইদ্দাত হচ্ছে 'চার মাস দশ দিন অথবা সন্তান প্রসবের সময়' এই দুইটি মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদটি। কিন্তু চার ইমামসহ প্রায় সকল ফিক্‌হবিদের মতে গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবার ইদ্দাত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। বিপুল সংখ্যক সাহাবীরও এই মত (অনুবাদক)।

৫৮১- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اٰلٰى مِنْ امْرَاَتِه فَاذَا (فَانَّهُ اذَا) مَضَتِ الْاَرْبَعَةُ الْاَشْهُرُ وُقِفَ حَتّٰى يُطَلِّقَ اَوْ يَفِيْئَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاَقٌ وَاِنْ مَضَتِ الْاَرْبَعَةُ الْاَشْهُرُ حَتّٰى يُوْقَفَ .

৫৮১। ইবনে উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তিই নিজ স্ত্রীর সাথে ঈলা (সংগম না করার শপথ) করে এবং এ অবস্থায় চার মাস অতীত হয়ে যায়, তাকে বিচারকের সামনে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য অথবা রুজু করার জন্য বাধ্য করতে হবে। চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তালাক হবে না, যতোক্ষণ তাকে বিচারকের সামনে উপস্থিত না করা হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), উছমান ইবনে আফ্ফান (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, তারা বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ঈলা করার পর ঈলা ভংগের পূর্বে চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তার স্ত্রী এক বায়েন তালাক হয়ে যায়। সে বিবাহের প্রস্তাবকদের মধ্যে গণ্য হয় (অর্থাৎ প্রস্তাব পাঠানোর মাধ্যমে তাকে নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে)। চার মাস পার হয়ে যাবার পর তারা স্বামীর উপর চাপ প্রয়োগের কোন প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না। ইবনে আব্বাস (রা) নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاؤُا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

"যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সাথে ঈলা (সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা) করে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ আছে। যদি তারা এথেকে প্রত্যাবর্তন করে তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আর যদি তারা তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত করে থাকে, তবে জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন" (সূরা বাকারা ঃ ২২৬, ২২৭)।

(ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যা), الفئ অর্থ 'চার মাসের মধ্যে সংগম করা' আর عزيمة الطلاق অর্থ 'চার মাস পার হয়ে যাওয়া'। চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর স্ত্রী এক বায়েন তালাক হয়ে যায়। এরপর আর স্বামীর উপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) অন্যদের তুলনায় কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অধিক অবহিত ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এই মত।[৮]

---

৮. ঈলা (ايلا) শব্দের অর্থ শপথ করা। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, আল্লাহ্র শপথ! আমি চার মাসের মধ্যে তোমার কাছে যাবো না (সহবাস করবো না), এরূপ প্রতিজ্ঞা করাকে ঈলা বলে। ঈলা সম্পর্কিত আয়াতে (সূরা বাকারা ঃ ২২৬) প্রতিজ্ঞা বা শপথ করার কথা উল্লেখ থাকাতে হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের ফিক্হবিদগণ মনে করেন, স্বামী যখন স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা করবে, কেবল তখনই ঈলা সম্পর্কিত নির্দেশ কার্যকর হবে। আর প্রতিজ্ঞা না করে যদি

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ সংগমের পূর্বে স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়া।

৫৮২– عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَيَاسِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَاَتَهُ ثَلٰثًا قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ اَنْ يَّنْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَفْتِيْ قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَئَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالاَ لاَ يَنْكِحُهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ طَلاَقِيْ اِيَّاهَا وَاحِدَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَرْسَلْتَ مِنْ يَّدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ .

৫৮২। মুহাম্মাদ ইবনে আইয়াস ইবনে বুকাইর (র) বলেন, এক ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। অতঃপর সে পুনরায় তাকে বিবাহ করতে চায়। তাই সে মাসআলা জানার জন্য আসে। আমিও তার সাথী হলাম। সে আবু হুরায়রা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে এ সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞেস করে। তারা উভয়ে বলেন, অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে তাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না। সে বললো, আমি নিশ্চিতরূপে তাকে এক তালাক দিয়েছি। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তুমি নিজের অধিকার হাতছাড়া করে ফেলেছো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের মাযহাবের ফিক্হবিদদের এটাই সাধারণ মত। কেননা সে একসাথে তিন তালাক দিয়েছে। এজন্য একত্রেই তিন তালাক কার্যকর হয়েছে। কারণ প্রথম তালাকের পরপরই এবং দ্বিতীয় তালাক উচ্চারণ করার পূর্বেই সে বায়েন তালাক হয়ে গেছে। তাকে কোন ইদ্দাত পালন করতে হবে না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালাক তো ইদ্দাত চলাকালে অবতীর্ণ হয়।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলা প্রথম স্বামী তালাক দেয়ার পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছে এবং সেও সহবাস করার পূর্বে তাকে তালাক দিয়েছে।

৫৮৩– عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ تَمِيْمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثًا فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزُّبَيْرِ

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ত্যাগ করা হয় তাহলে এ অবস্থায় যতো কালই অতিবাহিত হোক, সেখানে ঈলা সম্পর্কিত আয়াতের নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। মালিকী মাযহাবের ফিক্হবিদদের মতে, শপথ করা হোক বা না হোক, উভয় অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে এই চার মাস সময়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, মাকহূল, যুহরী প্রমুখ ইমামদের মতে, চার মাস শেষ হওয়ার পর স্ত্রী আপনা আপনিই এক রিজঈ তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা), আবু দারদা (রা) এবং মদীনার অধিকাংশ ফিক্হবিদের মতে, চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপন করতে হবে। বিচারক হয় স্ত্রীকে গ্রহণ করতে, না হয় সম্পূর্ণ তালাক দিতে স্বামীকে নির্দেশ দিবেন। ইমাম মালেক (র) ও শাফিঈ (র) এই মত গ্রহণ করেছেন (অনুবাদক)।

فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي طَلَّقَهَا فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيْجِهَا وَقَالَ لَا تَحِلُّ لَكَ حَتّٰى تَذُوْقَ الْعُسَيْلَةَ .

৫৮৩। যুবাইর ইবনে আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। রিফাআ ইবনে সিমওয়াল তার স্ত্রী তামীমা বিনতে ওয়াহ্‌বকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তিন তালাক দেন। অতঃপর আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর তাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তিনি অসুখের কারণে সংগম করতে সক্ষম হননি। অতএব তিনি তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেন। রিফাআ তাকে পুনর্বার বিবাহ করতে চাইলেন। তিনিই ছিলেন তার প্রথম স্বামী, যিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন। ব্যাপারটি তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বললেন। তিনি তাকে ঐ মহিলাকে বিবাহ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন ঃ "দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস না করা পর্যন্ত সে তোমার জন্য হালাল হবে না।"[৯]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত। কেননা দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করেনি। অতএব দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস করার পূর্বে সে প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারবে না।[১০]

---

৯. হাদীসটি সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ, বায়হাকী, ইবনে জারীর, শাফিঈ, ইবনে সাদ, বায্যার, তাবারানী প্রমুখ নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী তার আদ-দুররুল মানছূর গ্রন্থে হাদীসটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এই মাসআলাটিতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ছাড়া আর কেউই ভিন্নমত ব্যক্ত করেননি। তিনি বলেছেন, দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহই যথেষ্ট, সংগম শর্ত নয়। তিনি কুরআনের আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ এবং এজাতীয় হাদীস নিজ মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন (অনুবাদক)।

১০. এই অনুচ্ছেদে তাহলীল (তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার পন্থা) সম্পর্কে আংশিক আলোচনা করা হয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, তিন তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণের ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল। স্ত্রীলোকটি ইদ্দাতশেষে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করবে স্বাভাবিক পন্থায়। অতঃপর স্বামী মারা গেলে বা স্বেচ্ছায় তালাক দিলে পুনরায় ইদ্দাত পালন করার পর ইচ্ছা করলে সে প্রথম স্বামীর সাথে আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে তাহলীল করার নামে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিবাহের যে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়, তা সম্পূর্ণ নাজায়েয কাজ। একে মূলত বিবাহই বলা যায় না। প্রকারান্তরে তা এক ধরনের যেনা। এটা ছল-চাতুরীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আয়াত নিয়ে খেল-তামাশা এবং আইনের আক্ষরিক মারপ্যাচের সুযোগ নিয়ে তার মূল লক্ষ্য ও ভাবধারাকে বিনষ্ট করারই নামান্তর। ইমাম আবু হানীফার মতে এ ধরনের পূর্বপরিকল্পিত বিবাহ জায়েয হলেও তা মাকরূহ তাহরিমী। ইমাম আবু ইউসুফ, মালেক (এক বর্ণনা অনুযায়ী), শাফিঈ এবং আহমাদের মতে এ ধরনের বিবাহ বাতিল। তা স্ত্রীকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করবে না। রাসূলুল্লাহ (স) এ ধরনের লোকদের অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেন ঃ "যে লোক তাহলীল করলো এবং যার জন্য করলো উভয়ের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ" (তিরমিযী, নাসাঈ)। তিনি সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেনঃ "ভাড়ায় আনা ষাঁড় কে, তা আমি তোমার বলবো কি? তারা বলেন, অবশ্যই বলুন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলেন ঃ সে হলো হালালকারী ব্যক্তি। যে ব্যক্তি তা করে এবং যার জন্য করে, তাদের উভয়ের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেন" (ইবনে মাজা, দারু কুতনী) (অনুবাদক)।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সফরে বের হওয়া নিষেধ।

٥٨٤- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفّٰى عَنْهُنَّ اَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ (مِنَ الْحَجِّ) .

৫৮৪। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দাত পালনকারী মহিলাদেরকে হজ্জে যেতে নিষেধ করতেন। এমনকি তিনি বাইদা নামক স্থান থেকে এ ধরনের মহিলাদের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত। ইদ্দাত চলাকালে কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে সফরে বের হওয়া উচিৎ নয়। তা মৃত্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট ইদ্দাত হোক অথবা তালাকের সাথে সংশ্লিষ্ট ইদ্দাত, তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সফরে বের হওয়া নিষেধ।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুতআ বিবাহ।

٥٨٥- عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ جَدِّهِمَا اَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ .

৫৮৫। আলী (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুতআ বিবাহ করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٥٨٦- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيْمٍ دَخَلَتْ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ اِنَّ رَبِيْعَةَ بْنَ اُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَاَةٍ مُوَلَّدَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَخَرَجَ عُمَرُ فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ هٰذِهِ الْمُتْعَةُ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيْهَا لَرَجَمْتُ .

৫৮৬। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। হাকীম কন্যা খাওলা (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে এসে বলেন, উমাইয়্যার পুত্র রবীআ এক কুজন্মা নারীর সাথে মুতআ করেছে এবং সে তার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে। একথা শুনে হযরত উমার (রা) সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিজের চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন, এই ব্যক্তি মুতআ করেছে। আমি যদি পূর্বেই (তা হারাম হওয়ার কথা) ঘোষণা করে দিতাম, তাহলে আজ আমি তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতাম।[১১]

---

১১. নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে মুতআ বিবাহ বলে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই ধরনের বিবাহ জায়েয ছিলো। কিন্তু পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা চিরকালের জন্য হারাম ঘোষণা করেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এটাই মত। ইমাম নববী (র) বলেন, মুতআ বিবাহ দুইবার জায়েয করা হয় এবং দুইবার হারাম করা হয়। এক, খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে তা জায়েয ছিলো এবং এই যুদ্ধের

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মুতআ করা মাকরূহ। অতএব তা করা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে মুতআ করতে নিষেধ করেছেন। হযরত উমার (রা) যে বলেছেন, "আমি যদি পূর্বেই (তার হারাম হওয়ার কথা) ঘোষণা করে দিতাম, তাহলে আজ রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করতাম" এই কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য এবং সতর্ক করার জন্য বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ এক স্ত্রীকে অপর স্ত্রীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া।

৫৮৭- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ فَكَانَتْ تَحْتَهُ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَاَةً شَابَّةً فَاٰثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ اَمْهَلَهَا حَتّٰى اِذَا كَادَتْ تَحِلُّ ارْتَجَعَهَا ثُمَّ عَادَ فَاٰثَرَ الشَّابَّةَ فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ اَمْهَلَهَا حَتّٰى كَادَتْ اَنْ تَحِلَّ ارْتَجَعَهَا ثُمَّ عَادَ فَاٰثَرَ الشَّابَّةَ فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ فَقَالَ مَا شِئْتِ اِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَاِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ عَلٰى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْاَثَرَةِ وَاِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ قَالَتْ بَلْ اَسْتَقِرُّ عَلَى الْاَثَرَةِ فَاَمْسَكَهَا عَلٰى ذٰلِكَ وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ اَنَّ عَلَيْهِ فِيْ ذٰلِكَ اِثْمًا حِيْنَ رَضِيَتْ اَنْ تَسْتَقِرَّ عَلَى الْاَثَرَةِ .

৫৮৭। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সালামার কন্যাকে বিবাহ করলেন। তিনি তার ঘরসংসার করতে থাকলেন। অতঃপর তিনি এক যুবতীকে বিবাহ করলেন, তাকে প্রথম স্ত্রীর উপর অগ্রাধিকার দিতে লাগলেন এবং তার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। প্রথম স্ত্রী তার কাছে তালাক দাবি করলো। অতএব তিনি তাকে এক তালাক দিলেন এবং নিজ বাড়িতেই রাখলেন। ইদ্দাত শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে রুজু করলেন। কিন্তু এবারও তিনি যুবতী স্ত্রীর দিকেই ঝুঁকে থাকলেন। প্রথম স্ত্রী আবারও তালাক দাবি করলো। তিনি এবার তাকে এক তালাক দিলেন এবং স্ত্রীকে নিজ বাড়ীতেই রাখলেন। অতঃপর ইদ্দাত শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে আবারও স্ত্রীকে রুজু করলেন। কিন্তু তিনি যুবতী স্ত্রীকেই অগ্রাধিকার দিতে থাকলেন। প্রথম স্ত্রী পুনরায় তালাক দাবি করেন। স্বামী তাকে বলেন, তোমার কি খেয়াল, আর এক তালাক বাকী আছে। আমি তো দ্বিতীয় স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। এ অবস্থায় তুমি যদি আমার ঘর-সংসার করতে রাজী হও তাহলে থেকে যাও। আর যদি তুমি চাও তবে আমি তোমাকে তালাক দিতে পারি। স্ত্রী বললো, অগ্রাধিকার দেয়া সত্ত্বেও

দিন তা হারাম ঘোষণা করা হয়। দুই, মক্কা বিজয়ের সময় আওতাসের যুদ্ধ চলাকালে তা তিন দিনের জন্য হালাল করা হয়েছিলো। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম করা হয়েছে। রাফেযীগণ (শিয়া) মুতআ বিবাহ এখনো জায়েয মনে করে। তারা এই বিবাহ জায়েয সম্পর্কিত হাদীসগুলো নিজেদের মতের সমর্থনে গ্রহণ করেছে (অনুবাদক)।

আমি তোমার সংসারে থেকে যাওয়াই পছন্দ করি। অতএব তিনি নিজ স্ত্রীকে রেখে দিলেন। রাবী ইবনে শিহাব (র) বলেন, দ্বিতীয় স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দেয়া সত্ত্বেও প্রথম স্ত্রী যখন তার সংসারে থেকে যাওয়াকে বেছে নিলো, তখন রাফে (রা) এই অগ্রাধিকার দেয়াকে গুনাহ মনে করেননি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ ব্যাপারে এক স্ত্রী সম্মত হলে অপর স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দেয়ায় কোন দোষ নেই। তবে স্ত্রী তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হয়। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ লিআন-এর বর্ণনা।

৫৮৮- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَاَتَهُ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْتَفٰى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْاَةِ .

৫৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানায় নিজ স্ত্রীর সাথে লিআন করে এবং তার সন্তান অস্বীকার করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন এবং সন্তানকে স্ত্রীর সাথে মিলিত করলেন।[১২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। কোন ব্যক্তি সন্তান অস্বীকার করলে এবং স্ত্রীর সাথে লিআন করলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে হবে এবং সন্তান স্ত্রীকে দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

---

১২. লিআন (لعان) শব্দের অর্থ 'অভিশাপযুক্ত শপথ।' স্বামী যদি স্ত্রীর উপর যেনার অভিযোগ আনে অথবা সন্তানকে এই বলে অস্বীকার করে যে, এ সন্তান তার ঔরসজাত নয় এবং এর সপক্ষে কোন চাক্ষুস সাক্ষ্য-প্রমাণও না থাকে, অপরদিকে স্ত্রীও যদি তার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে—এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অথবা যে কোন একজনকে নিজ দাবির সমর্থনে বিচারকের সামনে নির্দিষ্ট পন্থায় শপথ করতে হয়। এই শপথকে ফিক্‌হের পরিভাষায় লিআন (অভিশাপযুক্ত শপথ) বলে। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ . وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ . وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ . وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

"আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে (যেনার) অভিযোগ তোলে এবং তাদের কাছে তাদের নিজেদের ছাড়া অপর কোন সাক্ষী না থাকে, তাহলে তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির সাক্ষ্য (এই যে, সে) চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, সে যদি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার উপর

২১. অনুচ্ছেদ ঃ তালাক দিয়ে বিদায় দেয়ার সময় কিছু মালপত্র দেয়া উচিৎ।

৫৮৯- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ اِلاَّ الَّتِىْ تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .

৫৮৯। ইবনে উমার (রা) বলেন, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারী কিছু মালপত্র পাবে। তবে যে নারীর মুহর নির্ধারণ করা হয়েছে–কিন্তু সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়েছে–সে নির্ধারিত মুহরের অর্ধেক পাবে (অতিরিক্ত কিছু পাবে না)।[১৩]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। অতিরিক্ত কিছু মাল দেয়া স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এজন্য তাকে চাপ দেয়াও যাবে না। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক। স্ত্রীকে যদি সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয় এবং তার জন্য মুহর নির্ধারণ করা না হয়ে থাকে তবে এক্ষেত্রে কিছু মাল আইনের আশ্রয় নিয়ে আদায় করা যাবে। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে বাড়িতে ব্যবহার্য স্ত্রীর কাপড়-চোপড়, ওড়না, জামা ইত্যাদি। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ ইদ্দাত চলাকালে রূপচর্চা করা মাকরূহ।

৫৯০- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ اَبِىْ عُبَيْدٍ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِىَ حَادٌّ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتّٰى كَادَتْ عَيْنَاهَا اَنْ تَرْمَصَ .

আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এভাবে রহিত হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিবে যে, এই ব্যক্তি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, এই দাসীর উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হোক–যদি সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়" (সূরা নূর ঃ ৬-৯)।

লিআন করার পর বৈবাহিক সম্পর্কের পরিণতি কি হবে? ইমাম শাফিঈর মতে, স্বামী যে মুহূর্তে লিআন করা শেষ করবে–ঠিক তখনই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, স্ত্রী লিআন করুক আর নাই করুক। ইমাম মালেক (র)-র মতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের লিআন শেষ হওয়ার পর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে, লিআন দ্বারা সরাসরি বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না। বরং আদালত কর্তৃক বিচ্ছেদ করলেই কেবল বিচ্ছেদ হয়। স্বামী নিজে তালাক দিলেই উত্তম। অন্যথায় বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘোষণা করবেন।

ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও আবু ইউসুফের মতে, যে স্বামী-স্ত্রী লিআনের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হয়েছে–তারা চিরদিনের জন্য পরস্পরের প্রতি হারাম। তারা পুনরায় কখনো পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদের মতে, স্বামী যদি নিজের অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করে নেয় এবং "যেনার মিথ্যা অপবাদের" শাস্তি ভোগ করে, তাহলে তারা পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। অন্যথায় পুনর্বার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম (অনুবাদক)।

১৩. **তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ ঃ** যে সকল তালাকপ্রাপ্তা নারীকে ইদ্দাত পালন করতে হয় না তারা তালাকদাতা স্বামীর নিকট থেকে খোরপোষ ও বাসস্থান প্রাপ্তির অধিকারী হয় না। কারণ তারা তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পরপরই অপর পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু যে সকল

তালাকপ্রাপ্তা নারীকে ইদ্দাত পালন করতে হয় তারা ইদ্দাতের মেয়াদকালের জন্য তাদের তালাকদাতা স্বামীর নিকট থেকে খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ .

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বসবাস করো, তাদেরকেও তথায় বসবাস করতে দাও। তাদেরকে সংকটে ফেলবার জন্য উত্যক্ত করো না। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করো। তারা যদি তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করায় তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দাও" (সূরা তালাক ঃ ৬)।

মহানবী (স) বলেন ঃ তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দাতকাল পর্যন্ত খোরপোষ পাবে (হিদায়া, ২য় খণ্ড)।

হযরত উমার ফারূক (রা) তার খেলাফতকালে এই ফরমান জারী করেন যে, তালাকপ্রাপ্তা নারী তার ইদ্দাতকাল পর্যন্ত তার তালাকদাতা স্বামীর নিকট থেকে খোরপোষ ও বাসস্থান পাবার অধিকারী হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) তথা হানাফী মাযহাবমতে তালাকপ্রাপ্তা নারী তার ইদ্দাতকাল পর্যন্ত খোরপোষ ও বাসস্থান পাবার অধিকারী হবে (কুরতুবীর আহ্‌কামুল কুরআন, ১খ, পৃ. ১৬৭)।

তালাকের মাতা ঃ কোন স্ত্রীলোককে তালাক দেয়ার পর যে 'উপহার সামগ্রী' প্রদান করা হয় তাকে পরিভাষায় 'মাতা' বলে। উপহার সামগ্রী বা মাতা (متعة) পাবে সেইসব তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক যাদেরকে নির্জনে মিলনের পূর্বে তালাক দেয়া হয়েছে এবং পূর্বে মাহর (মোহরানা) নির্ধারিত করা হয়নি। যাদের সাথে নির্জনে মিলন হয়নি কিন্তু পূর্বে মাহর নির্ধারিত করা হয়েছে অথবা নির্জনে মিলনও হয়েছে এবং মাহরও নির্ধারিত করা হয়েছে তাদেরকে "মাতা" অর্থাৎ উপহার সামগ্রী প্রদান স্বামীর জন্য বাধ্যকর নয়, তবে সে ভদ্রতা, মানবিকতা ও সৌজন্যের খাতিরে তা প্রদান করতে পারে। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ .

"তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার এবং মাহর ধার্য করার পূর্বে যদি তালাক দাও তবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। তাদেরকে কিছু (মাতা) দেয়া তোমাদের কর্তব্য। সচ্ছল ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী (মাতা) প্রদান করবে। এটা সৎকর্মশীল লোকদের কর্তব্য" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৬)।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ .

"যেসব স্ত্রীলোককে তালাক দেয়া হয়েছে তাদেরকে প্রথামতো কিছু প্রদান করে বিদায় করা উচিৎ। এটা মুত্তাকী লোকদের কর্তব্য" (সূরা বাকারা ঃ ২৪১)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا .

"হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিনা নারীগণকে বিবাহ করে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দাত নেই, যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী (মাতা') দিবে এবং ভদ্রতার সাথে তাদেরকে বিদায় দিবে" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৪৯)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তোমার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু সামগ্রী (মাতা') প্রদান করো, তা অর্ধ সা' (পৌণে দুই সের) খেজুরই হোক না কেন" (জুমউল জাওয়ামে, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬, দ্র. বায়হাকী)।

এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করলে মহানবী ﷺ তাকে বলেন ঃ "তুমি তোমার তালাক দেয়া স্ত্রীকে উপহার সামগ্রী (মাতা) দেয়ার মতো যদি কিছু না পাও তবে তোমার মাথার টুপিটি তাকে দিয়ে দাও" (কুরতবী, আল-জামে লি-আহ্‌কামিল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২)।

অতএব কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে তালাকপ্রাপ্তাকে মাতা' বা মুতা (উপহার সামগ্রী) দেয়ার যে নির্দেশ রয়েছে তা সম্পূর্ণ সাময়িক, অস্থায়ী, কোন স্থায়ী আর্থিক দায় নয়। আরবী ভাষার সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ "লিসানুল আরাব" গ্রন্থে তালাকপ্রাপ্তাকে দেয় মাতা' বা সামগ্রীর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ মাতার অর্থ 'এমন প্রত্যেক বস্তু যার দ্বারা উপকার লাভ করা যায়' (كُلُّ مَا انْتُفِعَ بِهِ فَهُوَ مَتَاعٌ। اَلْمَتَاعُ الزَّادُ الْقَلِيْلُ) "মাতা হলো সামান্য পাথেয়" (৬খ, পৃ. ৪১২৭, কলাম ২)।
যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا قَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ .

"হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো সামান্য উপভোগের বস্তু এবং আখেরাতই চিরস্থায়ী আবাস" (সূরা মুমিন ঃ ৩৯)।

"মাতআতুল মারআ" বলা হয় তালাকের পর তাকে যা দেয়া হয় তাকে।"

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে তালাকপ্রাপ্তাকে যে মাতা (বস্তুসামগ্রী) দেয়ার কথা বলেছেন তা দুই প্রকার ঃ একটি বাধ্যতামূলক এবং অপরটি ঐচ্ছিক বা মুস্তাহাব। যে নারীর বিবাহের সময় মাহর নির্ধারিত হয়নি এবং স্বামীর সাথেও নির্জনবাস হয়নি, তাকে ঐ অবস্থায় তালাক প্রদান করা হলে কিছু বস্তুসামগ্রী প্রদান করা তালাকদাতা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক, যার দ্বারা সে উপকৃত হতে পারে। যেমন পরিধেয় বস্ত্র, নগদ অর্থ, খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি। আর যে মাতা বা বস্তুসামগ্রী প্রদান তালাকদাতা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক নয় তা এই যে, কোন ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করার সময় মাহর ধার্য করলো, অতঃপর নির্জনবাসের আগে বা পরে তাকে তালাক দিয়েছে, তাকে অর্ধেক বা পূর্ণ মাহর প্রদানের পর সৌজন্যমূলকভাবে অতিরিক্ত যা প্রদান করে তা হলো মাতা। আবদুর রহমান (রা) তার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর তাকে উপহার সামগ্রী (متاع) হিসেবে একটি ক্রীতদাসী প্রদান করেন।

খৃস্টান অভিধানবেত্তা ইলয়াস আনতুন ইলয়াস তার সুবিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ আল-মুনজিদে লিখেছেন ঃ

مَتْعَةُ الْمَرْاَةِ وُصِلَتْ بِهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ مِنْ نَحْوِ الْقَمِيْصِ وَالْاِزَارِ وَالْمُلْحَفَةِ وَهِيَ مَتْعَةُ الطَّلَاقِ .

"মাতা বা মুতা শব্দের অর্থ উপকার সাধন, সামান্য পুঁজি। আর স্ত্রীলোকের মাতা হলো জামা, পাজামা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু যা তালাকের পর তাকে প্রদান করা হয় এবং একে বলে তালাকের মাতা" (আল-মুনজিদ, পৃ. ৭৪৫; মুজাম লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ৪০৩)।

ইমাম রাযী (র) লিখেছেন, মাতা বা মুতা উপকার লাভের এমন বিষয় যার উপকারিতা সাময়িক, বেশি দিন অবশিষ্ট থাকে না, অতি সত্বর নিঃশেষ হয়ে যায় (তাফসীর কবীর, ২খ, পৃ. ৪০৭)।

ইবনে উমার (রা) বলেন, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারী কিছু উপহার সামগ্রী (মুতআ) পাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হলে এবং তার মাহর ধার্য না হয়ে

৫৯০। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবু উবাইদের কন্যা সাফিয়্যার চোখে অসুখ হয়েছিল। তিনি তখন (স্বামী) আবদুল্লাহর মৃত্যুতে শোক পালন করছিলেন। তিনি চোখে সুরমা ব্যবহার করেননি। এমনকি তার চোখ ময়লায় ভরে গিয়েছিল।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইদ্দাত চলাকালে সাজসজ্জার উদ্দেশ্যে সুরমা ব্যবহার করবে না এবং সুগন্ধিও লাগাবে না। কিন্তু সাদা কোন জিনিস ব্যবহারে দোষ নেই। কেননা তা সাজসজ্জা করার জন্য নয়। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

٥٩١- عَنْ حَفْصَةَ اَوْ عَائِشَةَ اَوْ عَنْهُمَا جَمِيْعًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ.

৫৯১। উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) অথবা আয়েশা (রা) অথবা উভয়ের সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ঈমান আনয়নকারী কোন নারীর পক্ষে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। কিন্তু স্বামীর বেলায় এর ব্যতিক্রম আছে।

থাকলে এক্ষেত্রে উপহার সামগ্রী প্রদান বাধ্যতামূলক, অন্য সব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়। এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো- বাড়িতে ব্যবহার্য স্ত্রীর কাপড়-চোপড়, ওড়না, জামা ইত্যাদি। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতও তাই।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তালাকদাতা স্বামী তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোষ তার ইদ্দাতকাল সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত বহন করতে বাধ্য। এ বিষয়ে সকল মাযহাবের সকল যুগের আইনবেত্তা ফকীহগণ একমত।

ইসলামী আইনে প্রত্যেক বালেগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তারা নিজেরাই বহন ও পালন করবে, সে নারী হোক অথবা পুরুষ। প্রত্যেকের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার নিজের উপর বর্তায়। কেবল ব্যতিক্রম এই যে, স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণের এবং অভিভাবক তার অধীনস্তদের ভরণপোষণের জন্য দায়ী, অধীনস্তগণ বালেগ ও আত্মনির্ভরশীল না হওয়া পর্যন্ত। এ সমাজে পিতা-মাতা যেমন বালেগ পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ করতে বাধ্য নয়, তেমন তালাকদাতা স্বামীও তার পরিত্যক্তা স্ত্রীর ভরণপোষণ করতে বাধ্য নয়। বিবাহ বন্ধন যেমন দুইজন নারী-পুরুষকে স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের সৃষ্টি করে, তেমনি তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন করে তাদেরকে বিবাহের পূর্বের অবস্থায় নিয়ে যায় এবং তারা দুইজন সম্পর্কহীন দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে পরিণত হয় এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। এমনকি তালাকদাতা স্বামী ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে পরস্পর সংগমক্রিয়ায় লিপ্ত হলে ইসলামী দণ্ডবিধি মোতাবেক মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ভোগ করবে।

অবশ্য তালাকপ্রাপ্তা অসহায় হলে তার জন্য সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হবে। এক ব্যক্তি তার সৎমাতাকে বিবাহ করলে উমার (রা) তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দেন এবং বলেন, কে এই নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করতে সম্মত আছে? আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তার ভরণপোষণের ভার নিলেন এবং তাকে নিজের একটি বসতবাড়ি ছেড়ে দিলেন (আল-ইসাবা, ৩খ, পৃ. ৪৬৩; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৭খ, পৃ. ৪৩২, কলাম ১) (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। স্ত্রীর জন্য এটাই উপযুক্ত যে, ইদ্দাত চলাকালে স্বামীর জন্য শোক প্রকাশ করবে এবং ইদ্দাত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত রূপচর্চার জন্য তৈল ও সুরমা ব্যবহার করবে না। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর অথবা তালাকের ইদ্দাত চলাকালে স্বামীর বাড়ির বাইরে স্ত্রীর যাওয়া সম্পর্কে।

٥٩٢ – عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ اَلْبَتَّةَ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَرْسَلَتْ عَائِشَةُ اِلَى مَرْوَانَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ اتَّقِ اللّٰهَ وَارْدُدِ الْمَرْاَةَ اِلَى بَيْتِهَا فَقَالَ مَرْوَانُ فِيْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ اِنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ غَلَبَنِيْ وَقَالَ فِيْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ اَوَمَا بَلَغَكِ شَاْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ عَائِشَةُ لَا يَضُرُّكَ اَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ قَالَ مَرْوَانُ اِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ .

৫৯২। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ এবং সুলায়মান ইবনে ইয়াসারকে আলোচনা করতে শুনেছেন যে, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (নিজ স্ত্রী) আবদুর রহমান ইবনুল হাকামের কন্যাকে তিন তালাক দিলেন। আবদুর রহমান তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আয়েশা (রা) মদীনার গভর্নর মারওয়ানকে বলে পাঠালেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং মেয়েটিকে তালাকদাতা স্বামীর বাড়ীতে ফেরত পাঠাও। সুলায়মানের বর্ণনায় আছে, মারওয়ান বলে পাঠালেন, আবদুর রহমানকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। আসেমের বর্ণনায় আছে, মারওয়ান বললেন, আপনি কি ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঘটনা অবহিত নন? আয়েশা (রা) বলেন, ফাতিমার হাদীস বর্ণনা না করলে তোমার কোন ক্ষতি ছিলো না। মারওয়ান বলেন, স্বামীর বাড়ী থেকে ফাতিমার চলে যাওয়ার কারণ যদি উভয়ের পরিবারের মধ্যে বিরাজমান ঝগড়া হয়ে থাকে–তাহলে সেই একই কারণ এখানেও বিদ্যমান আছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। স্বামী স্ত্রীকে যে ঘরে তালাক দিয়েছে অথবা যে ঘরে স্বামী মারা গেছে–ইদ্দাত চলাকালে সেই ঘর থেকে তার বের হওয়া নিষেধ–তা এক তালাক হোক অথবা একাধিক তালাক। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

٥٩٣- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَةَ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ نُفَيْلٍ طَلَّقَتِ الْبَتَّةَ فَانْتَقَلَتْ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ .

৫৯৩। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে নুফাইলের কন্যাকে মুগাল্লাযা তালাক দেয়া হলো। তাকে সেই (তালাক দেয়া) ঘর থেকে সরিয়ে নেয়া হলো। ইবনে উমার (রা) এটা অপছন্দ করলেন।

٥٩٤- عَنِ الْفُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ اُخْتُ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَسْاَلُهُ اَنْ تَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِهَا فِيْ بَنِيْ خُدْرَةَ فَاِنَّ زَوْجِيْ خَرَجَ فِيْ طَلَبِ اَعْبُدٍ لَهُ اَبَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانَ بِطَرْفِ (بِطَرِيْقِ) الْقَدُوْمِ اَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوْهُ قَالَتْ فَسَئَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَاْذَنَ لِيْ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى اَهْلِيْ فِيْ بَنِيْ خُدْرَةَ فَاِنَّ زَوْجِيْ لَمْ يَتْرُكْنِيْ فِيْ مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ فَقَالَ نَعَمْ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ بِالْحُجْرَةِ دَعَانِيْ اَوْ اَمَرَ مَنْ دَعَانِيْ فَدُعِيْتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِيْ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ امْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ اَمْرُ عُثْمَانَ اَرْسَلَ اِلَيَّ فَسَئَلَنِيْ عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ فَاتَّبَعَهُ وَقَضٰى بِهِ .

৫৯৪। মালেক ইবনে সিনানের কন্যা এবং আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র বোন ফুরাইআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার বাপের বাড়ী ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। (তিনি বলেন), কেননা আমার স্বামী আমাদের পালিয়ে যাওয়া কয়েকটি গোলামের খোঁজে বাইরে গিয়েছিলেন। আল-কাদূম নামক এলাকার কাছাকাছি তিনি যখন তাদের প্রায় ধরে ফেলছিলেন তখন তারা তাকে হত্যা করে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার বাপের বাড়ী খুদরা গোত্রে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করি। কেননা আমার স্বামী তার মালিকানায় আমার বসবাসের জন্য কোন ঘর এবং খোরপোষ রেখে যাননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "হাঁ, তুমি যেতে পারো"। অতএব আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওয়ানা হলাম। আমি কেবল হুজরা থেকে বের হয়েছি এমন সময় তিনি আমাকে ডাকলেন অথবা আমাকে ডাকার জন্য কাউকে নির্দেশ দিলেন। অতএব আমাকে ডাকা হলো। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি কি বলেছিলে? আমি তার সামনে পূর্বের ঘটনা পুনরায় ব্যক্ত করলাম। তিনি বলেন ঃ "নিজ ঘরে অবস্থান করো ইদ্দাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত।" রাবী বলেন, অতএব আমি সেই ঘরে (স্বামীর

ঘরে) চার মাস দশ দিন ইদ্দাত পালন করলাম।[১৪] রাবী আরো বলেন, উছমান (রা) তার খিলাফতকালে আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং এই বিষয়ে আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাকে বিষয়টি আদ্যপান্ত অবহিত করি। তিনি এই বিষয়টির অনুসরণ করেন এবং তদনুযায়ী (এই জাতীয় ঘটনার) ফয়সালা দিতেন।

٥٩٥- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْاَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِيْ بَيْتٍ بِكَرَاءٍ عَلٰى مَنِ الْكِرَاءُ قَالَ عَلٰى زَوْجِهَا قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا قَالَ فَعَلَيْهَا قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا قَالَ فَعَلَى الْاَمِيْرِ .

৫৯৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তার কাছে এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তার স্বামী যখন তাকে তালাক দেয়, তখন সে ভাড়া বাড়িতে ছিল। এখন এ বাড়ির ভারা কে দিবে–স্বামী না স্ত্রী? সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, স্বামীকে ভাড়ার খরচ বহন করতে হবে। লোকেরা বললো, ভাড়া পরিশোধ করার সামর্থ্য যদি স্বামীর না থাকে? তিনি বলেন, তাহলে স্ত্রী তা পরিশোধ করবে। তারা আবার বললো, সেও যদি অসমর্থ হয়? তিনি বলেন, তাহলে সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি ভাড়া পরিশোধ করবে।

٥٩٦- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ فِيْ مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وكَانَ طَرِيْقُهُ فِيْ حُجْرَتِهَا فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيْقَ الْاُخْرٰى مِنْ اَدْبَارِ الْبُيُوْتِ اِلَى الْمَسْجِدِ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّسْتَاْذِنَ عَلَيْهَا حَتّٰى رَاجَعَهَا .

৫৯৬। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) তার স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা)-র ঘরে তালাক দেন। তার ঘরের মধ্য দিয়ে (ইবনে উমারের) মসজিদে যাওয়ার পথ ছিল। ইবনে উমার (রা) ঐ ঘরের পিছন দিয়ে অন্য পথে মসজিদে যেতেন। কেননা তিনি স্ত্রীকে রুজু করার পূর্বে তার অবস্থানের ঘরের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করার অনুমতি চাওয়া পছন্দ করেননি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। স্বামী স্ত্রীকে যে বাড়িতে তালাক দিয়েছে ইদ্দাত চলাকালে সেখান থেকে তার বের হওয়া উচিৎ নয়–তা বায়েন

---

১৪. কিন্তু ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা)-র হাদীস থেকে জানা যায়, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য বাসগৃহ ও খোরপোষের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেননি। ফাতিমা (রা) তা দাবি করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন (বুখারী, মুসিলম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ)। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, ফাতিমা (রা)-র এই বর্ণনা সাহাবীগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই ফাতিমার এই বর্ণনাটির উপর নির্ভর করা যায় না। অথবা তার বাসস্থান ও খোরপোষের ব্যবস্থা না করার পিছনে কোন ওজর অথবা বিশেষ কোন কারণ নিহিত ছিলো। আবার কেউ বলেছেন, তার ঘর ছিলো জংগলময় স্থানের পাশে। হিংস্র জন্তুর ভয় থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অন্যত্র গিয়ে ইদ্দাত পালনের অনুমতি দেন (অনুবাদক)।

তালাকই হোক অথবা রিজঈ তালাকই হোক অথবা স্বামী মারা গিয়েই থাকুক। ঐ বাড়ীতেই তাকে ইদ্দাত পূর্ণ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের মাযহাবের ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মে অলাদের ইদ্দাত।[১৫]

٥٩٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ عِدَّةُ اُمِّ الْوَلَدِ اِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ

৫৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, উম্মে অলাদের মনিব মারা গেলে তাকে এক হায়েযকাল ইদ্দাত পালন করতে হবে।

٥٩٨- عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَالَ عِدَّةُ اُمِّ الْوَلَدِ ثَلٰثُ حَيْضٍ .

৫৯৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে অলাদের ইদ্দাত তিন হায়েযকাল।

٥٩٩- عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ اَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ سُئِلَ عَنْ عِدَّةِ اُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ لاَ تَلْبِسُوْا عَلَيْنَا فِىْ دِيْنِنَا اِنْ تَكُ اَمَةً فَاِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ .

৫৯৯। আমর ইবনুল আস (রা)-কে উম্মে অলাদের ইদ্দাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে আমার দীনের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। যদিও সে বাঁদী, কিন্তু তার ইদ্দাতকাল স্বাধীন মহিলাদের ইদ্দাতকালের সমান।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। উম্মে অলাদের ইদ্দাতকাল স্বাধীন মহিলাদের ইদ্দাতকালের সমান। ইমাম আবু হানীফা, ইবরাহীম নাখঈ এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এই মত।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল-খালিয়্যাতু বা এই জাতীয় শব্দ প্রয়োগে তালাক দেয়া।

٦٠٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ ثَلٰثُ تَطْلِيْقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا .

৬০০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, আল-খালিয়্যাতু ও আল-বারিয়্যাতু শব্দদ্বয়ের প্রতিটির দ্বারা তিন তালাক অবতীর্ণ হয়।

---

১৫. যে বাঁদীর সাথে তার মালিক সহবাস করেছে এবং তার পেটে তার ঔরসজাত বাচ্চা হয়েছে–সেই বাদীকে 'উম্মে অলাদ' (সন্তানের মা) বলে। মালিকের মৃত্যুর পর এ ধরনের বাঁদী আপনা আপনি আযাদ হয়ে যায় (অনুবাদক)।

٦٠١ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ تَحْتَهُ وَلِيْدَةٌ فَقَالَ لِاَهْلِهَا شَأْنُكُمْ بِهَا قَالَ الْقَاسِمُ فَرَاى النَّاسُ اَنَّهَا تَطْلِيْقَةٌ .

৬০১। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক ব্যক্তির বিবাহাধীনে একটি বাঁদী ছিল। সে বাঁদীর মালিক পরিবারকে বললো, তোমরা জানো, তোমাদের কাজ জানে। রাবী বলেন, লোকেরা এটাকে এক তালাক মনে করলো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি খালিয়্যা (খালি করে দেয়া), বারিয়্যা (মুক্ত করে দেয়া) ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তিন তালাকের নিয়াত করলে তিন তালাকই হয়ে যাবে। কিন্তু এক অথবা দুই তালাকের নিয়াত করলে অথবা কিছু নিয়াত না করলে এক বায়েন তালাক হবে–স্ত্রীর সাথে সহবাস করুক বা না করুক। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এই মত।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তাত সম্পর্কে সন্দেহ হলে।

٦٠٢ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ امْرَاَتِىْ وَلَدَتْ غُلاَمًا اَسْوَدَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فِيْمَا كَانَ ذٰلِكَ قَالَ اُرَاهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ .

৬০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক গ্রাম্য বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললো, আমার স্ত্রী কালো চেহারার একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমার কি উট আছে? সে বললো, হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ "এগুলোর বর্ণ কি?" সে বললো, লাল। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার মধ্যে মেটে বর্ণের উটও আছে কি?" সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ "তা কেন?" সে বললো, কোন শিরা তা টেনে এনেছে হয়তো (উর্ধতন বংশের প্রভাব)। তিনি বলেন ঃ "তোমার সন্তানকেও হয়তো শিরায় টেনেছে।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ জাতীয় সন্দেহ-সংশয়ের ভিত্তিতে সন্তান অস্বীকার করা যায় না।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর আগে স্ত্রী মুসলমান হলে।

٦٠٣ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اُمَّ حَكِيْمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ اَبِىْ جَهْلٍ فَاَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَخَرَجَ عِكْرِمَةُ هَارِبًا مِّنَ الْاِسْلاَمِ حَتّٰى قَدِمَ

الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيْمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ فَقَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا وَرَمَا عَلَيْهِ رِدَاءَهُ حَتَّى بَايَعَهُ.

৬০৩। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। হারিছ ইবনে হিশাম-কন্যা উম্মে হাকীম (রা) আবু জাহলের পুত্র ইকরামার স্ত্রী ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ইকরামা ইসলাম থেকে পলায়ন করে ইয়ামানে চলে যান। উম্মে হাকীম (রা) ইয়ামান রওনা হলেন এবং তার কাছে গিয়ে পৌছলেন। তিনি স্বামীকে ইসলামের দিকে আহবান করলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, অতঃপর নবী ﷺ-এর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। নবী ﷺ তাকে দেখে আনন্দিত মনে তার দিকে দৌড়ে এলেন এবং তার উপর নিজের চাদর নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর তাকে বাইআত করলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে এবং স্বামী কাফের অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রে থেকে গেলে, তাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ করবে না। বরং তার সামনে দীন ইসলামকে পেশ করতে হবে। যদি সে ইসলাম কবুল করে তাহলে সে তার স্ত্রী হিসাবেই থেকে যাবে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাদের বিবাহ ভেংগে দিতে হবে। আর এটা এক বায়েন তালাক গণ্য হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইবরাহীম নাখঈর এই মত।

٦٠٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حِيْنَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَتْ صَدَقَ عُرْوَةُ وَقَدْ جَادَلَهَا فِيْهِ نَاسٌ وَقَالُوا إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ فَقَالَتْ صَدَقْتُمْ وَتَدْرُوْنَ مَا الْأَقْرَاءُ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ.

৬০৪। আয়েশা (রা) বলেন, আবদুর রহমান কন্যা (ও মুনযিরের স্ত্রী) হাফসার যখন তৃতীয় হায়েয শুরু হলো, তখন সে ইদ্দাত পালন থেকে উঠে গেলো। আমি (যুহরী) আবদুর রহমান-কন্যা আমরার কাছে ব্যাপারটি উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, উরওয়া ঠিকই বলেছেন (রিওয়ায়াত করেছেন)। লোকেরা আয়েশা (রা)-র সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো এবং বললো, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 'তিন কুরূ পর্যন্ত বিরত রাখতে হবে'। আয়েশা (রা) বলেন, তোমরা সত্যিই বলেছো। কিন্তু তোমরা জানো কুরূ কি? কুরূ বলতে তুহর (পবিত্র অবস্থা) বুঝায়।

٦٠٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ.

৬০৫। আবু বাক্র ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল হারিছ (র) থেকে বর্ণিত। তিনিও এরূপ বলতেন (কুরূ অর্থ তুহর)।

٦٠٦- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ الْاَحْوَصُ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ ثُمَّ مَاتَ حِيْنَ دَخَلَتْ فِى الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَتْ اَنَا وَارِثَتُهُ وَقَالَ بَنُوْهُ لاَ تَرِثِيْنَهُ (لاَ تَرِثُهُ) فَاخْتَصَمُوْا اِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ فَسَئَلَ مُعَاوِيَةُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَنَاسًا مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ عِلْمًا فِيْهِ فَكَتَبَ اِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَكَتَبَ اِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّهَا اِذَا دَخَلَتْ فِى الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَاِنَّهَا لاَ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا وَقَدْ بَرَاَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا .

৬০৬। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। আল-আহওয়াস নামে সিরিয়ার এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তালাক দেয়। তার তৃতীয় হায়েয শুরু হওয়ার পর লোকটি মারা গেলো। মহিলাটি তখন বললো, আমি তার ওয়ারিস। আল-আহওয়াসের ছেলেরা বললো, আপনি তার ওয়ারিস হতে পারেন না। তারা নিজেদের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য তা আমীর মুআবিয়া (রা)-র দরবারে উথাপন করলো। মুআবিয়া (রা) ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা)-র কাছে এবং সিরিয়ার কতিপয় লোকের কাছে এর সমাধান জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু এ সম্পর্কিত মাসআলার কোন সদুত্তর তাদের কাছে পাননি। অতঃপর তিনি বিষয়টি যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-কে লিখে জানান। যায়েদ (রা) উত্তরে লিখে পাঠান যে, তার যখন তৃতীয় হায়েয শুরু হয়ে গেছে তখন স্বামীর সাথেও তার কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকলো না এবং তার সাথে স্বামীরও কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকলো না। অতএব দু'জনের কেউই কারো ওয়ারিস হবে না।

٦٠٧-اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذٰلِكَ.

৬০৭। নাফে (র) ও ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে অনুরূপ কথাই বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে তৃতীয় হায়েয থেকে পাক হয়ে যাওয়ার এবং গোসল করার পরই ইদ্দাতের মেয়াদ শেষ হয়।

٦٠٨- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَاَتَهُ تَطْلِيْقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّٰى انْقَطَعَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَدَخَلَتْ مُغْتَسِلَهَا وَاَدْنَتْ مَاءَهَا فَاَتَاهَا فَقَالَ لَهَا قَدْ رَجَعْتُكِ فَسَئَلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ ذٰلِكَ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ عُمَرُ قُلْ فِيْهَا بِرَاْئِكَ فَقَالَ اَرَاهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَحَقَّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَقَالَ عُمَرُ وَاَنَا اَرٰى ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ كُنَيْفٌ مُلِيْءٌ عِلْمًا .

৬০৮। ইবরাহীম নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিলো, অতঃপর তাকে এই অবস্থায় রেখে দিলো। এমনকি তার তৃতীয় হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সে গোসল করতে গেলো এবং তার পানির নিকটবর্তী হলো। এ সময় তার স্বামী এসে বললো, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম। স্ত্রীলোকটি এ সম্পর্কে উমার (রা)-র কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করলো। তখন তার কাছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। উমার (রা) তাকে বলেন, তোমার রায় বলো। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! তৃতীয় হায়েয শেষ হওয়ার পর গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত সে তাকে রুজু করতে পারবে। উমার (রা) বলেন, আমারও এই মত। অতঃপর উমার (রা) ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলেন, তুমি জ্ঞানে পরিপূর্ণ একটি ঘর।

٦٠٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ هُوَ اَحَقُّ بِهَا حَتّٰى تَغْتَسِلَ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ .

৬০৯। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, আলী (রা) বলেছেন, তৃতীয় হায়েয শেষ হওয়ার পর গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার অধিকারী।

٦١٠- عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ ثَلٰثَةَ عَشَرَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ قَالُوا الرَّجُلُ اَحَقُّ بِامْرَاَتِهِ حَتّٰى تَغْتَسِلَ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ قَالَ عِيْسَى بْنُ اَبِىْ عِيْسٰى وَسَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ الرَّجُلُ اَحَقُّ بِامْرَاَتِهِ حَتّٰى تَغْتَسِلَ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ .

৬১০। ইমাম শাবী (র) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ১৩ জন সাহাবী সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তারা সকলে বলেন, তৃতীয় হায়েয শেষ হওয়ার পর গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার অধিকারী। ঈসা ইবনে আবু ঈসা আল-খায়্যাত (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবকে বলতে শুনেছি, তৃতীয় হায়েয থেকে পাক হওয়ার পর গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে রুজু করতে পারে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের অধিকাংশ ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।[১৬]

---

১৬. কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ .

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকেরা তিন কুরূ পর্যন্ত নিজেদের (পুনর্বিবাহ থেকে) বিরত রাখবে" (সূরা বাকারাঃ ২২৮)। কুরূ শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার কারণে আইনগত বিষয়ে ফিক্হবিদদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। অভিধানে শব্দটির অর্থ 'হায়েয' এবং 'তুহর' দু'টিই লেখা

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ এক রিজঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর এক বা দুই হায়েয হওয়ার পর হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে।

٦١١- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَدِّهِ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ وَكَانَتْ لَا تَحِيْضُ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّ بِهَا قَرِيْبٌ مِنْ سَنَةٍ ثُمَّ هَلَكَ زَوْجُهَا حَبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ اَوْ قَرِيْبٍ مِّنْ ذٰلِكَ وَلَمْ تَحِضْ فَقَالَتْ اَنَا اَرِثُهُ مَا لَمْ اَحِضْ فَاخْتَصَمُوْا اِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضٰى لَهَا بِالْمِيْرَاثِ فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ فَقَالَ هٰذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُوَ اَشَارَ عَلَيْنَا بِذٰلِكَ يَعْنِيْ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ .

৬১১। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তার দাদার অধীনে হাশিমী এবং আনসারী দু'জন মহিলা ছিলো। তিনি আনসারী স্ত্রীকে তালাক দিলেন। তখন তার কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলো। এ কারণে তার হায়েয হতো না। এভাবে এক বছর কেটে গেলো, কিন্তু তার হায়েয হলো না। এর মধ্যে তার স্বামী হাব্বান ইন্তেকাল করলো। মহিলাটি বললো, হায়েয না আসা পর্যন্ত আমি তার ওয়ারিস হবো। বিষয়টি উছমান ইবনে আফ্ফান (রা)-র কাছে ফয়সালার জন্য পেশ করা হলো। তিনি তাকে স্বামীর ওয়ারিস সাব্যস্ত করলেন। এতে হাশিমী মহিলা উছমান (রা)-কে তিরস্কার করলো। তিনি স্ত্রীলোকটিকে বলেন, এটা তোমার চাচা আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র কর্মপন্থা। তিনিই এই মাসআলা বর্ণনা করেছেন।

٦١٢- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَيُّمَا امْرَاَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً اَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رُفِعَتْ حَيْضَتُهَا فَاِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ اَشْهُرٍ فَاِنِ اسْتَبَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذٰلِكَ وَاِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ ثَلٰثَةَ اَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ .

৬১২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, কোন স্ত্রীলোককে তালাক দেয়া হলো, অতঃপর এক অথবা দুই হায়েয হওয়ার পর তার রক্তস্রাব

আছে এবং হাদীসবেত্তাগণও দুই অর্থে বিভক্ত হয়েছেন। হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা 'হায়েয' অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাই তাদের মতে, রিজঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তৃতীয় হায়েয শেষ হওয়ার পর গোসল করার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী নিজের বিবাহাধীনে ফেরত নিতে পারবে। আর শাফিঈ ও মালেকী মাযহাবের লোকেরা শব্দটির 'তুহর' অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাই তাদের মতে, রিজঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তৃতীয় হায়েয শুরু হওয়ার পর স্বামী আর নিজের বিবাহাধীনে ফেরত নিতে (রুজু করতে) পারবে না। অনুচ্ছেদে এই মাসআলাটিই আলোচিত হয়েছে (অনুবাদক)।

বন্ধ হয়ে গেলো। সে নয় মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি তার অন্তঃসত্তা প্রকাশ পায়, তবে তদনুযায়ী ফয়সালা হবে। অন্যথায় সে এই নয় মাস গত হওয়ার পর আরো তিন মাস ইদ্দাত পালন করবে, অতঃপর (পুনর্বিবাহের জন্য) হালাল হবে।

٦١٣- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ طَلَّقَ امْرَاَتَهُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَحَاضَتْ حَيْضَةً اَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ مَاتَتْ فَسَئَلَ عَلْقَمَةُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ هٰذِهِ امْرَاَةٌ حَبَسَ اللّٰهُ عَلَيْكَ مِيْرَاثَهَا فَكُلْهُ .

৬১৩। ইবরাহীম নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত। আলকামা ইবনে কায়েস (র) তার স্ত্রীকে এক রিজঈ তালাক দিলেন। অতঃপর এক বা দুই হায়েয হওয়ার পর আঠার মাস পর্যন্ত তার হায়েয বন্ধ থাকে। অতঃপর সে মারা গেলো। আলকামা এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা এই মহিলার মাধ্যমে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তোমার জন্য ধরে রেখেছেন। অতএব তুমি তা খাও।

٦١٤- عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ سَئَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ ذٰلِكَ فَاَمَرَهُ بِاَكْلِ (بِاَكْلِهِ) مِيْرَاثِهَا .

৬১৪। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। আলকামা (র) এ বিষয়ে ইবনে উমার (রা)-র কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ করার অনুমতি দেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটা নয় মাসের চেয়ে অধিক সময় এবং এরপর তিন মাস। আমরা এটি (ইবনে মাসউদের মত) গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্হবিদের এই মত। কেননা কুরআন মজীদে চার ধরনের ইদ্দাতের বর্ণনা এসেছে। পঞ্চম প্রকারের কোন সুযোগ নেই। (১) গর্ভবতীর ইদ্দাত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত, (২) এখনো যার হায়েয আসেনি তার ইদ্দাত তিন মাস, (৩) যার হায়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে তার ইদ্দাতও তিন মাস এবং (৪) যার হায়েয হয় তার ইদ্দাত তিন হায়েয পর্যন্ত। আর তোমরা এই যা উল্লেখ করেছো তা হায়েযগ্রস্ত মহিলার ইদ্দাত নয় এবং অন্য কোন প্রকারের মহিলারও ইদ্দাত নয়।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ রক্তপ্রদর রোগিনীর ইদ্দাত।

٦١٥- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ .

৬১৫। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, রক্তপ্রদর রোগিনীর ইদ্দাতকাল এক বছর।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যে নিয়মে তার হায়েয হতো, এখানে অনুরূপ মেয়াদ বিবেচনা করতে হবে। ইবরাহীম নাখঈ এবং অপরাপর ফিক্‌হবিদ এ কথাই বলেছেন। আমরা এ মতের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এই মত। সত্য ঘটনা এই নয় কি যে, ঐ মহিলা নামাযের বেলায় উপরোক্ত নিয়মে হায়েযের সময় গণনা করে থাকে এবং নামায ছেড়ে দিয়ে থাকে? অনুরূপভাবে সে ঐ নিয়মেই ইদ্দাত পালন করবে। তিন হায়েয পরিমাণ সময় অতিবাহিত হলে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে—তা এক বছরের কম হোক আর বেশীই হোক।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ দুধপান সম্পর্কিত বর্ণনা।

٦١٦- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لاَ رَضَاعَةَ الاَّ لِمَنْ أَرْضَعَ فِي الصِّغْرِ .

৬১৬। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) বলতেন, শিশুকালে দুধপান করার মাধ্যমেই দুধপান সম্পর্কিত আত্মীয়তার সূচনা হয়।

٦١٧- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلاً يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ كَانَ عَمِّيْ فُلاَنًا مِّنَ الرَّضَاعَةِ حَيًّا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ نَعَمْ .

৬১৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে ছিলেন। তিনি শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি হাফসা (রা)-র ঘরে প্রবেশ করার জন্য তার কাছে অনুমতি চাচ্ছে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই ব্যক্তি আপনার ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সম্ভবত হাফসার অমুক রিদাই (দুধ সম্পর্কের) চাচা। আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার অমুক রিদাই চাচা জীবিত থাকলে সে কি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারতো? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

٦١٨- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ .

৬১৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ রক্ত সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, দুধ সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয় (বুখারী)।[১৭]

٦١٩- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا وَبَنَاتُ أَخِيْهَا وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ نِسَاءُ إِخْوَاتِهَا .

৬১৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যাদেরকে তার বোনেরা এবং ভাইয়ের মেয়েরা দুধ পান করিয়েছে, তারা সরাসরি তার কাছে প্রবেশ করতে পারতো। কিন্তু যাদেরকে তার ভাবীরা দুধ পান করিয়েছে, তারা তার কাছে প্রবেশ করতে পারতো না।

٦٢٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَهُمَا غُلاَمًا وَالْأُخْرَى جَارِيَةً فَسُئِلَ هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ قَالَ لاَ اللِّقَاحُ وَاحِدٌ .

৬২০। আমর ইবনুস শারীদ (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যার অধীনে দুই স্ত্রী ছিলো। তাদের একজন একটি বালককে এবং অপরজন একটি বালিকাকে দুধ পান করিয়েছিল। জিজ্ঞেস করা হলো, এই বালক কি ঐ বালিকাকে বিবাহ করতে পারবে? তিনি বলেন, না। কেননা একই ব্যক্তি উভয়ের দুধপিতা।

٦٢١- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَئَلَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ فَقَالَ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ (وَلَوْ) كَانَتْ مَصَّةٌ (قَطْرَةٌ) وَاحِدَةٌ فَهِيَ تُحَرِّمُ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ .

৬২১। ইবরাহীম ইবনে উকবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে দুধপান জনিত ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, দুই বছর বয়সের মধ্যে দুধপান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয়ে যায়, তার পরিমাণ এক ফোটাই হোক না কেন। দুই বছরের পর পান করলে তা হারাম হয় না। তখন তা খাদ্য হিসাবে গণ্য হয়।

٦٢٢- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَئَلَ (عَنْ) عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ .

---

১৭. রক্তসম্পর্ক এবং দুধসম্পর্ক সম্পূর্ণ এক নয়। যেমন দুধবোনের মা, দুধপুত্রের বোন, দুধ বাপের অপর স্ত্রী এবং দুধপুত্রের স্ত্রী হারাম নয় (অনুবাদক)।

৬২২। ইবরাহীম ইবনে উকবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এই একই বিষয় উরওয়া ইবনুয যুবায়েরের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের অনুরূপ জওয়াব দিলেন।

٦٢٣- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُوْلُ مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ وَاِنْ كَانَتْ مَصَّةً وَّاحِدَةً فَهِىَ تُحَرِّمُ .

৬২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, দুই বছর বয়সসীমার মধ্যে একবার স্তন চুষলেও দুধপান জনিত হুরমাত সাব্যস্ত হবে।

٦٢٤- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَرْسَلَتْ بِهٖ وَهُوَ يُرْضَعُ اِلَى اُخْتِهَا اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَتْ اَرْضِعِيْهِ عَشَرَ رَضَعَاتٍ حَتّٰى يَدْخُلَ عَلَىَّ فَاَرْضَعَتْنِىْ اُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتُ اَبِىْ بَكْرٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْنِىْ غَيْرَ ثَلَاثَ مِرَارٍ (مَرَّاتٍ) فَلَمْ اَكُنْ اَدْخُلُ عَلٰى عَائِشَةَ مِنْ اَجْلِ اَنَّ اُمَّ كُلْثُوْمٍ لَمْ تُتِمَّ لِىْ عَشَرَ رَضَعَاتٍ .

৬২৪। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে নিজের বোন উম্মে কুলছূম বিনতে আবু বাক্‌র (রা)-র নিকট পাঠালেন। তখন তিনি দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। তিনি বলে দিলেন, তাকে দশবার দুধ পান করাও। তাহলে সে আমার কাছে (মাহরাম হিসাবে) আসতে পারবে। উম্মে কুলছূম আমাকে তিনবার দুধ পান করান, অতঃপর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি আমাকে তিনবারের বেশী দুধ পান করাতে পারেননি। তাই আমি আয়েশা (রা)-র সামনে এজন্য যেতে পারতাম না যে, উম্মে কুলছূম আমাকে দশবার দুধ পান করাতে পারেননি।

٦٢٥- عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ اَبِىْ عُبَيْدٍ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ حَفْصَةَ اَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ اِلٰى فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ وَهِىَ اُخْتُهَا تُرْضِعُهُ عَشَرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَوْمَ اَرْضَعَتْهُ صَغِيْرٌ يَرْضَعُ .

৬২৫। আবু উবায়েদের কন্যা সাফিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নাফেকে অবহিত করেছেন যে, হাফসা (রা) আসেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাদকে তার বোন ফাতিমা বিনতে উমার (রা)-র কাছে দশবার দুধ পান করানোর জন্য পাঠান—যাতে সে তার মাহরাম হতে পারে। ফাতিমা তাই করলেন। অতএব আসেম তার কাছে আসা-যাওয়া করতো। ফাতিমা তাকে শিশু অবস্থায় দুধ পান করিয়েছিলেন। অর্থাৎ আসেম তখনো দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন।

٦٢٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فِيمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৬২৬। আয়েশা (রা) বলেন, প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে নাযিল করেছিলেন যে, দশবার দুধ পান করলে হুরমাত (বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ) প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তা পাঁচবার পান করানোর আয়াত দ্বারা মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরও লোকেরা তা পাঠ করতো।[১৮]

٦٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَاَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْئَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ كَانَتْ لِىْ وَلِيْدَةٌ فَكُنْتُ اُصِيْبُهَا فَعَمَدَتْ امْرَاَتِىْ اِلَيْهَا فَاَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ امْرَاَتِىْ دُوْنَكَ وَاللّٰهِ قَدْ اَرْضَعْتُهَا قَالَ عُمَرُ اَوْجِعْهَا وَائْتِ جَارِيَتَكَ فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيْرِ .

৬২৭। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র কাছে দারুল কাদায় আসলো। আমি তখন তার সাথে ছিলাম। সে বয়স্ক লোকদের দুধপান সম্পর্কে তার কাছে জিজ্ঞেস করলো। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে এসে বললো, আমার কাছে একটি বাঁদী ছিলো। আমি তার সাথে সহবাস করতাম। আমার স্ত্রী তাকে নিজ স্তনের দুধ পান করিয়ে দিলো। আমি যখন আমার বাঁদীর কাছে যেতে লাগলাম তখন আমার স্ত্রী বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাকে আমার বুকের দুধ পান করিয়েছি। তুমি তার কাছে যাবে না। উমার (রা) বলেন, তোমার স্ত্রীকে শাস্তি দাও এবং নিজ বাঁদীর সাথে সহবাস করো। কেননা শিশু অবস্থায় দুধ পান করলে দুধ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

٦٢٨- اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ وَسُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيْرِ فَقَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَهِدَ

---

১৮. আয়েশা (রা)-র মতে কুরআন মজীদে দশবার ও পাঁচবার দুধপান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়। পরবর্তী পর্যায়ে তা মানসূখ হয়ে যায়। কতিপয় লোকের কাছে পাঁচবার দুধপান সম্পর্কিত আয়াত মানসূখ হওয়ার খবর না পৌঁছার কারণে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পরও তা পাঠ করতে থাকে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে কুরআনে এ ধরনের নির্দেশ সম্বলিত কোন আয়াত নাযিল হয়নি। হযরত আয়েশা (রা) ছাড়া আর কোন সাহাবীর কাছ থেকেই এরূপ কথা জানা যায়নি। এজন্য জমহুর সাহাবা, তাবিঈন এবং তাদের পরবর্তী পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণ এই বক্তব্য গ্রহণ করেননি (অনুবাদক)।

بَدْرًا وَكَانَ تَبَنّٰى سَالِمًا اَلَّذِىْ يُقَالُ لَهُ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ كَمَا كَانَ تَبَنّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَاَنْكَحَ اَبُوْ حُذَيْفَةَ سَالِمًا وَهُوَ يَرٰى اَنَّهُ ابْنُهُ اَنْكَحَهُ ابْنَةَ اَخِيْهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَهِىَ مِنْ مُهَاجِرَاتِ الْاَوَّلِ وَهِىَ يَوْمَئِذٍ مِّنْ اَفْضَلِ اَيَامٰى قُرَيْشٍ فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ زَيْدٍ مَا اَنْزَلَ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ رُدَّ كُلُّ اَحَدٍ تُبُنِّىَ اِلٰى اَبِيْهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ يُعْلَمْ اَبُوْهُ رُدَّ اِلٰى مَوَالِيْهِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ امْرَاَةُ اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَهِىَ مِنْ بَنِىْ عَامِرِ بْنِ لُوَىٍّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا بَلَغَنَا فَقَالَتْ كُنَّا نَرٰى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَىَّ وَاَنَا فُضُلٌ وَلَيْسَ لَنَا اِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَمَا تَرٰى فِىْ شَاْنِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا بَلَغَنَا اَرْضِعِيْهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَتَحْرُمُ بِلَبَنِكِ اَوْ بِلَبَنِهَا وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِّنَ الرَّضَاعَةِ فَاَخَذَتْ بِذٰلِكَ عَائِشَةُ فِيْمَنْ تُحِبُّ اَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَاْمُرُ اُمَّ كُلْثُوْمٍ وَّبَنَاتِ اَخِيْهَا يُرْضِعْنَ مَنْ اَحْبَبْنَ (اَحْبَبْتَ) اَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْهَا وَاَبٰى سَائِرُ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يَّدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللّٰهِ مَا نَرٰى الَّذِىْ اَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اِلَّا رُخْصَةً لَهَا فِىْ رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهٰذِهِ الرَّضَاعَةِ اَحَدٌ فَعَلٰى هٰذَا كَانَ رَاْىُ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ رَضَاعَةِ الْكَبِيْرِ .

৬২৮। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তাকে বড়োদের দুধপান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, উরওয়া ইবনুয যুবায়ের আমাকে অবহিত করেছেন যে, আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা ইবনে রবীআ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সালেমকে পালক পুত্র বানিয়েছিলেন—যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদ ইবনে হারিছা (রা)-কে পালক পুত্র বানিয়েছিলেন। সালেমকে আবু হুযায়ফা (রা)-র মুক্তদাস বলা হতো। আবু হুযায়ফা (রা) তার ভাই ওলীদ ইবনে উতবা ইবনে রবীআর কন্যা ফাতিমার সাথে তাকে বিবাহ করান এবং তিনি সালেমকে নিজের পুত্র মনে করতেন। ফাতিমা (রা) প্রথম দলের সাথে হিজরত করেন এবং সমসাময়িক কুরাইশ মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিতা ছিলেন। যায়েদ ইবনে হারিছা (রা) সম্পর্কে যখন নাযিল হলো ঃ "তোমরা মুখডাকা পুত্রদেরকে তাদের পিতাদের সাথে সম্পর্ক সূত্রে ডাকো, এটা আল্লাহ্র নিকট অধিক ইনসাফের কথা" (সূরা আহযাব ঃ ৫)—তখন থেকে মুখডাকা পুত্রদের নিজ নিজ পিতার সাথে

সম্পর্কিত করে ডাকা হয়। যদি তাদের কারো পিতার নাম জানা সম্ভব না হতো, তবে তাকে নিজ মনিবের সাথে সম্পর্কিত করে ডাকা হতো। আমের গোত্রের কন্যা এবং আবু হুযায়ফা (রা)-র স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। (রাবী বলেন), আমরা জানতে পেরেছি যে, তিনি বলেছেন, আমরা সালেমকে আপন সন্তান মনে করতাম এবং সে আমার কাছে আসা-যাওয়া করতো, আর আমরা তখন পর্দাহীন অবস্থায় থাকতাম। আমাদের একটি মাত্র ঘর আছে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই। (রাবী বলেন), আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন ঃ "তাকে পাঁচবার তোমার স্তনের দুধ পান করাও। তাহলে সে দুধপান জনিত কারণে তোমার মাহরাম হয়ে যাবে।"

অতএব সাহলা (রা) সালেমকে নিজের দুধপুত্র মনে করতেন। হযরত আয়েশা (রা) এ হাদীসকে নিজ মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তিনি যে পুরুষলোককে চাইতেন যে, সে তার ঘরে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করুক—তার সম্পর্কে তিনি উম্মে কুলছুম এবং নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীদের নির্দেশ দিতেন—তাকে তোমার স্তনের দুধ পান করাও। কিন্তু নবী ﷺ-এর আর সব স্ত্রীগণ এ ধরনের দুধপুত্রদের তাদের কাছে আসতে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। তারা সকলে আয়েশা (রা)-কে বলেন, আল্লাহ্র শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধ সম্পর্কের ব্যাপারে সালহা বিনতে সুহাইলকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন—তা কেবল সালেমের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলো। আল্লাহ্র শপথ! এ ধরনের দুধ সম্পর্কের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে আসা-যাওয়ার অনুমতি পাবে না। বয়স্কদের দুধ পান করানোর ব্যাপারে নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের এটাই ছিলো চূড়ান্ত অভিমত।

٦٢٩- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ لاَ رَضَاعَةَ اِلاَّ فِي الْمَهْدِ وَلاَ رَضَاعَةَ اِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ .

৬২৯। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছেন, দোলনায় থাকাকালীন দুধপানই নির্ভরযোগ্য। যে দুধপান রক্ত-মাংস বৃদ্ধি করে তাই নির্ভরযোগ্য।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দুই বছর বয়সসীমার মধ্যে দুধ পান করলে তাতেই কেবল দুধপান সম্পর্কিত হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হবে। দুই বছরের মধ্যে দুধ পান করাটাই হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ, তা একবার স্তন চুষলেও। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব এবং উরওয়া ইবনুয যুবায়ের তাই বলেছেন। দুই বছর বয়স হওয়ার পর দুধ পান করলে তাতে দুধপান জনিত হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ .

"যে পিতা চায় যে, তার সন্তান পূর্ণ মুদ্দতকাল পর্যন্ত দুধ পান করতে থাকুক—তখন মায়েরা নিজেদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৩)।

অতএব দুধপানের পূর্ণ মেয়াদ হচ্ছে দুই বছর। এই মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন দুধপান নেই—যা হুরমাত প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (র) সতর্কতা বিধানের জন্য দুই বছরের পর আরো ছয় মাস বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন, এই হচ্ছে তিরিশ মাস এবং তিরিশ মাস শেষ হওয়ার পর আর দুধপান সম্পর্কিত হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হবে না। কিন্তু আমাদের মতে দুই বছরের পর আর হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হবে না।

স্তনদায়িনীর স্বামীও স্তন পানকারিণীর মাহ্‌রাম হয়ে যায়। আমাদের মতে বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়—দুধপান জনিত কারণেও তাই হারাম হয়। অতএব দুধ-ভাইয়ের জন্য দুধবোন (উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন) হারাম। তাদের উভয়ের মা ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীলোক হওয়া সত্ত্বেও দুধপিতা একই ব্যক্তি হওয়ার কারণে তারা পরস্পরের জন্য হারাম। যেমন ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, 'একই স্ত্রীর দুধ হতে হবে।' আমরা এই মত গ্রহণ করেছি এবং ইমাম আবু হানীফারও এই মত।[১৯]

---

১৯. অপর স্ত্রীলোকের স্তনের দুধ পান করিয়ে শিশু সন্তান লালন-পালনের প্রচলন আমাদের দেশে নেই। কিন্তু মাসআলাটি জেনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ অনেক সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে শিশুকে অন্য মহিলার দুধ পান করানো হয়ে থাকে। আর একবার-দু'বার দুধ পান করলেই দুধপান সম্পর্কিত হুরমাত কায়েম হয়। তা শিশুকে ইচ্ছা করেই পান করানো হোক অথবা অসতর্ক মুহূর্তে শিশু নিজে পান করে নিক। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে দুই বছর বয়সের মধ্যে যে কোন সময় শিশু অন্যের দুধ পান করলে দুধপান সম্পর্কিত হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হবে। দুই বছরের পর পান করলে আর এ হুরমাত প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইমাম মালেক থেকেও এরূপ একটি উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে দুধ পানের এই মেয়াদ আড়াই বছর। সূরা বাকারার ২৩৩ নম্বর আয়াত, সূরা লোকমানের ১৪ নম্বর আয়াত এবং সূরা আহ্‌কাফের ১৫ নম্বর আয়াতে এ সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত হয়েছে।

দুই অথবা আড়াই বছর বয়স হওয়ার পর সন্তানের জন্য মায়ের বুকের দুধ পান করানো হারাম হয় কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। একদল বিশেষজ্ঞ আলেম তা হারাম বলেছেন। অপর একদল আলেমের মতে ঐ বয়সের পরও সন্তানকে মায়ের বুকের দুধ পান করানো জায়েয। সম্প্রতি ও.আই.সি.-র ফিক্‌হ একাডেমী সার্বিক দিক বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছে যে, শিশু চার বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ পান করতে পারে (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ৯

كِتَابُ الضَّحَايَا وَمَا يَجْزِئُ مِنْهَا

(কোরবানী শিকার ও আকীকা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুর বর্ণনা।

٦٣٠- اَخْبَرَنَا نَافِعُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ فِى الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ الثَّنِىَّ فَمَا فَوْقَهُ .

৬৩০। আবুদল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, কোরবানীর পশু ও বুদনার ক্ষেত্রে ছানী এবং তার চেয়ে অধিক বয়স্ক পশুর প্রয়োজন।[১]

٦٣١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَنْهٰى عَمَّا لَمْ تُسِنَّ مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ وَعَنِ الَّتِىْ نُقِصَ مِنْ خَلْقِهَا .

৬৩১। ইবনে উমার (রা) এমন পশু দিয়ে কোরবানী করতে নিষেধ করেছেন যার দাঁত নেই এবং যা সৃষ্টিগতভাবে পংগু।

٦٣٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ ضَحّٰى مَرَّةً بِالْمَدِيْنَةِ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَشْتَرِىَ لَهُ كَبْشًا فَحِيْلاً اَقْرَنَ ثُمَّ اَذْبَحَهُ لَهُ يَوْمَ الْاَضْحٰى فِىْ مُصَلَّى النَّاسِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ حُمِلَ اِلَيْهِ فَحَلَقَ رَاْسَهُ حِيْنَ ذُبِحَ كَبْشُهُ وَكَانَ مَرِيْضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيْدَ مَعَ النَّاسِ قَالَ نَافِعُ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ لَيْسَ حِلَاقُ الرَّاْسِ بِوَاجِبٍ عَلٰى مَنْ ضَحّٰى اِذَا لَمْ يَحُجَّ وَقَدْ فَعَلَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ .

৬৩২। নাফে (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) একবার মদীনায় কোরবানী করলেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন তার জন্য শিংবিশিষ্ট একটি ছাগ কিনে তা কোরবানীর দিন ঈদের মাঠে যবেহ করি। আমি তাই করলাম এবং তা তার কাছে নিয়ে আসা হলো। তা

---

১. আমাদের মতে 'বুদনা' বলতে উট ও গরুকে বুঝায়। আর 'ছানী' বলতে এমন উট বুঝায় যার বয়স পাঁচ বছর শেষ হয়ে ছয় বছরের কাছাকাছি পৌছেছে। গরুর ক্ষেত্রে দুই বছর শেষ হয়ে তিন বছর শুরু হয়েছে। আর বকরীর ক্ষেত্রে এক বছর পার হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে (অনুবাদক)।

যবেহ করার পর তিনি নিজ মাথা কামালেন। তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন, তাই লোকদের সাথে ঈদের মাঠে যেতে পারেননি। নাফে (র) আরো বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি কোরবানী করে কিন্তু হজ্জ করেনি, তার জন্য মাথা কামানো বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু ইবনে উমার (রা) এমনিই মাথা কামিয়েছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এসব মতের উপর আমল করি। তবে একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে। অর্থাৎ ছয় মাস বয়সের মেষ যদি হৃষ্টপুষ্ট দেখায় তাহলে তা দিয়েও কোরবানী করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে অনেক আছার (اثار) বর্ণিত আছে। খাসী, বকরী, পাঠা, ভেড়া সব দিয়েই কোরবানী করা যেতে পারে। আর মাথা কামানোর ব্যাপারে আমরা ইবনে উমারের অভিমতের উপর আমল করি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জ করেনি, কোরবানীর দিন মাথা কামানো তার উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

٦٣٣- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّى عَمَّا فِى بَطْنِ الْمَرْأَةِ .

৬৩৩। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এমন বাচ্চার পক্ষ থেকে কোরবানী করতেন না, যা এখনো মায়ের গর্ভে রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। যে শিশু এখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি তার পক্ষ থেকে কোরবানী করবে না।

২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের পশু দিয়ে কোরবানী করা মাকরূহ।

٦٣٤- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ سَئَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَرْبَعٌ وَكَانَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يُشِيْرُ بِيَدِهِ وَيَقُوْلُ يَدِىْ أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ وَهِيَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِىْ لاَ تُنْقَى .

৬৩৪। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোরবানীর বেলায় কোন ধরনের পশু বাদ দেয়া উচিৎ? রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে ইশারা করে বলেন ঃ "চার রকেমর (ত্রুটিযুক্ত) পশু বাদ দেয়া উচিৎ।" (অধস্তন রাবী বলেন), বারাআ ইবনে আযেব (রা)-ও নিজ হাতে ইশারা করে বলতেন, আমার হাত তাঁর হাতের তুলনায় খাটো। তা হচ্ছে ঃ "খোড়া—যার খোঁড়ামী সুস্পষ্ট, অন্ধ—যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন—যার রুগ্নত্ব সুস্পষ্ট এবং দুর্বল—যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। তবে খোঁড়া পশু যদি নিজ পায়ে ভর করে হাঁটতে পারে তাহলে এটা দিয়ে কোরবানী করা যেতে পারে। কিন্তু নিজ

পায়ে ভর করে চলতে অক্ষম হলে তা দিয়ে কোরবানী করা জায়েয নয়। চোখের অর্ধেকের বেশী ভালো থাকলে সে পশু দিয়েও কোরবানী করা যেতে পারে। কিন্তু যদি চোখের অর্ধেক অথবা তার বেশীরভাগ নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সেই পশু দিয়ে কোরবানী করা জায়েয হবে না। রোগের প্রকোপ যদি এতো বেশী হয়ে থাকে যে, পশু অচল হয়ে পড়েছে এবং দুর্বলতাও যদি এতো বেশী হয়ে থাকে যে, হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে, তবে এ ধরনের পশু দিয়ে কোরবানী করাও জায়েয নয়।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানী গোশত।

٦٣٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلٰثٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَقُوْلُ دَفَّ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَتَ الْاَضْحٰى فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ادَّخِرُوا الثُّلُثَ وَتَصَدَّقُوْا بِمَا بَقِىَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُوْنَ فِىْ ضَحَايَاهُمْ يَحْمِلُوْنَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُوْنَ مِنْهَا الْاَسْقِيَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ اَوْ كَمَا قَالَ قَالُوْا نَهَيْتَ عَنْ اِمْسَاكِ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىِّ بَعْدَ ثَلٰثٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ اَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِىْ دَفَّتْ حَضْرَةَ الْاَضْحٰى فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا .

৬৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ "তিন দিনের অধিক কোরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।" আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি একথা আবদুর রহমান-কন্যা আমরার কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) সত্য কথা বলেছেন। কেননা আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কোরবানীর সময় বনাঞ্চলে বসবাসকারী একদল দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোক মদীনায় এসে উপস্থিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তোমরা তিন দিনের পরিমাণ গোশত জমা রাখো এবং অবশিষ্টগুলো সদাকা করো।" পরবর্তী কালে বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লোকেরা কোরবানীর গোশত দিয়ে উপকৃত হতো, এর চর্বি জমা করে রাখতো এবং এর চামড়া দিয়ে পানির মশক বানাতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "কি ব্যাপার?" লোকেরা বললো, আপনি আমাদেরকে তিন দিনের অধিক কোরবানীর গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "কোরবানীর দিন যে দুর্ভিক্ষ কবলিত একদল লোক এসেছিলো—তাদের কারণে আমি এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলাম। অতএব এখন তোমরা তা খাও, সদাকা করো এবং জমা করে রাখো।"

٦٣٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلٰثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا وَادَّخِرُوْا .

৬৩৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিনের পর কোরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি আবার বলেন : "তোমরা তা খাও, পাথেয় বানাও এবং জমা করে রাখো।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। তিন দিনের পর কোরবানীর গোশত জমা করে রাখা বা পাথেয় হিসাবে সাথে নেয়ায় কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর পুনরায় অনুমতি দিয়েছেন। তার শেষোক্ত মত পূর্ববর্তী মতকে রহিত করেছে। এজন্য কোরবানীর গোশত জমা করায় এবং তা পাথেয় হিসাবে সাথে নেয়ায় কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

٦٣٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهٰى (نَهٰى) عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلٰثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ كُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا .

৬৩৭। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিনের পর কোরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আবার বলেছেন : "তোমরা তা খাও, জমা করে রাখো এবং সদাকা করো।"[২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। কোরবানীর গোশত (তিন দিনের পর) খাওয়া, জমা করে রাখা অথবা সদাকা করলে কোন দোষ নেই। তবে আমরা এটা পছন্দ করি না যে, কোন ব্যক্তি তার কোরবানীর গোশতের এক-তৃতীয়াংশেরও

---

২. এই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস সিহাহ সিত্তাসহ প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থেই উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরবর্তী বক্তব্য তাঁর পূর্বের বক্তব্যকে রহিত করেনি, বরং সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। অর্থাৎ মুসলিম সমাজে কখনো দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তার পূর্বেকার নির্দেশ কার্যকর হবে এবং পরের নির্দেশ স্থগিত থাকবে। আবার দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলে পরের নির্দেশ আবার কার্যকর হবে এবং পূর্বের নির্দেশ স্থগিত থাকবে। হাদীসের ভাব এবং ভাষা থেকেও তাই বুঝা যায়। যেমন তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "আমি তোমাদের কোরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক রাখতে নিষেধ করেছিলাম—যাতে ধনী লোকেরা গরীব লোকদের পর্যন্ত তাদের গোশত পৌঁছাতে পারে।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "যেসব লোক কোরবানী করতে সক্ষম নয়—তাদের পর্যন্ত কোরবানীর গোশত পৌঁছানোর জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন" (তিরমিযী)। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "আমি এজন্য নিষেধ করেছিলাম যে, সে বছর লোকজন আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হয়েছিল।" এসব হাদীসের ভিত্তিতে বাংলাদেশের কথা চিন্তা করলে বলা যায়, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বেকার নির্দেশ বলবৎ হবে। কারণ দেশের জনগণের বর্তমান আর্থিক অবস্থা এমন পর্যায়ে রয়েছে যে, অধিকাংশ পরিবারই কোরবানী করতে সক্ষম নয় (অনুবাদক)।

কম দান-খয়রাত করুক। কিন্তু তবুও কেউ যদি এক-তৃতীয়াংশেরও কম দান-খয়রাত করে তবে তাও জায়েয হবে।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে কোরবানী করলে।

٦٣٨- عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ اَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ اَشْقَرَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ اَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْاَضْحٰى وَاَنَّهُ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَهُ اَنْ يَعُوْدَ بِاُضْحِيَّةٍ اُخْرٰى .

৬৩৮। আব্বাদ ইবনে তামীম (রা) থেকে বর্ণিত। উয়াইমির ইবনে আশকার (রা) ঈদের দিন নামায পড়ার পূর্বে কোরবানী করেন। ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানানো হলে তিনি তাকে "আরেকটি পশু কোরবানী করার নির্দেশ দেন।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। যখন কোন ব্যক্তি এমন শহরে (জনপদে) বসবাস করে যেখানে ঈদের নামায অনুষ্ঠিত হয়—সেখানে ইমামের ঈদের নামায পড়ানোর পূর্বে কোরবানী করা হলে তা একটি বকরীর গোশত হিসাবে গণ্য হবে, কোরবানী হবে না। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি শহরের বাসিন্দা না হয়, বরং জংগলে অথবা শহর থেকে অনেক দূরে বসবাস করে—সে যদি ফজরের সময় অথবা সূর্য উদয়ের পর কোরবানী করে, তবে তার কোরবানী হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ একটি পশুতে কতোজন শরীক হতে পারে?

٦٣٩- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ اَبَا اَيُّوْبَ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرَهُ قَالَ كُنَّا نُضَحِّيْ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ اَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً .

৬৩৯। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, আমরা একটি বকরী কোরবানী করতাম—তা এক ব্যক্তি নিজের এবং নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে যবেহ করতো। এরপর লোকেরা গর্ব-অহংকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং কোরবানী করাটা গর্বের বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দরিদ্র ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে একটি বকরী কোরবানী করতো, তা নিজে খেতো এবং পরিবারের লোকদেরও খাওয়াতো। কিন্তু একটি বকরী যদি দুই অথবা তিন ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানী করা হয় তবে তা জায়েয হবে না। একটি বকরী কেবল এক ব্যক্তির পক্ষ থেকেই যবেহ করা যেতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এই মত।

٦٤٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

৬৪০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়া নামক স্থানে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে প্রতিটি উট সাত ভাগে এবং প্রতিটি গরুও সাত ভাগে কোরবানী করেছি।[৩]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। একটি উট অথবা একটি গরু সাতজনে মিলে কোরবানী করা যেতে পারে। তারা একই পরিবারের লোক হোক অথবা বিভিন্ন পরিবারের (উভয় অবস্থায়ই তা জায়েয)।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ যবেহ করার বর্ণনা।

٦٤١- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ يَرْعٰى لِقْحَةً لَهُ بِاُحُدٍ فَجَاءَ الْمَوْتُ فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ فَسَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِهَا فَقَالَ لاَ بَاْسَ بِهَا كُلُوْهَا .

৬৪১। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার একটি উষ্ট্রী উহুদ এলাকায় চরাচ্ছিল। হঠাৎ এর মৃত্যুর উপক্রম হলো। সে তা একটি ধারালো কাঠ দিয়ে যবেহ করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে তা খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেনঃ কোন অসুবিধা নেই, তোমরা তা খেতে পারো।

٦٤٢- عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ اَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ اَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعٰى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ فَاُصِيْبَتْ مِنْهَا شَاةٌ فَاَدْرَكَتْهَا ثُمَّ ذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ بَاْسَ بِهَا كُلُوْهَا .

৬৪২। মুআয ইবনে সাদ (রা) অথবা সাদ ইবনে মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। কাব ইবনে মালেক (রা)-র একটি বাঁদী সালআ নামক স্থানে তার মেষপাল চরাতো। পালের একটি মেষ মরার উপক্রম হলো। সে এর কাছে গিয়ে একটি পাথর দিয়ে তা যবেহ করলো। এর

---

৩. ইমাম মালেক (র), শাফিঈ (র) ও আহমাদ (র)-এর মতেও একটি গরু অথবা একটি উটে সর্বাধিক সাতজন লোক শরীক হয়ে কোরবানী করতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তখন কোরবানীর দিন উপস্থিত হলো। আমরা এক গরুতে সাতজন এবং এক উটে দশজন করে শরীক হলাম" (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা)। ইমাম ইসহাক (র) এ হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আমাদের মতে এ হাদীস সাতজন শরীক হওয়ার হাদীস দ্বারা রহিত হয়েছে। হাকেম নায়শাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হযরত জাবের (রা) বলেন, "হুদায়বিয়ার দিন আমরা সত্তরটি উট কোরবানী করি। প্রতিটি উটে দশজন করে শরীক হয়।" আমাদের মতে উটের ক্রয়মূল্যে দশজন করে শরীক হয়েছিলো, কিন্তু সাতজনের পক্ষ থেকে তা যবেহ করা হয়েছিলো। ইমাম বায়হাকী বলেন, জাবের (রা) থেকে যে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে 'একটি উটে সাতজন শরীক হওয়া' সম্পর্কিত হাদীসটি তুলনামূলকভাবে অধিক সহীহ। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নীও নিজ নিজ গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন (অনুবাদক)।

সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ "এতে কোন দোষ নেই, তোমরা তা খেতে পারো।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। শিরা কেটে দিতে এবং রক্ত প্রবাহিত করতে সক্ষম এমন যে কোন জিনিস দিয়ে যবেহ করা যেতে পারে। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু নখ, দাঁত ও হাড়, এর যে কোন একটি দিয়ে যবেহ করা মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এই মত।

٦٤٣- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَا ذُبِحَ بِهِ اِذَا بَضَعَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ اِذَا اضْطُرِرْتَ اِلَيْهِ .

৬৪৩। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলতেন, যে জিনিস শিরা কেটে দিতে সক্ষম—তোমার নিরুপায় অবস্থায় এমন কোন জিনিস দিয়ে যবেহ করায় কোন দোষ নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। এসব জিনিস দিয়ে যবেহ করায় কোন দোষ নেই—তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু বিচ্ছিন্ন দাঁত অথবা নখ দিয়ে যদি যবেহ করা হয় এবং এর সাহায্যে শিরা কেটে দেয়া হয় ও রক্ত প্রবাহিত হয়—তবে যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া জায়েয, যদিও তা দিয়ে যবেহ করা মাকরূহ। কিন্তু দাঁত ও নখ যদি বিচ্ছিন্ন না হয় তবে তার সাহায্যে যবেহ করলে তা মৃত বলে গণ্য হবে এবং তা খাওয়া হারাম। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ শিকার এবং যেসব হিংস্র জন্তু খাওয়া মাকরূহ।

٦٤٤- عَنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ .

৬৪৪। আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।

٦٤٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَكْلُ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ .

৬৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। শিকারী দাঁতযুক্ত প্রতিটি হিংস্র জন্তু এবং থাবাযুক্ত প্রতিটি শিকারী পাখি খাওয়া হারাম। তাছাড়া যেসব পাখি ছোঁ মেরে মৃত জীব নিয়ে খায়—তা খাওয়াও হারাম। ইমাম আবু হানীফা, ইবরাহীম নাখঈ এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ গুইসাপ খাওয়া সম্পর্কে।

٦٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَاُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوْذٍ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ الَّتِيْ كُنَّ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ اَخْبِرُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمَا يُرِيْدُ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْهُ فَقُلْنَ هُوَ ضَبٌّ فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ اَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِ قَوْمِيْ فَاَجِدُنِيْ اَعَافُهُ قَالَ فَاجْتَرَرْتُهُ فَاَكَلْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ .

৬৪৬। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (তার খালা এবং) নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা)-র ঘরে প্রবেশ করেন। তাঁর সামনে গুইসাপের ভাজা গোশত পেশ করা হলো। তিনি গোশতের দিকে নিজের হাত বাড়ালেন। মায়মূনা (রা)-র ঘরে উপস্থিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপর স্ত্রীগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে গোশত খেতে যাচ্ছেন তার নাম বলে দাও। অতএব তারা বললেন, এটা গুইসাপ। তিনি নিজের হাত তুলে নিলেন। আমি (খালিদ) বললাম, এটা কি হারাম? তিনি বলেন ঃ "না, তবে এটা আমাদের এলাকার জীব নয়। এজন্য তা খেতে আমার রুচি হয় না।" রাবী বলেন, আমি গোশতের পাত্র নিজের দিকে টেনে নিয়ে তা খেলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখলেন।

٦٤٧- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ نَادٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِيْ اَكْلِ الضَّبِّ قَالَ لَسْتُ بِاٰكِلِهٖ وَلاَ مُحَرِّمِهٖ .

৬৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ডাক দিয়ে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! গুইসাপের গোশত সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি বলেন ঃ "আমি নিজে তা খাই না এবং তা হারামও মনে করি না।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, গুইসাপের গোশত খাওয়া সম্পর্কে অনেক মতভেদ আছে। তবে আমাদের মতে তা খাওয়া উচিত নয়।

٦٤٨- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُ اُهْدِيَ لَهَا ضَبٌّ فَاَتَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَئَلَتْهُ عَنْ اَكْلِهٖ فَنَهَاهَا عَنْهُ فَجَاءَتْ سَائِلَةٌ فَاَرَادَتْ اَنْ تُطْعِمَهَا اِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتُطْعِمِيْنَهَا مِمَّا لاَ تَاْكُلِيْنَ .

৬৪৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে গুইসাপের গোশত উপঢৌকন দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে এলেন। তিনি তা খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস

করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খেতে তাকে নিষেধ করলেন। ইতিমধ্যে এক ভিখারিনী (তাহাবীর বর্ণনায় ভিখারী) আসলো। তিনি তা ভিখারিনীকে খাওয়ানোর ইচ্ছা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ "তোমরা নিজেরা যা খাও না তা তাকে খাওয়াতে চাও?"

٦٤٩- عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ اَكْلِ الضَّبِّ وَالضَّبُعِ .

৬৪৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি গুইসাপ ও হায়েনার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে তা না খাওয়াই উত্তম। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি যা ভেসে পানির উপরিভাগে চলে আসে।

٦٥٠- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ سَئَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا لَفَظَهُ الْبَحْرُ فَنَهَاهُ عَنْهُ ثُمَّ انْقَلَبَ فَدَعَا بِمُصْحَفٍ فَقَرَاَ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ قَالَ نَافِعٌ فَاَرْسَلَنِيْ اِلَيْهِ اَنْ لَيْسَ بِهِ بَاْسٌ فَكُلْهُ .

৬৫০। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আবু হুরায়রা (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র কাছে সমুদ্র বক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তা খেতে নিষেধ করলেন। অতঃপর তিনি নিজ ঘরে গিয়ে কুরআন মজীদ চাইলেন, অতঃপর এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে। যেখানে তোমরা অবস্থান করো—সেখানেও তা খেতে পারো এবং কাফেলার জন্যও তা রসদ বানানো যেতে পারে" (সূরা মাইদা ঃ ৯৬)। নাফে (র) বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে আবদুর রহমানের কাছে একথা বলার জন্য পাঠান যে, "তাতে কোন দোষ নেই। অতএব তা খেতে পারো।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-র এই শেষোক্ত মত গ্রহণ করেছি। সমুদ্র যা তীরে ছুড়ে ফেলে দেয় বা পানি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে যা আটকে যায়—তা খাওয়ায় কোন দোষ নেই। কিন্তু অসুখের কারণে মরে ভেসে উঠা প্রাণী খাওয়া মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এই মত।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ যে মাছ পানির মধ্যে মারা যায়।

٦٥١- عَنْ سَعِيْدِ الْجَارِيِّ بْنِ الْجَارِ قَالَ سَئَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيْتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَيَمُوْتُ صَرَدًا وَفِيْ اَصْلِ ابْنِ الصَّوَّافِ وَيَمُوْتُ بَرَدًا قَالَ لَيْسَ بِهِ بَاْسٌ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৬৫১। সাঈদ আল-জারী ইবনুল জার (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র কাছে এমন মাছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যাকে অন্য মাছে হত্যা করেছে অথবা ঠাণ্ডার প্রকোপে মারা

গেছে। তিনি বলেন, তা খেতে কোন দোষ নেই। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-ও অনুরূপ কথা বলতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরাও এই মত গ্রহণ করেছি। গরম অথবা ঠাণ্ডার প্রকোপে যদি কোন মাছ মারা যায় অথবা অন্য মাছের আক্রমণে নিহত হয়, তবে তা খেতে কোন দোষ নেই। আর যে মাছ নিজে নিজে মারা যায়, অতঃপর ভেসে পানির উপরিভাগে আসে তা খাওয়া মাকরূহ। এ ছাড়া আর সব মাছ খাওয়া জায়েয।[৪]

---

৪. মাটির বুকে যেমন হাজারো রকমের প্রাণী রয়েছে, তেমনি পানির জগতেও রয়েছে অসংখ্য প্রাণী। দিন দিন সমুদ্র বিজ্ঞানের যতোই উন্নতি হচ্ছে এ সম্পর্কে আমরা ততোই নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছি। পানির জগতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ফিক্‌হ্‌বিদগণের সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতে, পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা জায়েয। অপর এক দল ফিক্‌হবিদের মতে, নির্দিষ্ট কতিপয় প্রাণী ছাড়া আর সবই খাওয়া হালাল। আর হানাফী মাযহাবের ফিক্‌হবিদদের মতে, পানির জগতের সকল প্রকারের মাছ খাওয়া হালাল। এছাড়া আর সব প্রাণীই হারাম। আরেক দল ফিক্‌হবিদের মতে, স্থলভাগের যেসব প্রাণী খাওয়া হারাম, পানির জগতের ঐ জাতীয় প্রাণীগুলো ছাড়া আর সবই খাওয়া হালাল। কুরআন মজীদের আয়াতে 'বাহ্‌র' (সমুদ্র) শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাগর-মহাসাগর, নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ইত্যাদি সর্বপ্রকার জলাশয় এর অন্তর্ভুক্ত। এসম্পর্কে কয়েকজন প্রসিদ্ধ তাফসীরকারের অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

আল্লামা সাইয়েদ মাহমূদ আলূসী (র) লিখেছেন, ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে উমার (রা) এবং কাতাদার মতে সমুদ্রের শিকার বলতে পানিতে বসবাসকারী যেসব প্রাণী শিকার করা হয় এবং পরে মারা যায় তা বুঝানো হয়েছে। আর "সমুদ্রের খাদ্য" বলতে সমুদ্র যেসব প্রাণী মৃত অবস্থায় (উপরিভাগে) নিক্ষেপ করে তা বুঝানো হয়েছে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, ইবনে জারীর, মুজাহিদ ও ইবনে আব্বাস (রা)-র অপর মত অনুযায়ী প্রথমটির অর্থ সমুদ্রের তাজা খাবার, আর দ্বিতীয়টির অর্থ লবণ (তাফসীরে রূহুল মাআনী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০)।

আল্লামা ফাখরুদ্দীন রাযী (শাফিঈ) বলেন, শিকার শব্দের অর্থ যেসব প্রাণী শিকার করা হয়। পানির জগতের যেসব প্রাণী শিকার করা হয় তা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) মাছ এবং এই শ্রেণীভুক্ত যাবতীয় প্রাণী, তা খাওয়া হালাল। (২) ব্যাঙ এবং এই শ্রেণীভুক্ত যাবতীয় প্রাণী, তা খাওয়া হারাম। (২) উল্লেখিত দুই প্রকার প্রাণীর বাইরে যেসব প্রাণী রয়েছে তার হারাম বা হালাল হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফার মতে তা হারাম। ইবনে আবু লাইলা এবং অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে তা খাওয়া হালাল। সমুদ্র শব্দের অর্থ নদী-নালা ইত্যাদির যাবতীয় পানি। সুমদ্রের শিকার বলতে যেসব প্রাণী কেবল পানিতেই বসবাস করে তাকে বুঝায়। কিন্তু যেসব প্রাণী কিছুক্ষণ স্থলভাগে এবং কিছুক্ষণ জলভাগে বসবাস করে তা স্থলভাগের শিকার হিসাবেই গণ্য হবে। অতএব কাছীম, কাকড়া, উড়োক মাছ, ব্যাঙ, পানির পাখি ইত্যাদি স্থলভাগের শিকার হিসাবে গণ্য হবে (তাফসীরে কাবীর, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৯৭-৯৮)।

ইমাম কুরতবী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, যাবতীয় প্রকারের মাছ খাওয়া যাবে, এছাড়া পানিতে বসবাসকারী অন্য কোন প্রাণী খাওয়া জায়েয নয়। ইমাম মালেক, শাফিঈ, ইবনে আবু লায়লা, আওযাঈ এবং আসজাঈর বর্ণনা অনুযায়ী সুফিয়ান সাওরী ও জমহূরের মতে পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাওয়া হালাল, তা মাছ হোক বা অন্য কোন প্রাণী, তা শিকারের মাধ্যমে

হস্তগত হোক অথবা মৃত অবস্থায় পাওয়া যাক। কিন্তু ইমাম মালেক সামুদ্রিক শূকর (দেখতে সম্পূর্ণ মাছের মতো) খাওয়া মাকরূহ মনে করছেন এই নামের কারণে, তবে হারাম মনে করতেন না। ইমাম শাফিঈর মতে, সামুদ্রিক শূকর খাওয়ায় কোন দোষ নেই। লাইছ বলেন, সমুদ্রের মৃতজীব খেতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈর মতে ব্যাঙ এবং এ জাতীয় প্রাণী খাওয়া হারাম, কিন্তু ইমাম মালেকের মতে জায়েয। ইমাম শাফিঈর মতে ডলফিন, উড়োক পাখি ও কুমীর খাওয়া হারাম।

আতা ইবনে আবু রবাহ (র)-কে উভচর প্রাণী (ইবনুল মা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তা কি স্থলভাগের শিকার হিসাবে গণ্য হবে না জলভাগের শিকার? তিনি জওয়াবে বলেন, তা অধিকাংশ সময় যেখানে বসবাস করে এবং যেখানে বাচ্চা দেয় সেখানকার প্রাণী হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। উভচর প্রাণী সম্পর্কে সঠিক কথা হচ্ছে, তা স্থলভাগের প্রাণী হিসাবে গণ্য হবে। ইবনুল আরাবীর মতে তা হারাম। কেননা এগুলোর হালাল হওয়া বা হারাম হওয়া সম্পর্কে উভয় দিকের দলীল রয়েছে। অতএব সতর্কতার খাতিরে হারাম হওয়ার দলীলই অগ্রাধিকার পাবে (আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮-২০)।

আবু বাক্‌র আল-জাস্‌সাস (হানাফী)) বলেন, আমাদের মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, لا يؤكل من حيوان الماء الا السمك (মাছ ছাড়া পানির জগতের অন্য কোন প্রাণী খাওয়া যাবে না)। সুফিয়ান সাওরীরও এই মত। ইবনে আবু লায়লা বলেন, ব্যাঙ, সামুদ্রিক সাপ ইত্যাদি পানির যে কোন প্রাণী খাওয়ায় দোষ নেই। মালেক ইবনে আনাসেরও এই মত। ইমাম আওযাঈ বলেন, সমুদ্রের যাবতীয় শিকার খাওয়া হালাল। লাইছ ইবনে সাদ বলেন, সমুদ্রের মৃতজীব, সামুদ্রিক কুকুর ও সামুদ্রিক ঘোড়া খাওয়ায় কোন দোষ নেই। কিন্তু সামুদ্রিক শূকর খাওয়া যাবে না। ইমাম শাফিঈর মতে পানির জগতে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণীই হালাল। এগুলোকে কাবু করাই হচ্ছে যবেহ করা (অস্ত্র দিয়ে গলা কাটার প্রয়োজন নাই)। সামুদ্রিক শূকর খাওয়াও দোষের ব্যাপার নয়।

যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাওয়া হালাল বলেছেন তারা "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হলো" আয়াতকে নিজেদের মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু (এই তাফসীরকারের মতে) উল্লেখিত আয়াত তাদের এই মতের সমর্থন করে না। কেননা আয়াতটি কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহ্‌রামধারীদের জন্য সমুদ্রের শিকার বৈধ করেছে মাত্র। তা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার দিকে এ আয়াত ইংগিত করে না। অনন্তর যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাওয়া হালাল বলেন, তাদের এমত মহানবী ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে বাতিল প্রমাণিত হয়ঃ "আমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃতজীব হালাল করা হয়েছেঃ মাছ ও টিড্ডি"। অতএব এই দুই প্রকারের মৃতজীবকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অন্যান্য মৃতজীব হারাম প্রমাণিত হয়।কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "তোমাদের জন্য মৃতজীব হারাম করা হয়েছে" (বাকারা ঃ ১৭৩; নাহলঃ ১১৫) এবং "কিন্তু যদি মৃতজীব হয় তা হারাম" (আনআম ঃ ১৪৪)। সামুদ্রিক শূকরও হারাম। কেননা কুরআন মজীদে তা হারাম করা হয়েছে।

হযরত উছমান (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান বলেন, "এক ডাক্তার মহানবী ﷺ-এর কাছে ঔষধের কথা উল্লেখ করে। সে তাঁকে আরো জানায় যে, ব্যাঙ দিয়েও ঔষদ তৈরি হয়। মহানবী ﷺ তা নিষেধ করেন"। অতএব ব্যাঙ হচ্ছে পানির প্রাণী। তা খাওয়া এবং কোন কাজে লাগানো জায়েয হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হত্যা করতে নিষেধ করতেন না। এ হাদীসের মাধ্যমে ব্যাঙ খাওয়া যখন হারাম প্রমাণিত হয়, তখন এর দ্বারা পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী (মাছ ছাড়া) খাওয়া হারাম প্রমাণিত হয়। কেননা এ দু'টি প্রাণীর মধ্যে (জলজ প্রাণী হওয়ার ব্যাপারে) কেউ কোনরূপ পার্থক্য করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যে হাদীস (সমুদ্রের

পানি পাক এবং এর মৃতজীব হালাল) বর্ণিত হয়েছে তা জলভাগের সব প্রাণী হালাল হওয়ার পক্ষে চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ এ হাদীসের একজন রাবী সাঈদ ইবনে সালামা অপরিচিত ব্যক্তি (আহকামুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭৯-৮০)।

আবু বাকর আল-জাস্‌সাস (র) জমহূরের দলীল—কুরআনের আয়াতের জওয়াবে যে কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ উল্লিখিত আয়াতে যদি সমুদ্রের বুকে শুধু শিকারকার্যকেই হালাল করা হয়ে থাকে এবং শিকারকৃত প্রাণী খাওয়া হালাল না করা হয়, তবে এ শিকারকার্য হালাল করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া আয়াতেই তো পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, "সমুদ্রের খাদ্য" এবং "তা তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের পাথেয়"। দ্বিতীয়ত, তিনি আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জওয়াবে যা বলেছেন তা খুব একটা শক্তিশালী বক্তব্য নয়। কারণ হানাফী আলেমদের মতেই কোন যঈফ হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলে তা আর যঈফের পর্যায়ে থাকে না এবং তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আবু হুরায়রা (রা) ছাড়াও উল্লিখিত হাদীসটি আবু বুরদা (রা), জাবের (রা) ও ফিরাসী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। জাস্‌সাস তার তাফসীরেই ঐ সূত্রগুলো উল্লেখ করেছেন। অনন্তর এ হাদীসে যে বক্তব্য রয়েছে তার সমর্থনে আরো একাধিক হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। অতএব একথা স্বীকার করতে কোন দোষ নেই যে, এক্ষেত্রে আমাদের হানাফী মাযহাবের যুক্তি-প্রমাণের তুলনায় জমহূরের দলীল-প্রমাণ অধিক শক্তিশালী।

মরে ভেসে ওঠা মাছ

মরে পানির উপরিভাগে ভেসে ওঠা মাছকে বলা হয় তাফী (الطافى)। আমাদের হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, এ জাতীয় মাছ খাওয়া মাকরূহ। কিন্তু ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ, আসহাবে যাওয়াহির ও জমহূরের মতে তাফী খাওয়া জায়েয, এতে মাকরূহ কিছু নেই। হযরত আলী (রা), জাবের (রা), তাউস, ইবনে সীরীন ও জাবের ইবনে যায়েদ (র) তাফী খাওয়া মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু হযরত আলী (রা)-র জায়েয সম্পর্কিত মতও বর্ণিত আছে এবং এটাই সঠিক। মরে পানির উপরিভাগে ভেসে আসা মাছ খাওয়ার ক্ষেত্রেও হানাফী মাযহাবের যুক্তি-প্রমাণের তুলনায় জমহূরের দলীল অধিক শক্তিশালী।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আবু বাক্‌র (রা) বলেছেন, "তাফী খাওয়া হালাল, যে খেতে চায় তা খেতে পারে"। তিনি আরো বলেন, "আমি আবু বাক্‌র (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পানির উপর মরে ভেসে উঠা মাছ খেয়েছেন"। একবার আবু আইউব আনসারী (রা) সমুদ্র ভ্রমণে গেলেন। তার সংগীরা পানির উপরিভাগে মরে ভেসে উঠা মাছ পেলেন এবং তা খাওয়া সম্পর্কে তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, "তা খাও এবং আমাকেও দাও"। জাবালা ইবনে আতিয়া (র) বলেন, আবু তালহা (রা)-র সংগীরা পানির উপর ভাসমান মরা মাছ পেলেন। তারা এগুলো খাওয়া সম্পর্কে তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, "আমাকেও তা থেকে উপহার দাও" (ইমাম কুরতুবীর আহকামুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮-২০)।

নাফে (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র কাছে এসে বলেন, সমুদ্র প্রচুর মাছ তীরে নিক্ষেপ করেছে। আমরা কি তা খেতে পারি? তিনি বলেন, "তোমরা তা খেও না"। অতঃপর ইবনে উমার (রা) বাড়িতে গিয়ে কুরআন শরীফ হাতে নিলেন এবং সূরা মাইদা পাঠ করতে করতে "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তার খাদ্য হালাল করা হলো.........." আয়াতে পৌঁছলেন। আয়াত পাঠশেষে তিনি আমাকে বলেন, "যাও এবং তাকে বলো, সে যেন তা খায়। কেননা তা খাদ্য" (তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৩)।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী পশুর পেটের বাচ্চা যবেহ করার বর্ণনা।

٦٥٢- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِيْ بَطْنِهَا ذَكَاتُهَا اِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَاِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا ذُبِحَ حَتّٰى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ .

৬৫২। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, কোন উষ্ট্রী যবেহ করা হলে ও তার পেটে পূর্ণাংগ বাচ্চা থাকলে এবং তার গায়ে লোম গজালে তা ভিন্নভাবে যবেহ করার প্রয়োজন নেই—তার মাকে যবেহ করাই তার যবেহ বলে গণ্য হবে। বাচ্চা পেট থেকে জীবন্ত বের হলে তা যবেহ করা প্রয়োজন—যাতে তার পেটের রক্ত বের হয়ে যেতে পারে।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যখন বাহরাইন গেলাম, সেখানকার লোকেরা সমুদ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মাছ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলো। তাদেরকে আমি তা খাওয়ার অনুমতি দিলাম। অতঃপর আমি (মদীনায়) উমার (রা)-র কাছে ফিরে এসে বিষয়টি তাকে জানালাম। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন ঃ "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হলো"। অতএব 'সমুদ্রের শিকার' হচ্ছে 'যা শিকার করা হয়' এবং সমুদ্রের খাদ্য 'যা সে উদগীরণ করে' (ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬১৪)।

হাম্বলী মাযহাবের বিখ্যাত ফিক্হ গ্রন্থ আল-মুগনীতে লেখা আছেঃ আবু বাক্র (রা) ও আবু আইউব আনসারী (রা) তাফী খাওয়া হালাল বলেছেন। ইমাম শাফিঈ, আতা, মাকহূল, সুফিয়ান সাওরী ও ইবরাহীম নাখঈ এই মত গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে জাবের (রা), তাউস, ইবনে সীরীন, জাবের ইবনে যায়েদ ও হানাফী মতাবলম্বীগণ তাফী খাওয়া মাকরূহ বলেছেন (ঐ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৭২)।

হানাফী আলেমগণ নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তাফী খাওয়া মাকরূহ বলেন ঃ জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "সমুদ্র যা উদগীরণ করে অথবা তা থেকে যা নিক্ষিপ্ত হয় তা খাও। আর যা সমুদ্রে মারা যায়, অতঃপর পানির উপর ভেসে ওঠে তা খেও না।" কিন্তু এ হাদীসের সনদ সহীহ নয়। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী নয়, বরং জাবের (রা)-র নিজের বক্তব্য। ইমাম দারু কুতনী বলেন, এ হাদীসের এক রাবী আবদুল আযীয ইবনে উবায়দুল্লাহ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং তার বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণের অযোগ্য। হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী থেকে মারফূ ও মাওকূফ উভয় সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মাওকূফ সূত্রটিই সঠিক। আইউব সুখতিয়ানী, উবায়দুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে জুরাইজ, যুহাইর, হাম্মাদ ইবনে সালামা প্রমুখ রাবীগণ এটাকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া ও ইবনে আবু যেব আবুয-যুবায়রের সূত্রে এ হাদীসটি মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সহীহ নয় (তাফসীরে কুরতুবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮-১৯)। তাছাড়া হযরত জাবের (রা) নিজেই তাফী খেয়েছেন বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। জায়শুল খাবাত-এর যুদ্ধে তারা সমুদ্রের তীরে বিরাটকায় মরা তিমি মাছ (العنبرة) পান। এক মাস ধরে তিনশো সৈনিক তা খেয়ে শেষ করতে পারেনি। তারা মদীনায় ফিরে এসে এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ "তা খাদ্য, তা আল্লাহ তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। তোমাদের কাছে তা অবশিষ্ট থাকলে আমাদেরও খেতে দাও"। জাবের (রা) বলেন, আমরা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালাম এবং তিনি তা খেলেন (বুখারী, আবু দাউদ ও অন্যান্য) (অনুবাদক)।

٦٥٣- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ذَكَاةُ مَا كَانَ فِىْ بَطْنِ الذَّبِيْحَةِ ذَكَاةُ أُمِّهِ اِذَا كَانَ قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ وَتَمَّ خَلْقُهُ .

৬৫৩। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলতেন, যবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চা যদি পূর্ণাংগ দেহবিশিষ্ট হয় এবং তার শরীরে লোম উঠে থাকে—তাহলে তার মাকে যবেহ করাই তাকে যবেহ করা বলে গণ্য হবে।[৫]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। যখন বাচ্চার গঠন পূর্ণাংগ হয়ে যাবে তখন তার মাকে যবেহ করাই তাকে যবেহ করা বলে গণ্য হবে। এজন্য তা খেতে কোন দোষ নেই। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) এই বাচ্চার গোশত খাওয়া মাকরূহ মনে করেন। তবে তা পেট থেকে জীবন্ত বের হয়ে আসলে অতঃপর যবেহ করে নিলে এর গোশত খাওয়া যেতে পারে। তিনি হাম্মাদের সূত্রে, তিনি ইবরাহীম নাখঈর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একটি পশুকে যবেহ করলে তা অন্যটিকেও যবেহ করা হয়েছে বলে গণ্য হতে পারে না।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ টিডিড (বড়ো জাতের ফড়িং) খাওয়া সম্পর্কে।

٦٥٤- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ وَدِدْتُ اَنَّ عِنْدِىْ قَفْعَةً مِّنْ جَرَادٍ فَاٰكُلُ مِنْهُ .

৬৫৪। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে টিডিড খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার কাছে টিডিড ভর্তি একটি থলে থাকলে আমি তা থেকে খেতাম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। টিডিড যবেহ করার প্রয়োজন নেই। তাই তা খেতে কোন দোষ নেই। তা জীবন্ত ধরা যাক অথবা

---

৫. 'যাকাতুল-জানীন যাকাতু উম্মিহি' (গর্ভবতী পশুকে যবেহ করাই তার পেটের বাচ্চার জন্য যথেষ্ট) হাদীসটি মোট এগারজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ আবু সাঈদ খুদরী (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, আহমাদ), জাবের (আবু দাউদ), আবু হুরায়রা (হাকেম), ইবনে উমার (হাকেম, দারু কুতনী), আবু আইউব আনসারী (হাকেম), ইবনে মাসউদ (দারু কুতনী), ইবনে আব্বাস (দারু কুতনী), কাব ইবনে মালেক (তাবারানী), আবু উমামা, আবু দারদা (বাযযার, তাবারানী) ও আলী (দারু কুতনী) রাদিয়াল্লাহু আনহুম। গর্ভবতী পশু সাধারণত যবেহ করা হয় না। কিন্তু অজান্তে অথবা অসতর্কতাবশত তা যবেহ করা হলে এবং তার পেট থেকে পূর্ণাংগ বাচ্চা বের হলে—এই বাচ্চার গোশত খাওয়ায় কোন দোষ নেই। বাচ্চা জীবন্ত বের হলে সকল বিশেষজ্ঞের মতেই তা যবেহ করতে হবে। এক্ষেত্রে তার মায়ের যবেহ তার জন্য যথেষ্ট হবে না। বাচ্চা পূর্ণাংগ না হলে তা ফেলে দিবে। ইমাম মালেকেরও এই মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও যুফারের মতে, বাচ্চা মৃত বের হলে তা খাওয়া যাবে না। ইমাম আহমাদ ও শাফিঈর মতে অপূর্ণাংগ বাচ্চা হলেও তার গোশত খাওয়া যাবে (অনুবাদক)।

মৃত—উভয় অবস্থায় তা যবেহকৃত বলে গণ্য হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অধিকাংশ ফিক্‌বিদের এই মত।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ আরব খৃষ্টানদের যবেহকৃত প্রাণীর বর্ণনা।

٦٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا وَتَلاَ هٰذِهِ الْأٰيَةَ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ .

৬৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে আরব খৃষ্টানদের যবেহকৃত প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাদের যবেহকৃত প্রাণী খাওয়ায় কোন দোষ নেই।[৬] অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তবে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে" (সূরা মাইদা ঃ ৫৯)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা প্রাণী সম্পর্কে।

٦٥٦- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ قَالَ رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ (بِحَجَرَيْنِ) وَاَنَا بِالْجُرُفِ فَاَصَبْتُهُمَا فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَمَاتَ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللّٰهِ يُذَكِّيْهِ بِقَدُوْمٍ فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُذَكِّيَهُ فَطَرَحَهُ اَيْضًا .

৬৫৬। নাফে (র) বলেন, আমি আল-জুরুফ নামক স্থানে দু'টি পাখিকে লক্ষ্য করে একটি পাথর নিক্ষেপ করি। ঘটনাক্রমে তা দু'টি পাখির গায়েই লেগে যায়। ফলে একটি পাখি সাথে সাথে মারা যায় এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তা ফেলে দেন। অপর পাখিটি তিনি বাইস বা কুঠার দিয়ে যবেহ করতে নিয়ে যান। কিন্তু তাও যবেহ করার পূর্বে মারা যায়। এটাও তিনি ছুড়ে ফেলে দিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। পাথর নিক্ষেপ করে কোন পাখি শিকার করা হলে এবং যবেহ করার পূর্বে মারা গেলে তা খাওয়া যাবে না। কিন্তু এর দেহের কোন অংশ ফেটে গেলে অথবা কেটে গেলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ পাথরের আঘাতে পাখির দেহের কোন অংশ ফেটে গেলে অথবা কোন অংগ কেটে গেলে তা (যবেহ করার সুযোগ না পেলেও) খাওয়ায় কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

---

৬. যেসব প্রাণী আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে—তা যদি আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহূদী বা খৃষ্টানগণ নিজেদের ভাষায় মহান স্রষ্টার নামে যবেহ করে তবে তার গোশত মুসলমানদের জন্য খাওয়া জায়েয। অনুরূপভাবে যেসব খাদ্যদ্রব্য আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে—তাদের কাছ থেকে তা খাওয়াও আমাদের জন্য বৈধ। এই প্রসঙ্গে সুবিস্তার অবগতির জন্য মাওলানা সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী (র)-এর গ্রন্থ "নির্বাচিত রচনাবলী", ৩য় খণ্ডে "আহলে কিতাবের যবেহকৃত প্রাণীর হালাল-হারাম প্রসঙ্গ" শীর্ষক দীর্ঘ নিবন্ধটি পাঠ করা যেতে পারে (অনুবাদক)।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুমূর্ষু অবস্থায় ছাগল ইত্যাদি যবেহ করা হলে।

٦٥٧- عَنْ اَبِى مُرَّةَ اَنَّهُ سَئَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذَبَحَهَا فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا فَاَمَرَهُ بِاَكْلِهَا ثُمَّ سَئَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ اِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَحَرَّكُ وَنَهَاهُ .

৬৫৭। আবু মুররা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-র কাছে জিজ্ঞেস করলেন, একটি বকরী মুমূর্ষু অবস্থায় যবেহ করা হয়েছে এবং এর দেহের কোন কোন অংশ নড়াচড়া করেছে—তা খাওয়া যাবে কিনা? তিনি তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন। অতঃপর আবু মুররা বিষয়টি সম্পর্কে যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, মৃত জীবও (মৃত্যুর মুহূর্তে) নড়াচড়া করতে পারে। অতএব তিনি তা খেতে নিষেধ করলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি তা এমনভাবে নড়াচড়া করে যার ফলে প্রবল ধারণা জন্মে যে, তা এখনো জীবিত আছে—তবে এর গোশত খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা যদি এমনভাবে নড়াচড়া করে—যার ফলে প্রবল ধারণা জন্মায় যে, তা মরে গেছে, তবে তা খাওয়া যাবে না।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি গোশত খরিদ করলো, কিন্তু তা যবেহ করা হয়েছে কিনা তা তার জানা নাই।

٦٥٨-عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نَاسًا مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ يَاْتُوْنَ بِلُحْمَانٍ فَلاَ نَدْرِىْ هَلْ سَمُّوْا عَلَيْهَا اَمْ لاَ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَمُّوا اللّٰهَ عَلَيْهَا ثُمَّ كُلُوْهَا قَالَ وَذٰلِكَ فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلاَمِ.

৬৫৮। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গ্রামাঞ্চলের লোকেরা আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে—অথচ আমাদের জানা নেই যে, তারা যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়েছে কিনা? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তোমরা তার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করো, অতঃপর তা খাও।" রাবী বলেন, এটা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের ঘটনা।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। তবে শর্ত হচ্ছে, এই গোশত বিক্রয়কারীকে মুসলমান অথবা আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টান) হতে হবে। যদি কোন অগ্নিউপাসক (মজূসী) এই গোশত নিয়ে আসে এবং বলে যে, তা কোন মুসলমান অথবা আহলে কিতাব যবেহ করেছে—তবে তার কথা বিশ্বাসও করা যাবে না এবং তার কথার উপর ভিত্তি করে তা খাওয়াও যাবে না।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার সম্পর্কে।

٦٥٩- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ فِى الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ كُلْ مَا اَمْسَكَ عَلَيْكَ اِنْ قَتَلَ اَوْ لَمْ يَقْتُلْ .

৬৫৯। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর সম্পর্কে বলতেন, এটা যা ধরে রাখে তা তুমি খাও—সে তা হত্যা করলেও অথবা না করলেও।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। কুকুর তা মেরে ফেলুক বা জীবন্ত ধরে রাখুক, তুমি তা যবেহ করে খেতে পারো—যদি কুকুর তা থেকে না খেয়ে থাকে। যদি সে তা থেকে খেয়ে থাকে তাহলে তা খেও না। কেননা সে তা নিজের জন্য শিকার করেছে (তোমার জন্য নয়)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-রও এই মত আমরা জানতে পেরেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ আকীকা সম্পর্কে।

٦٦٠- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِى ضَمْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْعَقِيْقَةِ قَالَ لاَ اُحِبُّ الْعُقُوْقَ فَكَاَنَّهُ اِنَّمَا كَرِهَ الْاِسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَاَحَبَّ اَنْ يَّنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ .

৬৬০। দমরাহ্ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর কাছে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ "আমি কষ্টকে অপছন্দ করি।" (রাবী বলেন), তিনি যেন এই নামটিকেই অপছন্দ করলেন। তিনি বলেন ঃ "যার সন্তান জন্ম নিয়েছে সে পছন্দ করলে তার সন্তানের পক্ষ থেকে কোরবানী (আকীকা) করুক।"

٦٦١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْئَلُهُ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِهِ عَقِيْقَةً اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ عَنِ الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى .

৬৬১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তার পরিবারের কোন সদস্য তাকে আকীকা করার কথা বললে তিনি তা করতেন। তিনি তার সন্তানদের পক্ষ থেকে—তা পুত্র হোক অথবা কন্যা, একটি করে বকরী আকীকা করতেন।

٦٦٢- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّهُ قَالَ وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَعْرَ حَسَنٍ وَّحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَاُمِّ كُلْثُوْمٍ فَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ ذٰلِكَ فِضَّةً .

৬৬২। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা) তার পুত্র হাসান (রা), হুসাইন (রা) এবং কন্যা যয়নব (রা) ও উম্মে কুলছূম (রা)-র মাথার চুল বাটখারায় ওজন করেছিলেন এবং চুলের ওজনের সম-পরিমাণ রূপা দান-খয়রাত করেছিলেন।

٦٦٣- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَعْرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِهِ فِضَّةً.

৬৬৩। মুহাম্মাদ (ইমাম বাকের) ইবনে আলী (যয়নুল আবেদীন) ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা) তার পুত্র হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)-র মাথার চুল বাটখারায় ওজন করেন এবং ওজনের সম-পরিমাণ রূপা দান-খয়রাত করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আকীকা সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি যে, জাহিলী যুগে এর প্রচলন ছিলো এবং ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়েও আকীকা করা হতো। অতঃপর কোরবানীর প্রচলন যে কোন ধরনের যবেহ রহিত করে দেয়, রমযানের রোযা তার পূর্বেকার সমস্ত রোযাকে রহিত করে দেয়, নাপাকীর গোসল তার পূর্বে প্রচলিত সমস্ত প্রকারের গোসল রহিত করে দেয় এবং যাকাত তার পূর্বেকার প্রচলিত সমস্ত ধরনের দান-খয়রাত রহিত করে দেয়। আমরা এভাবেই জানতে পেরেছি।[৭]

---

৭. ইমাম মুহাম্মাদ (র) যে আকীকার প্রচলন রহিত হওয়ার দাবি করেছেন তাকে জাহিলী পন্থায় আকীকা করার রীতিকে রহিত করার উপর প্রয়োগ করতে হবে এবং তা শরীআত নির্ধারিত পন্থায় করতে হবে। অন্যথায় তার এই মত সহীহ হাদীস ও সাহাবাদের কর্মপন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত গণ্য হবে। অনুরূপভাবে জাহিলী পন্থায় রোযা রাখা, যবেহ করা, গোসল করা ও দান-খয়রাত করার ক্ষেত্রেই তার রহিত হওয়ার দাবি প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় তার এ দাবি বিবাহ ভোজের জন্য পশু যবেহ করা, শাবান ও হজ্জের মাসে রোযা রাখা, জুমুআর দিন গোসল করা এবং ফিতরা দেয়ার নির্দেশের পরিপন্থী হবে।

শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার নাম রাখতে হয়, মাথার চুল কামাতে হয় এবং আকীকা করতে হয়। চুলের ওজনের সমপরিমাণ সোনা বা রূপা দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব। ইমাম মালেক ও শাফিঈর মতে আকীকা করা সুন্নাত, ইমাম আবু হানীফার মতে মুস্তাহাব এবং আহমাদের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তা সুন্নাত। তার অপর মত অনুযায়ী আকীকা করা ওয়াজিব। কোন হাদীসে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী দিয়ে আকীকা করার কথা উল্লেখ আছে। আবার কোন কোন হাদীসে উভয়ের পক্ষ থেকে একটি করে বকরী দিয়ে আকীকা করার কথাও বলা হয়েছে। ইমাম মালেক (র) এই শেষোক্ত মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অবশ্য এটা কোন বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়। ছেলে বা মেয়ে উভয়ের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক বকরী দিয়ে একবার বা একাধিকবার আকীকা করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইন (রা)-র দুইবার আকীকা করেছেন বলে উল্লেখ আছে।

মুহাম্মাদ ইবনে আলী বর্ণিত হাদীস দু'টি মুরসাল হাদীসের পর্যায়ভুক্ত। কেননা তিনি ফাতিমা (রা)-র সাক্ষাতও পাননি এবং তার কাছ থেকে হাদীসও শুনেননি। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের ছয় মাস পর ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মাদ ইবনে আলী তার অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ১০

كِتَابُ الدِّيَاتِ

(রক্তপণ)

১. অনুচ্ছেদ ঃ হত্যাকাণ্ডের রক্তপণ (দিয়াত)।

٦٦٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ عَنِ الْكِتَابِ الَّذِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِى الْعُقُوْلِ فَكَتَبَ اَنَّ فِى النَّفْسِ مِائَةً مِّنَ الْاِبِلِ وَفِى الْاَنْفِ اِذَا اُوْعِيَتْ جَدْعًا مِائَةً مِّنَ الْاِبِلِ وَفِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِى الْمَأْمُوْمَةِ مِثْلُهَا وَفِى الْعَيْنِ خَمْسِيْنَ وَفِى الْيَدِ خَمْسِيْنَ وَفِى الرِّجْلِ خَمْسِيْنَ وَفِىْ كُلِّ اِصْبَعٍ مِّمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِّنَ الْاِبِلِ وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ مِّنَ الْاِبِلِ وَفِى الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ مِّنَ الْاِبِلِ .

৬৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়াত সম্পর্কে আমর ইবনে হাযম (রা)-কে যে চিঠি লিখেছিলেন, সে সম্পর্কে আবু বাক্‌র (রা) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে অবহিত করেছেন। চিঠিটি নিম্নরূপ ঃ "জীবনের দিয়াত এক শত উট, নাকের দিয়াত যদি গোটা নাকই কর্তিত হয়—এক শত উট, দেহের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া জখমের দিয়াত জীবনের দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ, মাথার জখমের দিয়াতও জীবনের দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ, এক চোখের দিয়াত পঞ্চাশ উট, এক হাতের দিয়াত পঞ্চাশ উট, এক পায়ের দিয়াত পঞ্চাশ উট, প্রতিটি আংগুলের দিয়াত দশ উট, প্রতিটি দাঁতের দিয়াত পাঁচ উট এবং মস্তকের ঝিল্লি কেটে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া জখমের দিয়াত পাচঁ উট।"[১]

---

১. কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে অথবা তার কোন অংগ আহত করলে অথবা তার দেহের কোন অংশ কেটে ফেললে জরিমানা হিসাবে যে অর্থদণ্ড দিতে হয় তাকে 'দিয়াত' বলে। পেট পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া জখম মূলে রয়েছে জাইফাহ। অর্থাৎ যে আঘাত পেটের দিক থেকে অথবা পিঠের দিক থেকে দেহের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মাথার জখম মূলে রয়েছে মামূমাহ। অর্থাৎ যে আঘাত মাথার চামড়ার নিচে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া জখম মূলে রয়েছে মূদিহাহ। অর্থাৎ যে আঘাতে চামড়ার নিচের হাড় পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিন্তু হাড় ভাংগেনি। হাড় ভেংগে যাওয়া আঘাতকে বলা হয় হাশিমাহ।

ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারবে না। বরং ইসলামী আদালত সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পরই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে। নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করলে অর্থের বিনিময়ে অথবা কোন কিছু গ্রহণ না করেও হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পারে। এরূপ অবস্থায় আদালত তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অধিকার

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।

২. অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঠোঁটের দিয়াত।

٦٦٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ فِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ فَاذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيْهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ .

৬৬৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উভয় ঠোঁটের জন্য (প্রাণহত্যার) পূর্ণ দিয়াত। যদি কেবল নীচের ঠোঁট কেটে ফেলা হয়, তবে এর দিয়াত হবে (প্রাণহত্যার) পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ।[২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করিনি। উভয় ঠোঁটের গুরুত্ব ও উপকারিতা সমান। অতএব প্রতিটির জন্য (প্রাণহত্যার) পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক দিয়াত হবে। তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, কনিষ্ঠ আঙ্গুল এবং বুড়ো আঙ্গুলের দিয়াত একই সমান? অথচ এ দু'টি আঙ্গুলের গুরুত্ব ও উপকারিতা এক সমান নয়। ইবরাহীম নাখঈ, আবু হানীফা এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করলে তার দিয়াত।

٦٦٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَحْمِلُ شَيْئًا مِّنْ دِيَةِ الْعَمَدِ الاَّ أَنْ تَشَاءَ .

রাখে না। আমাদের দেশে রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক হত্যাকারীকে ক্ষমা করার যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা কুরআনের নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কুরআন মজীদ হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার কেবল নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের দান করেছে। তবে কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) কার্যকর করার কতগুলো শর্ত রয়েছে। যেমন, "হত্যাকারী স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে হত্যা করেছে, তার এই ইচ্ছার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ নাই, সে নিজের ক্ষমতাবলে এবং সরাসরি হত্যা করেছে। অপরদিকে নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর অংশ (সন্তান) নয়, সে নিহত হওয়ার মত অপরাধ করেনি, তার রক্ত ও হত্যাকারীর রক্তের মূল্য সমান এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ হত্যার বিচার দাবি করেছে ইত্যাদি" (আল-বাদায়ে ওয়াস-সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪)।

উল্লেখিত শর্তের কোন একটির অনুপস্থিতি ঘটলে কিসাস কার্যকর হবে না। তখন দিয়াত (Blood Money) কার্যকর হবে। দিয়াতের পরিমাণ হচ্ছে এক শত উট অথবা তার আর্থিক মূল্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক শত উটের মূল্য ছিল এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) বা দশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা (দিরহাম)। হযরত উমার (রা)-র যুগে এসে এর বাজারমূল্য দাঁড়ায় বারো হাজার দিরহাম। বর্তমান কালেও দিয়াতের পরিমাণ হবে এক শত উট বা তার বাজার মূল্য। ইমাম আবু হানীফার মতে স্ত্রীলোকদের রক্তমূল্য পুরুষলোকদের অর্ধেক। কিন্তু ইমাম মালেক ও আহমাদের মতে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের দিয়াতের পরিমাণ এক সমান (অনুবাদক)।

২. নাসাঈ গ্রন্থে উল্লেখিত আমর ইবনে হাযম (রা)-কে লেখা চিঠিতে আছে, দুই ঠোঁটের দিয়াত প্রাণ হত্যার দিয়াতের সমান। তাই ইমাম মালেক এবং শাফিঈও এক-তৃতীয়াংশ দিয়াতের অভিমত গ্রহণ করেননি। বরং তাদের মতেও প্রতিটি ঠোঁটের দিয়াত প্রাণ হত্যার দিয়াতের অর্ধেক (অনুবাদক)।

৬৬৬। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচলিত নীতি এই যে, ইচ্ছাপূর্বক হত্যার দিয়াতের দায় হত্যাকারীর ওয়ারিসগণ বহন করবে না, তবে তারা স্বেচ্ছায় তা প্রদান করলে ভিন্ন কথা।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি।

٦٦٧- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمَدًا وَّلاَ صُلْحًا وَّلاَ اعْتِرَافًا وَّلاَ مَا جَنَى الْمَمْلُوْكُ .

৬৬৭। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হত্যাকারীর 'আকিলা' ইচ্ছাপূর্বক হত্যার দিয়াত স্বেচ্ছায়ও প্রদান করবে না, সন্ধি বা স্বীকারোক্তিমূলেও দিবে না এবং গোলামের অপরাধের দিয়াতও না।[৩]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ভুলবশত হত্যার দিয়াত।[৪]

٦٦٨- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَّعِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَّعِشْرُوْنَ ابْنَ لَبُوْنٍ وَّعِشْرُوْنَ حِقَّةً وَّعِشْرُوْنَ جَذَعَةً .

---

৩. 'আকিলা' বলতে ভুলবশত হত্যাকারীর বংশীয় পুরুষ আত্মীয়গণ এবং তার চাকুরীস্থলের পুরুষ সহকর্মীগণকে বুঝায়। হত্যাকারীর উপর আরোপিত আর্থিক দায় আনুপাতিক হারে তারা বহন করে। উক্ত আর্থিক দায়কেও 'আকিলা' বলে (অনুবাদক)।

৪. কোন কোন সময় মানুষ হয়তো কোন বৈধ কাজ করছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও হুঁশিয়ারির অভাবে তার এ কাজের দরুন অন্য কোন ব্যক্তি নিহত হয়, অথচ তাকে হত্যা করার কোনরূপ ইচ্ছাই তার থাকে না। এ জাতীয় খুনকে 'ভুলবশত হত্যা' বলা হয় (তাব্ঈনুল হাকাইক ফী শারহিল কান্য, ইমাম যায়লাঈ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০১; আল-বাদায়ে ওয়াস-সানায়ে, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫২; ইমাম মাওয়ারদীর আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ২২০; আবু ইয়ালার আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, পৃ. ২৫৭)। এক্ষেত্রে হত্যাকারী হত্যার অপরাধে অপরাধী নয়, বরং অসাবধানতা ও অসতর্কতার অপরাধে অপরাধী। কেননা কোন বৈধ এবং মুবাহ কাজের শর্ত হচ্ছে, তা এমনভাবে করতে হবে যেন অন্যের কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু যখনই অন্যের ক্ষতি সাধিত হলো তখন প্রমাণিত হলো যে, হত্যাকারী অসাবধনতা ও অসতর্কতার অপরাধে অপরাধী। ভুলবশত হত্যা তিনভাবে হতে পারে ঃ

(ক) ক্রিয়ার মধ্যে ভুল—যেমন কোন ব্যক্তি পাখিকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তা গিয়ে পাখির কাছাকাছি কোন ব্যক্তির গায়ে পড়লো এবং সে নিহত হলো। (খ) অথবা কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে শিকার মনে করে তার উপর গুলী চালালো অথবা কোন মুসলমানকে শত্রুবাহিনীর লোক মনে করে হত্যা করে বসলো। এক্ষেত্রে অপরাধী তার কাজের মধ্যে ভুল করেনি। কেননা সে যাকে মারতে চেয়েছে তাকেই মেরেছে। কিন্তু সে ভুল করেছে তার ধারণা

৬৬৮। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, ভুলবশত হত্যার দিয়াত হচ্ছে এক বছর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী, দুই বছর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী, দুই বছর বয়সের বিশটি উট, তিন বছর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী এবং চার বছর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী (মোট এক শত)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করিনি। বরং আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র বক্তব্যের উপর আমল করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

دِيَةُ الْخَطَأِ اَخْمَاسُ عِشْرُوْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَّعِشْرُوْنَ ابْنُ مَخَاضٍ وَّعِشْرُوْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَّعِشْرُوْنَ حِقَّةٌ وَّعِشْرُوْنَ جَذَعَةٌ اَخْمَاسٌ .

"ভুলবশত হত্যার দিয়াত পাঁচ ভাগে বিভক্ত ঃ এক বছর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী, এক বছর বয়সের বিশটি উট, দুই বছর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী, তিন বছর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী এবং চার বছর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী। এভাবে পাঁচটি অংশ পূর্ণ হলো।"

সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) মর্দা উট নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, দুই বছর বয়সের বিশটি উট। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, এক বছর বয়সের বিশটি উট। ইমাম আবু হানীফা (র)-র মত ইবনে মাসউদ (রা)-র মতের অনুরূপ।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁতের দিয়াত।

٦٦٩- عَنْ اَبِىْ غَطفَانَ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ اَرْسَلَهُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَّسْئَلُهُ مَا فِى الضِّرْسِ فَقَالَ اِنَّ فِيْهِ خَمْسًا مِّنَ الْاِبِلِ قَالَ فَرَدَّنِىْ مَرْوَانُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ فَلِمَ تَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْاَضْرَاسِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ لاَ اِنَّكَ لاَ تَعْتَبِرُ اِلاَّ بِالْاَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ .

ও অনুমানের মধ্যে। (গ) অথবা কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে শিকার মনে করে তার উপর গুলী ছুড়লো, কিন্তু তা তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলো। এক্ষেত্রে শিকারী তার ক্রিয়া এবং অনুমান উভয় ক্ষেত্রেই ভুল করেছে। কেননা সে একটি মানুষকে শিকার অনুমান করে ভুল করেছে এবং সে শিকারক্রিয়া প্রয়োগ করেছে একজনের উপর, কিন্তু তা পড়েছে গিয়ে অন্যের উপর। এই তিন প্রকারের হত্যাই ভুলবশত হত্যার অন্তর্ভুক্ত। ভুলবশত হত্যাকে তিনভাগে বিভক্ত করার ভিত্তি এই যে, মানুষ যুগপৎভাবে তার অংগ-প্রতংগ ও মস্তিষ্কের (বুদ্ধি) সাহায্যে কাজ করে। অতএব সে উভয় ক্ষেত্রে অথবা যে কোন একটি ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হতে পারে।

ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড (কিসাস) কার্যকর হবে না, বরং দিয়াত আদায়ের সাথে সাথে কাফ্ফারাও দিতে হবে। কাফ্ফারা হিসাবে একটি মুমিন গোলাম আযাদ করতে হবে। তা না পাওয়া গেলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে হবে (দ্র. সূরা নিসা ঃ ৯২) (অনুবাদক)।

৬৬৯। আবু গাতাফান (র) থেকে বর্ণিত। মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাকে মাড়ির দাঁতের দিয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে পাঠান। তিনি বলেন, মাড়ির দাঁতের দিয়াত পাঁচ উট। রাবী বলেন, মারওয়ান আমাকে পুনরায় তার কাছে এ কথা জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠান যে, আপনি সামনের দাঁতকে মাড়ির দাঁতের সমান করেছেন কেন? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তুমি দাঁতকে যদি আংগুলের উপর কিয়াস করতে তবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হতো। কেননা সব আংগুলের দিয়াত একসমান।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-র মত গ্রহণ করেছি। দাঁত ও আংগুলের দিয়াত একসমান। প্রতিটি আংগুলের দিয়াত হচ্ছে (প্রাণ হত্যার দিয়াতের) এক-দশমাংশ এবং প্রতিটি দাঁতের দিয়াত বিশ ভাগের একভাগ। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অধিকাংশ হানাফী ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণত মত।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ আহত হওয়ার কারণে দাঁত কালো হয়ে যাওয়া এবং চোখ ঠিক থাকা সত্ত্বেও নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ার দিয়াত।

٦٧٠- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اُصِيْبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيْهَا عَقْلُهَا تَامًّا .

৬৭০। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলতেন, দাঁত আহত হলে এবং তা কালো হয়ে গেলে (দাঁতের) পূর্ণ দিয়াত বাধ্যকর হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। দাঁত আহত হলে এবং তা কালো, লাল অথবা সবুজ বর্ণ ধারণ করলে পূর্ণ দিয়াত প্রদান বাধ্যকর হবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٦٧١- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُوْلُ فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ اِذَا فُقِئَتْ مِائَةُ دِيْنَارٍ .

৬৭১। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) বলতেন, আহত হওয়ার পরও চোখ ভালো থাকা সত্ত্বেও আলোহীন হয়ে গেলে তার দিয়াত এক শত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে এক্ষেত্রে কোন দিয়াত নির্ধারিত নেই। এক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান ও অভিজ্ঞ বিচারক যে ফয়সালা দান করবেন তাই কার্যকর হবে। তিনি যদি এক শত দীনার বা তার কম পরিমাণ দিয়াতের রায় প্রদান করেন তবে তাই কার্যকর হবে। এই মত আমরা যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে গ্রহণ করেছি। কেননা তিনি এইরূপ নির্দেশ দান করেছিলেন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ একদল লোক এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার দিয়াত।

٦٧٢- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً اَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوْهُ قَتْلَ غِيْلَةٍ وَقَالَ لَوْ تَمَالاَ عَلَيْهِ اَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ .

৬৭২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। হযরত উমার (রা) এক ব্যক্তিকে হত্যার কারণে পাঁচ অথবা সাত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দান করেন। তারা তাকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করেছিল। উমার (রা) আরো বলেছেন, যদি গোটা সানআবাসী তাকে সম্মিলিতভাবে হত্যা করতো, তবে তার পরিবর্তে আমি এদের সকলকে মৃত্যুদণ্ড দান করতাম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা উমার (রা)-র কর্মপন্থা গ্রহণ করেছি। সাত অথবা ততোধিক ব্যক্তি যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন ব্যক্তিকে ধোঁকা দিয়ে অথবা এমনিভাবে নিজেদের তরবারির আঘাতে হত্যা করে, তবে এদের সবাইকে এই হত্যার পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অধিকাংশ হানাফী ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী স্ত্রীর দিয়াতের এবং স্ত্রী স্বামীর দিয়াতের ওয়ারিস হবে।

٦٧٣- اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فِى الدِّيَةِ اَنْ يُخْبِرَنِىْ بِهِ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ فَقَالَ كَتَبَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَشْيَمِ الضَّبَابِىِّ اَنْ وَرِّثْ اِمْرَاَتَهُ مِنْ دِيَتِهِ فَقَالَ عُمَرُ اُدْخُلِ الْخِبَاءَ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَلَمَّا نَزَلَ اَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ بِذٰلِكَ فَقَضٰى بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

৬৭৩। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। মিনায় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) লোকদের তলব করে বলেন, যার কাছে দিয়াত সম্পর্কিত জ্ঞান আছে, সে যেন আমাকে তা অবহিত করে। দাহ্‌হাক ইবনে সুফিয়ান (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আশইয়াম আদ-দিবাবী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লিখে পাঠান ঃ "তার স্ত্রীকে তার দিয়াতের ওয়ারিস বানাও।" একথা শুনে উমার (রা) বলেন, আমি না আসা পর্যন্ত তুমি তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করো। তিনি তাঁবুতে ফিরে এলে দাহ্‌হাক ইবনে সুফিয়ান তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই চিঠির কথা অবহিত করেন। উমার (রা) তদনুযায়ী ফয়সালা দান করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। দিয়াত এবং রক্তে প্রতিটি ওয়ারিসের অংশ রয়েছে। সে ওয়ারিস চাই স্বামী হোক বা স্ত্রী অথবা অপর কোন ওয়ারিস। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ জখমের দিয়াত।

٦٧٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِيْ عُضْوٍ مِّنَ الْأَعْضَاءِ ثُلُثُ عَقْلِ ذٰلِكَ الْعُضْوِ .

৬৭৪। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, দেহের কোন অংগের কোন অংশের জখমের দিয়াত সেই অংগের দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক্ষেত্রে ন্যায়বিচারক শাসকের রায়ই নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত।

٦٧٥- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِي الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ فَقَالَ الَّذِيْ قَضٰى عَلَيْهِ كَيْفَ أُغْرِمُ مَنْ لاَّ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ .

৬৭৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। এক বাচ্চাকে মায়ের পেটে থাকতেই হত্যা করা হলে—তার দিয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গোলাম অথবা বাঁদী আযাদ করার নির্দেশ দেন। তিনি যার বিরুদ্ধে এই ফয়সালা দিলেন সে বললো, আমি কেমন করে তার জরিমানা আদায় করবো, যে না পানাহার করেছে, না কথা বলেছে, আর না চিৎকার করেছে? এমন ব্যক্তির দিয়াত তো অর্থহীন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "সে ভবিষ্যদ্বক্তাদের ভাই।"[৫]

٦٧٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اسْتَبَّتَا فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرٰى فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا (جَنِيْنًا) فَقَضٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ .

৬৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে হুযাইল গোত্রের দুই নারী পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয় এবং একজন অপরজনের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গোলাম অথবা বাঁদী আযাদ করার নির্দেশ দেন।

---

৫. মুওয়াত্তার রাবীগণ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুতাররিফ ও আবু আসেম উভয়ে ইমাম মালেকের সূত্রে, তিনি যুহরীর সূত্রে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও সালামার সূত্রে, তারা উভয়ে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে এটা মারফূ হাদীস (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। কোন আযাদ স্ত্রীলোকের পেটে আঘাত করার ফলে তার গর্ভপাত হয়ে মৃত বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলে এর দিয়াত হচ্ছে একটি গোলাম অথবা বাঁদী আযাদ করা অথবা দিয়াতের বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ পাঁচশো দিরহাম আদায় করা। অপরাধী উটের মালিক হলে তার কাছ থেকে পাঁচটি উট এবং বকরীর মালিক হলে এক শত বকরী (পূর্ণ দিয়াতের বিশ ভাগের একভাগ) আদায় করতে হবে।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ মুখমণ্ডল ও মাথার জখমের দিয়াত।

٦٧٧- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ قَالَ فِى الْمُوْضِحَةِ فِى الْوَجْهِ اِنْ لَّمْ تُعِبِ الْوَجْهُ مِثْلُ مَا فِى الْمُوْضِحَةِ فِى الرَّأْسِ .

৬৭৭। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, মুখমণ্ডলের আঘাতে যদি তা ত্রুটিযুক্ত হয়ে না যায়, তবে তার দিয়াত মাথার আঘাতের সমপরিমাণ।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মুখমণ্ডলের আঘাতের দিয়াত এবং মাথার আঘাতের দিয়াত একসমান। এর প্রতিটির জন্য পূর্ণ দিয়াতের এক-দশমাংশ দিয়াত আদায় করতে হবে। ইবরাহীম নাখঈ, আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ কূপ খনন করার সময় চাপা পড়ে মারা গেলে তার দিয়াত।

٦٧٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِيْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "পশুর আঘাতে দণ্ড নেই, কূপে পড়াতে দণ্ড নেই, খনিতে দণ্ড নেই এবং ভূগর্ভে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত) আদায় করতে হবে।"[৬]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। "জুবার" শব্দের অর্থ বৃথা অর্থাৎ কারো রক্তমূল্য বৃথা যাওয়া। 'আজমা' এমন জন্তুকে বলা হয়, যা চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয় এবং তা কোন ব্যক্তিকে আহত করে বা শিং দিয়ে খোঁচা মারে। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কূপ খনন বা খনিজদ্রব্য উত্তোলনের কাজে নিয়োগ করলে এবং

৬. নিয়োগকারীর ত্রুটির কারণে কূপ অথবা খনিতে শ্রমিকগণ দুর্ঘটনার শিকার হলে এজন্য তাকে দায়ী হতে হবে। হানাফী মাযহাবমতে খনিতে সোনা-রূপা পাওয়া গেলে তার চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে। কিন্তু বর্তমান কালে খনিজ সম্পদ সাধারণত সরকারী মালিকানাধীন থাকে। কোন এলাকায় খনিজ সম্পদ পাওয়া গেলে সরকার সেখানকার জমির মালিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দান করে জনস্বার্থের খাতিরে সেই জমি নিজ মালিকানায় অধিগ্রহণ করে। সরকারী সম্পদের উপর কোনরূপ যাকাত বা কর আরোপিত হয় না। সুতরাং খনিজ সম্পদের উপর এখন আর এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত) আরোপিত হবে না (অনুবাদক)।

সে তাতে চাপা পড়ে মারা গেলে এর কোন দিয়াত নেই। আর খনি থেকে সোনা, রূপা, সীসা, তামা বা লোহা যা পাওয়া যায়, তার এক-পঞ্চমাংশ (যাকাত) আদায় করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা এবং অধিকাংশ হানাফী ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।

٦٧٩- عَنْ حِزَامِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ اَنَّ نَاقَةً لِّلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا لِّرَجُلٍ فَاَفْسَدَتْ فِيْهِ فَقَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ عَلٰى اَهْلِ الْحَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَاَنَّ مَا اَفْسَدَتِ الْمَوَاشِيْ بِاللَّيْلِ فَالضَّمَانُ عَلٰى اَهْلِهَا .

৬৭৯। তাবিঈ হিযাম (কোন কোন বর্ণনায় হারাম) ইবনে সাঈদ ইবনে মুহাইয়্যাসা (র) থেকে বর্ণিত। বারাআ ইবনে আযেব (রা)-র একটি উষ্ট্রী এক ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করে তার ফসলের ক্ষতিসাধন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা দিলেন ঃ "দিনের বেলা বাগানের মালিক বাগানের হেফাযত করবে। আর রাতের বেলা পশু ফসলের ক্ষতি সাধন করলে—পশুর মালিক সেজন্য দায়ী হবে।"[৭]

১৩. অনুচ্ছেদঃ ভুলবশত হত্যাকারীর অভিভাবক না পাওয়া গেলে তার দিয়াত।

٦٨٠- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ سَائِبَةً كَانَ اَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحُجَّاجِ فَكَانَ يَلْعَبُ مَعَ ابْنِ رَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ عَابِدٍ فَقَتَلَ السَّائِبَةُ ابْنَ الْعَابِدِيِّ فَجَاءَ الْعَابِدِيُّ اَبُو الْمَقْتُوْلِ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَبَ دِيَةَ ابْنِهِ فَاَبٰى عُمَرُ اَنْ يَّدِيَهُ وَقَالَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَقَالَ الْعَابِدِيُّ لَهُ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ ابْنِيْ قَتَلَهُ قَالَ اِذَنْ تُخْرِجُوْا دِيَتَهُ قَالَ الْعَابِدِيُّ هُوَ اِذَنْ كَالْاَرْقَمِ اِنْ يُّتْرَكْ يَلْقَمْ وَاِنْ يُقْتَلْ يُنْقَمْ .

৬৮০। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। এক হাজী সাহেব একটি গোলাম আযাদ করেন।[৮] একদা সে আবেদ গোত্রের এক ব্যক্তির পুত্রের সাথে খেলছিল। সে আবেদ

---

৭. যেসব এলাকায় দিনের বেলা মাঠে পশু ছেড়ে দেয়ার প্রচলন আছে, সেখানে দিনের বেলা ফসল রক্ষা করার দায়িত্ব ফসলের মালিকের এবং রাতে পশু বেঁধে রাখার দায়িত্ব পশুর মালিকের। সুতরাং দিনের বেলা পশু ফসল নষ্ট করলে দণ্ড দিতে হবে না। কিন্তু মালিক সাথে থাকা অবস্থায় পশু ফসলের ক্ষতি সাধন করলে দণ্ড দিতে হবে। ইমাম মালেক (র) ও শাফিঈ (র)-র এই মত। হানাফী মাযহাবমতে রাতের বেলা পশু ফসলের ক্ষতিসাধন করলেও দণ্ড দিতে হবে না—যদি মালিক সাথে না থাকে (অনুবাদক)।

৮. গোলাম মূলে রয়েছে সায়িবাহ। এমন গোলামকে সায়িবাহ বলা হয়, যাকে মালিক এই বলে আযাদ করে দেয় ঃ 'আমি তোমার ওয়ারিস হবো না' (অনুবাদক)।

গোত্রের ছেলেটিকে হত্যা করে বসলো। নিহতের পিতা অর্থাৎ আবেদী হযরত উমার (রা)-র কাছে এসে তার দিয়াত দাবি করলো। কিন্তু উমার (রা) তার দিয়াতের দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বলেন, তার কোন মালিক নেই। তখন নিহতের পিতা তাঁকে বললো, যদি আমার ছেলে তাকে হত্যা করতো, তবে আপনি কি রায় দিতেন? তিনি বলেন, তাহলে তোমাদেরকে তার দিয়াত আদায় করতে হতো। আবেদ গোত্রের লোকটি বললো, সে তো এক কেউটে সাপ—ছেড়ে দিলে কামড় দিবে এবং মেরে ফেললে প্রতিশোধ নেয়া হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। আমরা এটা মনে করি না যে, হযরত উমার (রা) হত্যাকারীর উপর থেকে দিয়াত (রক্তপণ) প্রত্যাহার করেছেন। আমরা এও মনে করি না যে, তিনি রক্তপণ বাতিল করেছেন। বরং তার একজন মালিক আছে, কিন্তু সে অজ্ঞাত। মালিক জ্ঞাত থাকলে উমার (রা) তার কাছ থেকে রক্তপণ আদায় করতেন। কিন্তু হযরত উমার (রা) যদি জানতে পারতেন যে, তার কোন মালিক বা অভিভাবক নাই, তবে তিনি হত্যাকারীর মাল থেকে (যদি সে সম্পদশালী হতো) অথবা সরকারী কোষাগার থেকে (যদি সে গরীব হতো) রক্তপণ প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, তার একজন মালিক আছে, সে আপাতত অজ্ঞাত। কেননা জনৈক হাজী সাহেব তাকে আযাদ করেছিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। অতএব হযরত উমার (রা) তার মালিক জ্ঞাত হওয়া পর্যন্ত দিয়াত মুলতবি রেখেছেন। তিনি প্রথমেই যদি জানতে পারতেন যে, তার কোন মালিক বা রক্তপণ বহনকারী নেই, তবে হত্যাকারীর মাল থেকে অথবা সরকারী কোষাগার থেকে রক্তপণ দেয়ার ব্যবস্থা করতেন।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাসামাহ (সম্মিলিত শপথ)।

٦٨١- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعِرَاقِ بْنِ مَالِكِ الْغِفَارِيِّ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى اِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جُهَيْنَةَ فَنَزَفَ مِنْهَا الدَّمُ فَمَاتَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِيْنَ اُدُّعِيَ عَلَيْهِمْ اَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا مَا مَاتَ مِنْهَا فَاَبَوْا وَتَحَرَّجُوْا مِنَ الْاَيْمَانِ فَقَالَ لِلْاٰخَرِيْنَ اَحْلِفُوْا اَنْتُمْ فَاَبَوْا فَقَضٰى بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّيْنَ .

৬৮১। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার ও ইরাক ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণিত। সাদ ইবনে লাইছ গোত্রের এক ব্যক্তি নিজের ঘোড়া হাঁকালে তা জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তির হাতের আঙ্গুল থেতলিয়ে দেয়। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে সে মারা গেলো। হযরত উমার (রা) বিবাদীদের বলেন, তোমাদের পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ করে বলতে পারবে কি যে, সে এই কারণে মারা যায়নি? তারা তার মৃত্যুর কারণ প্রত্যাখ্যান করলো এবং শপথ করতে

অস্বীকৃতি জানালো। অতঃপর তিনি বাদী পক্ষকে শপথ করতে বলেন। কিন্তু তারাও শপথ করতে অস্বীকৃতি জানালো। অতঃপর তিনি সাদ গোত্রের লোকদের পূর্ণ দিয়াতের অর্ধেক প্রদানের নির্দেশ দেন।

٦٨٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَّمُحَيِّصَةَ خَرَجَا اِلٰى خَيْبَرَ مِنْ جُهْدٍ اَصَابَهُمَا فَاُتِىَ مُحَيِّصَةُ فَاُخْبِرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِىْ فَقِيْرٍ اَوْ عَيْنٍ فَاَتٰى يَهُوْدَ فَقَالَ اَنْتُمْ قَتَلْتُمُوْهُ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى قَدِمَ عَلٰى قَوْمِهِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُمْ ثُمَّ اَقْبَلَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ وَهُوَ اَخُوْهُ اَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِىْ كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَبِّرْ كَبِّرْ يُرِيْدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمَّا اَنْ يَّدُوْا صَاحِبَكُمْ وَاِمَّا اَنْ يُّؤْذَنُوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ذٰلِكَ فَكَتَبُوْا لَهُ اِنَّا وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُوْدُ قَالُوْا لاَ لَيْسُوْا بِمُسْلِمِيْنَ فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتّٰى اُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ قَالَ سَهْلُ بْنُ اَبِىْ حَثْمَةَ لَقَدْ رَكَضَتْنِىْ مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ .

৬৮২। সাহল ইবনে আবু হাছমা (র) থেকে বর্ণিত। তার গোত্রের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ তাকে অবহিত করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রা) ও মুহাইয়্যাসা (রা) দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে খায়বার এলাকায় চলে যান। মুহাইয়্যাসা (রা)-র কাছে এসে খবর দেয়া হলো যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রা)-কে হত্যা করে কূপের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। মুহাইয়্যাসা (রা) ইহুদীদের কাছে এসে বলেন, তোমরা তাকে হত্যা করেছো। তারা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। অতঃপর তিনি নিজ গোত্রে ফিরে এসে তাদেরকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। অতঃপর তিনি, তার বড়ো ভাই হুয়াইয়্যাসা ও আবদুর রহমান ইবনে সাহল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। মুহাইয়্যাসা (রা) কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কারণ তিনিই খায়বার গিয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, "বড়ো, বড়ো"। অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে কথা বলতে দাও। অতএব প্রথমে হুয়াইয়্যাসা এবং পরে মুহাইয়্যাসা (রা) কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "হয় তারা তোমার ভাইয়ের রক্তপণ দিবে অথবা যুদ্ধের ঘোষণা দিবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে খায়বারের ইহুদীদের

চিঠি লিখেন। জবাবে তারা তাকে লিখে পাঠায়, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। চিঠি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুয়াইয়্যাসা ও আবদুর রহমানকে বলেন ঃ "তোমরা শপথ করো এবং তোমাদের সাথীর রক্তপণের অধিকারী হও।" তারা বলেন, না, আমরা শপথ করবো না। তিনি বললেন ঃ "তাহলে ইহুদীরা শপথ করবে।" তারা তিনজনই বলেন, তা হতে পারে না, তারা তো মুসলমান নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত (রক্তপণ) পরিশোধ করলেন এবং তাদের কাছে এক শত উষ্ট্রী পাঠিয়ে দিলেন। তা তাদের বাড়িতে পৌঁছে গেলো। সাহল ইবনে আবু হাছমা (রা) বলেন, এর মধ্যে একটি লাল উট আমাকে লাথি মারে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন ঃ "তোমরা কি শপথ করবে তাহলে রক্তপণের মালিক হয়ে যাবে?" এ কথার লক্ষ্য হচ্ছে দিয়াতের মালিক হওয়া, কিসাসের অধিকারী হওয়া নয়। হাদীসের শুরুতে তিনি যে বলেছেনঃ ইহুদীরা হয় দিয়াত দিবে অথবা যুদ্ধ করবে" একথা উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন করে। হাদীসের শেষাংশে "তোমরা হলফ করো তাহলে তোমাদের সাথীর রক্তের দাবিদার হতে পারবে"—তাঁর এ কথাও উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থক। কেননা কখনো কিসাসের মাধ্যমে, আবার কখনো দিয়াতের মাধ্যমে রক্তের দাবিদার হওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা বলেননি, শপথ করো এবং হত্যাকারীর রক্তের অধিকারী হয়ে যাও। তিনি যদি তাই বলতেন, তবে এর অর্থ হতো কিসাস। বরং তিনি বলেছেন, নিজেদের সাথীর রক্তের অধিকারী হয়ে যাবে অর্থাৎ দিয়াতের মাধ্যমে নিজেদের সাথীর রক্তের মালিক হয়ে যাবে। হাদীসের প্রথমাংশে উল্লেখিত তাঁর বক্তব্য একথাই সমর্থন করে অর্থাৎ "হয় তারা দিয়াত দিবে, অন্যথায় যুদ্ধের ঘোষণা দিবে।" হযরত উমার (রা) বলেছেন, কাসামাহ দিয়াতকে বাধ্যতামূলক করে, কিন্তু রক্তপণ বাতিল করে না।[৯] একথা অসংখ্য হাদীসে উল্লেখ আছে। আমরা এসব হাদীসের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফা এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এই অভিমত।

---

৯. কাসামাহ (القسامة) শব্দের অর্থ হচ্ছে, যদি কোন মহল্লায় কোন ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে মহল্লার অধিবাসীগণ এবং তাদের আশপাশের লোকেরা শপথ করে বলবে যে, তারা তাকে হত্যা করেনি এবং হত্যাকারী সম্পর্কেও তারা কিছুই জানে না। এ ধরনের শপথের পর স্থানীয় লোকেরা হত্যার দায় থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। তৎকালীন যুগের লোকেরা অপরাধ করে তা অকপটে স্বীকার করতো এবং মিথ্যা শপথ করতে ভয় পেতো। তাই কোন হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী না পাওয়া গেলে স্থানীয় লোকদের সম্মিলিতভাবে শপথ করানোর বিধান তৎকালীন বিচার ব্যবস্থায় চালু ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে এতদূর নৈতিক অধপতন ঘটেছে যে, মানুষ কুরআন মজীদ হাতে নিয়ে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়েও মিথ্যা শপথ করতে দ্বিধাবোধ করে না। অতএব বর্তমান যুগে শুধু কাসামার উপর ভিত্তি করে রায় দেয়া যেতে পারে না। তাছাড়া শঠ লোকেরা কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে বহু দূরে অন্য এলাকায়ও ফেলে রেখে আসতে পারে। এরূপ অনেক বাস্তব ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ১১

كِتَابُ الْحُدُوْدِ فِى السَّرِقَةِ

(চুরির দণ্ডবিধি)

১. অনুচ্ছেদ ঃ গোলাম তার মালিকের মাল চুরি করলে।

٦٨٣- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو الْحَضْرَمِىَّ جَاءَ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَبْدٍ لَّهُ فَقَالَ اقْطَعْ هٰذَا فَاِنَّهُ سَرَقَ فَقَالَ وَمَاذَا سَرَقَ قَالَ سَرَقَ مِرْاٰةً لاِمْرَاَتِىْ ثَمَنُهَا سِتُّوْنَ دِرْهَمًا فَقَالَ عُمَرُ اَرْسِلْهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ .

৬৮৩। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল-হাদরামী (র) তার গোলামকে নিয়ে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট এসে বললো, এর হাত কাটুন, সে চুরি করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কি চুরি করেছে? হাদরামী বললো, সে আমার স্ত্রীর আয়না চুরি করেছে, যার মূল্য ষাট দিরহাম। উমার (রা) বলেন, তাকে ছেড়ে দাও, তার হাত কাটা যাবে না। কেননা সে তোমাদের খাদেম এবং তোমাদেরই মাল চুরি করেছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। কোন ব্যক্তির গোলাম যদি তার নিজের নিকটাত্মীয়ের, মালিকের, মালিকের স্ত্রীর বা মালিকিণীর স্বামীর মাল চুরি করে তবে তার হাত কাটা যাবে না। আর কোন ব্যক্তি নিজের ভাই, বোন, ফুফু বা খালার মাল চুরি করলে কিভাবে তার হাত কাটা যেতে পারে? কারণ সে যদি অভাবী, আশ্রয়হীন বালক হয়ে থাকে তবে তার ভরণপোষণের জন্য এদের বাধ্য করা যেতে পারে এবং তাদের সম্পদে এদের অধিকার রয়েছে। অতএব যে মালে তার হক রয়েছে তা চুরি করলে কি করে তার হাত কাটা যেতে পারে? ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।

২. অনুচ্ছেদ ঃ ফল বা এমন কিছু চুরি করা যা গুদামজাত করা যায় না।

٦٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ مُّعَلَّقٍ وَّلاَ فِىْ حَرِيْسَةِ جَبَلٍ فَاِذَا اٰوَاهُ الْمُرَاحُ اَوِ الْجَرِيْنُ فَالْقَطْعُ فِيْمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ .

৬৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ গাছে ঝুলন্ত ফল এবং পাহাড়ে বিচরণশীল ছাগল যার সাথে কোন রক্ষক নেই, তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু ছাগল মালিকের বাড়িতে চলে আসলে অথবা ফল কেটে তা শুকানোর জন্য কোথাও রাখা হলে, তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে, যদি তার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। কোন ব্যক্তি গাছের মাথার ফল চুরি করলে বা চারণ ভূমিতে চরে বেড়ানো ছাগল চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না। ফল যখন শুকাবার স্থানে অথবা ঘরে রাখা হয় এবং ছাগল বাড়িতে ফিরে আসে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণকারী থাকলে, তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে, যদি তার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হয়। তৎকালে একটি ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম। এর কম মূল্যের পরিমাণ জিনিস চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অধিকাংশ হানাফী ফিক্হবিদের এই মত।

٦٨٥- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ اَنَّ غُلاَمًا سَرَقَ وَدِيًّا مِّنْ حَائِطِ رَجُلٍ
فَغَرَسَهُ فِيْ حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدٰى
عَلَيْهِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَسَجَنَهُ وَاَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ اِلٰى رَافِعِ بْنِ
خَدِيْجٍ فَسَئَلَهُ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَّلاَ كَثَرٍ
وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ قَالَ الرَّجُلُ اِنَّ مَرْوَانَ اَخَذَ غُلاَمِىْ وَهُوَ يُرِيْدُ قَطْعَ يَدِهِ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ
تَمْشِيَ اِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِىْ سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَشٰى مَعَهُ حَتّٰى اَتٰى
مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ اَخَذْتَ غُلاَمَ هٰذَا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَنْتَ صَانِعٌ قَالَ اُرِيْدُ
قَطْعَ يَدِهِ قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ قَطْعَ فِىْ ثَمَرٍ وَّلاَ كَثَرٍ فَاَمَرَ
مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَاُرْسِلَ .

৬৮৫। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। একটি ক্রীতদাস এক ব্যক্তির বাগান থেকে খেজুরের চারা চুরি করে এনে তার মালিকের বাগানে রোপন করে। চারার মালিক তার চারার অনুসন্ধান করতে বের হলো এবং তা পেয়ে গেলো। এ সম্পর্কে সে মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে নালিশ করলো। মারওয়ান তাকে আটক করলেন এবং তার হাত কেটে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। ক্রীতদাসের মালিক রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-র কাছে এসে তাকে এ সম্পর্কিত বিধান জিজ্ঞেস করলো। রাফে (রা) তাকে অবহিত করলেন

যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ "ফল অথবা চারাগাছ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।" 'কাছার' অর্থ খেজুরগাছ। লোকটি বললো, মারওয়ান আমার গোলামকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছেন এবং তিনি তার হাত কাটতে চান। আমি চাচ্ছি যে, আপনি তার কাছে যান এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আপনার শোনা হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত করুন। অতএব তিনি গোলামের মালিকের সাথে পদব্রজে রওয়ানা হলেন এবং মারওয়ানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাফে (রা) মারওয়ানকে বলেন, তুমি কি তার দাসকে গ্রেফতার করেছো? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে চাও? মারওয়ান বলেন, আমি তার হাত কাটতে চাই। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ "ফল ও চারাগাছ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।" এ হাদীস শোনার পর মারওয়ান গোলমটিকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তাকে মুক্তি দেয়া হলো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। গাছের ঝুলন্ত ফল, বীজ, চারাগাছ এবং গাছ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কাছার (كثر) অর্থ খেজুরগাছ। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ মামলা দায়েরের পর চুরি যাওয়া মাল চোরকে দান করার বর্ণনা।

٦٨٦ – عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قِيْلَ لِصَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّهُ مَنْ لَّمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَدَعَا بِرَاحِلَةٍ فَرَكِبَهَا حَتّٰى قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ قِيْلَ لِىْ اَنَّهُ مَنْ لَّمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْجِعْ اَبَا وَهْبٍ اِلٰى اَبَاطِحِ مَكَّةَ فَنَامَ صَفْوَانُ فِى الْمَسْجِدِ مُتَوَسِّدًا رِدَاءَهُ فَجَاءَهُ سَارِقٌ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ فَاَخَذَ السَّارِقَ فَاَتٰى بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالسَّارِقِ اَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَمْ اُرِدْ هٰذَا هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَلَّا قَبْلَ اَنْ تَاْتِيَنِىْ بِهٖ .

৬৮৬। সাফওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (তার দাদা) সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা)-কে বলা হলো, "যে ব্যক্তি হিজরত করেনি সে ধ্বংস হয়েছে।" তিনি একটি জন্তুযান নিয়ে ডাকলেন এবং তাতে সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলেন। তিনি বললেন, আমাকে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি হিজরত করেনি সে ধ্বংস হয়েছে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ "আবু ওয়াহ্‌ব! তুমি মক্কার কংকরময় জমীনে চলে যাও। সাফওয়ান (রা) মসজিদে (নববী অথবা মসজিদুল

হারাম) এসে নিজের চাদর দিয়ে বালিশ বানিয়ে সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় একটি চোর এসে তার চাদর চুরি করলো। তিনি চোরকে গ্রেপ্তার করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ চোরের হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। তখন সাফওয়ান (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এটা আশা করিনি। আমি চাদরটি তাকে দান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "আমার কাছে নিয়ে আসার পূর্বেই তুমি তা করলে না কেন?" (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, চোর অথবা যেনার অপবাদ আরোপকারীকে বিচারকের কাছে সোপর্দ করার পর বাদী তার দাবি প্রত্যাহার করে নিলেও বিচারককে দণ্ড বিধান করতে হবে। তিনি অপরাধীকে রেহাই দিতে পারবেন না। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং হানাফী ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে পরিমাণ জিনিস চুরি করলে হাত কাটা যাবে।

٦٨٧-اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَطَعَ فِىْ مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .

৬৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি ঢাল চুরির অপরাধে হাত কাটার নির্দেশ দিয়েছেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

٦٨٨-عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ خَرَجَتْ اِلٰى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلاَتَانِ وَمَعَهَا غُلاَمٌ لِّبَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ وَاَنَّهُ بُعِثَ مَعَ تَيْنِكَ الْمَرْاَتَيْنِ بِبُرْدٍ مُّرَاجِلٍ قَدْ خِيْطَتْ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ قَالَتْ فَاَخَذَ الْغُلاَمُ الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبَداً اَوْ فَرْوَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ دَفَعَتَا ذٰلِكَ الْبُرْدَ اِلٰى اَهْلِهِ فَلَمَّا فَتَقُوْا عَنْهُ وَجَدُوْا ذٰلِكَ اللِّبَدَ وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ فَكَلَّمُوا الْمَرْاَتَيْنِ فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ اَوْ كَتَبَتَا اِلَيْهَا وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَاعْتَرَفَ فَاَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ فَقُطِعَتْ يَدُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِىْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِداً .

৬৮৮। আবদুর রহমান (রা)-র কন্যা আমরাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) মক্কার উদ্দেশে রওনা হলেন। তাঁর সাথে ছিল দু'টি মুক্ত ক্রীতদাসী। তার সাথে আবু

বাক্র (রা)-র পুত্র আবদুল্লাহ্র পুত্রদের একটি গোলামও ছিল। মেয়ে দু'টির সাথে একটি মারাজিল চাদর পাঠানো হয়। একটি সবুজ কাপড়ের মোড়কে তা সেলাই করা ছিল। আমরাহ (র) বলেন, গোলামটি সবুজ মোড়ক খুলে চাদরটি বের করে নিয়ে তদস্থলে পশমের অথবা চামড়ার পরিধেয় রেখে মোড়কটি সেলাই করে দেয়। আমরা মদীনায় পৌছে মোড়কে ভর্তি চাদরটি মালিকের কাছে পৌছে দেই। তারা মোড়ক খুলে তার মধ্যে চাদরের পরিবর্তে পশম অথবা চামড়ার পরিধেয় দেখতে পায়। মেয়ে দু'টিকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা উভয়ে হযরত আয়েশা (রা)-কে বললো অথবা লিখে জানালো, এ ব্যাপারে গোলামটিকে সন্দেহ হচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে প্রকৃত ঘটনা স্বীকার করে। আয়েশা (রা) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তার হাত কাটা হলো। আয়েশা ((রা) বলেন, এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তার বেশী পরিমাণ জিনিস চুরি করলে হাত কাটা যাবে।

٦٨٩- عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِىْ عَهْدِ عُثْمَانَ اُتْرُجَّةً فَاَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ اَنْ تَقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ بِثَلْثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِيْنَارٍ فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ .

৬৮৯। আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। এক চোর হযরত উছমান (রা)-র খেলাফতকালে একটি জম্বির (জামির) চুরি করে। উছমান (রা) তার মূল্য নিরূপণের নির্দেশ দেন। তার মূল্য অনুমানে তিন দিরহাম নির্ণয় করা হলো। বারো দিরহামে এক দীনার। উছমান (রা) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কি পরিমাণ সম্পদ চুরি করলে হাত কাটা যাবে—তা নিয়ে মতভেদ আছে। মদীনার বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, এক-চতুর্থাংশ দীনার (তিন দিরহাম) পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যাবে। তারা নিজেদের মতের সমর্থনে উপরে উল্লেখিত তিনটি হাদীস পেশ করেন। ইরাকের বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে দশ দিরহামের কম পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। এই মতের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার (রা), উছমান (রা), আলী (রা), ইবনে মাসঊদ (রা) এবং আরো অনেক সাহাবা ও তাবিঈ থেকে হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। হদ্দ (সুনির্দিষ্ট অপরাধের শাস্তি) নির্ধারণে যখন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, তখন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাই গ্রহণ করা উচিত। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং হানাফী ফিক্হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে চোরের এক হাত অথবা এক হাত ও এক পা কাটা গেছে।

٦٩٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ اَقْطَعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَشَكٰى اِلَيْهِ اَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ ظَلَمَهُ قَالَ

فَكَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُوْلُ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَبِيْكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ ثُمَّ افْتَقَدُوْا حُلِيًّا لِاَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ اِمْرَاَةِ اَبِىْ بَكْرٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوْفُ مَعَهُمْ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ اَهْلَ هٰذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ فَوَجَدُوْهُ عِنْدَ صَائِغٍ زَعَمَ اَنَّ الْاَقْطَعَ جَاءَهُ بِهٖ فَاعْتَرَفَ بِهِ الْاَقْطَعُ اَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ فَاَمَرَ بِهٖ اَبُوْ بَكْرٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰى قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَاللّٰهِ لَدُعَاءُهُ عَلٰى نَفْسِهٖ اَشَدُّ عِنْدِىْ عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهٖ .

৬৯০। আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। ইয়ামানের এক ব্যক্তি মদীনায় আসে। তার এক হাত ও এক পা কাটা ছিল। সে আবু বাক্‌র (রা)-র বাড়ীতে আশ্রয় নিলো এবং তার কাছে নালিশ করলো যে, ইয়ামানের শাসক তার উপর জুলুম করেছেন। লোকটি রাতে নফল নামায পড়ছিল। আর আবু বাক্‌র (রা) বলেন, তোমার পিতার শপথ! তোমার এ রাত যেন চোরের রাত না হয়। ইত্যবসরে আবু বাক্‌র (রা)-র স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইসের গলার হার হারিয়ে যায়। ইয়ামানী ব্যক্তি তাদের সাথে চলাফেরা করতো আর বলতো, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এই নেক পরিবারের ঘরে চুরি করেছে, তুমি তাকে ধ্বংস করো। অনুসন্ধানের পর হারটি এক স্বর্ণকারের দোকানে পাওয়া যায়। স্বর্ণকার বললো, ঐ খোঁড়া লোকটি তাকে এই হার দিয়েছে। খোঁড়া লোকটি নিজের চুরির কথা স্বীকার করলো অথবা সাক্ষ্য-প্রমাণে সে দোষী সাব্যস্ত হলো। আবু বাক্‌র (রা) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। অতএব তার বাম হাত কাটা হলো। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তার চুরির তুলনায় তার নিজের জন্য নিজের বদদোয়া আমার কাছে অধিক ভয়ংকর মনে হয়েছে।

٦٩١- قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ يُرْوٰى ذٰلِكَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ سَرَقَ حُلِىَّ اَسْمَاءَ اَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنٰى فَقَطَعَ اَبُوْ بَكْرٍ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَكَانَتْ تُنْكِرُ اَنْ يَكُوْنَ اَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ اَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهٖ بِهٰذَا اَوْ نَحْوِهٖ مِنْ اَهْلِ بِلَادِهٖ وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُمَا لَمْ يَزِيْدَا فِى الْقَطْعِ عَلٰى قَطْعِ الْيَدِ الْيُمْنٰى وَالرِّجْلِ الْيُسْرٰى فَاِنْ اُتِىَ بِهٖ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمْ يَقْطَعَاهُ وَضَمَّنَاهُ وَهُوَ قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا .

৬৯১। ইবনে শিহাব যুহ্‌রী (র) বলেন, আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আসমা (রা)-র অলংকার চুরি করেছিল তার ডান হাত কাটা ছিল। অতএব আবু বাক্‌র (রা) তার বাম পা কাটার নির্দেশ দেন। তার এক হাত ও এক পা কাটা ছিল, এ কথা হযরত আয়েশা (রা) অস্বীকার করেছেন। আর ইবনে শিহাব (র) এই ধরনের খবর সম্পর্কে তার এলাকার লোকদের তুলনায় অধিক বেশী অবগত ছিলেন। তাছাড়া আমরা হযরত উমার (রা) এবং হযরত আলী (রা) সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, তারা উভয়ে চোরের ডান হাত ও বাম পায়ের অধিক অঙ্গ কাটার নির্দেশ দিতেন না। এই দু'টি অংগ কাটার পরও যদি কোন ব্যক্তি পুনরায় চুরি করে ধরা পড়তো, তবে তারা উভয়ে তার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করতেন, অংগ ছেদন করতেন না। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাস পালিয়ে যাওয়ার পর চুরির অপরাধ করলে।

٦٩٢- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْداً لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ اٰبِقٌ فَبَعَثَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَاَبٰى سَعِيْدٌ اَنْ يُقْطَعَ يَدَهُ قَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ الْاٰبِقِ اِذَا سَرَقَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَفِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَجَدْتَ هٰذَا اَنَّ الْعَبْدَ الْاٰبِقَ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ فَاَمَرَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ .

৬৯২। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র এক পলায়মান ক্রীতদাস চুরি করলো। তিনি তাকে সাঈদ ইবনুল আস (রা)-র কাছে হাত কাটার জন্য পাঠালেন। কিন্তু সাঈদ (রা) তার হাত কাটতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, গোলাম যদি পলায়মান অবস্থায় চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে না। ইবনে উমার (রা) তাকে বলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র কিতাবে এমন কোন নির্দেশ পেয়েছো যে, পলায়মান গোলাম চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে না? অতএব ইবনে উমার (রা) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তার হাত কাটা হলো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, গোলাম পলায়মান অবস্থায় চুরি করুক বা অন্য কোন অবস্থায়—উভয় ক্ষেত্রেই তার হাত কাটা যাবে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারী ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে চোরের হাত কাটা বৈধ নয়। কেননা শরীআত নির্ধারিত দণ্ড (হদ্দ) কার্যকর করার অধিকার এবং ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধান বা তার অধস্তন কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করা হয়েছে। (বর্তমান পরিভাষায় আমরা বলতে পারি, কেবল বিচার বিভাগই শরীআতী দণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দিতে পারে)। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ছিনতাইয়ের শাস্তি।

٦٩٣- حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ رَجُلاً اخْتَلَسَ شَيْئًا فِىْ زَمَنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَارَادَ مَرْوَانُ قَطْعَ يَدِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ .

৬৯৩। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। মারওয়ান ইবনুল হাকামের শাসনামলে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কোন জিনিস ছিনতাই করে। মারওয়ান তার হাত কাটতে চাইলেন। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) তার নিকট এলেন এবং তাকে অবহিত করলেন যে, এর হাত কাটা যাবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।[১]

---

১. হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ .

"আত্মসাতকারী, লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না" (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, বায়হাকী)।

এ হাদীসের সমর্থনে ইবনে মাজায় আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র সূত্রে, তাবারানীতে আনাস ইবনে মালেক (রা)-র সূত্রে এবং ইবনুল জাওযী থেকে ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। হাত কাটার পরিবর্তে এসব অপরাধের জন্য ভিন্নতর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ১২

اَبْوَابُ الْحُدُوْدِ فِى الزِّنَا

(যেনা-ব্যভিচারের শাস্তি)

১. অনুচ্ছেদ ঃ রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা)।

٦٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ الرَّجْمُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى حَقٌّ عَلٰى مَنْ زَنٰى اِذَا اُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ اَوْ كَانَ الْحَبْلُ اَوِ الاِعْتِرَافُ .

৬৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ কোন বিবাহিত পুরুষ বা স্ত্রীলোক যেনায় লিপ্ত হলে এবং তার সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে বা গর্ভধারণ অথবা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে তা প্রমাণিত হলে, এর শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্র কিতাবে রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যার ব্যবস্থা রয়েছে।[১]

---

১. এটা হযরত উমার (রা)-র একটি দীর্ঘ ভাষণের অংশবিশেষ। হজ্জশেষে মদীনায় ফিরে এসে তিনি এ ভাষণ দেন। পূর্ণ ভাষণটি সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে। কুরআনের যে আয়াতের মাধ্যমে রজমের শাস্তি প্রমাণিত, তার তিলাওয়াত রহিত হলেও হুকুম বহাল রয়েছে। আয়াতটি হচ্ছেঃ

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

"বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যেনায় লিপ্ত হলে তাদের উভয়কে অবশ্যই রজম করো। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিবিশেষ। আল্লাহ সর্বশক্তিমান সর্বজয়ী।"

এখানে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বলতে বিবাহিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের বুঝানো হয়েছে, তাই তারা পরিণত বয়সের যুবক হোক অথবা বৃদ্ধ। কারণ অবিবাহিত বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যেনায় লিপ্ত হলে তার শাস্তি রজম নয়, বরং বেত্রাঘাত। উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কে কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন, কুরআন মজীদে এই ধরনের কোন আয়াত নেই, যার তিলাওয়াত (পাঠ) মানসূখ (রহিত) হয়েছে অর্থাৎ মূল পাঠ কুরআন থেকে বাদ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তার নির্দেশ এখনও বহাল আছে। বিভিন্ন হাদীসে রজম সম্পর্কিত আয়াতের যে উল্লেখ আছে, তার ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, তা মূলত আল্লাহ পাকের নাযিলকৃত অপর একটি কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের আয়াত ছিল, কুরআনের আয়াত নয়। এই আয়াত মানসূখ হওয়ার অর্থ—যে কিতাবে এই আয়াত ছিল, সেই কিতাব মানসূখ হয়েছে, কিন্তু তার রজম সম্পর্কিত নির্দেশ বহাল রাখা হয়েছে (অনুবাদক)।

٦٩٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنًى اَنَاخَ بِالْاَبْطَحِ ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً مِنْ بَطْحَاءَ ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ ثُمَّ اسْتَلْقَى وَمَدَّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّيْ وَضَعُفَتْ قُوَّتِيْ وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِيْ فَاقْبِضْنِيْ اِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ وَصَفَّقَ بِاِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى اِلَّا اَنْ لَا تَضِلُّوْا بِالنَّاسِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا ثُمَّ قَالَ اِيَّاكُمْ اَنْ تَهْلِكُوْا عَنْ اٰيَةِ الرَّجْمِ اَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَمْنَا وَاَنَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ لَا اَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَتَبْتُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ فَاِنَّا قَدْ قَرَاْنَاهَا قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتّٰى قُتِلَ عُمَرُ .

৬৯৫। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছেন, হযরত উমার (রা) মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করে আবতাহ নামক স্থানে পৌঁছে নিজের উটকে বসালেন। অতঃপর তিনি কাঁকড়ের একটি স্তূপ বানিয়ে তার উপর নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর তার উপর চিত হয়ে শুয়ে তিনি নিজের হাত দু'টি আসমানের দিকে উত্তোলন করে বললেন ঃ

"হে আল্লাহ! আমার বয়স অনেক বেড়ে গেছে, আমার শক্তি কমে গেছে এবং আমার প্রজাদের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। অতএব তুমি আমাকে এমন অবস্থায় তোমার কাছে তুলে নাও যে, আমি শরীআতের বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ও বাড়াবাড়ি করিনি।"

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি মদীনায় পৌঁছে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন ঃ "হে জনগণ! তোমাদের জন্য সুন্নাতসমূহ নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং ফরজসমূহ বিধিবদ্ধ হয়েছে। তোমাদের একটি সুস্পষ্ট রাস্তার উপর উঠিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।" রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তার উভয় হাতে তালি বাজাতে বাজাতে বলেন, "সাবধান! তোমরা অন্য লোকের সাথে (এই পথ ছেড়ে) ডানে বা বাঁয়ে গিয়ে পথহারা হয়ে পড়ো না।" অতঃপর তিনি বলেন, "সাবধান! রজম সম্পর্কিত আয়াতকে কেন্দ্র করে তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। হয়তো কোন ব্যক্তি বলবে, আমরা আল্লাহ্র কিতাবে দু'টি হদ্দ (বেত্রাঘাত

ও রজম) দেখতে পাচ্ছি না। (শুনে রেখো), রাসূলুল্লাহ ﷺ রজমের শাস্তি কার্যকর করেছেন এবং আমরাও তা কার্যকর করেছি এবং করছি। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি লোকদের এই কথা বলার আংশকা না করতাম যে, খাত্তাবের পুত্র উমার আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে, তবে আমি তার মধ্যে নিম্নোক্ত আয়াত লিখে দিতামঃ

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَرْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ .

নিশ্চয় আমরাও এ আয়াত পাঠ করেছি।" সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, যিলহজ্জ মাস শেষ না হতেই উমার (রা) ঘাতকের হাতে শহীদ হন (তেইশ হিজরীর ২৬ যিলহজ্জ ঘাতকের তরবারির আঘাতে আহত হন এবং ২৪ হিজরীর পহেলা মুহাররম ইন্তেকাল করেন)।

٦٩٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ الْيَهُوْدَ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَاَخْبَرُوْهُ اَنَّ رَجُلاً مِّنْهُمْ وَاَمْرَاَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَجِدُوْنَ فِى التَّوْرٰةِ فِىْ شَاْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوْا نَفْضَحُهُمَا وَيُجْلَدَانِ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ اِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَاَتَوْا بِالتَّوْرٰةِ فَنَشَرُوْهَا فَجَعَلَ اَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلٰى اٰيَةِ الرَّجْمِ ثُمَّ قَرَاَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَاِذَا فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَالَ صَدَقْتَ (صَدَقَ) يَا مُحَمَّدُ فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ فَاَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَرَاَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنَاءُ عَلَى الْمَرْاَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ .

৬৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ইহূদীরা নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে অবহিত করলো যে, তাদের মধ্যকার একটি পুরুষলোক ও একটি স্ত্রীলোক যেনা করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করেন ঃ "রজম সম্পর্কে তাওরাতে তোমরা কি নির্দেশ পাচ্ছো?" তারা বললো, আমরা এদের অপমান করি এবং বেত্রাঘাত করি। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) তাদের বলেন, তোমরা মিথ্যা কথা বললে। তাওরাতে রজম করার নির্দেশ রয়েছে। তারা তাওরাত শরীফ নিয়ে এলো। তারা তাওরাত খুললো এবং তাদের এক ব্যক্তি রজম সম্পর্কিত আয়াতটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখে তার আগে-পিছের অংশ পাঠ করলো। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, তোমার হাত সরাও। সে তার হাত তুলে নিলেই রজম সম্পর্কিত আয়াত প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সে (হাত দিয়ে আয়াতটি ঢেকে রাখা ব্যক্তি) বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনি সত্য কথা বলেছেন। তাতে রজম সংক্রান্ত আয়াত বর্তমান আছে। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তাদের উভয়কে রজম করা হলো। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি যেনাকারী পুরুষটিকে

দেখেছি সে স্ত্রীলোকটিকে পাথরের আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য তার দিকে ঝুঁকে যেতো (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)।[২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এসব হাদীস ও আছার-এর উপর আমল করি। কোন স্বাধীন মুসলমান বিবাহিত ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে সংগম স্বাদ লাভ করার সুযোগ পাওয়ার পরও অপর কোন নারীর সাথে যেনায় লিপ্ত হলে তাকে রজমের শাস্তি দিতে হবে। কেননা এই ব্যক্তি মুহসান (বিবাহের দুর্গে সুরক্ষিত)। কিন্তু সে যদি স্ত্রীর সাথে যৌনস্বাদ আস্বাদনের সুযোগ না পেয়ে থাকে, বরং কেবল বিবাহ করেছে এবং সংগম করেনি অথবা তার কাছে ইহূদী বা খৃস্টান বাঁদী রয়েছে—তবে এসব কারণে সে মুহসান নয়। অতএব তাকে রজম করা যাবে না, বরং এক শত বেত্রাঘাত করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত।[৩]

---

২. বাইবেলে 'পুরাতন নিয়ম' নামে যে তাওরাত বর্তমানে চালু আছে তাতেও যেনার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড উল্লেখ আছে। যেমন, "আর যে ব্যক্তি পরের ভার্য্যার (স্ত্রী) সহিত ব্যভিচার করে, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর ভার্য্যার সহিত ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্যই হইবে" (লেবীয় পুস্তক, ২০ অধ্যায়, ১০ ও ১১ নং আয়াত। এজন্য আরো দ্রষ্টব্য ঃ দ্বিতীয় বিবরণ, ২২ অধ্যায়, ২২-২৬ আয়াত; যোহন, ৮ ঃ ১-১১)। ইহূদীদেরকে তাওরাতের এই আইন পরিবর্তন করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে যে, তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যেনা করলে তাদের লঘুদণ্ড দেয়া হতো, আর সাধারণ লোকেরা যেনা করলে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হলে তাদের বেলায়ও লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় (আবু দাউদ)।

ইহূদী, খৃস্টান বা অন্য ধর্মের কোন অমুসলিম নাগরিক বিবাহিত অবস্থায় যেনায় লিপ্ত হলে তার কি শাস্তি হবে, এ নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও আবু ইউসুফের মতে তাকেও রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করতে হবে। তারা এ হাদীস নিজেদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা ও মালেকের মতে যেনার ক্ষেত্রে রজমের শাস্তি কেবল মুসলমানদের উপর কার্যকর হবে (অনুবাদক)।

৩. যেনা একটি হারাম এবং চরম ঘৃণিত কাজ। ইসলামী আইনে তা দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই এ সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তৃতীয় হিজরী সনে যেনা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু তখনও তা পারিবারিক পর্যায়ের অপরাধ হিসাবে পরিবারের লোকেরাই এর শাস্তি কার্যকর করতো। প্রাথমিক পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, কোন নারী বা পুরুষকে যেনা করতে দেখেছে বলে চারজন পুরুষ সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয়, তবে উভয়কেই মারপিট করতে হবে এবং স্ত্রীলোকটিকে ঘরে আটক করে রাখতে হবে (সূরা নিসা, ১৫, ১৬ এবং ২৬ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)। এই আয়াত নাযিল হওয়ার আড়াই কি তিন বছর পর সূরা নূর-এ যেনার শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয় (প্রথম রুকূ দ্রষ্টব্য)। এরপর থেকে তা সরকারী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হয় এবং সরকারের বিচার বিভাগকে এর শাস্তি বিধানের দায়িত্ব দেয়া হয়।

যেনার আইনগত সংজ্ঞা নির্ধারণে ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফী ফিক্‌হবিদগণ নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ "একজন পুরুষের এমন এক স্ত্রীলোকের যৌনাংগে সংগম করা, যে তার

বিবাহিতা স্ত্রীও নয় এবং মালিকানাধীন দাসীও নয়, একথা মনে করারও কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই যে, সে তাকে নিজের স্ত্রী বা দাসী মনে করে তার সাথে এই সংগম করেছে।" এই সংজ্ঞা অনুযায়ী পায়খানার দ্বারে রতিক্রিয়া, লাওয়াতাত (Sodomy), পশুর সাথে যৌনক্রিয়া ইত্যাদি হদ্দযোগ্য যেনার পর্যায়ে পড়ে না। মালিকী ফিক্‌হবিদগণ নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ "শরীআত ভিত্তিক অধিকার কিংবা এর কোনরূপ সন্দেহ ছাড়াই যৌনাংগে বা মলদ্বারে পুরুষ বা নারীর সাথে রতিক্রিয়া করা।" শাফিঈ ফিক্‌হবিদগণ নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন ঃ "যৌনাঙ্গকে এমন যৌনাঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করানো, যা শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম, কিন্তু স্বভাবত এর প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ হতে পারে"। এই দু'টি সংজ্ঞার দৃষ্টিতে লাওয়াতাত যেনার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু মূলত তা যেনার পর্যায়ভুক্ত নয়। ইসলামী আইনে যেনা (Fornication) এবং পরস্ত্রীর সাথে যেনার (Adultry) মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই। পাশ্চাত্য আইন Fonication-কে একটি নগণ্য অপরাধ এবং Adultryকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করে।

সূরা নূর-এর আয়াতে কেবল অবিবাহিত নারী-পুরুষের যেনার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ, ইসহাক, দাউদ যাহেরী, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে আবু লায়লা ও হাসান ইবনে সালেহ-এর মতে অবিবাহিত নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে যেনার শাস্তি হচ্ছে এক শত বেত্রাঘাত (সূরা নূর, ২ নং আয়াত দ্রষ্টব্য) এবং এক বছরের নির্বাসন (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ)। ইমাম মালেক ও আওযাঈর মতে পুরুষ লোকটির শাস্তি হচ্ছে এক শত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন ও মেয়েলোকটির শাস্তি হচ্ছে শুধু এক শত বেত্রাঘাত। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং যুফারের মতে নারী-পুরুষ উভয়ের শাস্তি হচ্ছে এক শত বেত্রাঘাত। এর সাথে অন্য কোন শাস্তি (নির্বাসন বা জেলে আটক) যোগ করা শরীআত নির্ধারিত হদ্দ (حد) বা শাস্তি নয়, বরং তা হচ্ছে তাযীর (সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি)।

হদ্দ ও তাযীরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, হদ্দ হলো একটি সুনির্দিষ্ট শাস্তি। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার শর্তাবলী পূর্ণ হওয়ার পর এই শাস্তি অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। এর ধরন ও পরিমাণ শরীআত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আর তাযীর হচ্ছে দৃষ্টান্তমূলক বা সুবিবেচনা প্রসূত শাস্তি। এর ধরন ও প্রকৃতি শরীআত নির্দিষ্ট করে দেয়নি, বরং বিচার বিভাগ পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং অপরাধের ধরন ও প্রকৃতি অনুযায়ী এই শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

বিবাহিত নারী-পুরুষ যেনায় লিপ্ত হলে ইমাম আহমাদ, দাউদ যাহেরী এবং ইসহাকের মতে, তাদেরকে এক শত বেত্রাঘাত করার পর পাথর নিক্ষেপে হত্যা (রজম) করতে হবে। ইমাম আবু হানীফাসহ অপরাপর ফিক্‌হবিদের মতে তাদেরকে শুধু পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে। কেননা হদ্দ ও তাযীর একত্রে দেয়া যেতে পারে না।

দুইজন নারী-পুরুষকে এক বিছানায় পাওয়া গেলে কিংবা সংগমপূর্ব শৃংগারে লিপ্ত পাওয়া গেলে বা উভয়কে উলংগ অবস্থায় পাওয়া গেলেই তা তাদেরকে ব্যভিচারী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং সরাসরি সংগমে লিপ্ত দেখতে পাওয়া গেলেই তাদেরকে ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে যেনা প্রমাণ করা এবং তার ভিত্তিতে হদ্দ-এর শাস্তির ব্যবস্থা করা ইসলাম সমর্থন করে না। তবে জোরপূর্বক ধর্ষণের ক্ষেত্রে পরীক্ষার সাহায্য নেয়া যেতে পারে, যদি ধর্ষণকারী অপরাধ অস্বীকার করে। যেসব লোককে এ ধরনের নির্লজ্জ অবস্থায়

পাওয়া যাবে, তাদেরকে বিচারক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবেন। অথবা দেশের জাতীয় সংসদ এই অপরাধের শাস্তি বিধান করবে। তা যদি বেত্রাঘাত হয়, তবে তা দশটি বেত্রাঘাতের অধিক হতে পারবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আল্লাহ্‌র নির্ধারিত দণ্ড ছাড়া আর কোন দণ্ডেই দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)।

স্বামীহীন স্ত্রীলোকের এবং মনিবহীন ক্রীতদাসীর অন্তঃসত্তা প্রকাশ পেলে, শুধু এই গর্ভকে যেনা প্রমাণের জন্য অবস্থাগত সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করা হবে কিনা, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। হযরত উমার (রা) বলেন, 'যেনার জন্য এটাই যথেষ্ট প্রমাণ।' মালিকী মাযহাব এই মত গ্রহণ করেছে। কিন্তু অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের মতে অন্তঃসত্তা প্রকাশ পাওয়াটাই যেনার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কেবল এর ভিত্তিতে কাউকে মৃত্যুদণ্ড (রজম) বা বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া যেতে পারে না। এতো ভয়ংকর শাস্তি দেয়ার জন্য প্রত্যক্ষ সাক্ষী বর্তমান থাকতে হবে অথবা অপরাধীর স্বেচ্ছামূলক (বল প্রয়োগে নয়) স্বীকারোক্তি বর্তমান থাকতে হবে। ইসলামী আইনের একটি মূলনীতি হচ্ছে, 'সন্দেহ' শাস্তি দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। তা মাফ করে দেয়ার দিকটিই অধিক প্রকট করে তোলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "শাস্তিদান এড়িয়ে যাও, তা যতোদূর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব" (ইবনে মাজা)। তিনি আরও বলেন ঃ "মুসলমানদের ব্যাপারে শরীআতের দণ্ডসমূহ যতোদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখো। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের কোন পথ পায়, তবে তাকে সে সুযোগ গ্রহণ করতে দাও। কেননা শাসকের জন্য কাউকে ভুল করে মাফ করে দেয়া, ভুল করে শাস্তি দেয়ার চেয়ে উত্তম (তিরমিযী)।

নিজের মাহরাম (যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম) আত্মীয়ের সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়া সাধারণ পর্যায়ের যেনার তুলনায় অধিকতর ঘৃণিত ও মারাত্মক অপরাধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ধরনের অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন এবং তাদের সম্পত্তি (সরকার কর্তৃক) বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশও দিয়েছেন (আবু দাউদ, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)। ইমাম আহমাদের মতে এই ধরনের অপরাধীকে হত্যা করা ও তার যাবতীয় সম্পত্তি ক্রোক করা আবশ্যক। ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও শাফিঈর মতে, কোন ব্যক্তি মাহরাম আত্মীয়ের সাথে যেনা করলে তাকে যেনার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি দিতে হবে।

সাক্ষী

কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, যেনা প্রমাণের জন্য অন্ততপক্ষে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী ন্যায়পরায়ণ মুসলমান পুরুষ সাক্ষী বর্তমান থাকতে হবে। সাক্ষী না পাওয়া গেলে বিচারক শুধু নিজের জানার বা দেখার ভিত্তিতে কাউকে শাস্তি দিতে পারবে না। এমন সাক্ষী বর্তমান থাকতে হবে, যাদের মধ্যে ইসলামের সাক্ষ্য আইনের শর্তাবলী বর্তমান আছে। যেমন পূর্বে সে কোন মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে বলে প্রমাণ নাই, সে আত্মসাৎকারী নয়, পূর্বে কখনো শাস্তিপ্রাপ্ত হয়নি ইত্যাদি। মোটকথা অবিশ্বস্ত লোকের সাক্ষীর ভিত্তিতে কাউকে রজমের মতো কঠিন শাস্তি দেয়া যেতে পারে না। সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিবে যে, তারা একত্রে চাক্ষুসভাবে অভিযুক্তদ্বয়কে সংগমকার্য সম্পন্ন করতে দেখেছে, যেমন সুরমাদানীর ভেতরে সুরমা-শলাকা এবং কূপের ভেতরে পানি তোলার রশি সংরক্ষিত থাকে ঠিক সেভাবে। তারা কবে, কোথায় এবং কাকে কার সাথে যেনায় লিপ্ত দেখেছে, এ বিষয়ে তাদের সাক্ষ্য অভিন্ন হতে হবে। এসব মৌলিক বিষয়ে মতভেদ হলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

লাওয়াতাত

পুরুষে পুরুষে যৌন সম্ভোগকে লাওয়াতাত বলে। এই জাতীয় নিকৃষ্ট অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিৎ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি এই অপরাধ করে এবং যার সাথে করে তাদের উভয়কে হত্যা করো, এরা বিবাহিত হোক কি অবিবাহিত।" অপর হাদীসে আছে, "যে উপরে থাকে আর যে নিচে থাকে, এদের উভয়কেই পাথর নিক্ষেপে হত্যা করো।" কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এ ধরনের কোন অপরাধ সংঘটিত হয়নি বলে এর বিচারের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে বর্তমান নেই। হযরত আলী (রা)-র মতে অপরাধীকে তরবারির আঘাতে হত্যা করতে হবে এবং তার লাশ দাফন করার পরিবর্তে আগুনে পুড়ে ফেলতে হবে। হযরত আবু বাক্র (রা)-রও এই মত। হযরত উমার ও উছমান (রা)-র মতে তাকে কোন ভগ্নপ্রায় দালানের নিচে দাঁড় করিয়ে গোটা দালানটি তার উপর ধ্বসিয়ে দিতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র ফতোয়া হচ্ছে, এলাকার সর্বোচ্চ দালানের ছাদের উপর থেকে তাকে উল্টিয়ে ফেলে দিতে হবে এবং সাথে সাথে তার উপর পাথর বর্ষণ করতে হবে।

ফিক্হবিদদের মধ্যে ইমাম শাফিঈর মতে এই পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদ্বয়কে হত্যা করা ওয়াজিব, তারা বিবাহিত হোক কি অবিবাহিত। ইমাম শাবী, যুহ্রী, মালেক ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে, এদেরকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা (রজম) করতে হবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, আতা, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান সাওরী ও আওযাঈর মতে এরা অবিবাহিত হলে প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে, আর বিবাহিত হলে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে এই অপরাধের কোন শাস্তি নির্ধারিত নেই। এর জন্য তাযীর রয়েছে। বিচার বিভাগ এদের জন্য কোন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারে। ইমাম শাফিঈরও একটি কথা থেকে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

স্ত্রীর বাহ্যদ্বারেও স্বামীর এই কাজ সম্পূর্ণ হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদ্বারে যৌনতৃপ্তি লাভ করে সে অভিশপ্ত" (আবু দাউদ)। "যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করে কিংবা স্ত্রীর পশ্চাদ্বারে যৌনতৃপ্তি লাভ করে অথবা কোন গণৎকারের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর নাযিলকৃত বিধানের প্রতি কুফরী করে" (তিরমিযী)। "যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর পশ্চাদ্বারে সংগম করে, আল্লাহ তার দিকে রহমাতের দৃষ্টিতে তাকাবেনও না" (ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ)।

পশুর সাথে যেনা

পশুর সাথে যৌনক্রিয়াকে কোন কোন ফিক্হবিদ যেনার মধ্যে গণ্য করেন এবং এ ধরনের অপরাধীকে যেনার শাস্তি দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও যুফার (র) বলেন, এটা যেনা নয়। অতএব এই কাজে লিপ্ত অপরাধীকে যেনার শাস্তি দেয়া যাবে না। তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে।

ভিনদেশী নাগরিক যেনা করলে

যে ব্যক্তি অন্য দেশ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে এখানে এসেছে, সে যদি এখানে যেনায় লিপ্ত হয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফের মতে তাকেও যেনার শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদের মতে তাকে যেনার শাস্তি দেয়া যাবে না।

বিচার বিভাগ শাস্তির নির্দেশ দিবে

ইসলামী আইন রাষ্ট্রীয় সংস্থা ছাড়া অপর কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে যেনার শাস্তিসহ অন্য যে কোন শাস্তি কার্যকর করার অধিকার বা এখতিয়ার দেয় না। তোমরা বেত্রাঘাত করো (فاجلدوا) বলে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ ও বিচারক মণ্ডলীকেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাতের সকল ফিক্‌হবিদ ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন। বিচার বিভাগ সাক্ষ্য-প্রমাণ ও তদন্তের ভিত্তিতে অপরাধীর কি ধরনের শাস্তি হবে তার রায় প্রদান করবে এবং প্রশাসন তা কার্যকর করবে। ইসলামী শরীআত কোন ব্যক্তিকে নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার অধিকার দেয় না।

শাস্তি কার্যকর করার পর অপরাধী মারা গেলে তার সাথে ব্যবহার

যেনার শাস্তি কার্যকর করার পর অপরাধী মারা গেলে তার সাথে পুরাপুরিভাবে একজন মুসলমানের মত ব্যবহার করতে হবে। তার কাফন-দাফন করতে হবে এবং তার জানাযাও পড়তে হবে। তাকে সসম্মানে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। তাকে খারাপভাবে স্মরণ করা কারো পক্ষে জায়েয নয়। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, "রজম করার ফলে মায়েয আসলামী যখন মারা গেলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে খুব ভালো মন্তব্য করলেন এবং নিজেই তার জানাযা পড়ালেন" (বুখারী)। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "তোমরা মায়েয ইবনে মালেকের জন্য মাগফিরতের দোয়া করো। সে এমন তওবা করেছে যে, তা যদি সমস্ত উম্মাতের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়, তবে তা সকলের জন্যই যথেষ্ট হবে (মুসলিম)।

যুহায়না গোত্রের গামেদ উপ-শাখার এক মহিলা যখন রজম করার পর মারা গেলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তার জানাযা পড়ালেন। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) তাকে খারাপ ইংগিতে স্মরণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "খালিদ! থামো!! যেই মহান সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! গামেদিয়া এমন তওবা করেছে যে, তা যদি কোন কর আদায়কারী উৎপীড়কও করতো তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হতো।" ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। গামেদিয়ার জানাযা পড়ার প্রাক্কালে হযরত উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এখন কি এই যেনাকারী মেয়েলোকটির জানাযা পড়া হবে? তখন নবী ﷺ বললেন ঃ "হাঁ, মেয়েলোকটি এমন তওবা করেছে যে, তা যদি গোটা মদীনাবাসীর মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়, তবে তা তাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হবে (মুসলিম)।

এক ব্যক্তিকে শরাব পানের অপরাধে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তখন কেউ বলে উঠলো, আল্লাহ তোমাকে লজ্জিত ও অপমানিত করুন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "না, এরূপ বলো না। তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না" (বুখারী)। অপর বর্ণনায় আছে, "এরূপ বলো না, বরং এরূপ বলো ঃ হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তাকে দয়া করো" (আবু দাউদ)। এই হচ্ছে ইসলামী আইনের শাস্তি ও দণ্ড আইনের অন্তর্নিহিত ভাবধারা। ইসলাম কাউকে শত্রুতার ভাবধারা নিয়ে শাস্তি দেয় না, বরং কল্যাণের ভাবধারা নিয়েই শাস্তি দেয়। অথচ তথাকথিত সভ্য আইনের অধীনে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলে কেউ তার লাশ তুলতেও রাজী হয় না। কারো মুখে তার সম্পর্কে ভালো উক্তিও শোনা যায় না। এই হীনতা ও সংকীর্ণতা কেবল আধুনিক সভ্যতারই দান (অনুবাদক)।

২. অনুচ্ছেদ ঃ যেনার স্বীকারোক্তি।

٦٩٧-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَدُهُمَا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَقَالَ الْاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُهُمَا اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَائْذَنْ لِّىْ فِىْ اَنْ اَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا يَعْنِىْ اَجِيْرًا فَزَنٰى بِامْرَاَتِهٖ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّ عَلٰى ابْنِىْ جَلْدُ مِائَةٍ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِّىْ ثُمَّ اِنِّىْ سَئَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّمَا عَلٰى ابْنِىْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاِنَّمَا الرَّجْمُ عَلٰى امْرَاَتِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتٰبِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَاَمَرَ اُنَيْسًا الْاَسْلَمِىَّ اَنْ يَّاْتِىَ امْرَاَةَ الْاٰخَرِ فَاِنْ اعْتَرَفَتْ فَرْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

৬৯৭। আবু হুরায়রা (রা) এবং যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি বিবাদ মীমাংসার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে উপস্থিত হলো। তাদের একজন বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে দিন। অপর ব্যক্তি, যে দু'জনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ছিল, বললো, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে কথা বলার অনুমতি দিন। তিনি বলেন ঃ 'বলো'। সে বললো, আমার ছেলে তার বাড়িতে শ্রমিকের কাজ করতো। সে এই ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে যেনা করে বসে। লোকেরা আমাকে বললো, আমার ছেলেকে রজম করতে হবে। আমি তাকে এক শত বকরী এবং আমার একটি বাঁদী দেয়ার বিনিময়ে আমার ছেলেকে মুক্ত করে নিয়েছি। অতঃপর আমি বিশেষজ্ঞ আলেমদের কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা আমাকে বলেন যে, আমার ছেলেকে এক শত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে। আর তার স্ত্রীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের মাঝে আল্লাহ তাআলার কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবো। তোমার বকরী ও বাঁদী তোমাকে ফেরত দেয়া হচ্ছে। তিনি তার ছেলেকে এক শত বেত্রাঘাত করার এবং এক বছরের নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অপরদিকে তিনি উনাইস আল-আসলামী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি অপর ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে গিয়ে এ

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখবেন। যদি সে যেনার স্বীকারোক্তি করে তবে তাকে রজম করতে হবে। স্ত্রীলোকটি যেনার অপরাধ স্বীকার করলো এবং তাকে রজম করা হলো।[৪]

٦٩٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا زَنَتْ وَهِىَ حَامِلٌ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذْهَبِىْ حَتّٰى تَضَعِىْ فَلَمَّا وَضَعَتْ اَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا اذْهَبِىْ حَتّٰى تُرْضِعِىْ فَلَمَّا اَرْضَعَتْ اَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا اذْهَبِىْ حَتّٰى تَسْتَوْدِعِيْهِ فَاسْتَوْدَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْهُ فَاَمَرَ بِهَا فَاُقِيْمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ .

৬৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। এক স্ত্রীলোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাকে জানায় যে, সে যেনা করেছে এবং সে গর্ভবতী। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ "চলে যাও যতোক্ষণ সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয়"। সন্তান প্রসব করার পর সে পুনরায় তাঁর কাছে এলো। তিনি তাকে বলেন ঃ "চলে যাও বাচ্চা যতোদিন দুধ না ছাড়ে।" বাচ্চা যখন দুধ ছাড়লো, তখন সে আবার তাঁর কাছে এলো। তিনি তাকে বলেন ঃ "চলে যাও বাচ্চা কারো কাছে অর্পণ করে আসো"। অতএব সে কারো কাছে বাচ্চাকে সোপর্দ করে তাঁর কাছে ফিরে এলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী তার উপর হদ্দ কার্যকর করা হলো।

٦٩٩- اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عَلٰى نَفْسِهِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَاَمَرَ بِهِ فَحُدَّ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَمِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ يُؤْخَذُ الْمَرْءُ بِاعْتِرَافِهِ عَلٰى نَفْسِهِ .

৬৯৯। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যেনা করেছে বলে স্বীকারোক্তি করে এবং নিজের বিরুদ্ধে চারবার স্বীকারোক্তি করে। তিনি তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী হদ্দ কার্যকর করা হলো। ইবনে শিহাব (র) বলেন, এ কারণেই কোন ব্যক্তি নিজ অপরাধের স্বীকারোক্তি করলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

٧٠٠- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ اَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلٰى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَوْطٍ فَاُتِىَ بِسَوْطٍ مَكْسُوْرٍ فَقَالَ فَوْقَ هٰذَا

---

৪. এ হাদীস থেকে জানা গেলো যে, এই ধরনের অপরাধের মামলায় বাদীপক্ষ কোনক্রমে রাজী হলেই এবং আপত্তি প্রত্যাহার করলেই মামলা খারিজ হবে না। এ থেকে আরো জানা যায় যে, ইসলামী আইনে সতীত্ব ও পবিত্রতা বিনষ্ট হলে টাকা-পয়সা দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ করা যায় না। ইজ্জত-আবরুর মূল্য দেওয়ার এই কদর্য রীতি পাশ্চাত্য আইনেই শোভা পায় (অনুবাদক)।

فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيْدٍ لَمْ تَقْطَعْ ثَمَرَتُهُ فَقَالَ بَيْنَ هٰذَيْنِ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهٖ فُلَانٌ فَأَمَرَ بِهٖ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اٰنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوْا عَنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَمَنْ أَصَابَ مِنْ هٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৭০০। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নিজের বিরুদ্ধে যেনার স্বীকারোক্তি করে। তিনি একটি চাবুক নিয়ে ডাকলেন। একটি ভাঙ্গা চাবুক আনা হলো। তিনি বলেন ঃ "এর চেয়ে ভালো চাবুক লও"। অতএব একটি নতুন চাবুক নিয়ে আসা হলো যা তখনো ব্যবহার করা হয়নি। তিনি বলেন ঃ "এই দু'টির মাঝামাঝি ধরনের চাবুক নিয়ে এসো।" অতএব একটি চাবুক নিয়ে আসা হলো যা কোন ব্যক্তি ব্যবহার করেছে। তিনি তাকে মারার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাকে চাবুক মারা হলো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ "হে জনগণ! তোমাদের জন্য সেই সময় এসে গেছে যে, তোমরা আল্লাহ্র নির্ধারিত হদ্দ (পাপ) থেকে বিরত থাকো। যে ব্যক্তি এ ধরনের পাপকাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে সে যেন তা আল্লাহ্র পর্দার অন্তরালে গোপন রাখে। আর যে ব্যক্তি নিজের অপকর্মের কথা আমাদের কাছে প্রকাশ করবে, আমরা তার উপর মহান আল্লাহ্র বিধান কার্যকর করবো"।

٧٠١- عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ عَلٰى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْمَلَهَا ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلٰى نَفْسِهٖ أَنَّهُ زَنٰى وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهٖ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَجُلِدَ الْحَدُّ ثُمَّ نُفِيَ إِلٰى فَدَكَ .

৭০১। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি কুমারী বাঁদীর সাথে যেনা করে এবং তার ফলে সে গর্ভবতী হয়। অতঃপর লোকটি এসে নিজের যেনার কথা স্বীকার করে। সে ছিল অবিবাহিত। আবু বাক্‌র (রা) তাকে চাবুক মারার নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তাকে বেত্রাঘাত করা হলো। অতঃপর তাকে ফাদাক এলাকায় নির্বাসন দেয়া হয়।

٧٠٢- حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ أَنَّ رَجُلاً مِّنْ أَسْلَمَ أَتٰى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّ الْأٰخِرَ قَدْ زَنٰى قَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ هَلْ ذَكَرْتَ هٰذَا لِأَحَدٍ غَيْرِيْ قَالَ لَا قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ تُبْ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ قَالَ سَعِيْدٌ فَلَمْ تَقِرَّ بِهٖ نَفْسُهُ حَتّٰى أَتٰى عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ لِاَبِى بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَمَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ سَعِيْدٌ فَلَمْ تَقِرَّ بِهِ نَفْسُهُ حَتّٰى اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ الْاٰخِرُ قَدْ زَنٰى قَالَ سَعِيْدٌ فَاَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ مِرَارًا كُلَّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حَتّٰى اِذَا اَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ اِلٰى اَهْلِهِ فَقَالَ اَيَشْتَكِىْ اَمْ بِهِ جِنَّةٌ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَصَحِيْحٌ قَالَ اَبِكْرٌ اَمْ ثَيِّبٌ قَالَ ثَيِّبٌ فَاَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ .

৭০২। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছি, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি আবু বাক্র (রা)-র কাছে এসে বললো, এই দুর্ভাগা যেনা করেছে। আবু বাক্র (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি ছাড়া আর কারো কাছে তুমি কি তা বলেছো? সে বললো, না। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কাছে তওবা করো এবং আল্লাহ্র পর্দার মধ্যে তোমার অপরাধ লুকিয়ে রাখো। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, আবু বাক্র (রা)-র কথায় তার মন আশ্বস্ত হলো না। অতএব সে উমার (রা)-র কাছে এসে আবু বাক্র (রা)-র নিকট বলা কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলো। উমার (রা)-ও তাকে আবু বাক্র (রা)-র অনুরূপ পরামর্শ দিলেন। কিন্তু এবারও তার মন আশ্বস্ত হলো না। অতএব সে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললো, এই হতভাগা যেনা করেছে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, নবী ﷺ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে কয়েকবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিবারই তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। সে যখন বারবার নিজের অপরাধের স্বীকারোক্তি করতে লাগলো, তখন তিনি তার পরিবারের লোকদের ডাকলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সে অসুস্থ না পাগল?" তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সে কি বিবাহিত না অবিবাহিত?" তারা বললো, বিবাহিত। অতএব তিনি তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী তাকে রজম করা হলো।

٧٠٣- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِّنْ اَسْلَمَ يُدْعٰى هَزَّالاً يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَّكَ قَالَ يَحْيٰى فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فِىْ مَجْلِسٍ فِيْهِ يَزِيْدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ فَقَالَ هَزَّالٌ جَدِّىْ وَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ حَقٌّ .

৭০৩। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জানতে পেরেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলাম গোত্রের হায্যাল নামক এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ "হে হায্যাল! তুমি যদি এ

অপরাধ তোমার চাদরের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে তবে তোমার জন্য ভালোই হতো"। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, আমি এক মজলিসে এই হাদীস বর্ণনা করলাম এবং সেখানে ইয়াযীদ ইবনে নুআইম ইবনে হায্যাল উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, হায্যাল আমার দাদা ছিলেন এবং হাদীসটি সহীহ ও প্রমাণিত।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা উল্লেখিত হাদীসসমূহের উপর আমল করি। কোন ব্যক্তি কর্তৃক যেনার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই তার উপর হদ্দ (শাস্তির দণ্ড) কার্যকর করা যাবে না, যতোক্ষণ সে চারটি ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে চারবার যেনার অপরাধ স্বীকার না করে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং হানাফী বিশেষজ্ঞ আলেমদের এটাই সাধারণ মত। চারবার যেনার স্বীকারোক্তি করার পর সে যদি তা প্রত্যাহার করে, তবে তার এই প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাকে ছেড়ে দিতে হবে।[৫]

---

৫. ইসলামী আইন এটা জরুরী মনে করে না যে, যেনাকারী অবশ্যই তার অপরাধ স্বীকার করবে অথবা যেসব লোক তাকে যেনায় লিপ্ত দেখেছে, তারা এসে শাসকবর্গকে তা অবহিত করবে। এ ধরনের বাধ্যবাধকতা ইসলামী আইনে নেই। কিন্তু অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গেলে শাসকবর্গের তা ক্ষমা করে দেয়ার এখতিয়ার আর থাকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি এসব কদর্য অপরাধের কোন একটিতে লিপ্ত হয়, সে যেন তা আল্লাহ্র বিছানো পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু সে যদি আমাদের সামনে তার পর্দা খুলে দেয়, তবে আমরা তার উপর আল্লাহ্র কিতাবের আইন কার্যকর করবো" (জাস্সাসের আহ্কামুল কুরআন)।

মায়েয ইবনে মালেক আল-আসলামী (রা) যেনার অপরাধ করলে হাযযাল ইবনে নুআইম তাকে বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে নিজ অপরাধের কথা স্বীকার করো। তিনি তাঁর কাছে এসে নিজ অপরাধের কথা প্রকাশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিকে তাকে রজমের শাস্তি দেন এবং অপরদিকে হাযযালকে বলেন ঃ "তুমি যদি তার অপরাধ লুকিয়ে রাখতে—প্রকাশ না করতে, তবে তা তোমার জন্য ভালোই হতো" (আবু দাউদ)। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন ঃ "আল্লাহ্র শাস্তিসমূহ আপোসে ক্ষমা করে দিতে হবে। কিন্তু শাস্তিযোগ্য যে অপরাধের খবর আমাদের কাছে পৌছবে, তার শাস্তি বিধান আমাদের উপর বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে" (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

সাক্ষ্য ছাড়া আর যে জিনিসের মাধ্যমে যেনার অপরাধ প্রমাণিত হয়, তা হচ্ছে অপরাধীর নিজ স্বীকারোক্তি। তাকে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করতে হবে যে, সে একটি মেয়েলোকের সাথে এমনভাবে যেনা করেছে, যেভাবে সুরমা-শলাকা সুরমাদানীর মধ্যে ঢুকানো থাকে। সেই সাথে আদালতকেও পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে যে, অপরাধী বাইরের কোনরূপ চাপ ছাড়াই স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তার অপরাধ স্বীকার করছে। ইমাম আবু হানীফা, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে আবু লায়লা, ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়হ ও হাসান ইবনে সালেহ-এর মতে একবার স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়, বরং আলাদাভাবে চারবার স্বীকারোক্তি করতে হবে। ইমাম মালেক, শাফিঈ, উছমান আল-বাত্তি ও হাসান বসরীর মতে একবারের স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট।

কিন্তু শাস্তিদানের মুহূর্তে অথবা তার পূর্বে যদি অপরাধী স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে তবে তার শাস্তিদান বন্ধ রাখতে হবে, সে শাস্তির ভয়েই এই স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করুক না কেন। মায়েয আসলামী (রা)-র গায়ে যখন পাথর পড়তে লাগলো, তিনি পালাতে লাগলেন আর বললেন, হে লোকেরা! তোমরা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ফেরত নিয়ে যাও। আমার কবিলার

৩. অনুচ্ছেদ ঃ বল প্রয়োগে যেনা করতে বাধ্য করা হলে।

٧٠٤- حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُوْمُ عَلَى رَقِيْقِ الْخُمُسِ وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِّنْ ذٰلِكَ الرَّقِيْقِ فَوَقَعَ بِهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ وَلَمْ يُجْلَدِ الْوَلِيْدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا .

৭০৪। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। একটি ক্রীতদাস খুমুসের (এক-পঞ্চমাংশ) খাত থেকে প্রাপ্ত বাঁদী অথবা গোলামদের দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে জোরপূর্বক একটি বাঁদীর সাথে যেনা (ধর্ষণ) করে। হযরত উমার (রা) তাকে বেত্রদণ্ড দিলেন এবং নির্বাসনে পাঠালেন, কিন্তু বাঁদীটিকে বেত্রাঘাত করেননি। কেননা সে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে।

লোকেরা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। তারা বলেছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিবেন না। কিন্তু দায়িত্বশীল লোকেরা তার কথা শুনেনি এবং তারা তাকে মেরে ফেলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা জানতে পেরে বলেন ঃ "তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না কেন? তাকে আমার কাছে নিয়ে আসতে। হয়তো সে তওবা করতো এবং আল্লাহ তার তওবা কবুল করতেন।

যে ব্যক্তি এসে অপরাধ স্বীকার করবে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না যে, সে কার সাথে যেনা করেছে। কারণ এতে একজনের পরিবর্তে দু'জনকে দণ্ড দিতে হয়। অথচ শরীআত মানুষকে ধরে ধরে শাস্তি দেয়ার পক্ষপাতী নয়। অবশ্য অপরাধী যদি বলে যে, সে অমুক স্ত্রীলোকের সাথে যেনা করেছে, তবে নিশ্চয় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সেও যদি অপরাধ স্বীকার করে তবে তাকেও শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু সে যদি অস্বীকার করে তবে কেবল স্বীকারোক্তিকারীকেই শাস্তি দেয়া হবে।

এক্ষেত্রে স্বীকারোক্তিকারীকে যেনার শাস্তি দেয়া হবে না যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি (আশি বেত্রাঘাত) দেয়া হবে, তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম মালেক ও শাফিঈর মতে তাকে যেনার শাস্তিই দেয়া হবে। কারণ সে নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করেছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও আওযাঈর মতে তাকে যেনার মিথ্যা অপবাদের শাস্তি দিতে হবে। কেননা দ্বিতীয় পক্ষের অস্বীকৃতি তার যেনার অপরাধকে সন্দেহপূর্ণ করে তুলেছে। ইমাম মুহাম্মাদের মতে, তাকে যেনার শাস্তিও দেয়া হবে এবং মিথ্যা অপবাদের শাস্তিও দেয়া হবে। কেননা সে নিজেই যেনার স্বীকারোক্তি করেছে, অপরদিকে অন্যের উপর যেনার অপবাদ আরোপ করেছে। ইমাম শাফিঈর একটি কথাও এই মতের সমর্থন করে। "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে স্বীকারোক্তি করে যে, সে অমুক স্ত্রীলোকের সাথে যেনা করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মেয়েটিকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলে সে তা অস্বীকার করে। তাই তিনি পুরুষ লোকটির উপর শাস্তি কার্যকর করেন এবং মেয়েলোকটিকে ছেড়ে দেন" (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)।

অপর এক বর্ণনায় আছে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে তার উপর যেনার শাস্তি কার্যকর করেন। অতঃপর স্ত্রীলোকটির কাছে জিজ্ঞেস করা হলে সে তা অস্বীকার করে। অতঃপর তিনি পুরুষলোকটির উপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তিও কার্যকর করেন" (আবু দাউদ, নাসাঈ)। কিন্তু সনদের দিক থেকে হাদীসটি দুর্বল। এর এক রাবী কাসিম ইবনে ফাইয়াদকে হাদীস বিশারদগণ বিশ্বাসের অযোগ্য ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া নবী ﷺ এক পক্ষের বক্তব্য শুনেই রায় দিবেন, তা কল্পনা করা যায় না। তাই হাদীসটি বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও গ্রহণযোগ্য নয় (অনুবাদক)।

٧٠٥- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضٰى فِىْ امْرَاَةٍ اُصِيْبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلٰى مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ .

৭০৫। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। একটি স্ত্রীলোককে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হলে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ধর্ষণকারীকে (স্ত্রীলোকটির) মুহর প্রদান করার নির্দেশ দেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি কোন স্ত্রীলোককে যেনা করতে বাধ্য করা হয়, তবে তার উপর হদ্দ (শাস্তি) কার্যকর হবে না। আর যে ব্যক্তি জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে তার উপর হদ্দ কার্যকর হবে। তার উপর যখনই হদ্দ কার্যকর হয় তখনি মুহর প্রদানের বাধ্যবাধকতা বাতিল হয়ে যায়। কারণ একই সংগমে হদ্দ এবং মুহর দুটোই কার্যকর হতে পারে না। কোনরূপ সন্দেহের কারণে হদ্দ মওকুফ হলে তার উপর মুহর প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। ইমাম আবু হানীফা, ইবরাহীম নাখঈ এবং আমাদের ফিক্হবিদদের এটাই সাধারণ মত।[৬]

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাস যেনা করলে বা শরাব পান করলে তার শাস্তি।

٧٠٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِىِّ قَالَ اَمَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِىْ فِتْيَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِّنْ وَلَائِدِ الْاِمَارَةِ خَمْسِيْنَ خَمْسِيْنَ فِى الزِّنَا .

৭০৬। আবদুল্লাহ ইবনে আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআ আল-মাখযূমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে এবং কয়েকটি যুবককে হদ্দ কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন। অতএব গনীমাতের খাতে প্রাপ্ত যেসব বাঁদী যেনায় লিপ্ত হয়, আমরা তাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশটি করে চাবুক মারি।

---

৬. জোর-জবরদস্তির কারণে কেউ যদি যেনা করতে বাধ্য হয়, তবে সে অপরাধীও সাব্যস্ত হবে না এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্যও হবে না। এক্ষেত্রে শুধু "কেউ জবরদস্তি কাজের জন্য দায়ী নয়" শরীআতের এই সাধারণ মূলনীতিই প্রযোজ্য নয়, বরং স্বয়ং কুরআন মজীদই জোরপূর্বক ধর্ষিতা মহিলাদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করেছে (সূরা নূর-এর ৩৩ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)। হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এক্ষেত্রে কেবল ধর্ষণকারীকেই শাস্তি দেয়া হয়েছে। "একটি স্ত্রীলোক অন্ধকারে নামাযে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হলো। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে ধরে ফেলে এবং জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। তার চিৎকারে চারদিক থেকে লোক জড়ো হলো এবং ধর্ষণকারী ধরা পড়লো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে রজম করলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে রেহাই দিলেন" (তিরমিযী, দারু কুতনী, ইবনে মাজা, বায়হাকী)। এসব দলীলের ভিত্তিতে ফিক্হবিদগণ একমত হয়ে বলেছেন যে, এক্ষেত্রে ধর্ষিতা মহিলার কোন শাস্তি হবে না। অপরদিকে পুরুষ লোককেও যদি জোরপূর্বক যেনা করতে বাধ্য করা হয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, শাফিঈ ও হাসান ইবনে সালেহ-এর মতে তাকেও ক্ষমা করা হবে (অনুবাদক)।

٧٠٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنْ زَيْد بْنِ خَالد الْجُهَنِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْاَمَةِ اِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ اِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ اَدْرِىْ اَبَعْدَ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ .

৭০৭। আবু হুরায়রা (রা) ও যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-কে অবিবাহিতা বাঁদী যেনায় লিপ্ত হলে তার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেনঃ "সে যেনায় লিপ্ত হলে তকে চাবুক মারো, পুনরায় যেনায় লিপ্ত হলে তাকে চাবুক মারো, পুনরায় যেনায় লিপ্ত হলে তাকে চাবুক মারো। এরপর তাকে একটি দড়ির বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দাও"। ইবনে শিহাব (র) বলেন, তৃতীয়বার যেনায় লিপ্ত হওয়ার পর না চতুর্থবার যেনায় লিপ্ত হওয়ার পর বিক্রি করার কথা বলা হয়েছে–তা আমি জানি না। 'দাফীর' শব্দের অর্থ রশি বা দড়ি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। যেনার শাস্তি স্বরূপ গোলাম ও বাঁদীদের পঞ্চাশ ঘা চাবুক মারতে হবে অর্থাৎ আযাদ মহিলাদের শাস্তির অর্ধেক। যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং শরাব অথবা নেশা উদ্রেককারী জিনিস পান করার ক্ষেত্রেও এই একই হুকুম (স্বাধীনদের শাস্তির অর্ধেক)। ইমাম আবু হানীফা এবং অধিকাংশ হানাফী ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

٧٠٨- اَخْبَرَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَنَّهُ جَلَّدَ عَبْدًا فِىْ فِرْيَةٍ ثَمَانِيْنَ قَالَ اَبُو الزِّنَادِ فَسَئَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَ اَدْرَكْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَاَيْتُ اَحَدًا ضَرَبَ عَبْدًا فِىْ فِرْيَةٍ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ .

৭০৮। আবুয যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার অপরাধে একটি ক্রীতদাসকে আশি ঘা চাবুক মারেন। আবুয যিনাদ (র) বলেন, আমি এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীআকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি উছমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) এবং অপরাপর খলীফার যুগ পেয়েছি। কিন্তু আমি তাদের কাউকে যেনার অপবাদ আরোপ করার অপরাধে ক্রীতদাসকে চল্লিশ ঘার অধিক চাবুক মারতে দেখিনি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি যে, যেনার অপবাদ আরোপ করার ক্ষেত্রেও ক্রীতদাসকে চল্লিশ ঘা চাবুক মারতে হবে। এটা আযাদ লোকের শাস্তির অর্ধেক। ইমাম আবু হানীফা এবং হানাফী ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

٧٠٩- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ وَسُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِى الْخَمْرِ فَقَالَ بَلَغَنَا اَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَاَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنَ عَامِرٍ (وَفِى الْمُوَطَّأْ يَحْىٰ مَكَانَهُ ابْنَ عُمَرَ) جَلَدُوْا عَبِيْدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِى الْخَمْرِ .

৭০৯। ইমাম মালেক (র) বলেন, ইবনে শিহাব (র)-কে ক্রীতদাসের শরাব পান করার অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি যতোদূর জানতে পেরেছি, তার শাস্তি আযাদ ব্যক্তির শাস্তির অর্ধেক। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), উছমান ইবনে আফফান (রা), আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে আমের (ইমাম মালেকের মুওয়াত্তায় আবদুল্লাহ ইবনে উমার) নিজ নিজ ক্রীতদাসদের শরাব পানের অপরাধে আযাদ লোকের শাস্তির অর্ধেক শাস্তি দিতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। শরাব এবং নেশা জাতীয় জিনিস পান করলে তার শাস্তি হচ্ছে আশি বেত্রাঘাত। কিন্তু ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে এই শাস্তির পরিমাণ চল্লিশ বেত্রাঘাত। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং হানাফী ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইশারা-ইংগিতে যেনার অপবাদ দিলে তার শাস্তি।

٧١٠- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَجُلَيْنِ فِى زَمَنِ عُمَرَ اسْتَبَّا فَقَالَ اَحَدُهُمَا مَا اَبِى بِزَانٍ وَلاَ اُمِّى بِزَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ فِى ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ اَبَاهُ وَاُمَّهُ وَقَالَ الْاٰخَرُوْنَ قَدْ كَانَ لاَبِيْهِ وَاُمِّهِ مَدْحٌ سِوٰى هٰذَا نَرٰى اَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِيْنَ .

৭১০। আবদুর রহমান-কন্যা আমরাহ (র) থেকে বর্ণিত। হযরত উমার (রা)-র খেলাফতকালে দুই ব্যক্তি পরস্পরকে গালিগালাজ করে। তাদের একজন বললো, আমার বাপও যেনাকারী ছিলো না এবং আমার মাও যেনাকারিণী ছিলো না। উমার (রা) এই ব্যক্তি সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। একজন পরামর্শদাতা বলেন, সে তার পিতা-মাতার প্রশংসা করেছে। অন্যরা বলেন, এ ছাড়া কি তার পিতা-মাতার অন্য কোন সৌন্দর্য ছিলো না? আমাদের মতে তাকে বেত্রাঘাত করা উচিৎ। অতএব উমার (রা) তাকে আশি ঘা চাবুক মারেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক্ষেত্রে অপরাপর সাহাবীগণ হযরত উমার (রা)-র সাথে মতবিরোধ করেছেন। তারা বলেছেন, সে এই শাস্তির যোগ্য হবে না। কেননা সে তার পিতা-মাতার সৌন্দর্য বর্ণনা করেছে। যারা শাস্তি না দেয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, আমরা তাদের বক্তব্যের উপর আমল করি। হযরত আলী (রা)-ও শাস্তি না দেয়ার পক্ষে ছিলেন। আমরা এ মতের উপরই আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদদের এই মত।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ মদপানের শাস্তি।

٧١١- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ انِّى وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ رِيْحَ شَرَابٍ فَسَئَلْتُهُ فَزَعَمَ اَنَّهُ شَرِبَ طَلاَءً وَاَنَا سَائِلٌ عَنْهُ فَاِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ .

৭১১। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, হযরত উমার (রা) আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, আমি অমুক ব্যক্তির মুখ থেকে শরাবের গন্ধ পেয়েছি। আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বললো যে, হাঁ, সে তালায়া নামক শরাব পান করেছে। এখন আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি, এটা নেশার উদ্রেক করে কি না? যদি তা নেশার উদ্রেক করে তবে আমি তাকে শাস্তি দিবো। অতএব হযরত উমার (রা) তাকে বেত্রাঘাত করেন।

٧١٢- اَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيْلِىُّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِى الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ اَرٰى اَنْ تَضْرِبَهُ ثَمَانِيْنَ فَاِنَّهُ اِذَا شَرِبَهَا سَكِرَ وَاِذَا سَكِرَ هَذٰى وَاِذَا هَذٰى افْتَرٰى اَوْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِى الْخَمْرِ ثَمَانِيْنَ.

৭১২। ছাওর ইবনে যায়েদ আদ-দীলী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) শরাব পানের শাস্তি সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। আলী (রা) বলেন, আমার মতে তাকে আশি ঘা চাবুক মারা উচিত। কেননা সে মদ পান করলে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, আর জ্ঞানশূন্য হলে আজেবাজে কথা বকে, আর আজেবাজে কথা বললেই সে মিথ্যা কথা বলবে। অতএব উমার (রা) শরাবপানে আশি বেত্রাঘাত করেন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ মধুর এবং গন্ধযুক্ত জিনিসের তৈরী শরাব ইত্যাদির বর্ণনা।

٧١٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .

৭১৩। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মধুর তৈরী শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ "নেশা উদ্রেককারী যে কোন পানীয় হারাম।"

٧١٤- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ فَقَالَ لاَ خَيْرَ فِيْهَا وَنَهٰى فَسَئَلْتُ زَيْدًا مَا الْغُبَيْرَاءُ فَقَالَ السُّكُرْكَةُ .

৭১৪। আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ -কে উবাইরাআ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ "এর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।" অতঃপর তিনি তা পান করতে নিষেধ করেন। আমি (ইমাম মালেক) যায়েদ ইবনে আসলামকে জিজ্ঞেস করলাম, উবাইরাআ কি জিনিস? তিনি বলেন, জোয়ার থেকে তৈরী শরাব।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ শরাবের অবৈধতা এবং যেসব পানীয় পান করা মাকরূহ।

٧١٥- عَنْ اَبِىْ وَعْلَةَ الْمِصْرِىْ اَنَّهُ سَئَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَهْدٰى رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ عَلِمْتَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَهَا قَالَ لاَ فَسَارَّهُ اِنْسَانٌ اِلٰى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِمَ سَارَرْتَهُ قَالَ اَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ حَتّٰى ذَهَبَ مَا فِيْهَا .

৭১৫। আবু ওয়ালা আল-মিসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে আংগুর নিংড়ানোর হুকুম জিজ্ঞেস করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উপঢৌকন দেয়ার জন্য এক কলসি শরাব নিয়ে আসে। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি কি জানো আল্লাহ তাআলা শরাব হারাম করেছেন?" সে উত্তর দিলো, না। লোকটির পাশের এক ব্যক্তি তার কানে কানে কিছু বললো। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি চুপে চুপে তাকে কি বললে?" সে জবাব দিলো, আমি তাকে এটা বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছি। নবী ﷺ বলেন ঃ "যে মহান সত্তা এটা পান করা হারাম করেছেন, তিনি এর ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসাও হারাম করেছেন।" রাবী বলেন, একথা শুনে সে কলসের মুখ কাৎ করে দিলো এবং এর মধ্যে যে শরাব ছিল তা ঢেলে পড়ে গেলো।

٧١٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالْقَصَبِ فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيْعُهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَنِّىْ لاَ اٰمُرُكُمْ اَنْ تَبْتَاعُوْهَا فَلاَ تَبْتَاعُوْهَا وَلاَ تَعْصِرُوْهَا وَلاَ تَسْقُوْهَا فَاِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .

৭১৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। ইরাকের এক ব্যক্তি তাকে বললো, আমরা গাছের খেজুর, আংগুর ও আখ খরিদ করে তা দিয়ে শরাব তৈরি করে বিক্রি করি। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে বলেন, আমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং জিন ও মানুষের মধ্যে যারা শুনতে পায় তাদের সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তোমাদের তা বিক্রি করার, ক্রয় করার, তা নিংড়ানোর এবং পান করার নির্দেশ দিতে পারি না। কেননা তা ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এসব হাদীসের উপর আমল করি। শরাব, নেশা উদ্রেককারী জিনিস এবং এ জাতীয় যাবতীয় পানীয়, যা পান করা আমরা মাকরূহ (হারাম) মনে করি, তার ক্রয়-বিক্রয় এবং তার মূল্য ভোগ করার কোন অনুমতি বা অবকাশ নেই।

٧١٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِّمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ فَلَمْ يَسْقِهَا .

৭১৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় শরাব পান করলো অথচ তা থেকে তওবা করলো না, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং কখনো তা পান করতে পারবে না।"

٧١٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ اَسْقِىْ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَاَبَا طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىَّ وَاُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِّنْ فَضِيْخٍ وَتَمْرٍ فَاَتَاهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا اَنَسُ قُمْ اِلٰى هٰذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا فَقُمْتُ اِلٰى مِهْرَاسٍ لَّنَا فَضَرَبْتُهَا بِاَسْفَلِهِ حَتّٰى تَكَسَّرَتْ .

৭১৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা), আবু তালহা আনসারী (রা) ও উবাই ইবনে কাব (রা)-কে শুকনা ও ভিজা খেজুরের শরাব পরিবেশন করছিলাম। এমন সময় তাদের কাছে এক আগন্তুক এসে বললো, শরাব হারাম ঘোষিত হয়েছে। আবু তালহা (রা) বলেন, হে আনাস! উঠো, এই মশকগুলোর কাছে গিয়ে তা ভেংগে ফেলো। অতএব আমি উঠে গিসে আমাদের একটি মুগড় তুলে নিয়ে তার আঘাতে সেগুলো ভেংগে ফেলি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে শরাব নিংড়ানো হারাম। ভিজা অথবা শুষ্ক খেজুর ও আংগুরের নিংড়ানো শরাব হারাম। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। তবে তাতে কড়া মাদকতা এসে গেলেই তা হারাম হয়।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ দু'টি জিনিসের সমন্বয়ে তৈরী নবীয।

٧١٩- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ شُرْبِ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ جَمِيْعًا وَالزَّهْوِ وَالرُّطَبِ جَمِيْعًا .

৭১৯। আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ খেজুর ও আংগুর একত্রে ভিজিয়ে এবং শুকনা ও তাজা খেজুর একত্রে ভিজিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

٧٢٠- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيْعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا .

৭২০। আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ শুকনা ও কাঁচা খেজুর একত্রে ভিজিয়ে অথবা খেজুর ও আঙ্গুর একত্রে ভিজিয়ে শরবত বানাতে নিষেধ করেছেন।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ কদুর খোলের পাত্রে এবং তৈলাক্ত পাত্রে তৈরী শরবত।

٧٢١- عَنِ ابْنِ عُـمَـرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ فِى بَعْضِ مَغَـازِيْهِ قَالَ ابْنُ عُـمَرَ فَاَقْبَلْتُ نَحْـوَهُ فَانْصَـرَفَ قَبْـلَ اَنْ اَبْلُغَـهُ فَقُلْتُ مَا قَـالَ قَالُـوْا نَهٰـى اَنْ يُّنْبَـذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

৭২১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর কোন এক যুদ্ধে ভাষণ দিলেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম, কিন্তু তাঁর কাছে পৌছার পূর্বেই তিনি ভাষণ শেষ করলেন। আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেছেন? তারা বললো, তিনি কদুর খোলের তৈরী পাত্রে (দুব্বা) ও তৈলাক্ত পাত্রে (মুযাফফাত) নবীয (শরবত) বানাতে নিষেধ করেছেন।

٧٢٢- عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْـهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّنْبَـذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

৭২২। আলা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ কদুর খোলের তৈরী পাত্রে এবং তৈলাক্ত পাত্রে নবীয বানাতে নিষেধ করেছেন।[৭]

১১. অনুচ্ছেদ ঃ নবীযের মলম বা হালুয়া।

٧٢٣- عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ قَدِمَ الشَّامَ شَكٰى اِلَيْهِ اَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الْاَرْضِ وَثِقْلَهَا وَقَالُوْا لاَ يَصْلُحُ لَنَا اِلاَّ هٰذَا الشَّرَابُ فَقَالَ اشْرَبُوا الْعَسَلَ قَالُوْا لاَ يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْاَرْضِ هَلْ لَكَ اَنْ اَجْعَلَ لَكَ مِنْ هٰذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لاَّ يُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ فَطَبَخُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِىَ ثُلُثُهُ فَاَتَوْا بِهِ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَهُ فِيْهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَتَبِعَهُ يَتَمَطَّطُ فَقَالَ هٰذَا الطِّلاَءُ مِثْلُ طِلاَءِ الْاِبِلِ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّشْرَبُوْهُ فَقَالَ عُبَادَةُ

৭. দুব্বা ও মুযাফ্ফাত নামক পাত্রে জাহিলী যুগে মদ তৈরি করা হতো। মদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পর এই পাত্র দু'টির ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু মানুষের মন থেকে যখন মদের প্রতি আকর্ষণ দূরীভূত হয়ে যায়, তখন আবার তা ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। বর্তমান কালে এ জাতীয় পাত্রের কোন অস্তিত্ব নেই (অনুবাদক)।

بْنُ الصَّامِتِ اَحْلَلْتَهَا وَاللّٰهِ قَالَ كَلاَّ وَاللّٰهِ مَا اَحْلَلْتُهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لاَ اُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ وَلاَ اُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا اَحْلَلْتَهُ لَهُمْ .

৭২৩। মাহমূদ ইবনে লাবীদ আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) যখন সিরিয়ায় পৌঁছলেন, তখন সেখানকার লোকেরা প্লেগ-মহামারী ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতার অভিযোগ করলো এবং বললো, নবীয পান করা ছাড়া মন-মেজাজ চাংগা রাখা সম্ভব নয়। উমার (রা) বলেন, তোমরা মধু পান করো। তারা বললো, মধুও অনুকূল নয়। সিরিয়ার অধিবাসীদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো, আপনি কি নবীয থেকে এমন কিছু বানানোর অনুমতি দিবেন যাতে নেশার উদ্রেক হবে না? তিনি বলেন, হাঁ। সুতরাং তারা এটাকে জ্বাল দিতে থাকলো, এমনকি তার দুই-তৃতীয়াংশ পানি কমে গেলো এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকলো। তারা তা উমার (রা)-র কাছে নিয়ে এলো। তিনি তাতে নিজের হাতের আংগুল ঢুকালেন, অতঃপর তা তুলে নিলেন। তার আংগুলগুলো আঠালো হয়ে গেলো। তিনি বলেন, এই মলম তো উটের মলমের সদৃশ। তিনি তা পান করার অনুমতি দিলেন। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) তাকে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তা হালাল করে দিলেন! উমার (রা) বলেন, কখনো নয়, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তা হালাল করিনি। হে আল্লাহ! আমি তাদের জন্য এমন কোন জিনিস হালাল করিনি, যা আপনি তাদের জন্য হারাম করেছেন এবং যে জিনিস তাদের জন্য হালাল করেছেন তাও আমি হারাম করিনি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। যে হালুয়ার দুই-তৃতীয়াংশ শুকিয়ে গেছে তা পান করায় কোন দোষ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, তা যেন নেশা উদ্রেককারী না হয়। নেশার উদ্রেক হলে তা হারাম। কিন্তু পুরাতন শরাব যার মাদকতা নষ্ট হয়ে গেছে তা পান করাতেও কোন কল্যাণ নেই (তাও হারাম)।

অধ্যায় ঃ ১৩

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

(ওয়ারিসী সম্পত্তি বণ্টন বা দায়ভাগ)

[ফারাইদ (فرائض) একবচনে ফারীদাহ (فريضة), এর অর্থ নির্ধারিত বিষয়, নির্ধারিত অংশ। এখানে শব্দটির অর্থ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার আত্মীয়দের জন্য শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا .

"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যে সম্পত্তি রেখে যায়, তাতে পুরুষদের জন্য অংশ রয়েছে। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যে সম্পত্তি রেখে যায়, তাতে স্ত্রীলোকদের জন্যও অংশ রয়েছে, তা অল্প হোক আর বেশীই হোক। এই অংশ (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে) নির্ধারিত" (সূরা নিসা ঃ ৭)।

উল্লেখিত আয়াতে পাঁচটি আইনগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ (এক) মীরাস কেবল পুরুষদের প্রাপ্য নয়, মহিলারাও এর অধিকারী হবে। (দুই) মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি অবশ্যই বণ্টিত হতে হবে, এর পরিমাণ যতোই কম হোক না কেন। (তিন) উত্তরাধিকার আইন সকল প্রকার সম্পত্তির উপর কার্যকর হবে, তা স্থাবর, অস্থাবর, কৃষিজ, শিল্পজাত, ব্যবসায়িক যে কোন ধরনের সম্পত্তিই হোক না কেন। (চার) কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরই তার পরিত্যক্ত সম্পদে তার আত্মীয়দের উত্তরাধিকার স্বত্ব সৃষ্টি হয়। (পাঁচ) নিকটাত্মীয়দের বর্তমানে দূরাত্মীয়গণ মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না।

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে যথাক্রমে চারটি কর্তব্য বর্তায়। তার পরিত্যক্ত সম্পতি থেকে সর্বপ্রথম তার কাফন-দাফনের ব্যয় বহন করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে তার ওসিয়াত পূর্ণ করতে হবে। চতুর্থ পর্যায়ে ওসিয়াত পূর্ণ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি তার ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

মৃতের ওয়ারিসগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা ঃ (১) **যাবিল-ফুরূয** ঃ যাদের অংশ সরাসরি কুরআন ও হাদীস নির্ধারিত করে দিয়েছে।

(২) **আসাবা ঃ** যাদের অংশ কুরআন-হাদীসে নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি, তবে প্রথমোক্তদের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তাতে এরা অংশীদার হবে। আসাবাগণ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা ঃ

(ক) **আসাবা বি-নাফ্সিহী ঃ** মৃত ব্যক্তির সাথে যার সম্পর্ক কোন স্ত্রীলোকের মধ্যস্থতায় নয়, বরং পুরুষদের মধ্যস্থতায়। এরা চারজন ঃ মৃতের অধস্তন, যেমন পুত্রের কন্যাগণ। মৃতের উর্ধ্বতন, যথা বাপ, দাদা। মৃতের পিতার অধস্তন, যেমন (মৃতের) ভাই-বোন। মৃতের দাদার অধস্তন, যেমন (মৃতের) চাচা। এদের মধ্যে সম্পর্কের দিক থেকে যারা মৃতের যতো নিকটতর হবে—তারা ততো বেশি অগ্রাধিকার পাবে। যেমন আপন পুত্র থাকতে পিতা আসাবা হিসাবে অংশ পাবে না, যদিও যাবিল ফুরূয হিসাবে অংশ পায়। অনুরূপভাবে পিতার বর্তমানে ভাই অংশ পাবে না এবং ভাইয়ের বর্তমানে চাচা অংশ পাবে না। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, একসাথে একই পর্যায়ের দুইজন আসাবা বর্তমান থাকলে, তাদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির সাথে যার আত্মীয়তার সম্পর্ক অধিক দৃঢ় সে-ই আসাবা হবে। যেমন, সহোদর ভাই ও সৎ ভাই। এখানে সহোদর ভাই আসাবা হবে। কেননা পিতা-মাতা এক হওয়ার কারণে মৃতের সাথে সহোদর ভাইয়ের সম্পর্ক সৎ ভাই অপেক্ষা অধিক দৃঢ়।

(খ) **আসাবা বি-গায়রিহী (যারা অন্যের কারণে আসাবা হয়) ঃ** এরা হচ্ছে চারজন স্ত্রীলোক যাদের অংশ যাবিল ফুরূযরূপে অর্ধেক অথবা তিন ভাগের দুই ভাগ নির্ধারিত। এরা হচ্ছে কন্যা, পৌত্রী, সহোদর বোন এবং সৎ বোন। এরা অন্যের কারণে অর্থাৎ ভাই থাকার কারণে আসাবা হয়, কিন্তু মনে রাখা দরকার, যে মহিলা যাবিল ফুরূযদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার ভাই আসাবা হলেও সে আসাবা হবে না। যেমন, ফুফু এবং চাচা। চাচা আসাবা হলেও ফুফু আসাবা হয় না।

(গ) **আসাবা মাআ গায়রিহী (অন্যের সাথে আসাবা) ঃ** এরা হচ্ছে সেই সকল মহিলা, যারা অন্য মহিলার সাথে আসাবা হয়। যথা মৃতের বোন। মৃতের কন্যা বর্তমান থাকলে সে তার সাথে আসাবা হয়।

(৩) **যাবিল-আরহাম ঃ** যাবিল ফুরূয ও আসাবাদের মধ্যে কেউ বর্তমান না থাকলে যাবিল আরহামগণ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হয়। যথা, মৃতের কন্যার সন্তানগণ, বোনের সন্তানগণ, ভাইয়ের কন্যাগণ, চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামা, খালা, নানা, পিতার বৈপিত্রেয় ভাইগণ, ফুফু এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তানগণ। অতঃপর এদের মধ্যস্থতায় যারা মৃতের আত্মীয় গণ্য হবে।

উল্লেখিত তিন শ্রেণীর কোন ওয়ারিস বর্তমান না থাকলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বাইতুল-মালে (সরকারী কোষাগারে) জমা হবে এবং তা সরাসরি জনসাধারণের সম্পদে পরিণত হবে। তা বিশেষত দরিদ্র ও বঞ্চিত শ্রেণীর উন্নয়নে ব্যয়িত হবে।

যাবিল-ফুরূয ১৩ ব্যক্তি। তাদের মধ্যে চারজন পুরুষ এবং অবশিষ্ট ৯জন স্ত্রীলোক।

১। পিতাঃ (ক) মৃতের পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র (যতো নিম্নে যাক) থাকলে পিতা যাবিল ফুরূয হিসাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। (খ) মৃতের কন্যা, কন্যার কন্যা (যতো নিম্নে যাক) বর্তমান থাকলে পিতা যাবিল ফুরূয হিসাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে এবং অপরাপর যাবিল-ফুরূযদের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তাও আসাবা হিসাবে পিতা লাভ করবে। (গ) মৃতের কোন সন্তান-সন্ততি, কোন অধস্তন না থাকলে পিতা আসাবা হিসাবে তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে।

২। দাদা ঃ তিন অবস্থায় পিতার অনুরূপ। তবে পিতার বর্তমানে দাদা বঞ্চিত থাকবে।

৩। বৈপিত্রেয় ভাই ঃ (ক) একজন হলে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। (খ) একাধিক হলে সকলে মিলে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। (গ) মৃতের সন্তান, কোন অধস্তন নারী-পুরুষ কিংবা বাপ অথবা দাদা বর্তমান থাকলে বৈপিত্রেয় ভাইগণ কোন অংশ পাবে না।

(৪) স্বামী ঃ (ক) স্ত্রীর কোন সন্তান না থাকলে স্বামী $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে এবং (খ) স্ত্রীর সন্তান বর্তমান থাকলে $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে।

৫। স্ত্রী ঃ (ক) স্বামীর সন্তান বর্তমান থাকলে $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবে এবং (খ) স্বামীর কোন সন্তান বর্তমান না থাকলে $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে। স্ত্রী একজন হোক বা একাধিক, তারা সকলে মিলে উল্লেখিত পরিমাণই পাবে।

৬। কন্যা ঃ (ক) একজন হলে $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে; (খ) একাধিক হলে $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। (গ) পুত্র-কন্যা একসাথে থাকলে কন্যা আসাবা হবে এবং পুত্র যা পায় সে তার অর্ধেক পাবে।

৭। পৌত্রী ঃ মৃতের পুত্র-কন্যার অবর্তমানে (ক) একজন পৌত্রী থাকলে $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে এবং (খ) এদের সংখ্যা একাধিক হলে সকলে মিলে $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। (গ) মৃতের এক কন্যার বর্তমানে পৌত্রীর সংখ্যা একজন হোক বা একাধিক সকলে মিলে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। (ঘ) মৃতের একাধিক কন্যা থাকলে পৌত্রীরা বঞ্চিত হবে। (ঙ) তবে পৌত্রীর সাথে তার ভাই থাকলে তারা সকলে আসাবা হবে এবং কন্যাদের $\frac{২}{৩}$ অংশ দেয়ার পর যে $\frac{১}{৩}$ অংশ অবশিষ্ট থাকবে তাতে তারা পুরুষের দুই ভাগ ও নারীর এক ভাগ হিসাবে অংশীদার হবে। (চ) মৃতের পুত্রের বর্তমানে পৌত্রীরা বঞ্চিত হবে।

৮। সহোদর বোন ঃ মৃতের পুত্র-কন্যা (যতো নিম্নে যাক) কেউ বর্তমান না থাকলে (ক) এক বোন $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে এবং (খ) একাধিক বোন থাকলে সকলে মিলে $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। (গ) মৃতের এক বা একাধিক সহোদর ভাই থাকলে সহোদর বোনেরা আসাবা হবে এবং ভাইদের অর্ধেক পাবে। (ঘ) মৃতের পৌত্রী, প্রপৌত্রী (যতো নিম্নে যাক) থাকলে তাদের $\frac{২}{৩}$ অংশ দেয়ার পর যা থাকবে এরা তাই পাবে। (ঙ) মৃতের পুত্র, পৌত্র (যতো নিম্নে যাক) অথবা পিতা বা দাদা থাকলে সহোদর বোনেরা বঞ্চিত হবে।

৯। বৈমাত্রেয় বোন ঃ মৃতের কন্যা, পৌত্রী (যতো নিম্নে যাক) ও সহোদর বোন না থাকলে (ক) বৈমাত্রেয় বোন একজন হলে $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে এবং (খ) একাধিক হলে $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। (গ) মৃতের কন্যা বা পৌত্রী নেই কিন্তু এক সহোদর বোন আছে, এ অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে এবং (ঘ) দুই সহোদর বোন থাকলে সে বঞ্চিত হবে। (ঙ) বৈমাত্রেয় বোনের সাথে বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে বোন আসাবা হবে এবং ভাইয়ের অর্ধেক অংশ পাবে। (চ) মৃতের কন্যা, পৌত্রী ইত্যাদি কেউ থাকলে এবং সহোদর বোন না থাকলে যাবিল ফুরূযদের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা আসাবা হিসাবে বৈমাত্রেয় বোন পাবে। (ছ) মৃতের পুত্র, পৌত্র, পিতা এবং দাদা কেউ বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয় বোনেরা বঞ্চিত হবে।

১০। বৈপিত্রেয় বোন ঃ বৈপিত্রেয় বোনের অবস্থা বৈপিত্রেয় ভাইয়ের অনুরূপ। (ক) এক বোন থাকলে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং (খ) একাধিক হলে $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। (গ) মৃতের কোন সন্তান-সন্ততি (অধস্তন) অথবা পিতা বা দাদার বর্তমানে তারা বঞ্চিত হবে।

১১। মা ঃ (১) মৃতের পুত্র, কন্যা, পৌত্রী—কোন অধস্তন নারী-পুরুষ অথবা যে কোন প্রকারের একাধিক ভাই-বোন বর্তমান থাকলে মা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। (২) এদের মধ্যে কেউ না থাকলে এবং মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে ও তার স্ত্রী বর্তমান না থাকলে অথবা মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হলে এবং তার স্বামী বর্তমান না থাকলে—মা $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। (গ) মৃতের স্ত্রী অথবা স্বামী বর্তমান থাকলে তার নির্ধারিত অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে—মা তার $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে।

১২। দাদী ঃ (ক) মৃতের মা কিংবা বাপ বর্তমান না থাকলে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে এবং (খ) তাদের বর্তমানে দাদী বঞ্চিত হবে।

১৩। নানী ঃ (ক) মৃতের মা বর্তমান না থাকলে নানী $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। (খ) মা থাকলে নানী বঞ্চিত হবে।

আলোচনাটি মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (র) অনূদিত "মিশকাত শরীফ" ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬২–১৬৭ থেকে নেয়া হয়েছে (অনুবাদক)]।

১. অনুচ্ছেদ ঃ দাদা-দাদীর অংশ।

٧٢٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِلْجَدِّ الَّذِى يَفْرِضُ لَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ .

৭২৪। কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) দাদার জন্য এতোটা অংশ নির্ধারণ করেছেন যতোটা আজকাল দেয়া হয়ে থাকে।[১]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দাদার বেলায় আমরা এই আছার (হাদীস) অনুযায়ী আমল করি। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-রও এই মত। ফিক্‌হবিদদেরও এটাই সাধারণ মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) দাদার ক্ষেত্রে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র মতের উপর আমল করেন। তারা দাদার বর্তমানে ভাইকে ওয়ারিস করতেন না।[২]

---

১. অর্থাৎ মৃতের এক ভাই থাকলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক দাদা পাবে। আর দুই ভাই থাকলে দাদা এক-তৃতীয়াংশ এবং দুইয়ের অধিক ভাই থাকলেও এক-তৃতীয়াংশ পাবে (অনুবাদক)।

২. আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র মতে, দাদার বর্তমানে মৃত ব্যক্তির ভাইগণ তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এই মত গ্রহণ করেছেন। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, আবু সাঈদ খুদরী, উবাই ইবনে কাব, মুআয ইবনে জাবাল, আবু মূসা আশআরী, আয়েশা, আবু হুরায়রা ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-এরও এই মত। তাবিঈদের মধ্যে হযরত কাতাদা, জাবের ইবনে যায়েদ, শুরায়হ, আতা, আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ, উরওয়া, উমার ইবনে আবদুল আযীয, হাসান বসরী ও ইবনে সীরীনের এই মত।

অপরদিকে হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-এর মতে মৃত ব্যক্তির ভাইগণ তার দাদার সাথে তার ওয়ারিস হবে। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ, আলকামা, আসওয়াদ, ইবরাহীম নাখঈ ও সুফিয়ান সাওরীরও এই মত। তবে সম্পত্তি বণ্টনের অনুপাত নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে (অনুবাদক)।

٧٢٥- عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ تَسْئَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْئٍ وَمَا عَلِمْنَا لَكِ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا فَارْجِعِىْ حَتّٰى اَسْئَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَنْفَذَهُ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْاُخْرٰى اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْئَلُهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْئٍ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِىْ قُضِىَ بِهِ اِلاَّ لِغَيْرِكِ وَمَا اَنَا بِزَائِدٍ فِى الْفَرَائِضِ مِنْ شَيْئٍ وَلٰكِنْ هُوَ ذٰلِكَ السُّدُسُ فَاِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَاَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

৭২৫। কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (র) বলেন, এক মৃতের নানী আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-র কাছে নিজের ওয়ারিসী স্বত্ব দাবি করার জন্য আসলো। আবু বাক্র (রা) বলেন, আল্লাহ্র কিতাবে তোমার জন্য কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতে তোমার জন্য কিছু নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। অতএব তুমি চলে যাও, আমি এ সম্পর্কে লোকদের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখি। রাবী বলেন, তিনি এ সম্পর্কে লোকদের জিজ্ঞেস করলে মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি নানীকে এক-ষষ্ঠাংশ দান করেছেন। আবু বাক্র (রা) বলেন, আপনার সাথে আপনি ছাড়া আর কেউ ছিল কি? তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) দাঁড়িয়ে তার অনুরূপ কথা বলেন। অতএব আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) তাকে এক-ষষ্ঠাংশ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে এক দাদী এসে তার মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্র কিতাবে তোমার জন্য কোন অংশ নির্ধারিত নেই। আর সেই যে ফয়সালা করা হয়েছিল (রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বাক্র (রা)-র যুগে) তা তুমি ছাড়া অন্য কারো (অর্থাৎ নানী) ক্ষেত্রে করা হয়েছে। আমি ফারাইদে এক-ষষ্ঠাংশের অধিক বৃদ্ধি করতে পারি না। যদি তোমরা দু'জন (দাদী-নানী) একত্র হও তবে এক-ষষ্ঠাংশ তোমাদের উভয়ের মাঝে সমানভাবে বণ্টিত হবে। আর তোমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ যদি একা থাকে, তবে সে একাই তা পাবে (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মালেক, আহমাদ)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। দুই দাদী অর্থাৎ দাদী ও নানী উভয় বর্তমান থাকলে এক-ষষ্ঠাংশ তাদের উভয়ের মাঝে সমান অংশে বণ্টিত হবে। যদি তাদের কোন একজন বর্তমান থাকে তবে সে একাই এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। কিন্তু তাদের বর্তমানে পরদাদী (পিতার দাদী) এবং পরনানী (মায়ের নানী) কোন অংশ পাবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

২. অনুচ্ছেদ ঃ ফুফুর প্রাপ্য অংশ।

٧٢٦- عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ عَجَبًا لِّلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ .

৭২৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলতেন, আশ্চর্যের বিষয়! ভ্রাতুষ্পুত্র (ও পুত্রী) ফুফুর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়, কিন্তু ফুফু তার উত্তরাধিকারী (ওয়ারিস) হয় না (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের ধারণা, হযরত উমার (রা) এই যে বলেছেন, ভ্রাতুষ্পুত্র ফুফুর ওয়ারিস হয়, কিন্তু ফুফু তার ওয়ারিস হয় না—হয়তো এইজন্য বলেছেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্র অংশ পাওয়ার অধিকারী এবং ফুফু অংশ পাওয়ার অধিকারী নয় (সে যাবিল ফুরূযও নয়, আসাবাও নয়)। আমরা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করে থাকি, তারা বলেছেন, ফুফু ও খালার ক্ষেত্রে যদি কোন যাবিল ফুরূয বা আসাবা বর্তমান না থাকে, তবে খালা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ এবং ফুফু দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। মদীনার রাবীগণ যে হাদীস বর্ণনা করেন, তা বিরুদ্ধবাদীগণ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। হাদীসটি এই ঃ

انَّ ثَابِتَ ابْنَ الدَّحْدَاحِ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَاعْطَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَكَانَ ابْنُ اُخْتِهِ مِيْرَاثَهُ .

"ছাবিত ইবনুদ দাহ্দাহ (রা) মারা গেলেন, কিন্তু তার কোন ওয়ারিস ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ভাগ্নে আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির (রা)-কে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস বানান।"

ইবনে শিহাব (র) নিকটাত্মীয়তার ভিত্তিতে ফুফু, খালা ও সমস্ত যাবিল-আরহামকে ওয়ারিস বানাতেন। তিনি ছিলেন মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী রাবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ফিক্হবিদ।[৩]

---

৩. ফুফু ও খালা যাবিল আরহামের অন্তর্ভুক্ত। তাদের জন্য কোন অংশ নির্ধারিত নেই এবং তারা আসাবাও নয়। অধিকাংশ সাহাবীর মতে, যাবিল ফুরূয ও আসাবাদের অবর্তমানে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। এই মত ব্যক্তকারী সাহাবীদের মধ্যে রয়েছেন হযরত উমার, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, মুআয ইবনে জাবাল, আবু দারদা ও ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। তাবিঈদের মধ্যে আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ, শুরায়হ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, আতা, মুজাহিদ, তাউস, উবায়দা সালমানী, মাসরূক, জাবের ইবনে যায়েদ, ইবনে আবু লায়লা ও ঈসা ইবনে আবান এই মত অনুসরণ করেছেন। হানাফী মাযহাবের ফিক্হবিদগণও এই মত গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে যায়েদ ইবনে ছাবিত ও ইবনে আব্বাস (বিরল বর্ণনা) রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতে, যাবিল ফুরূয ও আসাবাদের অবর্তমানে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকারী বাইতুল মালে জমা হবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মালেক ও শাফিঈ এই মত গ্রহণ করেছেন (অনুবাদক)।

٧٢٧- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ عَجْلَانَ الزُّرَقِىِّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ كَانَ قَدِيْمًا يُقَالُ لَهُ ابْنُ مِرْسَىٍّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا صَلَّى صَلٰوةَ الظُّهْرِ قَالَ يَا يَرْفَاءُ هَلُمَّ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لِكِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ فِىْ شَاْنِ الْعَمَّةِ يَسْئَلُ عَنْهُ يَسْتَخْبِرُ (يَسْتَخِيْرُ) اللّٰهَ فِيْهِ هَلْ لَهَا مِنْ شَيْئٍ فَاَتٰى بِهِ يَرْفَاءُ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ فِيْهِ مَاءٌ اَوْ قَدَحٍ فَمَحَا ذٰلِكَ الْكِتَابَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ رَضِيَكِ اللّٰهُ اَقَرُّكِ لَوْ رَضِيَكِ اللّٰهُ اَقَرُّكِ .

৭২৭। আবদুর রহমান ইবনে হানযালা (র) থেকে বর্ণিত। কুরাইশের মুক্তদাস বয়ঃবৃদ্ধ ইবনে মিরসী (র) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে বসা ছিলাম। তিনি যুহরের নামায পড়ার পর বলেন, হে ইয়ারফা! সেই পত্রটি নিয়ে এসো। পত্রটি তিনি ফুফুর উত্তরাধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে লিখেছিলেন। তিনি তা দেখবেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে ইস্তেখারা করবেন যে, তার জন্য কোন অংশ আছে কিনা? ইয়ারফা পত্রটি নিয়ে তার কাছে এলো। অতঃপর তিনি একটি পানির পাত্র বা পিয়ালা চাইলেন। পত্রটি তিনি পাত্রের পানির মধ্যে ধুয়ে ফেলেন, অতঃপর বলেন, তোমার জন্য আল্লাহ্‌র অনুমোদন থাকলে তিনি তোমাকে বহাল রাখতেন, তোমার জন্য আল্লাহ্‌র অনুমোদন থাকলে তিনি তোমাকে বহাল রাখতেন (পত্রের লেখা মুছে যেতে দিতেন না)।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর কি কেউ ওয়ারিস হবে?

٧٢٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِىْ دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِىْ وَمَئُوْنَةِ عَامِلِىْ فَهُوَ صَدَقَةٌ .

৭২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি দীনার দীনার করে বণ্টিত হবে না। আমার স্ত্রীদের ভরণ-পোষণ এবং আমার কর্মচারীদের বেতন দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা সদাকা হিসাবে গণ্য হবে।

٧٢٩- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ نِسَاءَ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَدْنَ اَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ يَسْئَلْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ .

৭২৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নিজেদের প্রাপ্য অংশ দাবি করার জন্য উছমান ইবনে আফ্ফান (রা)-কে আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-র কাছে পাঠাবার ইচ্ছা করলেন। আয়েশা (রা) তাদের বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি ঃ "কেউ আমাদের (নবীদের) ওয়ারিস হবে না, আমরা যা রেখে যাবো তা সদাকা হিসাবে গণ্য হবে" (এবং তা দান-খয়রাত করে দিতে হবে)?

৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানগণ কাফেরদের ওয়ারিস হবে না।

٧٣٠- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ .

৭৩০। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "মুসলিম ব্যক্তি কাফের ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করি। কোন মুসলমান কোন কাফেরের ওয়ারিস হবে না এবং কোন কাফেরও কোন মুসলমানের ওয়ারিস হবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত কুফর একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। তাই তারা পরস্পরের ওয়ারিস হবে, তাদের পরস্পরের ধর্ম ভিন্ন হলেও। অতএব ইহূদীরা খৃস্টানদের এবং খৃস্টানরা ইহূদীদের ওয়ারিস হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

٧٣١- عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ وَرَثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيْلٌ وَّطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ .

৭৩১। আলী (যয়নুল আবেদীন) ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, আকীল ও তালিব খাজা আবু তালিবের ওয়ারিস হন, কিন্তু আলী (রা) তার ওয়ারিস হননি।[৪]

---

৪. আবু তালিবের মৃত্যুর সময় পুত্র আকীল ও তালিব কাফের ছিল। তাই তারা পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হয়। তালিব বদর যুদ্ধের পূর্বে কাফের অবস্থায় মারা যায়। আর আকীল (রা) হুদাইবিয়ার সন্ধির যুগে মুসলমান হন। মতান্তরে তিনি মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন এবং অষ্টম হিজরীর প্রথমদিকে মদীনায় হিজরত করেন। পুত্র আলী ও জাফর (রা) পিতার মৃত্যুর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাই তারা উভয়ে তার ওয়ারিস হতে পারেননি। কাফের ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না, এ ব্যাপারে সকল ফিক্হবিদ একমত। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً .

"মুসলমানদের উপর কাফেরদের স্থায়ী জয়লাভ করার কোন পথই আল্লাহ অবশিষ্ট রাখেননি" (সূরা নিসা ঃ ১৪১)।

কিন্তু মুসলিম ব্যক্তি কাফের ব্যক্তির ওয়ারিস হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। হযরত আলী (রা)-সহ প্রায় সকল সাহাবী, তাবিঈন এবং ফিক্হবিদের মতে মুসলিম ব্যক্তিও কাফের ব্যক্তির

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ালায়ার মীরাস।[৫]

٧٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِيْنَ لَهُ ثَلٰثَةً اِبْنَيْنِ لِاُمٍّ وَرَجُلاً لِعَلَّةٍ فَهَلَكَ اَحَدُ الْاِبْنَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا لِاُمٍّ وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِيْ فَوَرِثَهُ اَخُوْهُ لِاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَوَرِثَ مَالَهُ وَوَلَاءَ مَوَالِيْهِ ثُمَّ هَلَكَ اَخُوْهُ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَاَخَاهُ لِاَبِيْهِ فَقَالَ ابْنُهُ قَدْ اَحْرَزْتُ مَا كَانَ

ওয়ারিস হবে না। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ لاَ يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتّٰى "দুই ভিন্ন ধর্মের লোকেরা পরস্পরের ওয়ারিস হবে না" (তিরমিযী)। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ لاَ يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتّٰى "দুই ভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা পরস্পরের ওয়ারিস হবে না" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

কিন্তু হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা), মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, মাসরূক, হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া ও মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইনের মতে, মুসলিম ব্যক্তি কাফের ব্যক্তির ওয়ারিস হবে। তারা নিম্নোক্ত হাদীস নিজেদের মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন ঃ মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ الاسلام يزيد ولا ينقص "ইসলাম বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কমে না" (আবু দাউদ)। অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ الاسلام يعلوا ولا يعلى "ইসলাম উপরে থাকে, নিচে থাকে না" (তাবারানী ও বায়হাকী উমার (রা) থেকে এবং দারু কুতনী আয়েয ইবনে আমর (রা)-র সূত্রে)। এই শেষোক্ত হাদীস দু'টির জওয়াবে বলা হয়েছে, তা মীরাস সম্পর্কে নয়, বরং আদর্শগত। অকাট্য প্রমাণ পেশের দিক থেকে এবং দুর্দমনীয় শক্তি হিসাবে ইসলাম সবার উপরে এবং সর্বোন্নত ও সর্বোচ্চ। ইবনে আবদুল বার (৩৬২-৪৬৩ হি.) বলেন, মুসলমান যে কাফেরের ওয়ারিস হতে পারে না তা সিকাহ রাবীদের মাধ্যমে মরফূ সনদে বর্ণিত হয়ে এসেছে। এর বিরোধী দলীল বিবেচনার যোগ্য নয়।

কোন মুসলমান মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলে সে অপর কোন মুসলমানের ওয়ারিস হবে না, এ ব্যাপারে সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেম একমত। কিন্তু মুসলিম ব্যক্তি তার ওয়ারিস হবে কি না, এ নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও ইবনে আবু লায়লার মতে, সে তার ওয়ারিস হবে না। ইমাম আবু হানীফার মতে মুরতাদ মুসলমান থাকা অবস্থায় যে সম্পদ উপার্জন করেছে তাতে মুসলিম ব্যক্তি ওয়ারিস হবে। আর মুরতাদ অবস্থায় যা উপার্জন করেছে, তা বাইতুল মালে (সরকারী কোষাগারে) জমা হবে (অনুবাদক)।

৫. আযাদকৃত দাসের পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে ওয়ালায়া বলে। প্রথমে আযাদকারী মারা গেলো, অতঃপর আযাদকৃত দাস মারা গেলো এবং তার কোন বংশগত ওয়ারিস নাই। এক্ষেত্রে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে আযাদকারীর ওয়ারিসগণ। আযাদকারীর আসাবা বি-নাফসিহীগণ ওয়ারিস হবে, আসাবা বি-গায়রিহীগণ নয় (অনুবাদক)।

أَبِىْ أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلاَءِ الْمَوَالِىْ وَقَالَ أَخُوْهُ لَيْسَ كُلُّهُ لَكَ اِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ فَأَمَّا وَلاَءَ الْمَوَالِىْ فَلاَ أَرَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِى الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ (وَارِثُهُ) أَنَا فَاخْتَصَمَا اِلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَضَى لِأَخِيْهِ بِوَلاَءِ الْمَوَالِىْ .

৭৩২। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আস ইবনে হিশাম মারা যান এবং তিনটি পুত্র সন্তান রেখে যান। তাদের তিনজনের মধ্যে দুইজন ছিল সহোদর ভাই এবং একজন ছিল বৈমাত্রেয় ভাই। অতঃপর দুই সহোদর ভাইয়ের একজন মারা গেলো এবং কিছু সম্পত্তি ও একটি আযাদকৃত গোলাম রেখে গেলো। অপর সহোদর ভাই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও গোলামের ওয়ালায়ার ওয়ারিস হলো। অতঃপর এই সহোদর ভাইও মারা গেলো এবং একটি পুত্র সন্তান ও বৈমাত্রেয় ভাই রেখে গেলো। পুত্র বললো, আমি আমার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও আযাদকৃত গোলামের ওয়ালায়ার ওয়ারিস হবো। সৎ চাচা বললো, তুমি সব কিছুর ওয়ারিস হবে না। তুমি তার সম্পত্তির ওয়ারিস হবে ঠিকই, কিন্তু ওয়ালায়ার পূর্ণ মালিক হবে না। আমার ভাই যদি আজ মারা যেতো, তাহলে আমি কি আজ তার ওয়ারিস হতাম না? তারা উভয়ে এই বিবাদ মীমাংসার জন্য উছমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-র কাছে উপস্থিত হন। তিনি ভাইকে ওয়ালায়ার মালিক হওয়ার ফয়সালা দিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। উল্লেখিত অবস্থায় বৈমাত্রেয় ভাই ওয়ালায়ার মালিক হবে। কিন্তু সহোদর ভাই বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই ওয়ালায়ার মালিক হবে না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٧٣٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ فَاخْتَصَمَ اِلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِّنْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِّنْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ كُلَيْبٍ فَمَاتَتْ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا وَتَرَكَتْ مَالاً وَمَوَالِىَ ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا فَقَالَ (فَقَالَتْ) وَرَثَتُهُ لَنَا وَلاَءُ الْمَوَالِىْ وَقَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ وَقَالَ الْجُهَيْنِيُّوْنَ لَيْسَ كَذٰلِكَ اِنَّمَا هُمْ مَوَالِىْ صَاحِبَتِنَا فَاِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قُلْنَا وَلاَؤُهُمْ وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَيْنِيِّيْنَ بِوَلاَءِ الْمَوَالِىْ .

৭৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হায্‌ম (র) থেকে তার পিতার (আবু বাক্‌র) সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি আবান ইবনে উছমানের নিকট বসা ছিলেন। জুহায়না গোত্রের একদল লোক এবং হারিছ ইবনুল খাযরাজ গোত্রের একদল লোক পরস্পর ঝগড়া করতে করতে আবানের কাছে এসে উপস্থিত হলো। জুহায়না গোত্রের একটি স্ত্রীলোক হারিছ ইবনুল খাযরাজ গোত্রের একটি পুরুষ লোকের বিবাহাধীন ছিল। তার নাম

ছিল ইবরাহীম ইবনে কুলাইব। স্ত্রীলোকটি কিছু সম্পদ ও কয়েকটি আযাদকৃত গোলাম রেখে মারা গেলো। তার পুত্র ও স্বামী তার ওয়ারিস হলো। অতঃপর তার পুত্রও মারা গেলো। তখন পুত্রের ওয়ারিসগণ বললো, আমরা ওয়ালায়ার মালিক হবো। কেননা তা স্ত্রীলোকটির পুত্রের হস্তগত ছিল। আর জুহায়না গোত্রের লোকেরা বললো, ওয়ালায়ার মালিক হবো আমরাই। কেননা এই গোলাম আমাদের বংশেরই মহিলার ছিল। তার ছেলে যখন মারা গেছে এখন আমরাই হবো ওয়ালায়ার মালিক। আবান ইবনে উছমান (রা) জুহায়নার লোকদেরই আযাদকৃত গোলামদের ওয়ালায়ার অধিকারী হওয়ার রায় দিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মতও গ্রহণ করেছি। যখন স্ত্রীলোকটির পুত্র সন্তান মারা গেলো তখন তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি এবং ওয়ালায়া তার পরে মারা যাওয়া উত্তরাধিকারীর আসাবাগণ পাবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং হানাফী ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

٧٣٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِّنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ لِمَنْ وَلاَؤُهُمْ قَالَ اِنْ مَاتَ اَبُوْهُمْ وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ فَوَلاَؤُهُمْ لِمَوَالِي اُمِّهِمْ .

৭৩৪। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন স্বাধীন মহিলার গর্ভে কোন গোলামের ঔরসজাত সন্তান থাকলে তার ওয়ালায়ার অধিকারী কে হবে? তিনি বলেন, তার পিতা যদি দাসত্বমুক্ত হওয়ার পূর্বেই মারা গিয়ে থাকে তবে তার (সন্তানের) মাকে মুক্তকারীগণ তার ওয়ালায়ার অধিকারী হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। যদি তার পিতা দাসত্বমুক্ত হওয়ার পর মারা যায়, তবে তার ওয়ালায়ার মালিক হবে তার পিতার আযাদকারীগণ। ইমাম আবু হানীফা এবং হানাফী ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ হামীলের উত্তরাধিকার।

٧٣٥- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنْ يُوَرِّثَ اَحَدًا مِّنَ الْأَعَاجِمِ اِلاَّ مَا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ .

৭৩৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) অনারবকে উত্তরাধিকারী বানাতে অস্বীকৃতি জানান। তবে তিনি আরবে ভূমিষ্ঠ অনারব সন্তানদের উত্তরাধিকারী বানাতে সম্মতি প্রকাশ করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। তাকে ওয়ারিস করা হবে না। হামীল সেই শিশুকে বলা হয় যাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয় এবং তার সাথে স্ত্রীলোকও বন্দী হয়ে আসে এবং সে এই শিশুকে তার সন্তান, ভাই অথবা বোন বলে দাবি করে। কেবল বংশগত সম্পর্কের দাবির ভিত্তিতে সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত ওয়ারিস সাব্যস্ত হবে না। পিতা-পুত্রের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যতিক্রম আছে। কেননা পিতা যখন দাবি করে যে, সে তার

সন্তান এবং পুত্র তা স্বীকার করে তখন সে তার পুত্র বলে সাব্যস্ত হবে এবং সাক্ষীর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু পুত্র যদি গোলাম হয় এবং তার মালিক তা অস্বীকার করে, তাহলে সে ঐ পিতার সন্তান সাব্যস্ত হবে না, যতোক্ষণ তার মালিক এর সত্যতা স্বীকার না করবে। অপরদিকে কোন স্ত্রীলোক এই বাচ্চার দাবিদার হলে এবং কোন মুসলমান মহিলা তার সপক্ষে এই সাক্ষ্য দিলে যে, এই সন্তান সে প্রসব করেছে এবং সন্তানও তা স্বীকার করলে, সে তারই সন্তান সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং হানাফী ফিক্হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ওসিয়াত করার ফযীলাত।

٧٣٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِءٍ مُّسْلِمٍ لَهُ شَيْئٌ يُوْصِي فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ الاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ .

৭৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে মুসলমানের কাছে এমন মাল আছে যাতে ওসিয়াত করা যেতে পারে, তার নিজের কাছে এর ওসিয়াতনামা লিখে না রেখে দুই রাত অতিবাহিত করারও তার অধিকার নেই (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। ওসিয়াতনামা লিখে রাখা বা ওসিয়াত করা খুবই উত্তম কাজ।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর সময় এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে ওসিয়াত করা।

٧٣٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ اَنَّهُ قِيْلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ انَّ هٰهُنَا غُلاَمًا يُفَاعًا مِّنْ غَسَّانَ وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ وَلَهُ مَالٌ وَلَيْسَ هُنَا الاَّ ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ مُرُوْهُ فَلْيُوْصِ لَهَا فَاَوْصٰى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِيْرُ جُشَمَ قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ فَبِعْتُ ذٰلِكَ الْمَالَ بِثَلٰثِيْنَ اَلْفًا بَعْدَ ذٰلِكَ وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِيْ اَوْصٰى لَهَا هِيَ اُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ .

৭৩৭। আমর ইবনে সুলাইম আয-যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলা হলো, এখানে গাস্সান গোত্রের একটি প্রাপ্তবয়সের কাছাকাছি বালক (মুমূর্ষু অবস্থায়) আছে। তার ওয়ারিসগণ সিরিয়ায় রয়েছে। তার কাছে এখানে সম্পদ আছে এবং এখানে তার চাচাতো বোন ছাড়া আর কেউ নাই। উমার (রা) বলেন, তাকে নিজ চাচাতো বোনের জন্য ওসিয়াত করতে বলো। অতএব সে 'বিরে জুশাম' নামক কূপটি তার জন্য ওসিয়াত করলো। আমর ইবনে সুলাইম বলেন, অতঃপর আমি সেই কূপটি তিরিশ হাজার দিরহামে বিক্রি করেছি। যে চাচাতো বোনের জন্য সে ওসিয়াত করেছিল সে ছিল আমর ইবনে সুলাইমের মা।

٧٣٨- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَعُوْدُنِىْ مِنْ وَّجَعٍ اشْتَدَّ بِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَلَغَ مِنِّى الْوَجَعُ مَا تَرٰى وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَّلاَ تَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَةٌ لِّىْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالشَّطْرِ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالثُّلُثِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَوْ كَبِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَّتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلاَّ اُجِرْتَ بِهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ اِمْرَاَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِىْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا تَبْتَغِىْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَّرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ حَتّٰى تَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَّيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

৭৩৮। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি যা আপনি দেখছেন। আমি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি এবং আমার একটিমাত্র কন্যা সন্তান ছাড়া আর কোন ওয়ারিস নাই। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান-খয়রাত করে যেতে পারি? এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? তিনি বলেনঃ "না"। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক পরিমাণ? তিনি বলেন, "না"। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "এক-তৃতীয়াংশ করা যেতে পারে। তবে এই পরিমাণটাও অধিক। তোমার ওয়ারিসগণ অসচ্ছলতার কারণে অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হবে, তাদেরকে এরূপ অবস্থায় রেখে যাওয়ার চাইতে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া অনেক উত্তম। তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমার পরিবারবর্গের জন্য যা কিছুই খরচ করবে তাতে তোমাকে সওয়াব দেয়া হবে, এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাসটি তুলে দিবে তার জন্যও তোমাকে সওয়াব দেয়া হবে।" আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি আমার সাথীদের পিছনে থেকে যাবো? তিনি বলেন ঃ "তুমি পিছনে থেকে যাবে না (তোমার পিছনে থেকে যাওয়াটা তোমার জন্য ক্ষতিকর নয়), বরং তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কাজই করবে তার ফলে তুমি উন্নত হবে এবং তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। খুব সম্ভব তুমি আরো বেশী দিন জীবিত থাকবে এবং তোমার মাধ্যমে একদলের উপকার হবে এবং অপর একদল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরত পূর্ণ

করুন এবং তাদেরকে তাদের হিজরত থেকে পশ্চাদমুখী করবেন না।" কিন্তু বিপদগ্রস্ত সাদ ইবনে খাওলা (রা)-র জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আফসোস করতেন। কেননা তিনি মক্কায়ই ইন্তিকাল করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার ঋণ পরিশোধের পর উদ্বৃত্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশে ওসিয়াত করা জায়েয। তার জন্য এর অধিক পরিমাণ সম্পদে ওসিয়াত করা জায়েয নয়। যদি সে এর অধিক পরিমাণ মালে ওসিয়াত করে এবং তার ওয়ারিসগণ তার মৃত্যুর পর এটা মেনে নেয় তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু মেনে নেয়ার পর তারা আর তাদের সম্মতি প্রত্যাহার করতে পারবে না। যদি তারা এ ওসিয়াত প্রত্যাখ্যান করে, তবে মৃতের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে তার ওসিয়াত কার্যকর হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে ওসিয়াত করা যেতে পারে, তবে এটাও পরিমাণে অধিক। এজন্য এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের বেশী ওসিয়াত করা জায়েয নয়। তবে ওয়ারিসরা যদি এর বেশী পরিমাণ সম্পদে ওসিয়াত অনুমোদ করে তাহলে তা জায়েয হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অধিকাংশ ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।[৬]

---

৬. ওসিয়াত (وص : يصى : وصينا) শব্দের অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, মিলিতি হওয়া, সংলগ্ন হওয়া, একটিকে অপরটির সাথে মিলানো, কল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি। এর পারিভাষিক অর্থ ঃ 'মৃত্যুকালীন আখেরাতের কল্যাণের জন্য নিজের মালিকানাধীন সম্পদের কিছু অংশ নিঃস্বার্থভাবে অন্য কাউকে দিয়ে যাওয়া।' এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে ধনসম্পদ রেখে গেলে তার পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ওসিয়াত করাকে তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে" (সূরা বাকারা ঃ ১৮০)। আতা, যুহরী, আসহাবে যাওয়াহির ও ইবনে জারীরের মতে, ওসিয়াত করা ফরয। কিন্তু ইমাম আবু হানীফাসহ জমহূরের মতে, ওসিয়াত করা মুস্তাহাব। মীরাসের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওসিয়াত করা ফরয ছিল। কিন্তু মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার পর উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে।

আইনগত উত্তরাধিকারীদের জন্য ওসিয়াত করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। অর্থাৎ কুরআন মজীদ যেসব ওয়ারিসের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, ওসিয়াতের মাধ্যমে তাদের অংশের হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে না। আর ওসিয়াতের মাধ্যমে কাউকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করাও যাবে না। এমনকি কোন ওয়ারিসকে তার প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত কোন জিনিস ওসিয়াতের সাহায্যে দান করাও জায়েয নয়। জমহূরের মতে মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়াত করা জায়েয নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে কোন ব্যক্তির ওয়ারিস না থাকলে তার সমস্ত মালে ওসিয়াত করা জায়েয। ওসিয়াত লিখিত আকারে হওয়া এবং কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী রাখা উচিত। কোন ব্যক্তি শরীআতের আওতায় কোন ওসিয়াত করে গেলে তা পূর্ণ করা ওয়ারিসদের জন্য বাধ্যতামূলক। তা গোপন করা বা পূর্ণ না করা আত্মসাতের শামিল। যার ওয়ারিসদের মধ্যে গরীব লোক রয়েছে তার পক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিও ওসিয়াত করে যাওয়া সংগত নয়। ওসিয়াত কেবল সেইসব লোকের জন্য করতে হবে যারা আইনগতভাবে ওসিয়াতকারীর ওয়ারিস হতে পারবে না। যেমন, মৃত পুত্রের সন্তানগণ ও তাদের বিধবা স্ত্রীগণ ইত্যাদি। কোন জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যও সম্পদ ব্যয় করার ওসিয়াত করা যেতে পারে (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ১৪

كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُرِ

(শপথ ও মানত)

১. অনুচ্ছেদ ঃ শপথ ভংগের সর্বনিম্ন কাফ্ফারা।

٧٣٩- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِيْنِه بِاِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ اِنْسَانٍ مُدٌّ مِّنْ حِنْطَةٍ وَكَانَ يَعْتِقُ الْجَوَارِىَ اِذَا وَكَّدَ فِى الْيَمِيْنِ .

৭৩৯। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) শপথ ভংগের জরিমানা হিসাবে দশজন মিসকীনকে আহার করাতেন। তিনি প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ করে গম দিতেন। তিনি শপথকে সুদৃঢ় করার পর তা ভংগ করলে একটি বাঁদী আযাদ করতেন।

٧٤٠- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ اِذَا اَعْطَوُا الْمَسَاكِيْنَ فِى كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ اَعْطَوْا مُدًّا مِّنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْاَصْغَرِ وَرَاَوْا اَنَّ ذٰلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُمْ .

৭৪০। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহাবী ও তাবিঈদের দেখেছি, তারা শপথ ভংগের কাফ্ফারা হিসাবে মিসকীনদের জনপ্রতি এক ক্ষুদ্রতর মুদ্দ অর্থাৎ নবী ﷺ প্রবর্তিত এক মুদ্দ করে গম দিতেন। তাদের মতে এটাই যথেষ্ট ছিল।

٧٤١- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِيْنٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنَثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ اَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِيْنٍ وَلَمْ يُؤَكِّدْهَا فَحَنَثَ فَعَلَيْهِ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ مِّنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ .

৭৪১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি শপথ করলো, অতঃপর তা দৃঢ় করলো (পুনর্বার উচ্চারণ করলো), অতঃপর তা ভংগ করলো, তাকে একটি গোলাম আযাদ করতে হবে অথবা দশজন মিসকীনকে পরিধেয় বস্ত্র দান করতে হবে। আর যে ব্যক্তি শপথ করলো, কিন্তু তা দৃঢ় করলো না, অতঃপর তা ভংগ করলো, তাকে দশজন মিসকীনকে আহার করাতে হবে। প্রত্যেককে এক মুদ্দ (সোয়া চৌদ্দ ছটাক) করে গম দিতে হবে। যার এই সামর্থ্য নেই তাকে পরপর তিন দিন রোযা রাখতে হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দশজন মিসকীনকে সকাল ও সন্ধ্যায় আহার করাতে হবে অথবা মাথাপিছু অর্ধ সা (এক সের সাড়ে বারো ছটাক) গম অথবা এক সা' (সাড়ে তিন সের) খেজুর অথবা এক সা' বার্লি দিতে হবে।

٧٤٢- عَنْ يَرْفَاءَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا يَرْفَاءُ اِنِّىْ اَنْزَلْتُ مَالَ اللّٰهِ مِنِّىْ مَنْزِلَةَ مَالِ الْيَتِيْمِ اِنِ احْتَجْتُ اَخَذْتُ مِنْهُ فَاِذَا اَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَاِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ وَاِنِّىْ قَدْ وَلِّيْتُ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ اَمْرًا عَظِيْمًا فَاِذَا اَنْتَ سَمِعْتَنِىْ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَلَمْ اُمْضِهَا فَاَطْعِمْ عَنِّىْ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ خَمْسَةَ اَصْوُعٍ بُرٍّ بَيْنَ كُلِّ مِسْكِيْنٍ صَاعٌ .

৭৪২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তার দ্বাররক্ষী ইয়ারফাকে বললেন, হে ইয়ারফা! আমি বাইতুল মাল (সরকারী সম্পদ)-কে ইয়াতীমের মালের মতোই মনে করি। আমি যদি অর্থের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ি তাহলে এ থেকে গ্রহণ করি এবং হাতে সম্পদ এসে গেলে তা ফেরত দেই। কিন্তু আমি যদি এর মুখাপেক্ষী না হই, তাহলে তা গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকি। মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত রয়েছে। অতএব তুমি যদি কখনো আমাকে শপথ করে তা ভংগ করতে দেখো, তাহলে আমার পক্ষ থেকে দশজন মিসকীনকে পাঁচ সা' গম দিবে, তাদের প্রত্যেককে অর্ধ সা' (মূল পাঠে এক সা) করে দিবে।

٧٤٣- عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ يَرْفَاءَ غُلَامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ اِنَّ عَلَىَّ اَمْرًا مِّنْ اَمْرِ النَّاسِ جَسِيْمًا فَاِذَا رَاَيْتَنِىْ قَدْ حَلَفْتُ عَلٰى شَىْءٍ فَاَطْعِمْ عَنِّىْ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ كُلَّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ .

৭৪৩। ইয়াসার ইবনে নুমায়ের (র) থেকে বর্ণিত। ইয়ারফা বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে বললেন, জনগণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত রয়েছে। যখন তুমি দেখতে পাবে যে, আমি কোন বিষয়ে শপথ করেছি, তখন আমার পক্ষ থেকে দশজন মিসকীনকে আহার করাবে। প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা গম দিবে।

٧٤٤- عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَمَرَ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْ يَمِيْنِهِ بِنِصْفِ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ .

৭৪৪। ইয়াসার ইবনে নুমায়ের (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) শপথ ভংগের কাফ্‌ফারা স্বরূপ দশজন মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধ সা' গম দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

٧٤٥- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِى كُلِّ شَىْءٍ مِّنَ الْكَفَّارَاتِ فِيْهِ اِطْعَامُ الْمَسَاكِيْنِ نِصْفُ صَاعٍ لِّكُلِّ مِسْكِيْنٍ .

৭৪৫। মুজাহিদ (র) বলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে (শপথ, যিহার, রোযা ইত্যাদি) কাফ্ফারা হচ্ছে মিসকীনদের আহার করানো। প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা খাবার (গম) দেয়া।[১]

২. অনুচ্ছেদ ঃ বাইতুল্লাহ্ পর্যন্ত পদব্রজে যাওয়ার মানত করলে।

٧٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ جَدَّتِهِ اَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا مَشْيًا اِلٰى مَسْجِدِ قُبَاءَ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ فَاَفْتَى ابْنُ عَبَّاسٍ اِبْنَتَهَا اَنْ تَمْشِىَ عَنْهَا .

৭৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্র (র) তার ফুফুর সূত্রে, তিনি তার দাদীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি কুবার মসজিদে পদব্রজে যাওয়ার মান্নত করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা পূর্ণ করার পূর্বেই মারা যান। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তার কন্যাকে তার পরিবর্তে পদব্রজে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

٧٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبَةَ قَالَ قُلْتُ لِرَجُلٍ وَاَنَا حَدِيْثُ السِّنِّ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَقُوْلُ عَلَىَّ الْمَشْىُ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَلاَ يُسَمِّىْ نَذْرًا شَىْءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ هَلْ لَكَ اِلٰى اَنْ اُعْطِيَكَ هٰذَا الْجَرْوَ الْجَرْوُ قِثَّاءٌ فِىْ يَدِهِ تَقُوْلُ عَلَىَّ مَشْىٌ اِلٰى

১. শপথ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "তোমরা আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণ করো, যখন তোমরা তাঁর নিকট কোন ওয়াদা শক্ত করে বেঁধে নিয়েছো এবং নিজেদের শপথ পাকাপোক্তভাবে করার পর তা ভংগ করো না, যখন তোমরা আল্লাহ্‌কে নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছো। আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কর্মতৎপরতা সম্পর্কে অবহিত। তোমাদের অবস্থা যেন সেই নারীর মতো না হয়, যে অনেক শ্রম ব্যয় করে সুতা কেটেছে, অতঃপর নিজেই তা টুকরা টুকরা করে ছিড়ে ফেলেছে। তোমরা নিজেদের শপথকে পারস্পরিক ব্যবহারসমূহে ধোঁকা ও প্রতারণার হাতিয়াররূপে ব্যবহার করছো, যেন একদল অপর দল অপেক্ষা অধিক ফায়দা লাভ করতে পারে" (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৯১-২)। "তোমরা নিজেদের শপথগুলিকে পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে ধোঁকা দেয়ার হাতিয়ারে পরিণত করো না। এমন যেন না হয় যে, কোন পদক্ষেপ স্থিতি লাভ করার পর তা স্খলিত হবে" (সূরা নাহ্‌লঃ ৯৪)। "তোমরা যেসব অর্থহীন শপথ করে থাকো, আল্লাহ্ সেজন্য পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তোমরা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে যে শপথ করো, সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন। এ ধরনের শপথ (ভংগ করার) কাফ্ফারা হচ্ছে, দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাবার দান করা, যা তোমাদের পরিবারের লোকদের খাইয়ে থাকো অথবা তাদের কাপড় দান করা অথবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। যার তা করার সামর্থ্য নেই, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটাই হচ্ছে তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, যখন শপথ করে তা ভংগ করো। তোমরা নিজেদের শপথের হেফাজত করো" (সূরা মাইদা ঃ ৮৯) (অনুবাদক)।

بَيْتَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقُلْتُ نَعَمْ فَقُلْتُهُ فَمَكَثْتُ حِيْنًا حَتّٰى عَقَلْتُ فَقِيْلَ لِىْ اِنَّ عَلَيْكَ
مَشْيًا فَجِئْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَسَئَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ مَشْىٌ فَمَشَيْتُ .

৭৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাবীবা (র) বলেন, আমি উঠতি বয়সে এক ব্যক্তিকে বললাম, যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমাকে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পদব্রজে যেতে হবে, কিন্তু সে মান্নতের উল্লেখ করেনি, এক্ষেত্রে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। লোকটি বললো, আমি তোমাকে এই ছোট শসাটি দিচ্ছি। তুমি কি বলবে, আমাকে পদব্রজে বাইতুল্লাহ যেতে হবে? আমি বললাম, হাঁ এবং আমি তাই বললাম। কিছুকাল পর আমার জ্ঞান-বুদ্ধি হলে আমাকে বলা হলো যে, কাবাঘর পর্যন্ত পদব্রজে যাওয়া তোমার উপর ওয়াজিব। অতএব আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের কাছে আসলাম। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কাবাঘর পর্যন্ত পদব্রজে যাওয়া তোমার উপর ওয়াজিব। অতএব আমি কাবা ঘর পর্যন্ত পদব্রজে আসলাম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। যে ব্যক্তি পদব্রজে কাবাঘর পর্যন্ত যাওয়া নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছে, তা মানত হিসাবে হোক বা না হোক, তার উপর পদব্রজে কাবাঘর পর্যন্ত যাওয়া ওয়াজিব। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি পদব্রজে বাইতুল্লাহ যাওয়ার মানত করার পর অপারগ হয়ে পড়লে।

٧٤٨- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اُذَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِىْ عَلَيْهَا مَشْىٌ اِلٰى بَيْتِ
اللّٰهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَجَزَتْ فَاَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ
عُمَرَ لِيَسْئَلَهُ وَخَرَجْتُ مَعَ الْمَوْلٰى فَسَئَلَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ثُمَّ
لْتَمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ .

৭৪৮। উরওয়া ইবনে উযাইনা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক দাদীর সংগে পদব্রজে বাইতুল্লাহ রওয়ানা হলাম। তিনি পদব্রজে বাইতুল্লায় যাওয়ার মানত করেছিলেন। কিছু রাস্তা অতিক্রম করার পর তিনি অপারগ হয়ে পড়লেন। অতএব তিনি তার আযাদকৃত গোলামকে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র কাছে পাঠান। আমিও তার সাথে গেলাম। সে তার কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তাকে বাহনে সওয়ার হয়ে যেতে বলো এবং বাহন যেখানে অপারগ হয়ে পড়েছিল, সে যেন সেখান থেকে হেঁটে যায়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞ আলেমের এই মত। তবে আমাদের কাছে এর চাইতে আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বর্ণিত মতই অধিক পছন্দনীয়।

٧٤٩- عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا ثُمَّ عَجَزَ فَلْيَرْكَبْ وَلْيَحُجَّ وَلْيَنْحَرْ بَدَنَةً وَجَاءَ عَنْهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ وَيُهْدِي هَدْيًا .

৭৪৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি পদব্রজে হজ্জ করতে যাওয়ার মানত করলো, অতঃপর অপারগ হয়ে পড়লো, সে সওয়ার হয়ে হজ্জ করতে যাবে এবং একটি উট কোরবানী করবে। তার কাছ থেকে অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, সে কোরবানীর জন্য একটি পশু পাঠাবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি এবং এই পশু পদব্রজে যাওয়ার স্থলাভিষিক্ত হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অধিকাংশ ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।

٧٥٠- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عَلَيَّ مَشْيٌ فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ فَسَئَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ فَقَالُوا عَلَيْكَ هَدْيٌ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَسَئَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ مَرَّةً أُخْرَى فَمَشَيْتُ .

৭৫০। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, বাইতুল্লায় হেঁটে যাওয়া আমার উপর ওয়াজিব ছিল। আমার কোমরে ব্যথার সৃষ্টি হলো। আমি সওয়ারীতে চড়ে মক্কায় এলাম এবং এ সম্পর্কে আতা ইবনে আবু রাবাহ প্রমুখের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলেন, তোমার উপর কোরবানী ওয়াজিব। আমি মদীনায় এসে এখানকার বিশেষজ্ঞদের কাছে জিজ্ঞেস করলে তারা আমাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি যেখানে পৌছে হেঁটে যেতে অপারগ হয়ে পড়েছিলে সেখান থেকে পুনর্বার পদব্রজে বাইতুল্লাহ যাবে। অতএব আমি তাই করলাম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা আতা ইবনে আবু রাবাহ (র)-র মত গ্রহণ করেছি। সে বাহনে চড়ে বাইতুল্লাহ যাবে এবং একটি পশু কোরবানী করবে। পুনর্বার হেঁটে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব নয়।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইনশাআল্লাহ বলে শপথ করা।

٧٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ قَالَ وَاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِيْ حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ .

৭৫১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি বলে—'আল্লাহ্র শপথ', অতঃপর বলে, ইনশা আল্লাহ তাআলা, অতঃপর যে কাজ করার জন্য শপথ করেছিল তা করেনি, সে শপথ ভংগকারী হিসাবে গণ্য হবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। কোন ব্যক্তি শপথ করার পরপর ইনশা আল্লাহ বললে, তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি মানত অপূর্ণ রেখে মারা গেলে।

٧٥٢–عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهٖ قَالَ اَقْضِهٖ عَنْهَا .

৭৫২। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাদ ইবনে উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন, আমার মা মারা গেছেন, তার একটি মানত ছিল, যা তিনি পূর্ণ করার সুযোগ পাননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তার পক্ষ থেকে তুমি তা পূর্ণ করো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মানত, দান-খয়রাত, হজ্জ ইত্যাদি যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে পূর্ণ করা হয়, তবে ইনশা আল্লাহ তা যথেষ্ট হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ পাপকাজ করার শপথ করলে অথবা মানত করলে তার ফলাফল।

٧٥٣– عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ نَذَرَ اَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّعْصِيَهٗ فَلَا يَعْصِهٗ .

৭৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার মানত করেছে সে যেন তা পূর্ণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার মানত করেছে, সে যেন তার বিরোধিতা করে (মানত পূর্ণ করবে না)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করি। কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানীমূলক কাজ করার মানত করলে এবং তা সুনির্দিষ্ট করে না বললে, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্যমূলক কাজ করবে এবং শপথের কাফ্‌ফারা আদায় করবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٧٥٤– اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ اَتَتْ امْرَاَةٌ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ اِنِّىْ نَذَرْتُ اَنْ اَنْحَرَ ابْنِىْ فَقَالَ لَا تَنْحَرِىْ ابْنَكِ وَكَفِّرِىْ عَنْ يَمِيْنِكِ فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسٌ كَيْفَ يَكُوْنُ فِىْ هٰذَا كَفَّارَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَرَاَيْتَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ فِيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَاَيْتَ .

৭৫৪। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, আমি কাসিম ইবনে মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি, এক মহিলা ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে এসে বললো, আমি আমার ছেলেকে যবেহ

করার মানত করেছি। তিনি বলেন, তুমি তোমার ছেলেকে যবেহ করো না এবং তোমার শপথের কাফ্ফারা আদায় করো। ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট বসা এক প্রবীণ ব্যক্তি বললো, কিভাবে এর কাফ্ফারা হবে? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তুমি কি দেখছো না, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে...." এবং এক্ষেত্রেও তিনি কাফ্ফারা ধার্য করেছেন? (অর্থাৎ যিহার তো একটি পাপকাজ, কিন্তু তাতেও কাফ্ফারার ব্যবস্থা করা হয়েছে)।

٧٥٥- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ فَرَاٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلْيَفْعَلْ .

৭৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে শপথ করার পর তার বিপরীতে কল্যাণ দেখতে পেলে, সে যেন নিজ শপথ ভংগ করে অধিকতর কল্যাণের কাজটি করে এবং শপথ ভংগের কাফ্ফারা আদায় করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র)-রও এই মত।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা নিষেধ।

٧٥٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ وَاَبِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا لَّيَحْلِفْ بِاللّٰهِ ثُمَّ لِّيَبْرُرْ اَوْ لِيَصْمُتْ .

৭৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনলেন, 'না, আমার পিতার শপথ।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি শপথ করতে চায় সে যেন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে, অতঃপর তা পবিত্র করে (পূর্ণ করে) অন্যথায় নীরব থাকে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। পিতার নামে শপথ করা উচিৎ নয়। অতএব কোন ব্যক্তি শপথ করতে চাইলে সে আল্লাহ্‌র নামেই করবে, অতঃপর তা পূর্ণ করবে অথবা নীরব থাকবে (শপথ করা থেকে বিরত থাকবে)।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বলে, আমার সম্পদ কাবার দরজার জন্য ওয়াক্ফ।

٧٥٧- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ فِيْمَنْ قَالَ مَالِىْ فِىْ رِتَاجِ الْكَعْبَةِ بِمَا يُكَفِّرُ ذٰلِكَ يُكَفِّرُ الْيَمِيْنَ .

৭৫৭। নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি বলে, আমার সম্পদ কাবার দরজার জন্য ওয়াক্ফ, তাকে শপথ ভংগের অনুরূপ কাফ্ফারা দিতে হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) থেকে আমাদের কাছে এই রিওয়ায়াত পৌছেছে। কিন্তু আমাদের মতে উত্তম পন্থা এই যে, সে যা বলেছে তা পূর্ণ করবে, নিজের স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ অর্থ হাতে রেখে অবশিষ্ট সব অর্থ দান-খয়রাত করবে। অতঃপর আবার আর্থিক প্রাচুর্য ফিরে আসলে, প্রথমে যে পরিমাণ অর্থ হাতে রেখে দেয়া হয়েছিল, সেই পরিমাণ অর্থ পুনরায় দান-খয়রাত করবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ অর্থহীন শপথের বর্ণনা।

٧٥٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لغوُ الْيَمِيْنِ قَوْلُ الْاِنْسَانِ لاَ وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ .

৭৫৮। আয়েশা (রা) বলেন, অর্থহীন শপথ হচ্ছে যা মানুষ কথায় কথায় বলে থাকে, না, আল্লাহ্র শপথ, হাঁ, আল্লাহ্র শপথ ইত্যাদি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। অর্থহীন শপথ এই যে, কোন ব্যক্তি কোন কথাকে সত্য জেনে শপথ করলো। অতঃপর সে জানতে পারলো যে, সত্য এর বিপরীতে রয়েছে। আমাদের মতে এটাই হচ্ছে অর্থহীন শপথ।

অধ্যায় ঃ ১৫

كِتَابُ الْبُيُوْعِ فِى التِّجَارَاتِ وَالسَّلَمِ
(ব্যবসা-বাণিজ্য ও অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়)

১. অনুচ্ছেদ ঃ আরিয়্যা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়।

٧٥٩– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ اَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا .

৭৫৯। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরিয়্যা পদ্ধতিতে বিক্রয়কারীকে অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন।

٧٦٠–عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِىْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ لاَ يَدْرِى اَقَالَ خَمْسَةً اَوْ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةَ .

৭৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরিয়্যা পদ্ধতিতে পাঁচ ওয়াসাকের কম অথবা পাঁচ ওয়াসাক (প্রায় সাতাশ মন) পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। (অধস্তন রাবী) দাউদ সংশয়ে পড়ে গেছেন যে, (তার উর্ধ্বতন রাবী আবু সুফিয়ান) পাঁচ ওয়াসাক বলেছেন না পাঁচ ওয়াসাকের কম বলেছেন, তা তার মনে নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করি। ইমাম মালেক (র) বলেন, 'আরিয়্যা এই যে, কোন ব্যক্তির খেজুরের বাগান আছে। সে তা থেকে কোন গরীব লোককে একটি অথবা দু'টি গাছ দান করলো। কিন্তু দরিদ্র লোকটির বারবার বাগানে যাতায়াত সে অপছন্দ করে। তাই সে বললো যে, ফল কাটার সময় উক্ত গাছের সমপরিমাণ খেজুর ওজন করে তাকে দিয়ে দিবে।' আমাদের কাছে এই পদ্ধতি নাজায়েয নয়। কেননা খেজুরের মালিক মূলত দানকারীই। সে ইচ্ছা করলে গাছ থেকে ফল কেটেও তাকে দিতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে এর সমপরিমাণ শুকনা খেজুরও তাকে ওজন করে দিতে পারে। কারণ এটা আসলে ক্রয়-বিক্রয় নয়। যদি তা ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাবে দেয়া হতো, তবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি জায়েয নয়।

২. অনুচ্ছেদ ঃ ফল পাকার পূর্বে বিক্রয় করা মাকরূহ।

٧٦١– حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ .

৭৬১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছে ফল (খাওয়ার বা কাজে লাগার) উপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।

٧٦٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ .

৭৬২। আবুর রিজাল (র) থেকে তার মা আমরা (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফল বিপদমুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[১]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ফল পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত গাছে থাকার শর্তসহ বিক্রি করা জায়েয নয়। তবে তা পাকার কাছাকাছি পৌছে গেলে বা দুই-চারটি পেকে গেলে উল্লেখিত শর্তসহ ক্রয়-বিক্রয় করাতে কোন দোষ নেই। অতএব ফল যদি সবুজ থাকে, তাতে হলুদ অথবা লাল রং না এসে থাকে, তবে তা শর্ত যোগ করে ক্রয়-বিক্রয় করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। বরং কেটে কেটে বিক্রি করার শর্ত আরোপ করলে দোষ নেই। হাসান বসরী (র) থেকে আমাদের কাছে অনুরূপ বর্ণনা পৌছেছে। তিনি বলেছেন, কেবল ধরেছে এরূপ ফল কেটে বিক্রি করায় কোন দোষ নেই। অতএব আমরা এই মতের উপর আমল করি।

٧٦٣- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَبِيْعُ ثِمَارَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الثُّرَيَّا يَعْنِى بَيْعَ النَّخْلِ .

৭৬৩। খারিজা ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) তার ফল (খেজুর) বিপদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করতেন না।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ফলের কিছু অংশ বিক্রি করা এবং কিছু অংশ পৃথক করা।

٧٦٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ حَائِطًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ أَلاَفِ دِرْهَمٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا .

---

১. ফুল থেকে ফল বের হয়ে যাওয়ার পর যে কোন অবস্থায় তা বিক্রি করা হানাফী মাযহাবমতে জায়েয। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ফল পাকা পর্যন্ত গাছে রাখার শর্ত আরোপ করলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। কিন্তু যদি এরূপ কোন শর্ত আরোপ না করা হয় এবং ঝগড়া-বিবাদের আশংকাও না থাকে, তবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তা পাকা পর্যন্ত গাছে রেখে দেয়ায় কোন দোষ নেই (ফাইদুল বারী, ৩য় খণ্ড)।

আলোচ্য হাদীসখানা মুরসাল পর্যায়ভুক্ত। কেননা আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (র) হচ্ছেন তাবিঈ। ইবনে আবদুল বার একটি সূত্রে দেখিয়েছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-র সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে হাদীসটি মারফূ বলে গণ্য হয় (অনুবাদক)।

৭৬৪। ইমাম মালেক (র)... মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (র) তার আফরাক নামের বাগানটি চার হাজার দিরহামে বিক্রি করেন এবং তা থেকে আট শত দিরহাম পরিমাণ খেজুর ব্যতিক্রম করেন।

٧٦٥- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهَا كَانَتْ تَبِيْعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِيْ مِنْهَا .

৭৬৫। ইমাম মালেক (র)... আবদুর রহমান কন্যা আমরাহ (র) নিজের ফলের বাগান বিক্রি করতেন এবং তা থেকে কিছু ফল বাদ রাখতেন।

٧٦٦- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَبِيْعُ ثِمَارَهُ وَيَسْتَثْنِيْ مِنْهَا .

৭৬৬। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তার ফল বিক্রি করতেন এবং তা থেকে কিছু ফল বাদ রাখতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। কোন ব্যক্তি নিজের ফলের বাগান বিক্রি করার সময় তা থেকে এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ পৃথক করে রাখতে পারে। এতে কোন দোষ নেই।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাটা খেজুরের বিনিময়ে শুকনা খেজুর বিক্রি করা নিষেধ।

٧٦٧- عَنْ زَيْدٍ أَبَا عَيَّاشٍ مَوْلٰى لِبَنِيْ زُهْرَةَ أَنَّهُ سَئَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَمَّنِ اشْتَرَى الْبَيْضَاءَ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ قَالَ فَنَهَانِيْ عَنْهُ وَقَالَ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَمَّنِ اشْتَرَى التَّمْرَ بِالرُّطَبِ فَقَالَ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ قَالُوْا نَعَمْ فَنَهٰى عَنْهُ .

৭৬৭। বনু যাহ্‌রার আযাদকৃত দাস যায়েদ আবু আইয়্যাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র কাছে বার্লিকে খোশাযুক্ত বার্লির বিনিময়ে বিক্রি করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাদ (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এর কোনটি অপেক্ষাকৃত উত্তম? তিনি বলেন, সাদাটি (গুড়ো) বার্লি। রাবী বলেন, তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কাঁচা খেজুরের বিনিময়ে শুকনা খেজুর বিক্রি করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "শুকিয়ে গেলে কাঁচা খেজুর কি কমে যায়? উপস্থিত লোকজন বললো, হাঁ। তিনি এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। সমপরিমাণ কাঁচা খেজুরের বিনিময়ে সমপরিমাণ শুকনা খেজুর নগদ বিক্রি করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

কেননা কাঁচা খেজুর শুকানোর পর তার পরিমাণ কমে যায়। এই কারণে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল গণ্য হয়।[২]

৫. অনুচ্ছেদ ঃ শস্য ইত্যাদি হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা নিষেধ।

٧٦٨- أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ اِبْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ فَبَاعَ حَكِيْمُ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ لاَ تَبِعْ طَعَامًا اِبْتَعْتَهُ حَتّٰى تَسْتَوْفِيَهُ .

৭৬৮। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নির্দেশে জনগণের জন্য খাদ্যশস্য খরিদ করলেন। তিনি (হাকীম) তা হস্তগত করার পূর্বেই বিক্রি করে দিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একথা জানতে পেরে বিক্রয় বাতিল গণ্য করেন এবং বলেন, তুমি যে শস্য খরিদ করেছো তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করো না।

٧٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ .

৭৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করেছে, সে যেন তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি না করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। অনুরূপভাবে যে কোন খাদ্যশস্য বা অন্য কোন জিনিস ক্রয় করার পর তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা ঠিক নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-ও এই কথা বলেছেন ঃ

أَمَّا الَّذِيْ نَهٰى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتّٰى يُقْبَضَ .

---

২. ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু ইউসুফ ও অপরাপর ইমামের এই অভিমত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। তিনি এ হাদীস গ্রহণ করেননি। কারণ তার মতে যায়েদ আবু আইয়্যাশ একজন অখ্যাত ও অপরিচিত ব্যক্তি। আল্লামা ইবনে হাযম, ইমাম তাহাবী ও ইমাম তাবারীও অনুরূপ কথা বলেছেন। কিন্তু ভিন্নমত পোষণকারীদের কাছে এটা সহীহ হাদীস এবং যায়েদ অখ্যাত ও অপরিচিত ব্যক্তি নন। আল্লামা যুরকানী বলেন, যায়েদের ডাকনাম আবু আইয়্যাশ এবং তার পিতার নাম আইয়্যাশ। তিনি মদীনার অধিবাসী এবং তাবিঈ, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র মুক্তদাস ছিলেন। মতান্তরে তিনি মাখযূম গোত্রের মুক্তদাস ছিলেন। তিনি সাদ (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার নিকট থেকে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ ও ইমরান ইবনে আবু উনায়েস হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী, ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান তার এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। ইমাম দারু কুতনীও তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। হাকেম তার আল-মুসতাদরাক গ্রন্থে লিখেছেন, হাদীস সংকলনকারী ইমামদের ঐক্যমত অনুযায়ী এটা সহীহ হাদীস। মুনযিরী বলেছেন, তার নিকট থেকে দুইজন সিকাহ রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেকও তাকে নির্ভরযোগ্য রাবী বলেছেন (অনুবাদক)।

"রাসূলুল্লাহ ﷺ হস্তগত করার পূর্বে যে জিনিস বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন তা হচ্ছে এই খাদ্যশস্য।"

ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, সব জিনিসের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হবে বলে আমি মনে করি। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। তবে তিনি জায়গা-জমি ও ঘর-বাড়িসহ স্থাবর প্রকৃতির সম্পত্তির বেলায় তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করার অনুমতি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে, স্থাবর প্রকৃতির সম্পত্তিও হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয নয়।

٧٧٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَبْتَاعُ يَدًا بِيَدٍ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ عَلَيْنَا مَنْ يَّاْمُرُ بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِىْ نَبْتَاعُهُ فِيْهِ اِلٰى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ اَنْ نَبِيْعَهُ .

৭৭০। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নগদ মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয় করতাম। তিনি আমাদের কাছে লোক পাঠালেন এবং সে আমাদেরকে ক্রীত পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের স্থান থেকে পুনরায় বিক্রি করার পূর্বে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিতো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এর অর্থ হস্তগত করা। হস্তগত করার পূর্বে তা থেকে সামান্য পরিমাণও বিক্রি করবে না। অতএব কোন ব্যক্তির পক্ষে তা(ক্রয়কৃত জিনিস)হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয নয়।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য ধারে বিক্রি করার পর বললো, এখনই মূল্য পরিশোধ করলে দাম কম রাখবো।

٧٧١- عَنْ اَبِىْ صَالِحِ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاعَ بَزًّا مِّنْ اَهْلِ دَارِ النَّخْلَةِ اِلٰى اَجَلٍ ثُمَّ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ اِلٰى كُوْفَةَ فَسَئَلُوْهُ اَنْ يَّنْقُدُوْهُ وَيَضَعَ عَنْهُمْ فَسَئَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا اٰمُرُكَ اَنْ تَاْكُلَ ذٰلِكَ وَلَا تُوْكِلَهُ .

৭৭১। সাফ্ফাহ-এর আযাদকৃত দাস আবু সালেহ ইবনে উবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি দারুন-নাখলার লোকদের কাছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজের কাপড় ধারে বিক্রি করলেন (দারুন-নাখলা তৎকালীন মদীনার উপকণ্ঠের একটি মহল্লার নাম, এখানে তাঁতীরা বসবাস করতো)। অতঃপর তারা কুফায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলো এবং ক্রেতাগণ তাকে বললো, কিছু কম নিলে নগদ মূল্য পরিশোধ করবো। আবু সালেহ এ সম্পর্কে যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি তোমাকে তা ভোগ করার বা ভোগ করানোর অনুমতি দিতে পারি না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। কোন ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির কাছে টাকা-পয়সা পাওনা আছে এবং তা পরিশোধ করার মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে।

এমতাবস্থায় দেনাদার যদি পাওনাদারকে বলে, তুমি পাওনার পরিমাণ কিছুটা ছেড়ে দিলে ধার পরিশোধ করে দিবো, এটা জায়েয নয়। কেননা সে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে ধার শোধ করে তার পরিবর্তে কিছু বিনিময় গ্রহণ করতে চাচ্ছে। এ যেন মোটা অংকের দেনার বিনিময়ে সামান্য কিছু নগদ ক্রয় করা। এটা জায়েয নয়। উমার ইবনুল খাত্তাব, যায়েদ ইবনে সাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র এই মত। ইমাম আবু হানীফাও এই মত পোষণ করেন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ গমের বিনিময়ে বার্লি খরিদ করা।

٧٧٢- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ فَقَالَ لِغُلَامِهِ خُذْ مِنْ حِنْطَةِ اَهْلِكَ فَاشْتَرِ بِهِ شَعِيْرًا وَلاَ تَاْخُذْ الاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ .

৭৭২। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদের পশুখাদ্য শেষ হয়ে গেলো। তিনি তার গোলামকে বলেন, ঘর থেকে গম নিয়ে গিয়ে তা দিয়ে বার্লি কিনে আনো। কিন্তু সমান সমান গ্রহণ করবে (পরিমাণে অধিক গ্রহণ করবে না)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি এক কাফীয গমের পরিবর্তে এক কাফীয বার্লি নগদ বিনিময় করে তবে আমাদের মতে এতে কোন দোষ নেই। এ সম্পর্কে হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীস খুবই প্রসিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ بَاْسَ بِاَنْ يَّاْخُذَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ اَكْثَرُ وَلاَ بَاْسَ بِاَنْ يَّاْخُذَ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرُ اَكْثَرُ يَدًا بِيَدٍ .

"সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, বার্লির বিনিময়ে বার্লি সমান পরিমাপে ক্রয়-বিক্রয় করতে হবে। সোনার বিনিময়ে রূপা বা বার্লির বিনিময়ে গম পরিমাপে অধিক হলে এবং নগদ ক্রয়-বিক্রয় হলে কোন দোষ নেই।"

এ সম্পর্কে অনেক হাদীস আছে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যশস্য বাকিতে বিক্রি করে তার মূল্যের বিনিময়ে অন্য জিনিস ক্রয় করার বর্ণনা।

٧٧٣-اَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يُكْرِهَانِ اَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ طَعَامًا الَى اَجَلٍ بِذَهَبٍ ثُمَّ يَشْتَرِى بِذٰلِكَ الذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ اَنْ يَّقْبِضَهَا .

৭৭৩। আবুয-যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) কোন ব্যক্তির বাকিতে সোনার বিনিময়ে খাদ্যশস্য বিক্রি করা এবং সোনা হস্তগত করার পূর্বে তার বিনিময়ে খেজুর ক্রয় করা মাকরূহ মনে করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে তা হস্তগত করার পূর্বে এর বিনিময়ে খেজুর ক্রয় করায় কোন দোষ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে খেজুরের আদান-প্রদান নগদ হতে হবে, বাকিতে হতে পারবে না। সাঈদ ইবনে জুবায়েরের কাছে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে তিনি এতে কোন দোষ দেখেননি এবং বলেছেন, এ ধরনের লেনদেনে কোন আপত্তি নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ শহর বা বাজারের বাইরে পথিমধ্যে গিয়ে বাজারে আগত লোকদের সংগে মিলিত হওয়া এবং দালালী করা মাকরূহ।

٧٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ تُلَقِّى السِّلَعُ حَتّٰى تُهْبَطَ الْاَسْوَاقَ وَنَهٰى عَنِ النَّجَسِ .

৭৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ পণ্যদ্রব্য বাজারে পৌছার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে তা ক্রয় করতে এবং দালালী করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। উল্লেখিত কাজগুলো মাকরূহ। দালালী (نجش) এই যে, এক ব্যক্তি কোন দ্রব্য ক্রয় করার জন্য দাম-দস্তুর করছিল, এমন সময় অপর এক ব্যক্তি এসে (নকল ক্রেতা সেজে) তার দাম বাড়িয়ে বললো, অথচ সে ক্রেতা নয়, বরং এই উদ্দেশ্যে অধিক মূল্য বলে যাতে আসল ক্রেতা পণ্যদ্রব্যটি অধিক মূল্যে ক্রয় করে। সুতরাং এটা জায়েয নয়। আর অগ্রবর্তী হয়ে পণ্যবাহীদের সাথে মিলিত হওয়ায় যদি তা শহরবাসীদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়, তবে এটাও ভালো কাজ নয়। কিন্তু পণ্যের পরিমাণ যদি প্রচুর হয় এবং অগ্রবর্তী হয়ে ক্রয় করার কারণে বাজার দরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকে, তবে পথিমধ্যে এগিয়ে গিয়ে তা ক্রয় করায় কোন দোষ নেই।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ ওজন দিয়ে বিক্রি করা জিনিস অগ্রিম ক্রয় করা।

٧٧٥- حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ لاَ بَاْسَ بِاَنْ يَّبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ بِسِعْرٍ مَّعْلُوْمٍ اِنْ كَانَ لِصَاحِبِهِ طَعَامٌ اَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَعَامٌ مَا لَمْ يَكُنْ فِىْ زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا اَوْ فِىْ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ وَعَنْ شِرَائِهَا حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا .

৭৭৫। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্যশস্য অগ্রিম ক্রয় করায় দোষ নেই, বিক্রেতার নিকট সেই খাদ্যশস্য মওজুদ থাক বা না থাক। কিন্তু তা যদি ক্ষেতের ফসল অথবা গাছের ফল হয় তবে পুষ্ট ও কাজে লাগার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তার অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ গাছের ফল পুষ্ট ও কাজে লাগাবার উপযোগী হওয়ার পূর্বে তা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে খাদ্যদ্রব্যের রকম-প্রকার (qualities), পরিমাণ ও সময়সীমা নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু কোন ক্ষেত অথবা গাছ নির্দিষ্ট করে দেয়া হলে, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্যের ত্রুটির জন্য দায়িত্বশীল হওয়া।

٧٧٦- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ بِالْبَرَاءَةِ وَقَالَ الَّذِىْ ابْتَاعَ الْعَبْدَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِالْعَبْدِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِىْ فَاخْتَصَمَا اِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ الرَّجُلُ بَاعَنِىْ عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَضَى عُثْمَانُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ اَنْ يَّحْلِفَ بِاللّٰهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ فَاَبَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنْ يَّحْلِفَ فَارْتَجَعَ الْغُلَامَ فَصَحَّ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَبَاعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِاَلْفٍ وَّخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ .

৭৭৬। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আট শত দিরহামে তার একটি গোলাম বিক্রি করলেন এবং শর্ত করলেন যে, কোন ত্রুটি দেখা দিলে সেজন্য তিনি দায়ী হবেন না। ক্রয়কারী পরে তার কাছে অভিযোগ করলো যে, গোলামটি রুগ্ন এবং আপনি বিক্রির সময় তা আমাকে বলেননি। তারা উভয়ে নিজেদের বিবাদের মীমাংসার জন্য উছমান ইবনে আফ্ফান (রা)-র কাছে উপস্থিত হলেন। ক্রেতা বললো, তিনি আমার কাছে একটি গোলাম বিক্রি করেছেন এবং এর রোগ আছে। ইবনে উমার (রা) বললেন, আমি তার কাছে গোলামটি এই শর্তে বিক্রি করেছি যে, দোষ-ত্রুটি দেখা দিলে আমি সেজন্য দায়ী নই। উছমান (রা) সিদ্ধান্ত দিলেন, ইবনে উমার (রা)-কে এই মর্মে শপথ করতে হবে যে, গোলামটি বিক্রি করার সময় এর রোগ সম্পর্কে তার জানা ছিলো না। কিন্তু তিনি শপথ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর গোলাম তার কাছে ফিরে এলো এবং রোগ সেরে গেলো। অতঃপর তিনি তাকে পনের শত দিরহামে বিক্রি করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র সূত্রে জানতে পেরেছি, তিনি বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি এই শর্তে কোন গোলাম বিক্রি করে যে, কোন ত্রুটি দেখা দিলে এজন্য সে দায়ী হবে না, তবে তার কোন দোষের জন্য সে দায়ী হবে না। এ থেকে সে

সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) দোষ-ত্রুটির দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকার শর্তে দাস বিক্রি করেছেন এবং এই ধরনের শর্ত আরোপ করাকে তিনি জায়েয মনে করেছেন। অতএব আমরা যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র মত গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি গোলাম অথবা অন্য কিছু বিক্রি করার সময় পণ্যের দোষ-ত্রুটির জন্য দায়ী না হওয়ার শর্ত আরোপ করলে এবং ক্রেতা এই শর্ত মেনে নিয়ে তা হস্তগত করলে তা জায়েয হবে। বিক্রি করার সময় এই দোষ সম্পর্কে তার (বিক্রেতার) জানা থাক বা না থাক, উভয় অবস্থায় সে দায়িত্বমুক্ত থাকবে। কেননা ক্রেতা তাকে এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু মদীনার আলেমদের মতে, কেবল অজানা ত্রুটির দায়িত্ব থেকে বিক্রেতা মুক্ত থাকবে। যে ত্রুটি সম্পর্কে তার জানা ছিল এবং সে তা গোপন রেখেছে, এই ত্রুটি থেকে সে দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে না। তারা আরো বলেন, যদি বিক্রির সময় সে বিক্রিত পণ্যের দোষত্রুটি প্রকাশ করে দেয় এবং এর দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকার শর্ত আরোপ করে, তবে এক্ষেত্রে সে ত্রুটির জন্য দায়িত্বমুক্ত থাকবে, ত্রুটি সম্পর্কে তার জানা থাক বা না থাক। (অর্থাৎ সে বলে দিলো যে, পণ্যের মধ্যে ত্রুটি আছে, কিন্তু কি ত্রুটি আছে তা বললো না)।

বিক্রেতা বললো, আমি দোষ-ত্রুটির দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকার শর্তে পণ্য বিক্রি করছি। অতঃপর যে ব্যক্তি পণ্যের ত্রুটি থেকে দায়িত্বমুক্ত থাকার শর্তে তা বিক্রি করলো এবং ত্রুটিও নির্দেশ করে দিলো এ ক্ষেত্রে সে দায়িত্বমুক্ত থাকবে (ক্রেতা পণ্যের ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হতে পারুক বা না পারুক)। ইমাম আবু হানীফা এবং অধিকাংশ হানাফী ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়।

٧٧٧- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَازِمِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

৭৭৭। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। যে কোন অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এটাই সাধারণ মত।

---

৩. অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়, যেমন মাছ ধরার পূর্বে বা পাখি শিকার করার পূর্বে তা বিক্রি করা ইত্যাদি। কোন কোন এলাকায় অগ্রিম টিকেট কেটে ছিপ ফেলে মাছ ধরার যে প্রথা চালু আছে, তা এই নিষিদ্ধ শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এমন কোন জিনিস বিক্রি করো না যা প্রকৃতপক্ষে তোমার নিকট নেই (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ)।

ইমাম মালেকের বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসটি মুরসাল এবং এটাই সঠিক। কেননা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) হচ্ছেন একজন প্রসিদ্ধ তাবিঈ, সাহাবী নন। আবু খিযাফা নিজস্ব সূত্র পরম্পরায় এ

٧٧٨–عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لاَ رِبوًا فِى الْحَيْوَانِ وَاِنَّمَا نُهِىَ عَنِ (مِنَ) الْحَيْوَانِ عَنْ ثَلْثٍ عَنِ الْمَضَامِيْنِ وَالْمَلاَقِيْحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِيْنُ مَا فِىْ بُطُوْنِ اِنَاثِ الْاِبِلِ وَالْمَلاَقِيْحُ مَا فِىْ ظُهُوْرِ الْجِمَالِ .

৭৭৮। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলতেন, জীব-জন্তুতে কোন সূদ নেই। জীব-জন্তু তিন ধরনের পদ্ধতিতে বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে ঃ মাদামীন, মালাকীহ ও হাবালুল হাবালা। মাদামীন হচ্ছে সেই পুশ, যা এখনো উষ্ট্রীর পেটে (ডিম্বাকারে) আছে। আর মালাকীহ হচ্ছে সেই পশু, যা এখনো উটের পিঠে (বীর্যাকারে) রয়েছে।

٧٧٩– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَبْتَاعُهُ الْجَاهِلِيَّةُ يَبِيْعُ اَحَدُهُمُ الْجَزُوْرَ اِلٰى اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِىْ فِىْ بَطْنِهَا .

৭৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ "পেটের বাচ্চা (হাবালুল-হাবালা) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।" (ইবনে উমার বলেন), জাহিলী যুগে ক্রয়-বিক্রয়ের এ ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল। কোন কোন উট উত্তম জাতের (এবং এর চাহিদা বেশি) হওয়ায় তাদের কেউ এই শর্ত করতো যে, বিক্রেতার উষ্ট্রীর পেটে যে বাচ্চা হবে এবং এই বাচ্চা বড়ো হওয়ার পর এর পেটে যে বাচ্চা হবে, তা ক্রয় করা হলো (বুখারী, মুসলিম)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের এসব পদ্ধতি নাজায়েয এবং বাতিল। আমাদের মতে, এটা 'অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের একটি পদ্ধতি।' অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয়।

٧٨٠– عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ وَبَيْعُ الْعِنَبِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً .

হাদীস ইবনে উমার (রা)-র কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবু খিযাফা হলেন একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। তবে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে এই মর্মে একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁকর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় নির্ধারণ করতে এবং অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন" (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে হিব্বান)। অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীস নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোতেও উল্লেখ আছে ঃ ইবনে মাজা ও মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে, দারু কুতনী ও তাবারানীতে সাহ্ল ইবনে সাদ (রা)-র সূত্রে, মুসনাদে আবু ইয়ালায় আনাস (রা)-র সূত্রে, মুসনাদে আহমাদ ও আবু দাউদে আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র সূত্রে, ইবনে আবু আসীমে ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-র সূত্রে এবং বায়হাকী ও ইবনে হিব্বানে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে (অনুবাদক)।

৭৮০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ "মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।" মুযাবানা এই যে, অনুমানে শুকনা খেজুর ও আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ করে তার বিনিময়ে গাছে ঝুলন্ত খেজুর ও আঙ্গুর বিক্রি করা।

٧٨١- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَاسْتِكْرَاءُ الْاَرْضِ بِالْحِنْطَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَئَلْنَا عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ .

৭৮১। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ "মুযাবানা ও মুহাকালা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।" মুযাবানা এই যে, গাছের মাথায় ঝুলন্ত ফল শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা। আর মুহাকালা এই যে, ক্ষেতের (অসংগৃহীত) গম সংগৃহীত গমের বিনিময়ে খরিদ করা অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ গমের বিনিময়ে জমি চাষাবাদ করতে দেয়া। ইবনে শিহাব (র) বলেন, আমরা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের কাছে সোনা অথবা রূপার বিনিময়ে (নগদ অর্থে ভাড়া নিয়ে) জমি চাষাবাদ করতে দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই।[৪]

٧٨٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ فِى رُؤُوْسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْاَرْضِ .

৭৮২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "মুযাবানা ও মুহাকালা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।" মুযাবানা এই যে, গাছের মাথার খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ক্রয় করা। আর মুহাকালা এই যে, (শস্যের বিনিময়ে) জমি ভাড়া দেয়া (চাষাবাদ করতে দেয়া)।

---

৪. কোন কোন এলাকায় নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য দেয়ার শর্তে জমি অন্যকে চাষাবাদ করতে দেয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। ইসলামী শরীআতে এই প্রথা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা জমিতে কোন কারণে ফসল উৎপন্ন না হলে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হলে অথবা মালিককে যে পরিমাণ শস্য দিতে হবে, তার কম উৎপন্ন হলে সমস্ত লোকসানের বোঝা চাষীকে বহন করতে হয় এবং সে চুক্তি মোতাবেক নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য জমির মালিককে দিতে বাধ্য থাকে। অতএব এ ধরনের চুক্তি অবৈধ এবং বাতিল গণ্য হবে। তবে নগদ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমি ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে যুযাবানা এই যে, গাছের মাথার ফল শুষ্ক ও সংগৃহীত ফলের বিনিময়ে অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর প্রদত্ত খেজুরের পরিমাণ কম না বেশী তা জানা থাকে না। শুষ্ক আঙ্গুরকে তাজা আঙ্গুরের বিনিময়ে এমনভাবে বিক্রি করা যে, এর মধ্যে কোন্‌টির পরিমাণ বেশী তা জানা থাকে না। আর মুহাকালা এই যে, গমকে খোশার মধ্যের গমের বিনিময়ে বিক্রি করা। এ ক্ষেত্রেও কোন্‌টির পরিমাণ বেশী তা জানা থাকে না। এইসব পন্থাই নাজায়েয। এজন্য এই প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ও নাজায়েয। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সকল বিশেষজ্ঞ আলেমের এটাই সাধারণ মত।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ গোশতের বিনিময়ে পশু খরিদ করা।

٧٨٣- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِاللَّحْمِ قَالَ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً اشْتَرٰى شَارِفًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ اَوْ قَالَ شَاةٍ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا فَلاَ خَيْرَ فِيْ ذٰلِكَ قَالَ اَبُو الزِّنَادِ وَكَانَ مَنْ اَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِاللَّحْمِ وَكَانَ يُكْتَبُ فِيْ عُهُوْدِ الْعُمَّالِ فِيْ زَمَانِ اَبَانَ وَهِشَامٍ يَنْهَوْنَ عَنْ ذٰلِكَ .

৭৮৩। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, গোশতের বিনিময়ে পশু ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি (আবুয যিনাদ) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ব্যক্তি যদি দশটি ছাগলের বিনিময়ে একটি উট ক্রয় করে, তবে এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেন, যদি কেউ তা যবেহ করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে, তবে এটা ভালো কাজ নয়। আবুয যিনাদ বলেন, আমি যার সাক্ষাতই পেয়েছি, তিনি গোশতের বিনিময়ে পশু ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আবান ইবনে উছমান ও হিশামের যুগে সরকারী কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরিত নির্দেশনামায় "গোশতের বিনিময়ে পশু ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ" একথা লেখা থাকতো।

٧٨٤- اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ وَكَانَ مِنْ مَيْسِرِ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ اَوِ الشَّاتَيْنِ .

৭৮৪। দাউদ ইবনে হুসাইন (র) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছেন, একটি অথবা দুইটি ছাগলের বিনিময়ে গোশত ক্রয়-বিক্রয় করাও জাহিলী যুগের জুয়ার মধ্যে গণ্য।

٧٨٥- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِاللَّحْمِ (شرح السنة) .

৭৮৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জানতে পেরেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ "গোশতের বিনিময়ে পশু ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"[৫]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। কোন ব্যক্তি জীবিত ছাগলের বিনিময়ে গোশত বিক্রি করলো। তার জানা নেই যে, বিক্রীত গোশতের পরিমাণ বেশী হবে, না ক্রয়কৃত ছাগলের গোশত। এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল এবং নাজায়েয। এটা মুযাবানা ও মুহাকালারই অনুরূপ। একইভাবে তৈলবীজের পরিবর্তে তৈল বিক্রি করাও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত (অর্থাৎ নাজায়েয)।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তির দামের উপর অপর ব্যক্তির দাম বাড়িয়ে বলা।

٧٨٦- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ .

৭৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন অপর কারো ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চলাকালে (একই বস্তুর) দরদাম না করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। এক ব্যক্তির দর কষাকষির উপর আরেক ব্যক্তির দর করা বা দর বাড়িয়ে বলা কোনটাই সংগত নয়। হাঁ, প্রথম ক্রেতা তা খরিদ করার পর অথবা ত্যাগ করার পর দ্বিতীয় খরিদদারের দর কষাকষি করা নাজায়েয নয়।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ যেসব কারণে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়।

٧٨٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ .

---

৫. এটাও মুরসাল হাদীস। ইমাম আবু দাউদ এটাকে মুরসাল হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইয়াযীদ ইবনে মারওয়ান নিজস্ব সনদ পরম্পরায় এটাকে সাহল ইবনে সাদ (রা)-র মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুক্ত করেছেন। কিন্তু এটা মনগড়া সনদ, এর নির্ভুলতা প্রমাণিত নয়।

ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফিঈর ছাত্র মুযানীর মতে, পশুর বিনিময়ে গোশত ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয, গোশত ও পশু একই প্রজাতির হোক বা না হোক। তবে গোশত ও পশুর নগদ আদান-প্রদান হতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদের মতে গোশত ও পশু একই প্রজাতির না হলে, যেমন জীবিত ছাগলের বিনিময়ে গরুর গোশত অথবা জীবিত গরুর বিনিময়ে উটের গোশত ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের মতে, একই প্রজাতির পশু ও গোশতের মধ্যে বিনিময় করা মূলতই জায়েয নয়। তবে যদি তা একই প্রজাতির না হয়, তাহলে ইমাম মালেক ও আহমাদের মতে এর বিনিময় জায়েয। এ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈর দু'টি মত রয়েছে। তার অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী পশু ও গোশত একই প্রজাতির না হলেও এর পারস্পরিক বিনিময় জায়েয নয়। কেননা হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক (অনুবাদক)।

৭৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ শর্ত রাখলে স্বতন্ত্র কথা।[৬]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি এবং এ সম্পর্কে আমরা ইবরাহীম নাখঈর ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি। তিনি বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা থেকে অবসর না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের তা প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে। বিক্রেতা বললো, আমি এই পণ্য তোমার কাছে বিক্রি করলাম। ক্রেতা যতোক্ষণ 'আমি তা ক্রয় করলাম' না বলবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতার জন্য বিক্রয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে। অপরদিকে প্রথমে ক্রেতা বললো, আমি এতো দামে তোমার এই পণ্য ক্রয় করলাম। এক্ষেত্রে বিক্রেতা যতোক্ষণ 'আমি তা বিক্রি করলাম' না বলবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতার ক্রয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

---

৬. বিভিন্ন কারণে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ রয়েছে। যেমন,

(ক) ক্রেতা পণ্য দেখেনি, কেবল মৌখিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তা ক্রয় করেছে। এক্ষেত্রে পণ্যের কোন দোষ-ত্রুটি না থাকলেও শুধু পূর্বে না দেখার অজুহাতে সে ক্রয়চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এজন্য বিক্রেতা তার সাথে কোনরূপ অভদ্র ব্যবহার করলে গুনাহগার হবে। ইসলামের বাণিজ্য আইনের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় খিয়ারুর রুইয়াত (خيار الرؤيات)।

(খ) ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর, এমনকি মূল্য পরিশোধ করার পর পণ্যের মধ্যে কোন ত্রুটি পরিদৃষ্ট হলে (যে সম্পর্কে পূর্বে কোন মীমাংসা হয়নি) ক্রেতার জন্য এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে। এক্ষেত্রেও বিক্রেতা কোন আপত্তি করতে পারবে না। এটাকে বলা হয় খিয়ারুল আয়েব (خيار العيب)।

(গ) ক্রেতা-বিক্রেতা যে কোন এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষ যদি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করাকালে, নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে তা প্রত্যাখ্যান করার শর্ত রাখে তবে সে ক্ষেত্রেও শর্ত আরোপকারী এই ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এই অবকাশকে বলে খিয়ারুশ শর্ত (خيار الشرط)।

(ঘ) বিক্রেতা কোন পণ্য নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করার কথা দিয়েছে। ক্রেতা ঐ পণ্য নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করার জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করতে পারে, যাবত না তারা ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণরূপে সাব্যস্ত করার পূর্বে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(ঙ) অনুরূপভাবে ক্রেতা কোন পণ্য নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করার কথা দিয়েছে। বিক্রেতা ঐ পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করার জন্য ক্রেতাকে বাধ্য করতে পারে, যতোক্ষণ তারা ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণরূপে সাব্যস্ত করার পূর্বে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে না যায়।

উল্লেখিত ক্ষেত্রদ্বয়ে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণরূপে সাব্যস্ত করার পূর্বে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তারা একে অপরকে নিজ নিজ কথার উপর অটল থাকার জন্য বাধ্য করতে পারবে না। এটাকে বলা হয় খিয়ারুল আক্দ (خيار العقد)।

(চ) ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়েছে, কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতা এখনো পরস্পর থেকে পৃথক হয়নি, নিজ নিজ স্থানে বসা আছে। এমতাবস্থায় ক্রেতা বা বিক্রেতা কোন কারণ ব্যতিরেকে এই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এই অবকাশকে বলা হয় খিয়ারুল মজলিস(خيار المجلس)। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের কথা সাব্যস্ত হওয়ার পর একজন অপরজনকে বললো, গ্রহণ করলেন তো? উত্তরে অপরজন বললো, গ্রহণ করলাম। তবে এক্ষেত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হলেও ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ থাকে না। (আলোচনাটি মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী অনূদিত মেশকাত শরীফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১ ও ২২ থেকে নেয়া হয়েছে—অনুবাদক)।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হলে।

٧٨٨-اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ بْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ اَوْ يَتَرَادَّانِ

৭৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হলে বিক্রেতার কথাই নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য হবে অথবা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। পণ্যের মূল্য নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হলে উভয়কেই শপথ করতে হবে এবং ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত। তবে শর্ত হচ্ছে বিক্রীত পণ্য অবিকল মওজুদ থাকতে হবে। কিন্তু পণ্য যদি ক্রেতার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, এ ক্ষেত্রেও উভয়কে শপথ করতে হবে এবং মূল্য (ক্রেতাকে) ফেরত দিতে হবে (এবং ক্রেতা পণ্য ফেরত দিবে)।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার পণ্য ধারে বিক্রি করলো এবং মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে গেলো।

٧٨٩- عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَاَفْلَسَ الَّذِىْ ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِىْ بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ وَاِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِىْ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيْهِ اُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .

৭৮৯। আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল হারিছ ইবনে হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে কোন ব্যক্তি (ধারে) পণ্যদ্রব্য বিক্রি করলো। অতঃপর ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে গেলো এবং বিক্রেতা তার পণ্যের কোন মূল্য আদায় করতে পারলো না। কিন্তু নিজের পণ্য অবিকল তার কাছে পেয়ে গেলো। এ ক্ষেত্রে সে তার পণ্য ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে (অন্যান্য পাওনাদারের তুলনায়) অগ্রাধিকার পাবে। আর মূল্য পরিশোধের পূর্বেই যদি ক্রেতা মারা যায়, তবে সে অন্যান্য পাওনাদারের সমতুল্য গণ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ক্রেতা যদি মারা যায় এবং পণ্যও হস্তগত করে থাকে, তবে বিক্রেতা অন্যান্য পাওনাদারের মতো একজন সাধারণ পাওনাদার হিসাবে গণ্য হবে। আর ক্রেতা যদি পণ্য হস্তগত না করে থাকে তাহলে বিক্রেতা অন্যান্য পাওনাদারের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবে। এমনকি সে তার পূর্ণ পাওনা ফেরত পাবে। অনুরূপভাবে ক্রেতা দেউলিয়া সাব্যস্ত হলে এবং পণ্য হস্তগত না করে থাকলে বিক্রেতা তার পণ্য ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে এবং প্রথমে তার সমস্ত পাওনা পরিশোধ করে দিতে হবে।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়ে ঠকে গেলে এবং মুসলমানদের জন্য মূল্য বেঁধে দেয়া।

৭৯٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ يَخْدَعُ فِى الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَايَعْتَهُ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا بَاعَ فَقَالَ لاَ خِلاَبَةَ .

৭৯০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বললো যে, সে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা খায় (ঠকে যায়)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ "তুমি যার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করবে তাকে বলবে, যেন না ঠকানো হয়।" অতঃপর সে যখনই ক্রয়-বিক্রয় করতো তখন বলতো, যেন না ঠকানো হয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এই নির্দেশ বিশেষভাবে কেবল ঐ ব্যক্তির জন্যই ছিল।

৭৯১- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ عَلٰى حَاطِبِ بْنِ اَبِى بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيْعُ زَبِيْبًا لَهُ بِالسُّوْقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِمَّا اَنْ تَزِيْدَ فِى السِّعْرِ وَاِمَّا اَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوْقِنَا .

৭৯১। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হাতিব ইবনে আবু বালতাআর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন মদীনার বাজারে নিজের শুকনো আংগুর বিক্রি করছিলেন। উমার (রা) তাকে বলেন, হয় মূল্য বাড়িয়ে দাও অথবা আমাদের বাজার থেকে উঠে যাও।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। 'মূল্য বেঁধে দেয়া এবং "এই এই মূল্যে বিক্রয় করো" বলা জায়েয নয়। এজন্য বাধ্য করাও জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্হবিদদের এটাই সাধারণ মত।[৭]

২০. অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রয়ে শর্ত আরোপ এবং যে কারণে বিক্রয় বাতিল হয়।

৭৯২- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اشْتَرٰى مِنْ امْرَاَتِهِ الثَّقَفِيَّةِ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ اَنَّكَ اِنْ بِعْتَهَا فَهِىَ لِىْ بِالثَّمَنِ الَّذِىْ تَبِيْعُهَا بِهِ فَاسْتَفْتٰى فِىْ ذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيْهَا شَرْطٌ لِاَحَدٍ .

---

৭. জনসাধারণের জীবনযাপন অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়লে, উৎপাদক ও সরবরাহকারীগণ অতি মুনাফাখোর হলে এবং জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলে জাতীয় সরকার জনগণের কল্যাণ ও সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে জিনিসপত্রের মূল্য বেঁধে দিতে পারেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ করা জায়েয নয় (অনুবাদক)।

৭৯২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের সাকীফ গোত্রীয় স্ত্রীর (যয়নব) নিকট থেকে একটি বাঁদী ক্রয় করলেন। তার স্ত্রী এই শর্তে তা বিক্রি করলেন, 'আপনি যদি একে পুনরায় বিক্রি করেন তাহলে যে পরিমাণ মূল্যই চান আমার কাছে বিক্রি করবেন'। এ ব্যাপারে তিনি উমার (রা)-র কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, এই বাঁদীর সাথে সংগম করো না। কেননা এর সাথে অন্যের শর্ত যুক্ত রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। যদি ক্রেতা বা বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে এমন শর্ত আরোপ করে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাতে ক্রেতা বা বিক্রেতার কোন স্বার্থ যুক্ত থাকে, তবে এই প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٧٩٣- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لاَ يَطأُ الرَّجُلُ وَلِيْدَةً اِلاَّ وَلِيْدَتَهُ اِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَاِنْ شَاءَ وَهَبَهَا وَاِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ .

৭৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলতেন, কোন ব্যক্তি কেবল তার এমন বাঁদীর সাথে সহবাস করতে পারে, যাকে সে ইচ্ছা করলে বিক্রিও করতে পারে অথবা দানও করতে পারে অথবা ভিন্নরূপ যা করার ইচ্ছা তাই করতে পারে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইবনে উমার (রা)-র কথার ব্যাখ্যা এই যে, কোন ক্রীতদাসের জন্য এমন কোন ক্রীতদাসীর সাথে সহবাস করা জায়েয নয়, যাকে সে আযাদ ব্যক্তির ন্যায় অন্যকে দান করতে পারে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

২১. অনুচ্ছেদঃ কেউ তাবীরকৃত খেজুর গাছ এবং মালদার গোলাম বিক্রি করলে[৮]

٧٩٤- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ اُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ .

৭৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: কেউ তাবীরকৃত খেজুর গাছ বিক্রি করলে তার ফল বিক্রেতা পাবে। কিন্তু ক্রেতা যদি (নিজের জন্য) ফলের শর্ত আরোপ করে থাকে তবে স্বতন্ত্র কথা।

٧٩٥- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

---

৮. কোন কিছুর সাহায্যে মাদী খেজুর গাছের ফুলের আবরণ চিরে তার মধ্যে নর খেজুর গাছের ফুলের রেণু প্রবিষ্ট করানোকে তাবীর বলা হয়। মদীনার অধিবাসীগণ এই কাজ করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে প্রথমে তাদের এই কাজ করতে নিষেধ করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তা করার পুনরানুমতি দেন (অনুবাদক)।

৭৯৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি মালদার গোলাম বিক্রি করলে এই মাল বিক্রেতারই থেকে যাবে। তবে ক্রেতা নিজের জন্য তার শর্ত আরোপ করে থাকলে ভিন্ন কথা।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি বিবাহিতা বাঁদী ক্রয় করলে অথবা বিবাহিতা বাঁদী উপঢৌকন দেয়া হলে তার বিধান।

٧٩٦- عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوفٍ اشْتَرٰى مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ جَارِيَةً فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا .

৭৯৬। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) আসেম ইবনে আদী (রা)-র কাছ থেকে একটি বাঁদী ক্রয় করলেন। পরে তিনি তাকে সধবা পেলেন। তাই তিনি বাঁদীটি ফেরত দিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। তাকে বিক্রি করার কারণে সে তালাকপ্রাপ্তা হবে না। অতএব কোন বাঁদীর স্বামী বর্তমান থাকলে তা এমন একটি ত্রুটি, যার কারণে তাকে (বিক্রেতার নিকট) ফেরত দেয়া যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

٧٩٧- اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرٍ اَهْدٰى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً مِّنَ الْبَصْرَةِ وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَ عُثْمَانُ لَنْ اَقْرِبَهَا حَتّٰى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا فَارْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا .

৭৯৭। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আমের উছমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে বসরার একটি বাঁদী উপঢৌকন দিলেন। তার স্বামী বর্তমান ছিল। উছমান (রা) বলেন, তার স্বামী তাকে তালাক না দেয়া পর্যন্ত আমি কখনো তার কাছে যাবো না। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে আমের তার স্বামীকে সম্মত করালেন এবং সে তাকে তালাক দিলো।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ তিন দিন এবং এক বছরের শর্ত আরোপ করা (পণ্য ফেরত দেয়ার জন্য)।

٧٩٨- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ وَهِشَامَ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ عُهْدَةَ الثَّلٰثِ وَالسَّنَةِ يَخْطُبَانِ بِهٖ عَلَى الْمِنْبَرِ .

৭৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্র (রা) বলেন, আমি আবান ইবনে উছমান ও হিশাম ইবনে ইসমাঈলকে লোকদের তিন দিন এবং এক বছরের চুক্তি করার শিক্ষা দিতে শুনেছি। এ সম্পর্কে তারা মিম্বারের উপরও ভাষণ দিতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা তিন দিন এবং এক বছরের চুক্তি সম্পর্কে কিছু জানি না। তবে কোন ব্যক্তি এক বছর অথবা তিন দিনের শর্ত করলে তদনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-র মত অনুযায়ী তিন দিনের অতিরিক্ত সময়েল জন্য পণ্য ফেরত দেয়ার অবকাশ রাখা জায়েয নয়।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ালায়ার ক্রয়-বিক্রয়।

٧٩٩- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ .

৭৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ালায়ার ক্রয়-বিক্রয় এবং তা দান করতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। ওয়ালায়া (الولاء)-র ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয নয় এবং তা দান করাও জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের সকল ফিক্হবিদের এটাই সাধারণ মত।

٨٠٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَرَدَتْ اَنْ تَشْتَرِى وَلِيْدَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِ عَلٰى اَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذٰلِكَ اِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ .

৮০০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) একটি বাঁদী ক্রয় করে তাকে আযাদ করে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু বাঁদীর মালিক পরিবারের লোকজন বললো, আমরা তাকে আপনার কাছে এই শর্তে বিক্রি করতে রাজী আছি যে, আমরা তার ওয়ালায়ার মালিক থাকবো। তিনি একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন। তিনি বলেন ঃ এই শর্ত তোমাকে বাধাগ্রস্ত করবে না। কেননা যে ব্যক্তি দাসত্বমুক্ত করে, সে-ই ওয়ালায়ার মালিক হয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। আযাদকারীই ওয়ালায়ার মালিক হয়। এই স্বত্ব তার কাছ থেকে স্থানান্তরিত হয় না। এটা বংশীয় উত্তরাধিকারের অনুরূপ। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এই মত।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ উম্মু অলাদের ক্রয়-বিক্রয়।

٨٠١- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَيُّمَا وَلِيْدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَاِنَّهُ لاَ يَبِيْعُهَا وَلاَ يَهَبُهَا وَلاَ يُوَرِّثُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا فَاِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ .

৮০১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, যে বাঁদী তার মনিবের ঔরসজাত সন্তান প্রসব করে, মনিব তাকে বিক্রয় করতে পারবে না, দানও করতে পারবে না এবং তাকে ওয়ারিসও বানাতে পারবে না। বরং সে তাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। মালিক মরে যাবার সাথে সাথে সে আপনা আপনি দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে।[৯]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ পশুর বিনিময়ে পশু ধারে অথবা নগদ বিক্রি করা।

٨٠٢- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا صَالِحٌ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعٰى عُصَيْفِيْرًا بِعِشْرِيْنَ بَعِيْرًا اِلٰى اَجَلٍ .

৮০২। হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) তার উসাইফীর নামের উটটি বিশটি উটের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করেন।

٨٠٣- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرٰى رَاحِلَةً بِاَرْبَعَةِ اَبْعِرَةٍ مَضْمُوْنَةٍ عَلَيْهِ يُوَفِّيْهَا اِيَّاهُ بِالرَّبَذَةِ .

৮০৩। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) চারটি উটের বিনময়ে একটি উষ্ট্রী ধারে ক্রয় করেন এবং এই শর্ত আরোপ করেন যে, উটগুলো রাবাযা নামক স্থানে পৌছার পর (বিক্রেতার কাছে) হস্তান্তর করবেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র সূত্রে এর বিপরীত (অর্থাৎ উল্লেখিত দু'টি হাদীসের বিপরীত) বর্ণনা আমাদের কাছে পৌছেছে।

٨٠٤- عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْبَعِيْرِ بِالْبَعِيْرَيْنِ اِلٰى اَجَلٍ وَالشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ اِلٰى اَجَلٍ وَبَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً .

---

৯. যে দাসী মনিবের ঔরষজাত সন্তান প্রসব করে তাকে উম্মু অলাদ (সন্তানের মা) বলে। এই ধরনের দাসী মালিকের মৃত্যুর সাথে সাথে দাসত্বমুক্ত হয়ে যায় (অনুবাদক)।

৮০৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট এবং দু'টি ছাগলের বিনিময়ে একটি ছাগল ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা আরো জানতে পেরেছি যে, নবী ﷺ "পশুর বিনিময়ে পশু ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন"।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের সকল ফিক্হবিদের এটাই মত।[১০]

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবসায়ে অংশীদার হওয়া (অংশীদারী কারবার)।

٨٠٥- اَخْبَرَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ (يَعْقُوْبُ الْمَدَنِىُّ) قَالَ كُنْتُ اَبِيْعُ الْبَزَّ فِىْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاَنَّ عُمَرَ قَالَ لاَ يَبِيْعُهُ فِىْ سُوْقِنَا اَعْجَمِىٌّ فَانَّهُمْ لَمْ يَفْقَهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُقِيْمُوْا فِى الْمِيْزَانِ وَالْمِكْيَالِ قَالَ يَعْقُوْبُ فَذَهَبْتُ اِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِىْ غَنِيْمَةٍ بَارِدَةٍ قَالَ وَمَا هِىَ قُلْتُ بَزٌّ قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهُ يَبِيْعُهُ صَاحِبُهُ بِرُخْصٍ لاَ يَسْتَطِيْعُ بَيْعَهُ اَشْتَرِيْهِ لَكَ ثُمَّ اَبِيْعُهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ فَذَهَبْتُ فَصَفَقْتُ بِالْبَزِّ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ فَطَرَحْتُ فِىْ دَارِ عُثْمَانَ فَلَمَّا رَجَعَ عُثْمَانُ فَرَاَى الْعُكُوْمَ فِىْ دَارِهِ قَالَ مَا هٰذَا

---

১০. পশুর বিনিময়ে পশু নগদ এবং অসম মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু ধারে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। এ সম্পর্কে ইমাম আহমাদের তিনটি মত লক্ষ্য করা যায় ঃ (এক) এ ধরনের বিনিময় সাধারণত জায়েয, (দুই) সাধারণত জায়েয নয়, (তিন) যদি একই প্রজাতির পশু হয় তবে ধারে বিনিময় জায়েয নয়, কিন্তু দুই প্রজাতির হলে জায়েয হবে। ইমাম মালেক (র) ও শাফিঈ (র)-ও এই শেষোক্ত মত পোষণ করেন। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার সহচরবৃন্দ ধারে পশুর আন্ত-বিনিময় সাধারণভাবেই নাজায়েয মনে করেন। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ "জীবের বিনিময়ে জীব ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা, দারিমী)। আর যেসব আলেম ধারে পশুর আন্ত-বিনিময় জায়েয বলেন তারা নিম্নোক্ত হাদীস নিজেদের মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একটি অভিযানের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তা প্রস্তুত করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় উটের অভাব হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাকাতের উট প্রাপ্তি সাপেক্ষে (জনসাধারণের নিকট থেকে) উট ধার নেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি তদনুযায়ী যাকাতের উট সংগৃহীত হওয়া সাপেক্ষে দুই দুইটি উটের বিনিময়ে এক একটি উট গ্রহণ করেন" (আবু দাউদ, দারু কুতনী)। "নবী ﷺ একটি কম বয়সী উট ধার নিলেন এবং এর বিনিময়ে ছয় বছর বয়সের একটি উট দেয়ার নির্দেশ দিলেন" (বুখারী) (অনুবাদক)।

قَالُوا بَزٌّ جَاءَ بِهِ يَعْقُوبُ قَالَ اُدْعُوهُ لِي فَجِئْتُ فَقَالَ مَا هٰذَا قُلْتُ هٰذَا الَّذِي قُلْتُ لَكَ قَالَ اَنْظَرْتَهُ قُلْتُ كَفَيْتُكَ وَلٰكِنْ رَاَ بِهِ حَرَسُ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ فَذَهَبَ عُثْمَانُ اِلٰى حَرَسِ عُمَرَ فَقَالَ اِنَّ يَعْقُوبَ يَبِيعُ بَزِّي فَلاَ تَمْنَعُوهُ قَالُوا نَعَمْ فَجِئْتُ بِالْبَزِّ السُّوْقَ فَلَمْ اَلْبَثْ حَتّٰى جَعَلْتُ ثَمَنَهُ فِي مِزْوَدٍ وَذَهَبْتُ اِلٰى عُثْمَانَ وَبِالَّذِي اشْتَرَيْتُ الْبَزَّ مِنْهُ فَقُلْتُ عُدَّ الَّذِي لَكَ فَاعْتَدَّهُ وَبَقِيَ مَالٌ كَثِيرٌ قَالَ فَقُلْتُ لِعُثْمَانَ هٰذَا لَكَ اَمَا اِنِّي لَمْ اَظْلِمْ بِهِ اَحَدًا قَالَ جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَفَرِحَ بِذٰلِكَ قَالَ فَقُلْتُ اَمَا اِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَ بَيْعِهَا مِثْلَهَا اَوْ اَفْضَلَ قَالَ وَعَائِدٌ اَنْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ قَالَ قَدْ شِئْتُ قَالَ فَقُلْتُ فَاِنِّي بَاغٍ خَيْرًا فَاَشْرِكْنِي قَالَ نَعَمْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ .

৮০৫। ইয়াকূব আল-মাদানী (র) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র যুগে কাপড়ের ব্যবসা করতাম। উমার (রা) নির্দেশ দিলেন, আমাদের বাজারে অনারব লোকেরা ব্যবসা করতে পারবে না। কেননা দীন সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তারা ওজন-পরিমাপও সঠিকভাবে করে না। ইয়াকূব (র) বলেন, আমি উছমান ইবনে আফ্ফান (রা)-র কাছে গিয়ে তাকে বললাম, আপনি কি সস্তার সুযোগ নিতে চান? তিনি বলেন, তা কি করে? আমি বললাম, কাপড় আছে। আমি এর স্থান চিনি, মালিক সস্তায় তা বিক্রি করে দিচ্ছে। কারণ সে আর কাপড় বিক্রি করতে পারবে না (কেননা উমার (রা) তা বাজারে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন)। আমি কি তা আপনার পক্ষ হয়ে ক্রয় করবো এবং পরে তা বিক্রি করবো? তিনি বলেন, হাঁ। অতএব আমি নির্দিষ্ট স্থানে গেলাম এবং সেখান থেকে কাপড় খরিদ করে হযরত উছমানের বাসায় নিয়ে এলাম। উছমান (রা) বাড়ি ফিরে এসে কাপড়ের গাঁট দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি? লোকেরা বললো, কাপড়ের গাঁট, ইয়াকূব নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। অতএব আমি তার কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন,এগুলো কি? আমি বললাম, যে সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে আপনাকে অবহিত করেছিলাম। তিনি বলেন, তুমি তা ভালো করে দেখে নিয়েছো কি? আমি বললাম, প্রয়োজন নেই। কিন্তু উমার (রা)-র পাহারাদারগণ ভয় দেখিয়েছে। উছমান (রা) উমার (রা)-র চৌকিদারদের কাছে গিয়ে বলেন, ইয়াকূব আমার কাপড় বিক্রি করছে, তাকে বাধা দিও না। তারা বললো, ঠিক আছে। অতএব আমি কাপড় নিয়ে বাজারে গেলাম এবং অল্প সময়ের মধ্যে তা বিক্রি করে মূল্যটা থলের মধ্যে পুরে নিলাম। অতঃপর আমি উছমান (রা)-র কাছে ফিরে এলাম। আমি যার কাছ থেকে কাপড় ক্রয় করেছিলাম, সেও আমার সাথে ছিল। আমি তাকে বললাম, তোমার পাওনা হিসাব করে বুঝে নাও। অতএব সে তার পাওনা হিসাব করে বুঝে নিল। তারপরও যথেষ্ট মাল পড়ে থাকলো। আমি উছমান (রা)-কে বললাম, এগুলো আপনার মাল। আমি কারো উপর যুলুম করিনি। তিনি বলনে, আল্লাহ তোমাকে উত্তম

প্রতিদান দিন। তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। ইয়াকূব বলেন, আমি বললাম, আমি বিক্রি করার এরূপ স্থান বা তার চেয়েও উত্তম স্থান সম্পর্কে জানি। তিনি বলেন, পুনর্বার এরূপ করার খেয়াল আছে না কি? আমি বললাম, হাঁ, যদি আপনার অনুমতি হয়। তিনি বলেন, হাঁ, অনুমতি আছে। আমি বললাম, আমি নেক কাজ করতে চাই, যদি আপনি আমাকে শরীক করেন। তিনি বলেন, হাঁ, তোমার অর্ধেক এবং আমার অর্ধেক।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। যদি দুই ব্যক্তি ধারে খরিদ করার জন্য অংশীদার হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। তাদের যে কোন একজনের মূলধন না থাকলেও কোন দোষ নেই। লাভও সমান অংশে ভাগ করে নিবে এবং লোকসানও সমান অংশ বহন করবে। যদি একজন অংশীদার গোটা ব্যবসা পরিচালনা করে এবং অপরজন কিছুই না করে তবে তাকে সমান অংশের অধিক মুনাফা দেয়া জায়েয নয়। কেননা যে ব্যবসায়ের দায়দায়িত্ব অপর ব্যক্তি বহন করে, তার লাভ সে কি করে ভোগ করতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণের এটাই মত।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কথা।

٨٠٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعُ اَحَدُكُمْ جَارَهُ اَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِىْ جِدَارِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا لِىْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللّٰهِ لَاَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ اَكْتَافِكُمْ .

৮০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তোমাদের কেউ যেন নিজ প্রতিবেশীকে তার দেয়ালের সাথে খুঁটি পুততে নিষেধ না করে।" (অধস্তন রাবী) আরাজ (র) বলেন, অতঃপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, কি ব্যাপার!আমি তোমাদেরকে এ হাদীসের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করতে দেখছি। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা যদি অস্বীকার করো, তবে আমি তা তোমাদের পার্শ্বদেশে নিক্ষেপ করবো।[১১]

---

১১. হাদীসটির বিভিন্ন বর্ণনায় কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য আছে। যেমন কোন কোন বর্ণনায় خشبة -এর স্থলে حشبة এবং اكنافكم -এর স্থলে اكتافكم (কাঁধ) শব্দ রয়েছে। আবু হুরায়রা (রা)-র কথার অর্থ হচ্ছে, তোমরা যদি হাদীসের এই নির্দেশ গ্রহণ না করো এবং এর উপর আমল না করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের কাঁধের উপর খুঁটি স্থাপন করবো, যা তোমরা পছন্দ করবে না। আধিক্য বুঝানোর জন্য কথাটি বলা হয়েছে। হাদীসের নির্দেশের ব্যাপারে তারা যে অবহেলা ও অলসতা প্রদর্শন করেছে তা থেকে তাদের সতর্ক করার জন্য একথা বলা হয়েছে।

আল্লামা যুরকানী (র) বলেন, হাদীসের এই নিষেধাজ্ঞা হারাম পর্যায়ের নয়, মাকরূহ তানযীহ পর্যায়ের। অতএব প্রতিবেশীকে বাঁধা না দেয়াই উত্তম। ইমাম আবু হানীফা (র), মালেক, শাফিঈ (তার সর্বশেষ মত) এবং জমহুরের এটাই অভিমত। কেননা অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "কোন ব্যক্তির জন্য অপর কোন ব্যক্তির সম্পদ জবরদখল করা জায়েয নয়। তবে সে খুশিমনে কিছু দান করলে ভিন্ন কথা" (হাকেম)। ইমাম শাফিঈ (তার প্রাচীন মত), আহমাদ, ইসহাক ও আহলুল

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, নিজেদের মধ্যে আপোষে সহজতা বিধান, পরস্পরের জন্য সুযোগ-সুবিধা করে দেয়া এবং সৌজন্যমূলক ব্যবহারের জন্য হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিচার-ব্যবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে এই নির্দেশ কার্যকর হবে না অর্থাৎ এক প্রতিবেশী তার জায়গায় খুঁটি গাড়তে না দিলে অপর প্রতিবেশীর পক্ষে তা জোরপূর্বক গাড়ার রায় দেয়া যাবে না। আমরা জানতে পেরেছি যে, কাযী শুরায়হ্-এর কোর্টে এই ধরনের একটি মামলা উত্থাপিত হয়েছিল। যে ব্যক্তি খুঁটি পুঁতেছিল, তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, তোমার পা তোমার ভাইয়ের সওয়ারী থেকে সরিয়ে নাও। অতএব আমাদের মতে, এই নির্দেশই কার্যকর হবে। তবে প্রতিবেশীর সুযোগ-সুবিধা করে দেয়াই উত্তম।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ হেবা ও সদাকার বর্ণনা।

٨٠٧- عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِّصِلَةِ رَحِمٍ اَوْ عَلٰى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَاِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيْهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرٰى اَنَّهُ اِنَّمَا اَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلٰى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيْهَا اِنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا .

৮০৭। মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে অথবা সদাকা হিসাবে কাউকে কিছু দান (হেবা) করলো, তা সে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আর যদি কোন ব্যক্তি বিনিময়ে কোন কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু দান করে থাকে, তবে সে এই দান ফেরত নিতে পারবে, যদি সে তার প্রতি (কোন কারণে) সন্তুষ্ট না হতে পারে।[১২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। কোন ব্যক্তি আত্মীয়তার খাতিরে অথবা সদাকা হিসাবে অপর কোন ব্যক্তিকে কিছু দান করেছে এবং সে তা হস্তগতও করেছে। এ অবস্থায় দানকারীর জন্য তা ফেরত নেয়া জায়েয নয়। যদি সে কোন অনাত্মীয় ব্যক্তিকে কিছু দান করে এবং দান গ্রহীতা তা হস্তগত করে থাকলেও দাতা তা ফেরত নিতে পারে, যদি সে তার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার না পায় অথবা দানকৃত বস্তু (এমন) কোন ব্যক্তির হাতে চলে যায় যাকে সে পছন্দ করে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্হবিদ সাধারণের এটাই মত।

হাদীসের মতে প্রতিবেশী তার দেয়ালের সাথে খুঁটি পুততে বাঁধা দিলে জোরপূর্বক তা পোতা যাবে। কেউ কেউ বলেছেন, এক্ষেত্রে প্রতিবেশীর কাছ থেকে আগে অনুমতি নিতে হবে। সে অনুমতি দিলে খুঁটি গাড়বে, অন্যথায় গাড়বে না (অনুবাদক)।

১২. কোন কিছু দান করে পুনরায় তা ফেরত নেয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি (কোন কিছু) দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয়, সে সেই কুকুরের সমতুল্য যে পেট ভরে আহার করার পর বমি করে, অতঃপর তা আবার খায়" (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা) (অনুবাদক)।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ নুহ্‌লা (উপঢৌকন)।

٨٠٨- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اِنَّ اَبَاهُ اَتٰى بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ نَحَلْتُ اِبْنِىْ هٰذَا غُلَامًا كَانَ لِىْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلَّ وَلَدٍ لَّكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ .

৮০৮। নুমান ইবনে বাশীর (রা) বলেন যে, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমার এই পুত্রকে আমি আমার একটি গোলাম দান করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এরূপ দান করেছ? তিনি বলেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তাহলে তুমি তা ফেরত নাও।[১৩]

---

১৩. হাদীসটি সহীহ বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ ও মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তুমি কি আশা করো যে, তোমার সকল সন্তান তোমার সাথে সমানভাবে সদ্ব্যবহার করুক? তিনি বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তবে তো এরূপ হওয়া উচিৎ নয়।" জাবের (রা)-র সূত্রে সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে ঃ "বশীরের স্ত্রী (আমরাহ) বশীরকে বললো, আপনার গোলামটি আমার পুত্রকে দান করুন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এর সাক্ষী রাখুন। অতএব তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, অমুকের কন্যা অমুক (আমার স্ত্রী) চাচ্ছে যে, আমি তার ছেলেকে আমার গোলামটি দান করি এবং এর অনুকূলে সে আপনাকে সাক্ষী করার জন্য বলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন ঃ এর আরো ভাই আছে কি? বশীর বলেন, হাঁ, আছে। তিনি বলেন ঃ তাদের প্রত্যেককেই কি তুমি এর অনুরূপ দান করেছ? তিনি বলেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তাহলে এটা ঠিক নয়। আর আমি সঠিক বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর সাক্ষী হই না।"

বুখারী-মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, নুমান (র) বলেন, "আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলেন। তখন আমার মা আমরাহ বিনতে রওয়াহা (আমার পিতাকে) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এর সাক্ষী না করা পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হবো না। অতএব তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, আমি (আমার স্ত্রী) আমরাহ বিনতে রওয়াহার গর্ভজাত আমার এই সন্তানকে একটি উপঢৌকন দিয়েছি। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে এর অনুকূলে আপনাকে সাক্ষী করার জন্য আমার কাছে বায়না ধরেছে। তিনি বলেন ঃ তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এর অনুরূপ উপঢৌকন দিয়েছ? তিনি বলেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তবে আল্লাহ্‌কে ভয়ক করো এবং সকল সন্তানের সাথে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করো। নুমান (রা) বলেন, তিনি ফিরে এসে উপঢৌকনটি ফেরত নিলেন।" বুখারী-মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "আমি অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হই না"।

তাউস, সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ (তার একমত অনুযায়ী), ইসহাক ও ইমাম বুখারীর মতে হাদীসে উপঢৌকন ফেরত নেয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা বাধ্যতামূলক নির্দেশ। তাদের মতে দান ও উপঢৌকনের বেলায় সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান করা ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)। তারা আরো বলেন, এ ব্যাপারে সমতা বিধান না করা হলে দান বাতিল গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফিঈ ও জমহুর আলেমদের মতে, দান, উপঢৌকন ইত্যাদি মুস্তাহাব ও ঐচ্ছিক পর্যায়ের ব্যাপার। তবে সমতা বিধান না করা মাকরূহ। এতে দান বাতিল গণ্য হবে না।

٨٠٩- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جُذَاذَ عِشْرِيْنَ وَسْقًا مِنْ
مَالِهِ بِالْعَالِيَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللّٰهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَىَّ
غِنًى بَعْدِيْ مِنْكِ وَلَا اَعَزَّ اِلَىَّ فَقْرًا مِنْكِ وَاِنِّيْ كُنْتُ نَحَلْتُكِ مِنْ مَالِيْ جُذَاذَ
عِشْرِيْنَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَذَذْتِيْهِ وَاحْتَزْتِيْهِ كَانَ لَكِ فَاِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ
وَاِنَّمَا هُوَ اَخُوْكِ (اَخَوَاكِ) وَاُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوْهُ عَلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ يَا
اَبَتِ وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ اِنَّمَا هِيَ اَسْمَاءُ فَمَنِ الْاُخْرٰى قَالَ ذُوْ بَطْنِ
بِنْتِ خَارِجَةَ اُرَاهَا جَارِيَةً فَوَلَدَتْ جَارِيَةً .

৮০৯। আয়েশা (রা) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) তাকে কতগুলো খেজুর গাছ দান করেছিলেন। এগুলো আলীয়া নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল এবং তাতে (বছরে) বিশ ওয়াসাক খেজুর উৎপন্ন হতো। তার মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি বলেন, হে বেটি! আল্লাহ্‌র শপথ! আমার পরে তুমি ছাড়া অপর কাউকে তোমার চেয়ে অধিক ধনবান দেখাটা আমার কাছে অধিক প্রিয় নয় এবং অপর কারো দরিদ্র হওয়াটা তোমার দরিদ্র হওয়ার চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় নয়। আমি তোমাকে আমার সম্পদ থেকে বিশ ওয়াসাক পরিমাণ খেজুর গাছ দান করেছিলাম। তুমি যদি তা কেটে নিতে তবে এটা তোমারই হতো। কিন্তু এখন তা ওয়ারিসদের সম্পদ। তাদের সংখ্যা হচ্ছে তোমার এক ভাই এবং দুই বোন। অতএব আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তা বণ্টন করে দিও। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে আব্বাজান, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি এর চেয়েও অধিক সম্পদ হতো, তবে তাও আমি ছেড়ে দিতাম। আমাদের এক বোন তো আসমা, দ্বিতীয় বোন কে? তিনি বলেন, হাবীবা বিনতে খারিজার পেটে যে সন্তান রয়েছে, আমার মনে হয় তা কন্যা সন্তানই হবে। অতএব তার পেট থেকে কন্যা সন্তানই ভূমিষ্ঠ হলো।

٨١٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ
يَنْحَلُوْنَ اَبْنَائَهُمْ نَحْلًا ثُمَّ يُمْسِكُوْنَهَا قَالَ فَاِنْ مَاتَ ابْنُ اَحَدِهِمْ قَالَ مَالِيْ بِيَدِيْ

ইমাম তহাবী (র) তার 'শারহু মাআনিল আছার' গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, দান ও উপঢৌকনের ক্ষেত্রে পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান করতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (র) বলেন, উত্তরাধিকার আইনের বিধান "এক পুত্র দুই কন্যার সমান অংশ পাবে" দান ও উপঢৌকনের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করতে হবে। ইমাম তহাবী অতঃপর ইমাম আবু ইউসুফের মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ইমাম শাফিঈর মতে পিতা পুত্রকে যা দান করে তা ফেরত নেয়া তার জন্য জায়েয। কিন্তু অন্যকে দান করে তা ফেরত নেয়া হারাম। আর ইমাম আবু হানীফার মতে তা হারাম নয়, বরং মাকরূহ (অনুবাদক)।

لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ هُوَ لاِبْنِى قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ مَنْ نَحَلَ نَحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِىْ نُحِلَهَا حَتّٰى تَكُوْنَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ فَهِىَ بَاطِلٌ .

৮১০। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, লোকজনের কি হলো, তারা নিজেদের পুত্রদের কোন কিছু দান করে, অতঃপর তা নিজেদের দখলে রাখে। যখন তাদের কারো পুত্র মারা যায় তখন বলে, আমার মাল আমার হাতেই আছে, তা কাউকে দেইনি। আর যদি সে (দাতা) মারা যায় তখন বলে, এই মাল আমি আমার পুত্রকে দান করেছিলাম। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কিছু হেবা (দান) করলো। তা দান গ্রহীতার হস্তগত হওয়ার পূর্বেই দাতা মারা গেলো। এ অবস্থায় দান বাতিল হয়ে যাবে এবং দানকারীর ওয়ারিসগণই তার মালিক হবে।

٨١١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ مَنْ نَحَلَ وَلَداً لَهُ صَغِيْراً لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوْزَ نُحْلَةً فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِىَ جَائِزَةٌ وَإِنَّ وَلِيُّهَا أَبُوْهُ .

৮১১। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। উছমান ইবনে আফ্ফান (রা) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার নাবালেগ সন্তানকে কোন কিছু দান করে তার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয় এবং এর স্বপক্ষে সাক্ষী রাখে তবে এই দান বৈধ হবে, বাচ্চা তা হস্তগত করার উপযুক্ত না হলেও। এ অবস্থায় পিতা হবে তার অভিভাবক।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উল্লেখিত সব হাদীসের উপর আমরা আমল করি। সন্তানদের কোন কিছু দান করার ব্যাপারে পিতার কর্তব্য হচ্ছে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা। তাদের একজনকে অপরজনের উপর অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ নয়। কোন ব্যক্তি তার নাবালেগ সন্তানকে অথবা অপর কোন ব্যক্তিকে কিছু দান করলো। যাকে দান করা হয়েছে সে এখনো তা হস্তগত করেনি। এই অবস্থায় দানকারী অথবা দানগ্রহীতা মারা গেলো। এক্ষেত্রে দানকৃত বস্তু দানকারী বা তার ওয়ারিসদের অধিকারে ফিরে আসবে। দান হস্তগত করার পূর্ব পর্যন্ত এর উপর দানগ্রহীতার বৈধ অধিকার জন্মায় না। কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম রয়েছে। তাকে যা দান করা হয়েছে তা তার পিতার হস্তগত হওয়া তারই হস্তগত হওয়া বলে গণ্য হবে। অতএব পিতা যখন দানের ঘোষণা দেয় এবং এর সাক্ষী রাখে, তখন তা তার সন্তানের বৈধ সম্পত্তিতে পরিণত হয়। পিতার জন্য তা ফেরত নেয়ার আর কোন পথ থাকে না। সাক্ষী বানানোর পর তা কোন উপায়ে আত্মসাৎ করাও তার জন্য জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্হবিদ সাধারণের এই মত।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ উমরা (জীবনস্বত্ব) এবং সুকনা (বাসস্থান)।

٨١٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ اُعْمِرَ عُمْرٰى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَاِنَّهَا لِلَّذِىْ يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ اِلَى الَّذِىْ اَعْطَاهَا لاَنَّهُ اَعْطٰى عَطَاءً وَقَعَتِ الْمَوَارِيْثُ فِيْهِ .

৮১২। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তিকে জীবনস্বত্ব দেয়া হলে, তা তার জন্য ও তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। তা যাকে দেয়া হয়েছে তারই থেকে যাবে, দানকারীর হাতে আর ফিরে আসবে না। কেননা সে এমনভাবে একটি স্বত্ব দান করেছে, যাতে গ্রহীতার উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

٨١٣- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَرِثَ حَفْصَةَ دَارَهَا وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ اَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَبَضَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ وَرَاٰى اَنَّهُ لَهُ .

৮১৩। নাফে (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা)-র ঘরের ওয়ারিস হলেন। তিনি নিজের ঘরটি যায়েদ ইবনুল খাত্তাবের কন্যাকে তার জীবদ্দশা পর্যন্ত দিয়ে গিয়েছিলেন। যায়েদের কন্যা মারা যাওয়ার পর, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ঘরটি নিজ দখলে নিলেন। তিনি মনে করেন, এই ঘর এখন তারই।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। জীবনস্বত্ব হচ্ছে এক প্রকারের হেবা (দান)। তা যাকে দেয়া হয়, তারই হয়ে যায়। আর বাসস্থান দেয়া হলে তা ধার বা কর্জ হিসাবে গণ্য হয় এবং তা মূল মালিকের নিকট বা তার ওয়ারিসদের অধিকারে ফিরে আসতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং অন্যান্য ফিক্‌হবিদ সাধারণের এই মত। উমরা বা জীবনস্বত্ব এই যে, বলা হলো, এটা তার জন্য এবং তার ওয়ারিসদের জন্য।[১৪]

---

১৪. 'জীবনস্বত্ব' এই যে, "কোন ব্যক্তি বললো, আমার এই ঘরটি তোমাকে আমার জীবদ্দশার জন্য দান করলাম অথবা আমি যতো দিন জীবিত থাকবো তুমি তা ব্যবহার করবে অথবা তুমি যতো দিন জীবিত থাকবে ততো দিন এটা তোমার ভোগদখলে থাকবে অথবা তোমার জীবনকাল পর্যন্ত তা তোমাকে দেয়া হলো। তুমি মারা গেলে তা পুনরায় আমার স্বত্বাধিকারে ফিরে আসবে।" জমহূরের মতে এই ধরনের দান জায়েয। তবে ফেরত পাওয়ার শর্ত আরোপ করলে তা (শর্ত) বাতিল গণ্য হবে। যাকে দান করা হয়েছে সে নিজের জীবদ্দশায় এটা ভোগ করবে। তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ এর মালিক হবে। কিন্তু তা কখনো দানকারীর স্বত্বাধিকারে ফিরে যাবে না। হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমদের এই মত। ইমাম শাফিঈর সর্বশেষ মতও তাই। ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, আলী (রা), শুরায়হ, মুজাহিদ, তাউস ও সুফিয়ান সাওরীরও এই মত বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে ইমাম মালেক, লাইছ ও শাফিঈর (প্রাচীন) মত অনুযায়ী, যাকে জীবনস্বত্ব দেয়া হয়েছে, সে মূল জিনিসের স্বত্বাধিকার হবে না, বরং সে কেবল তা ব্যবহার করতে পারবে মাত্র (অনুবাদক)।

৩২. অনুচ্ছেদঃ সোনা-রূপার বিনিময়ে সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয় ও সূদের বর্ণনা।

٨١٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ اَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْاٰخَرُ نَاجِزٌ فَاِنِ اسْتَنْظَرَكَ اِلٰى اَنْ يَّلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّمَاءَ وَالرِّمَاءُ هُوَ الرِّبٰوا .

৮১৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, সোনার বিনিময়ে রূপা এমনভাবে ক্রয়-বিক্রয় করো না যে, একটির নগদ বিনিময় হবে এবং অপরটির বাকিতে বিনিময় হবে। এমনকি যদি এতোটুকু অবকাশ চাওয়া হয় যে, এখনই ঘর থেকে নিয়ে এসে দেয়া হবে, তবে তাও অনুমোদন করো না। আমি তোমাদের সম্পর্কে সূদের আশংকা করছি। 'রিমা' শব্দের অর্থ 'রিবা' বা সূদ।

٨١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ اَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالْاٰخَرُ نَاجِزٌ وَاِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَتّٰى يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبٰوا .

৮১৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, সোনার বিনিময়ে সোনা সমান সমান পরিমাণ ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় করো না। রূপার বিনিময়ে রূপা পরিমাণে সমতা ব্যতিরেকে ক্রয়-বিক্রয় করো না। রূপার বিনিময়ে সোনা এমনভাবে ক্রয়-বিক্রয় করো না যে, একটির নগদ এবং অপরটির বাকি আদান-প্রদান হবে। এমনকি যদি ঘর থেকে এনে দেয়ার পরিমাণ সময়ও অবকাশ চাওয়া হয়, তবে তাও অনুমোদন করো না। আমি তোমাদের সম্পর্কে সূদের আশংকা করছি।

٨١٦-عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ .

৮১৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সোনার বিনিময়ে সোনা পরিমাণে সমতা ব্যতিরেকে ক্রয়-বিক্রয় করো না এবং (পাল্লার) একদিক অপর দিক থেকে বেশী করো না। রূপার বিনিময়ে রূপা পরিমাণে সমতা ব্যতিরেকে ক্রয়-বিক্রয় করো না এবং এক দিক অপর দিক অপেক্ষা বেশী করো না। আর এক্ষেত্রে একটি নগদ এবং অপরটি বাকিতে বিনিময় করো না।

٨١٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا .

৮১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ দীনারের বিনিময়ে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কম-বেশী করা যাবে না।

٨١٨- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ ابْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ وَقَالَ فَدَعَانِىْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَقَالَ فَتَرَاوَضْنَا حَتّٰى اِصْطَرَفَ مِنِّىْ فَأَخَذَ طَلْحَةُ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِىْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتّٰى يَأْتِيَنِىْ خَازِنِىْ مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ تُفَارِقْهُ حَتّٰى تَأْخُذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ .

৮১৮। মালেক ইবনে আওস ইবনুল হাদাছান (রা) থেকে বর্ণিত।[১৫] তিনি ইবনে শিহাব (র)-কে অবহিত করেন যে, তার এক শত দীনারের বিনিময়ে দিরহাম নেয়ার প্রয়োজন হলো। তিনি আরো বলেন, আমাকে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) ডাকলেন। মালেক (রা) বলেন, আমরা বিনিময় করার জন্য সম্মত হলাম। তিনি আমার কাছ থেকে দীনারগুলো নিলেন এবং নিজের হাতের মধ্যে তা ওলোটপালট করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমার কোষাধ্যক্ষকে গাবা (মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম) থেকে ফিরে আসার অবসর দাও (তারপর দিরহাম দিবো)। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাদের কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! বিনিময় গ্রহণ না করা পর্যন্ত তালহাকে ছাড়বে না। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "সোনার সাথে রূপার বিনিময়ের ক্ষেত্রে যদি উভয় পক্ষ থেকে নগদ লেনদেন না হয় তবে তা সূদী বিনিময় হবে। খেজুরের সাথে খেজুরের বিনিময়ের ক্ষেত্রে যদি উভয় পক্ষ থেকে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সূদী বিনিময় হবে। বার্লির বিনিময়ের ক্ষেত্রে যদি উভয় পক্ষ থেকে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সূদী বিনিময় হবে।"

---

১৫. ইবনুল আছীর বলেন, মালেক ইবনে আওস (রা) সাহাবী ছিলেন কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ইবনে আবদুল বার বলেন, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে তিনি সাহাবী ছিলেন। ইবনে মান্দা বলেন, তিনি সাহাবী ছিলেন একথা প্রমাণিত। তিনি আশারায়ে মুবাশ্শারা (বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবী) এবং অপরাপর সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৯২ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তবে তার পিতা আওস ইবনে হাদাছান (রা) সাহাবী ছিলেন (জামিউল উসূল) (অনুবাদক)।

٨١٩-عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَوْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِّنْ وَرِقٍ اَوْ ذَهَبٍ بِاَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ لَهُ اَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذَا اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ قَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مَا نَرٰى بِهِ بَأْسًا فَقَالَ لَهُ اَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يَعْذِرُنِىْ مِنْ مُعَاوِيَةَ اُخْبِرُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيُخْبِرُنِىْ عَنْ رَأْيِهِ لاَ اُسَاكِنُكَ بِاَرْضٍ اَنْتَ بِهَا قَالَ فَقَدِمَ اَبُو الدَّرْدَاءِ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاَخْبَرَهُ فَكَتَبَ اِلٰى مُعَاوِيَةَ اَنْ لاَّ يَبِيْعَ ذٰلِكَ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ اَوْ وَزْنًا بِوَزْنٍ .

৮১৯। আতা ইবনে ইয়াসার অথবা সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) সোনা অথবা রূপার একটি পানপাত্র তার ওজনের চেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রি করলেন। আবু দারদা (রা) তাকে বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করতে শুনেছি। তবে ওজনে সমতা থাকলে তা জায়েয।" মুআবিয়া (রা) বলেন, এ ধরনের বিনিময়ে আমি কোন দোষ দেখছি না। আবু দারদা (রা) বলেন, মুআবিয়ার বিরুদ্ধে আমার ওজর কে কবুল করবে? আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস সম্পর্কে অবহিত করছি আর সে আমাকে (রাসূলের নির্দেশের পরিপন্থী) নিজের ব্যক্তিগত মত সম্পর্কে অবহিত করছে, যে দেশে (সিরিয়া) তুমি বসবাস করছো সেখানে আমি আর বসবাস করবো না। রাবী বলেন, অতঃপর আবু দারদা (রা) উমার (রা)-র কাছে (মদীনায়) ফিরে আসেন এবং তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। অতঃপর খলীফা উমার (রা) তাকে লিখে পাঠান, "ওজনে ও পরিমাণে সমতা ব্যতীত ভবিষ্যতে আর এ ধরনের লেনদেন করবে না।"

٨٢٠-عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِىِّ اَنَّهُ رَاٰى سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ قَالَ فَيُفْرِغُ الذَّهَبَ فِىْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ وَيُفْرِغُ الْاٰخَرُ الذَّهَبَ فِىْ كِفَّةِ الْاُخْرٰى قَالَ ثُمَّ يَرْفَعُ الْمِيْزَانَ فَاِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيْزَانِ اَخَذَ وَاَعْطٰى صَاحِبَهُ .

৮২০। ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুসাইত আল-লাইছী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে সোনার বিনিময়ে সোনা ওজন করতে দেখলেন। তিনি নিজের সোনা নিক্তির এক পাল্লায় এবং অপর ব্যক্তির সোনা দ্বিতীয় পাল্লায় রাখলেন। নিক্তির কাঁটা যখন সোজা দাঁড়িয়ে যেতো তখন তিনি অপরের সোনা নিতেন এবং নিজের সোনা তাকে দিতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা উপরোক্ত সব হাদীস অনুযায়ী আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের ফিক্হবিদ সাধারণেরও এই মত।

৩৩. অনুচ্ছেদঃ ওজন ও পরিমাপের মাধ্যমে বিনিময়কৃত জিনিসের মধ্যে সূদ।

٨٢١- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا اَبُو الزِّنَادِ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ لاَ رِبُوا اِلاَّ فِى ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ اَوْ مَا يُكَالُ اَوْ يُوْزَنُ مِمَّا يُوْكَلُ اَوْ يُشْرَبُ .

৮২১। আবুয যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছেন, সূদ কেবল সোনা-রূপা অথবা খাদ্য ও পানীয় বস্তুর মধ্যে হয়ে থাকে, যা ওজন অথবা পরিমাপ করে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ওজন ও পরিমাপ করে ক্রয়-বিক্রয় করা জিনিস যদি একই জাতীয় বা একই শ্রেণীভুক্ত হয় তবে তাও (ওজন-পরিমাপে কমবেশী করে ক্রয়-বিক্রয় করা) মাকরূহ। নগদ লেনদেন হলে এবং ওজন-পরিমাপে সমতা থাকলে তা মাকরূহ হবে না। এসব জিনিসের হুকুমও খাদ্যবস্তুর অনুরূপ। ইবরাহীম নাখঈ, ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্হবিদ সাধারণও এই মত পোষণ করেন।

٨٢٢- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَامِلَكَ عَلٰى خَيْبَرَ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِى عَدِىٍّ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَاْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ قَالَ ادْعُوْهُ لِىْ فَدُعِىَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَاْخُذِ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ يُعْطُوْنِى الْجَنِيْبَ بِالْجَمْعِ اِلاَّ صَاعًا بِصَاعَيْنِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ وَاشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا .

৮২২। আতা ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সমান ওজনে ক্রয়-বিক্রয় করো।" বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! খায়বার এলাকায় আপনার নিয়োগকৃত কর্মকর্তা, আনসার আদী গোত্রের লোক (সাওয়াদ ইবনে গাযিয়া) দুই সা খেজুরের বিনিময়ে এক সা (সাড়ে তিন সের) খেজুর গ্রহণ করে থাকেন। তিনি বলেন ঃ "তাকে আমার কাছে ডেকে আনো।" অতএব তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ডেকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেনঃ "দুই সা খেজুরের পরিবর্তে এক সা খেজুর গ্রহণ করো না।" তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এখানকার লোকজন নিকৃষ্ট শ্রেণীর খেজুরের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট খেজুর দেয় না। বরং দুই সা নিকৃষ্ট মানের খেজুরের বিনিময়ে এক সা উৎকৃষ্ট মানের খেজুর দিয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "নিকৃষ্ট মানের খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করো। অতঃপর দিরহামের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট মানের খেজুর কিনে নাও।"

٨٢٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلٰى خَيْبَرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ

هٰكَذَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلٰثَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ تَفْعَلْ بِعْ تَمْرَكَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَّقَالَ فِى الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৮২৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে (সাওয়াদ) খায়বার এলাকায় প্রশাসক নিয়োগ করেন। তিনি সেখান থেকে উৎকৃষ্ট মানের খেজুর নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "খায়বারের সব খেজুরই কি এরূপ উৎকৃষ্ট মানের?" তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র শপথ! না; বরং নিকৃষ্ট মানের দুই সা খেজুরের বিনিময়ে এক সা এই (উৎকৃষ্ট) খেজুর অথবা তিন সা নিকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে দুই সা এই খেজুর গ্রহণ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "এরূপ করো না। বরং তোমার খেজুর দিরহামের বিনিময়ে (নগদ মূল্যে) বিক্রি করো, অতঃপর এই দিরহাম দিয়ে উৎকৃষ্ট মানের খেজুর কিনে নাও।" তিনি আরো বলেন ঃ "বাটখারায় ওজন করা জিনিসের ক্ষেত্রেও এই বিধান।"[১৬]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণেরও এই মত।

---

১৬. সূদ (سود) শব্দের মূল আরবী পরিভাষা হচ্ছে 'রিবা' (ربوا) রিবার আভিধানিক অর্থ ঃ বৃদ্ধি, বিকাশ, ধন বৃদ্ধি হওয়া এবং আসল থেকে বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি। কোন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে মূলধনের সাথে সাথে নির্দিষ্ট হারে যে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করে, আরববাসীরা পরিভাষাগতভাবে একেই বলতো রিবা, আমরা বলি সূদ। ইসলামী শরীআত সূদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا .

"যেসব লোক সূদ খায় তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান নিজের স্পর্শ দ্বারা পাগল ও সুস্থ জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা-বাণিজ্য তো সূদেরই অনুরূপ। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ .

"আল্লাহ্ সূদকে নির্মূল করেন এবং দান-খয়রাতকে বৃদ্ধি করেন" (বাকারা ঃ ২৭৬)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং লোকজনের কাছে তোমাদের যে সূদ পাওনা রয়েছে তার দাবি ত্যাগ করো, যদি তোমরা বাস্তবিকই মুমিন হয়ে থাকো। যদি তোমরা তা না

করো, তবে জেনে রাখো! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রইলো। আর যদি তোমরা তওবা করো (এবং সূদের দাবি ত্যাগ করো), তবে তোমরা মূলধন ফেরত পাওয়ার অধিকারী হবে। তোমরাও যুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না" (বাকারা ঃ ২৭৮-৯)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খাওয়া পরিত্যাগ করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে" (আল ইমরান ঃ ১৩০)।

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوْا فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ .

"লোকদের ধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তোমরা যে সূদ দাও, আল্লাহ্‌র নিকট তার সাহায্যে ধন বৃদ্ধি পায় না" (সূরা রূম ঃ ৩৯)।

রিবা (সূদ) আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা, রিবা আন-নাসী (ربا النّاسى) এবং রিবা আল-ফাদল (ربا الفضل)। নগদ অর্থে প্রদত্ত ঋণের উপর যে সূদ আরোপ করা হয় তাকে রিবা আন-নাসী বলা হয়। আমাদের দেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় নগদ ঋণের উপর যে সূদ আরোপ করা হয়, তা এই রিবা আন-নাসীর পর্যায়ভুক্ত। কুরআন মজীদ এই সূদকেই হারাম ঘোষণা করেছে। এর হারাম হওয়ার ব্যাপারে উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আইনবিদগণের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সূদ সম্পর্কিত প্রাথমিক বিধান কেবল ঋণের ক্ষেত্রে সূদ হারাম হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اِنَّمَا الرِّبَا فِى النَّسِيَةِ اَوْ فِىْ بَعْضِ الْاَلْفَاظِ لاَ رِبَا اِلاَّ فِى النَّسِيَةِ .

"কেবলমাত্র আর্থিক ঋণের সাথে সূদী লেনদেন সম্পৃক্ত।"

পরবর্তী পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ রিবা আল-ফাদলকেও হারাম ঘোষণা করেন। একই শ্রেণীভুক্ত দু'টি জিনিসের নগদ বিনিময়ের ক্ষেত্রে এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট থেকে অতিরিক্ত যা গ্রহণ করে তাকে রিবা আল-ফাদল বলা হয়। অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের লেনদেনের (commodity transaction) ক্ষেত্রে যে সূদ হয় তাকে রিবা আল-ফাদল বলে। এই সূদ হাদীসের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

তবে পশুর সাথে পশুর অসম বিনিময়কে সূদের বাইরে রাখা হয়েছে। সম জাতের পশুর মধ্যে বৃদ্ধি সহকারে বিনিময় করা যেতে পারে। কারণ পশুদের মধ্যে মূল্য ও মানের দিক থেকে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। যেমন একটি সাধারণ ঘোড়া এবং একটি উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়ার মধ্যে মূল্য ও মানের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে পশুর অসম বিনিময় করেছেন এবং তাঁর পরে তাঁর সাহাবীগণও এ ধরনের বিনিময় করেছেন। অতএব দু'টি পশুর সাথে একটি পশুর বিনিময় জায়েয।

ইসলামী শরীআত সূদের কারবার চরমভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اَلرِّبٰوا سَبْعُوْنَ جُزْءًا اَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ .

"সূদের গুনাহের সত্তরটি স্তর আছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম স্তরের গুনাহের পরিমাণ হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিজ মাকে বিবাহ করা" (ইবনে মাজা, বায়হাকীর শুআবুল ঈমান)।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "মিরাজের রাতে আমি এমন এক শ্রেণীর লোকের নিকট পৌছলাম, যাদের পেটগুলো ঘরের ন্যায় বিরাটকায় ছিল এবং তা সাপে ভর্তি

٨٢٤- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ اَنَّهُ سَئَلَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِىْ طَعَامًا مِّنَ الْجَارِ بِدِيْنَارٍ وَّنِصْفِ دِرْهَمٍ اَيُعْطِيْهِ دِيْنَارًا وَّنِصْفَ دِرْهَمٍ طَعَامًا قَالَ لاَ وَلٰكِنْ يُّعْطِيْهِ دِيْنَارًا وَّدِرْهَمًا وَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ نِصْفَ دِرْهَمٍ طَعَامًا .

৮২৪। ইমাম মালেক (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের কাছে অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যে, সে 'আল-জার' নামক স্থানে এক দীনার ও অর্ধ দিরহামের খাদ্যশস্য ক্রয় করেছে। সে কি বিক্রেতাকে অর্ধ দিরহামের পরিবর্তে (নিজের মালিকানাধীন অন্য প্রকারের) খাদ্যশস্য দিতে পারে? সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, না, সে তাকে এক দীনার ও এক দিরহাম দিবে এবং বিক্রেতা তাকে আরও অর্ধ দিরহাম পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রদান করবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের কাছে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের নির্দেশিত পদ্ধতি পছন্দনীয়। তবে তিনি যে পদ্ধতি নিষিদ্ধ করেছেন তাও একটি শর্তে জায়েয হতে পারে। ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে প্রথমবার অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য লাভ করেছে, বিক্রেতাকেও সে ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রদান করবে। যদি সে (অর্ধ দিরহাম খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ) বিক্রেতাকে ঐ পরিমাণের কম খাদ্যশস্য প্রদান করে তবে তা জায়েয হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের এই মত।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির নিকট উপঢৌকন অথবা ঋণ প্রাপ্য আছে। সে কি তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করতে পারবে?

٨٢٥- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَمِيْلَ الْمُؤَذِّنَ يَقُوْلُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اِنِّىْ رَجُلٌ اَشْتَرِىْ هٰذِهِ الْاَرْزَاقَ الَّتِىْ يُعْطَاهَا النَّاسُ بِالْجَارِ فَاَبْتَاعُ مِنْهَا مَا شَاءَ

ছিল। সেগুলো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি আমার সংগীকে জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বলেন, এরা সূদখোর" (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজা)।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ ﷺ সূদখোর, সূদদাতা এবং সূদের চুক্তিপত্র লেখকের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন" (নাসাঈ)।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "লোকদের উপর এমন এক যুগ আসবে (সূদের কারবার ব্যাপক হয়ে পড়বে, এমনকি) একটি লোকও সূদের কারবার থেকে অব্যাহতি পাবে না। সে সরাসরি সূদ না খেলেও সূদের ধোঁয়া বা ধূলা তাকে স্পর্শ করবে" (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "জাহিলী যুগের সমস্ত সূদ হারাম করা হলো। আমি সর্বপ্রথম আমার বংশের সূদের দাবি অর্থাৎ (আমার চাচা) আব্বাসের সূদের দাবি রহিত করলাম। সুতরাং সকল সূদই আজ হারাম করা হলো" (মুসলিম) (অনুবাদক)।

اللّٰهُ ثُمَّ أُرِيْدَ اَنْ اَبِيْعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُوْنَ عَلَىَّ اِلَى ذٰلِكَ الْاَجَلِ فَقَالَ لَهُ سَعِيْدٌ أَتُرِيْدُ اَنْ تُوَفِّيْهِمْ مِنْ تِلْكَ الْاَرْزَاقِ الَّتِى اَبْتَعْتَ قَالَ نَعَمْ فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ .

৮২৫। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জামীল আল-মুয়াযযিনকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের কাছে বলতে শুনেছেন, আমি এই খাদ্যশস্য, যা লোকদের জন্য মওজুদ রয়েছে, আল-জার নামক স্থানে খরিদ করে থাকি। এর মধ্যে কিছু শস্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাকিতে খরিদ করি। এখন আমি তা ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রি করে দিতে চাই। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব তাকে বলেন, তুমি যে খাদ্যশস্য ক্রয় করেছো তা থেকে কি লোকদের দিতে চাচ্ছো? জামীল বলেন, হাঁ। তিনি তাকে এটা করতে নিষেধ করলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যে জিনিস অপরের কাছে ধার হিসাবে রয়ে গেছে তা হস্তগত না করে বিক্রি করা জায়েয নয়। কেননা এর মধ্যে ধোঁকার উপাদান রয়েছে এবং তার জানা নেই যে, তা সম্পূর্ণরূপে আদায় হবে কি না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٨٢٦- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ مَيْسَرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْئَلُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ اِنِّى رَجُلٌ اَبِيْعُ الدَّيْنَ وَذَكَرَ لَهُ شَيْأً مِّنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لاَ تَبِعْ اِلاَّ مَا اَوَيْتَ اِلَى رَحْلِكَ .

৮২৬। মূসা ইবনে মাইসারা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের কাছে জিজ্ঞেস করতে শুনলেন, "আমি ঋণ বিক্রি করি।" সে এর পদ্ধতিও বর্ণনা করলো। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব তাকে বলেন, ঋণ বিক্রি করো না, যতোক্ষণ না তা আদায় করে আনতে পারবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। যা অপর কোন ব্যক্তির কাছে ঋণ হিসাবে রয়ে গেছে তা ঋণদাতার জন্য বিক্রি করা জায়েয নয়। তবে ঋণী ব্যক্তির কাছে তা বিক্রি করা জায়েয আছে। কেননা পাওনা আদায় করার পূর্বে তা বিক্রি করার মধ্যে একটা প্রতারণা রয়েছে। পাওনাদার ব্যক্তির জানা নেই যে, গোটা ঋণ আদায় হবে কি না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি উৎকৃষ্টতর জিনিস দিয়ে ঋণ পরিশোধ করবে।

٨٢٧- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَضَى خَيْرًا مِّنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ هٰذِهِ خَيْرٌ مِّنْ دَرَاهِمِى الَّتِى اَسْلَفْتُكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ وَلٰكِنْ نَفْسِى بِذٰلِكَ طَيِّبَةٌ .

৮২৭। মুজাহিদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এক ব্যক্তির নিকট থেকে দিরহাম ধার নিলেন। দেয়ার সময় তিনি অপেক্ষাকৃত উত্তম দিরহাম দান করলেন। পাওনাদার বললো,

এতো আমার দেয়া দিরহামের তুলনায় উত্তম। ইবনে উমার (রা) বলেন, তা আমি জানি, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তা দিয়েছি।

٨٢٨- عَنْ اَبِـى رَافِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ اِبِلٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ فَاَمَرَ اَبَا رَافِعٍ اَنْ يَّقْضِىَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ اِلَيْهِ اَبُوْ رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ اَجِدْ فِيْهَا اِلاَّ جَمَلاً رُبَاعِيًا خِيَارًا فَقَالَ اَعْطِهِ اِيَّاهُ فَاِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً .

৮২৮। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি অল্প বয়স্ক উট ধার নিলেন। তার কাছে যখন যাকাতের খাতে উট এলো, তিনি আবু রাফে (রা)-কে ঐ ব্যক্তির উটের পরিবর্তে উট দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আবু রাফে (উটের খোঁয়াড় থেকে) ফিরে এসে বলেন, যাকাতের উটের মধ্যে ছোট উট নেই, সবগুলোই উৎকৃষ্ট মানের এবং ছয় বছর বয়সের। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এগুলোর মধ্য থেকেই তাকে দাও। লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে উত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। অপেক্ষাকৃত উত্তম জিনিস দিয়ে ঋণ পরিশোধ করায় কোন দোষ নেই। তবে তা জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে এ ধরনের কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যাবে না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٨٢٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ اَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ اِلاَّ قَضَاءَهُ .

৮২৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলে সে যেন তা পরিশোধ করা ছাড়া অন্য কোন শর্ত না করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। অপেক্ষাকৃত অধিক অথবা অপেক্ষাকৃত উত্তম জিনিস প্রদানের শর্ত আরোপ করা জায়েয নয়। যদি এরূপ শর্ত আরোপ করা হয় তা বৈধ হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্হবিদ সাধারণের এই মত।

৩৬. অনুচ্ছেদ : দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) ও দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ভাঙ্গা মাকরূহ।

٨٣٠- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ قَالَ قَطْعُ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ مِنَ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ .

৮৩০। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সোনা-রূপার মুদ্রা ভাংগা পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টিরই নামান্তর।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন বিশেষ ফায়দা লাভ ছাড়া সোনা-রূপার মুদ্রা ভাংগা ভালো কাজ নয়।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর বাগান এবং ভূমিতে ভাগচাষ ও কৃষিকাজ।

٨٣١- عَنْ حَنْظَلَةَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ سَئَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ وَقَالَ حَنْظَلَةُ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ قَالَ رَافِعٌ لاَ بَاْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ .

৮৩১। হানযালা আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-র কাছে ভাগচাষে কৃষিকাজ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হানযালা বলেন, আমি তাকে আরও জিজ্ঞেস করলাম, সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি চাষাবাদ করতে দেয়া কি জায়েয? রাফে (রা) বলেন, সোনা-রূপার বিনিময়ে চাষাবাদ করতে দেয়ায় কোন দোষ নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। সোনা-রূপা ও গমের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেয়া (নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য নগদ বিক্রি করা) জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে ওজন, পরিমাপ ও শস্যের শ্রেণী বা প্রজাতি সুনির্দিষ্ট হতে হবে। আর এই শর্ত আরোপ করা যাবে না যে, জমীনে যা উৎপন্ন হবে তা থেকে এই নির্দিষ্ট পরিমাণ দিতে হবে। অতএব যদি এই শর্ত আরোপ করা হয় যে, জমীনে উৎপন্ন ফসলের এই নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির মালিককে দিতে হবে, তবে এর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণের এই মত। সাঈদ ইবনে জুবায়েরের নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণ গমের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেয়া (নগদ বিক্রি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তার অনুমতি দেন এবং বলেন, ঘর-বাড়ীর ন্যায় জমীও ভাড়া দেওয়া যেতে পারে।

٨٣٢- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ فَتَحَ خَيْبَرَ قَالَ لِلْيَهُوْدِ أُقِرُّكُمْ مَا اَقَرَّكُمُ اللّٰهُ عَلٰى اَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَاِنْ شِئْتُمْ فَلِيْ قَالَ فَكَانُوْا يَاْخُذُوْنَهُ .

৮৩২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার এলাকা বিজয়ের পর সেখানকার ইহূদীদের বলেন ঃ "আল্লাহ তোমাদের যেখানে স্থান দিয়েছেন আমিও তোমাদের সেখানে বসবাস করতে দিলাম এই শর্তে যে, এখানে উৎপাদিত ফলে তোমাদের ও আমাদের অংশীদারিত্ব থাকবে।" সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে (খায়বার) পাঠাতেন। তিনি অনুমানে ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করতেন এবং বলতেন, যদি তোমরা চাও তবে তোমরা এই ফল নিতে পারো অথবা আমাদেরও দিতে পারো (আমরা তোমাদেরকে অনুমানে নির্ধারিত পরিমাণের অর্ধেক ফল দিবো)। ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, ইহূদীরা ফল নিতো (এবং নির্ধারিত পরিমাণের অর্ধেক ফল মুসলমানদের দিতো)।

٨٣٣- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَهُوْدِ قَالَ فَجَمَعُوْا حُلِيًّا مِّنْ حُلِىِّ نِسَاءِهِمْ فَقَالُوْا هٰذَا لَكَ وَخَلِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِى الْقِسْمَةِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ وَاللّٰهِ اِنَّكُمْ لَمِنْ اَبْغَضِ خَلْقِ اللّٰهِ اِلَىَّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِىْ اَنْ اَحِيْفَ عَلَيْكُمْ اَمَّا الَّذِىْ عَرَضْتُمْ مِّنَ الرَّشْوَةِ فَاِنَّهَا سُحْتٌ وَاِنَّا لاَ نَاْكُلُهَا قَالُوْا بِهٰذَا قَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ .

৮৩৩। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে (খায়বার এলাকায়) পাঠাতেন। তিনি নিজের এবং ইহূদীদের মাঝে অনুমানে ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিতেন। একদা তারা নিজেদের মহিলাদের অলংকারপত্র একত্র করে (আবদুল্লাহ্‌কে) বললো, এটা আপনার জন্য, আমাদের উপর নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কমিয়ে দিন এবং বণ্টনে বিলম্ব করুন। তিনি বলেন, হে ইহূদী সম্প্রদায়, আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের দৃষ্টিতে তোমরা আল্লাহ্‌র সবচেয়ে অভিশপ্ত সৃষ্টি। এরপরও তোমাদের পেশকৃত এই ঘুষ আমাকে তোমাদের উপর জুলুম করতে উত্তেজিত করে না। কেননা এটা হারাম এবং আমরা তা খাই না। ইহূদীরা বললো, আসমান ও জমীন এইজন্যই কায়েম রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। খেজুর বাগান এবং কৃষিযোগ্য খালি জমি উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক, তিনের-একাংশ, চারের-একাংশ চুক্তিতে ভাগচাষে দেয়ায় কোন দোষ নেই। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (র) এটাকে মাকরূহ মনে করতেন এবং বলতেন যে, এটা সেই মুখাবারা (বর্গাচাষ), যা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন।[১৭]

---

১৭. ভাগচাষ সম্পর্কিত অধ্যায় হাদীস শাস্ত্রের অন্যতম কঠিন অধ্যায়। কেননা এই অধ্যায়ে আমরা পাশাপাশি দুই ধরনের অভিমত দেখতে পাই। একদিকে আমরা দেখছি রাসূলুল্লাহ ﷺ কৃষিযোগ্য ভূমি বা ফলের বাগান ভাগচাষে দিতে নিষেধ করেছেন। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে, তিনি ভাগচাষের অনুমতি দিচ্ছেন। আমরা কখনো এটা কল্পনা করতে পারি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একই ব্যাপারে দুই বিপরীত নির্দেশ দিতে পারেন। অতএব বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। মূল বিষয়ের আলোচনার পূর্বে এর সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি পরিভাষার উপর আলোকপাত করা দরকার।

'মুযারাআ' (المزارعة) ও মুখাবারা (المخابرة) ঃ শব্দ দু'টি সমার্থবোধক। এর অর্থ, উৎপাদিত শস্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের চুক্তিতে অন্যকে নিজ জমি চাষাবাদ করতে দেয়া। স্থানীয় পরিভাষায় এটাকে বলা হয় ভাগচাষ বা বর্গাচাষ (কোন কোন এলাকায় বলা হয় আধি)। মুযারাআ ও মুখাবারার মধ্যে পার্থক্য এই যে, মুযারাআর ক্ষেত্রে জমীর মালিক বীজ সরবরাহ করে এবং মুখাবারার ক্ষেত্রে বর্গাচাষী বীজ সরবরাহ করে। মুসাকা (المساقاة) শব্দটিও মুযারাআ শব্দের সমার্থবোধক। শুধু পার্থক্য এই যে, কৃষি জমি বর্গা দেয়াকে মুযারাআ বলে আর ফলের বাগান বর্গা

দেয়াকে মুসাকা বলে। বাগানের ক্ষেত্রে চাষাবাদের প্রয়োজন হয় না, শুধু পানি সরবরাহ করতে হয়। শব্দটির আভিধানিক অর্থ পানি সরবরাহ করা। আর মুযারাআ শব্দটির অর্থ ফসল উৎপন্ন করা।

মুহাকালা (المحاقلة) ঃ এই শব্দটি হাদীস শরীফে পৃথক পৃথক তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'ক্ষেতের ফসল পাকার পূর্বেই বিক্রি করা', 'জমি বর্গা দেয়া' এবং 'জমি ইজারা (lease) দেয়া'।

কিরাউল আরদ (كراء الارض) ঃ শব্দটি 'নগদ মূল্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কৃষিজমি বিক্রি করা' এবং 'জীমর উৎপাদিত ফসলের অংশ দেয়ার শর্তে অন্যকে তা চাষাবাদ করতে দেয়া', এই দু'টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

যেসব হাদীসে ভাগচাষ নিষিদ্ধ উল্লেখ আছে তার রাবীগণ হচ্ছেন রাফে ইবনে খাদীজ (রা), জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ও ছাবিত ইবনুদ দাহ্হাক (রা)। হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (র) তার 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে এসব হাদীস নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং ভাগচাষ বা বর্গাচাষ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পিছনে যেসব শোষণমূলক কারণ বিদ্যমান রয়েছে, তা নির্দেশ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদিত ফসলে চাষী ও মালিকের অংশ নির্দিষ্ট না করা, চাষীকে দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে জোরপূর্বক অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেয়া অথবা তাদের কাছ থেকে অগ্রিম কোন সুবিধা গ্রহণ করা (যেমন এতো পরিমাণ টাকা ধার দিলে আমি তোমাদেরকে আমার জমি চাষাবাদ করতে দিবো ইত্যাদি)। এসব কারণেই আল্লাহ্র রাসূল ﷺ ভাগচাষ নিষিদ্ধ করেছেন।

কিন্তু এই প্রথা যদি চূড়ান্তরূপেই নিষিদ্ধ হতো তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় এবং চারজন মহান ও সৎপথপ্রাপ্ত খলীফার জীবদ্দশায় ভাগচাষের প্রচলন থাকতো না। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র মতো আল্লাহভীরু সাহাবীও আমীর মুআবিয়ার রাজত্বের শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রথাকে অভ্রান্ত মনে করতেন না। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-র কাছে এর অবৈধতা সম্পর্কে জানতে পারলেন এবং তা পরিত্যাগ করলেন। তবে তিনি এই প্রথাকে হারাম মনে করে পরিত্যাগ করেননি, বরং তাকওয়া ও পবিত্রতার অনুভূতিই তাকে এটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছে।

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাযম (র)-ও তার 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে (৮ম খণ্ডে) ভাগচাষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যেসব সাহাবী নিজেদের জমি অন্যদের ভাগচাষে দিতেন তিনি তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু বাক্র (রা), উমার (রা), খাব্বাব (রা) ও হুযায়ফা (রা)। অতএব বর্গাপ্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হলে এই মহান সাহাবীগণ তা অবশ্যই পরিহার করতেন।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ভংগীতে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন? অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের ধরন থেকে বুঝা যায়, তিনি চূড়ান্তভাবে বর্গাপ্রথা নিষিদ্ধ করেননি। বরং ভাগচাষের নির্দিষ্ট কতগুলো পন্থাকে তিনি অপছন্দ করেছেন এবং সাহাবীদের মনে অন্যদের জন্য নিঃস্বার্থ ত্যাগের ভাবধারা জাগ্রত করতে চেয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তি যদি নিজের জমি তার মুসলিম ভাইকে কোন বিনিময় ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দেয়, তবে তা খুবই উত্তম।"

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্গাপ্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কারো জমি তার ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দেয়া উৎপাদিত ফসলে অংশীদারিত্বের শর্তে চাষাবাদ করতে দেয়ার চেয়ে অধিক উত্তম" (মুসলিম)। এ ধরনের উদারতা, মহানুভবতা ও সহৃদয়তা সর্বাবস্থায় প্রশংসনীয়। মুহাজিরগণ যখন মদীনায় এসে উপস্থিত হন, তখন

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে অথবা অনুমতি ছাড়াই পতিত জমি আবাদ করা।

٨٣٤- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ .

৮৩৪। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উরওয়া) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি পতিত জমি আবাদ করে তা তারই মালিকানাভুক্ত হবে। যালেমের কোন অধিকার নেই।"

তাদের খুবই দুর্দিন যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুঃসময় উপরোক্ত উপদেশবাণী দান করেন। এটা কোন আইনের নির্দেশ ছিলো না, বরং মুসলিম ভাইদের সাথে সদয় ব্যবহার করার উপদেশ দেয়া হয়েছিল (আল-মাবসূত, খণ্ড ২৩, পৃ. ১৩; ইবনে মাজা, মুযারাআ অনুচ্ছেদ)।

অপরদিকে ভাগচাষ বৈধ হওয়ার সপক্ষেও হাদীস রয়েছে। তাতে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাগচাষের অনুমতি দিয়েছেন, যদি তা চাষীর জন্য উপকারী হয় এবং শোষণের উপাদান উপস্থিত না থাকে। মূলত ভাগচাষকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, বরং এর মধ্যকার কতগুলো অন্যায় আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্গাপ্রথা যদি অসহায় চাষীদের শোষণ করার হাতিয়ারে পরিণত না হয়, তবে তা ক্ষতিকর নয়। যদি উৎপাদিত শস্যে উভয়ের অংশ নির্দিষ্ট করে নেয়া হয় এবং চাষীর কাছে কোন অতিরিক্ত ও অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দাবি না করা হয়, তবে শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রথা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

এখানে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, মুযারাআ (ভাগচাষ) মুদারাবারই (লাভ-লোকসানে ভাগী হওয়ার শর্তে একজনের পুঁজি দিয়ে অপরজনের ব্যবসা করা) অনুরূপ। ইমাম খাত্তাবী (র) তার আবু দাউদের শরাহ 'মাআলিমুস সুনান' গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪) লিখেছেন, মুযারাআর ভিত্তি তো মুদারাবার মধ্যেই নিহিত। এখন মুদারাবা পদ্ধতি যদি জায়েয হয়, তবে মুযারাআ নাজায়েয হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? ইমাম আবু ইউসুফ (র) তার 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থে এই একই কথা বলেছেন এবং মুযারাআ ও মুদারাবাকে একই স্তরে রেখেছেন (পৃ. ৯১)। অতএব মুযারাআ যদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হতো, তবে মুদারাবাকে বৈধ বলার কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু ফিক্‌বিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ইসলামী শরীআতে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয। সুতরাং মুযারাআকে অবৈধ বলার পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। মুযারাআ সম্পর্কে আল্লামা শাওকানীও ব্যাপক আলোচনা করেছেন (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭২-৮১ দ্রষ্টব্য)।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ফিক্‌হ-এর প্রখ্যাত চার ইমামের মধ্যে ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম আবু হানীফার দুই প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ শায়বানী (র)-এর মতে মুযারাআ সম্পূর্ণরূপে হারাম নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) যদিও মুযারাআকে নিষিদ্ধ বলেছেন, কিন্তু কতগুলো শর্ত সাপেক্ষে তিনিও এই প্রথাকে জায়েয মনে করেন। তার মতে জমির মালিক যদি জমি ভাগচাষে দেয়ার সময় বীজ ও চাষাবাদের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে এবং লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে তবে মুযারাআ প্রথায় কোন দোষ নেই (বিস্তারিত জানার জন্য আবদুর রহমান আল-জাযারীর কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল-মাযাহিবিল আরবাআ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩-২৫ দ্রষ্টব্য) (অনুবাদক)।

٨٣٥- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِىَ لَهُ .

৮৩৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি আবাদযোগ্য করে, তা তারই থাকবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীসের উপর আমল করি। কোন ব্যক্তি সরকারের অনুমতি নিয়ে অথবা বিনা অনুমতিতে কোন পতিত জমি আবাদযোগ্য করলে তা তারই মালিকানাভুক্ত হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, সরকারের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তাতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তবে ইমামের (সরকার) কর্তব্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি তা চাষাবাদযোগ্য করে তাকেই এটা দিয়ে দেয়া। সরকার তাকে এটা না দিলে তাতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ সেচের ব্যাপারে সমঝোতা স্থাপন এবং পানি বণ্টন।

٨٣٦- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ مَهْزُوْرٍ وَمُذَيْنَبٍ يُمْسَكُ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْاَعْلٰى عَلَى الْاَسْفَلِ .

৮৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মাহযূর' ও 'মুযায়নাব' নামক পানির নালা দু'টি সম্পর্কে বলেন ঃ "উচ্চ ভূমির লোকদের জমিতে পায়ের গোছা পর্যন্ত জমা হওয়ার পর তারা নিম্ন ভূমির লোকদের জন্য পানির প্রবাহ ছেড়ে দিবে।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। কেননা এভাবেই পরস্পরের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপিত হতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নিজ নিজ পানির উৎসসমূহ, বৃষ্টির পানি ও ঝর্ণাধারা সম্পর্কে যে কোন ধরনের সমঝোতা স্থাপন করা এবং আপোষে কথাবার্তা চূড়ান্ত করে নেয়া জায়েয ও উত্তম।

٨٣٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيْفَةَ سَاقَ خَلِيْجًا لَهُ حَتّٰى النَّهْرَ الصَّغِيْرَ مِنَ الْعَرِيْضِ فَاَرَادَ اَنْ يُمَرَّ بِهِ فِىْ اَرْضٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ الضَّحَّاكُ لِمَ تَمْنَعُنِىْ وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ اَوَّلاً وَاٰخِرًا وَلاَ يَضُرُّكَ فَاَبٰى فَكَلَّمَ فِيْهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَدَعَا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَاَمَرَهُ اَنْ يُخَلِّىَ سَبِيْلَهُ فَاَبٰى فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَمْنَعُ اَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ تَشْرَبُ بِهِ اَوَّلاً وَاٰخِرًا وَلاَ يَضُرُّكَ قَالَ مُحَمَّدٌ لاَ وَاللّٰهِ فَقَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلٰى بَطْنِكَ فَاَمَرَهُ عُمَرُ اَنْ يُجْرِيَهُ فَفَعَلَ .

৮৩৭। আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। দাহ্হাক ইবনে খলীফা আরীদ নামক উপত্যকা থেকে একটি ক্ষুদ্র নালা খনন করে তা মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা)-র জমীনের মধ্য দিয়ে (নিজের জমিতে) প্রবাহিত করতে চাইলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) তাতে বাধা দিলেন। দাহ্হাক (রা) বলেন, তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছো কেন? এতে তোমারও তো উপকার হবে। তুমি প্রথমেও নিজ জমিতে পানি দিতে পারবে এবং শেষেও, আর নালা খননে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তা মানলেন না। অতএব দাহ্হাক (রা) এই ঘটনা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে ডেকে এনে তাকে নালা খনন করার সুযোগ করে দিতে বলেন। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করেন। উমার (রা) বলেন, তুমি নিজের ভাইকে এমন কাজে বাধা দিচ্ছো কেন, যা তোমার জন্যও উপকারী হবে? তুমি প্রথমেও এবং শেষেও তোমার জমিতে পানি দেয়ার সুযোগ পাচ্ছো এবং তাতে তোমার কোনই লোকসান নেই। মুহাম্মাদ (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি তাতে সম্মত নই। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! নালা অবশ্যই প্রবাহিত করা হবে, তা তোমার পেটের উপর দিয়ে হলেও। অতএব উমার (রা) দাহ্হাক (রা)-কে নালা প্রবাহিত করার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তা প্রবাহিত করলেন।

٨٣٨- اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْىَ الْمَازِنِىُّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ فِىْ حَائِط جَدِّه رَبِيْعٌ لِّعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَاَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَنْ يُّحَوِّلَهُ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْحَائِط هِىَ اَرْفَقُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاَقْرَبُ اِلٰى اَرْضِه فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَضٰى لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِتَحْوِيْلِه .

৮৩৮। আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-মাযিনী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। ইয়াহ্ইয়ার দাদার (আবু হাসান তামীম) বাগানের মধ্য দিয়ে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র একটি ক্ষুদ্র নালা ছিল। তিনি এটিকে গতি পরিবর্তন করে বাগানের এক প্রান্ত দিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। কেননা এদিক থেকে তার জমি নিকটবর্তী ছিলো এবং এখান থেকে তাতে পানি পৌছানো সহজ ছিলো। কিন্তু বাগানের মালিক (তামীম) তাতে বাঁধা দেন। আবদুর রহমান (রা) এ ব্যাপারে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র শরণাপন্ন হলেন। তিনি তাকে নিজের সুবিধামত নালা প্রবাহিত করার নির্দেশ দেন।

٨٣٩- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا اَبُو الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِيْرٍ .

৮৩৯। আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "কূপের অতিরিক্ত পানি নেয়ার ব্যাপারে বাধা দেয়া যাবে না।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করি। কোন ব্যক্তির মালিকানায় কূপ থাকলে তা থেকে খাবার পানি নেয়া বা গৃহপালিত পশুকে পান করানোর ক্ষেত্রে অন্যদের বাধা দেয়া জায়েয নয়। তবে খেজুর বাগান বা ফসলের জমিতে পানি নিতে চাইলে মালিকের বাধা দেয়ার অধিকার আছে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত।

৪০. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি শরীকানা গোলামে নিজের অংশ আযাদ করে দিলে, উট (মানত করে রাখালহীন) ছেড়ে দিলে অথবা আযাদ করার ওসিয়াত করলে।

٨٤٠- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ سَيَّبَ سَائِبَةً .

৮৪০। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) একটি উট ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, একটি প্রসিদ্ধ হাদীস এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "আযাদকারী ওয়ালায়ার মালিক হবে।" আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন, ইসলামে সায়েবা জায়েয নয়।[১৭] সায়েবা আযাদ করা যদি কারো জন্য এভাবে জায়েয হতো যে, তার ওয়ালায়ার মালিক আযাদকারী হবে না, তবে যারা হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেছিলো, আপনি দাসত্বমুক্ত করবেন কিন্তু ওয়ালায়ার মালিক আপনি হবেন না, এটাও জায়েয হতো। তার কাছে এই ওয়ালায়া দাবিও করা হয়েছিলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ালায়ার ক্রয়-বিক্রয় ও হেবা করতে নিষেধ করেছেন। আমাদের কাছে ওয়ালায়া হচ্ছে বংশীয় সম্পর্কের মতো। সুতরাং যে ব্যক্তি দাসত্ব মোচন করবে সেই ওয়ালায়ার অধিকারী হবে, তা সায়েবা হিসাবে অথবা অন্য যে কোন প্রক্রিয়ায় আযাদ করা হোক না কেন। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের ফিক্‌হবিদগণের এটাই সাধারণ মত।

٨٤١- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ قِيْمَةَ الْعَدْلِ ثُمَّ اَعْطٰى شُرَكَائَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا اُعْتِقَ .

৮৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তি শরীকানা গোলামের নিজের অংশ আযাদ করে দিলো এবং তার কাছে গোলামের মূল্যের

---

১৭. সায়েবা (سائبة) শব্দের অর্থ, 'যে উটকে মানত হিসাবে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। এর সাথে কোন রাখাল থাকে না, তা স্বাধীনভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়।" আর গোলামের ক্ষেত্রে এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, 'যে দাসকে এই শর্তে আযাদ করা হয় যে, আযাদকারী ও আযাদকৃতের মধ্যে উত্তরাধিকারের কোন সম্পর্ক থাকবে না।' আযাদকৃত গোলাম যদি কোন সম্পদ রেখে মারা যায় এবং তার বৈধ উত্তরাধিকারী না থাকে, তবে আযাদকারীই তার ওয়ারিস হয়। আর এটাকেই বলা হয় ওয়ালায়া (الولاء) (অনুবাদক)।

সমপরিমাণ সম্পদও আছে। এ ক্ষেত্রে গোলামের একটা উপযুক্ত মূল্য নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর আযাদকারী অন্য শরীকদের অংশের মূল্য পরিশোধ করবে। এভাবে তার পক্ষ থেকে গোলামটি সম্পূর্ণ আযাদ হয়ে যাবে। অন্যথায় সে যতোটুকু আযাদ করে গোলাম ততোটুকু আযাদ হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। কোন অংশীদার শরীকানা গোলামের একটি অংশ আযাদ করে দিলে সে সম্পূর্ণ আযাদ হয়ে যাবে। আযাদকারী ধনী হলে সে অন্য শরীকদের অংশের জামিনদার হবে। আর সে যদি গরীব হয়, তবে গোলাম দিনমজুরী খেটে তাদের অংশের মূল্য পরিশোধ করবে। নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে এ ধরনের হাদীস পৌঁছেছে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, গোলামের যতোটুকু অংশ আযাদ করা হয়েছে ততোটুকুই সে আযাদ হবে। অন্য শরীকরা ইচ্ছা করলে অপর শরীকদের মতো আযাদ করে দিবে অথবা আযাদকারীর কাছ থেকে ধনবান হওয়া সাপেক্ষে নিজেদের অংশের মূল্য আদায় করে নিবে অথবা গোলামকে মজুর হিসাবে খাটিয়ে নিজেদের পাওনার পরিমাণ কাজ করিয়ে নিবে। অতএব তারা তার কাছ থেকে কাজ আদায় করার পর সে দাসত্বমুক্ত হয়ে গেলে সব অংশীদারই নিজ নিজ অংশ মোতাবেক ওয়ালায়ার মালিক হবে। আর আযাদকারীর নিকট থেকে নিজ নিজ অংশের মূল্য আদায় করে নেয়ার ক্ষেত্রে কেবল সে একাই তার ওয়ালায়ার অধিকারী হবে। সে যে পরিমাণ অর্থ অন্য শরীকদের দিয়েছে, তার কাছ থেকে সেই পরিমাণ কাজ আদায় করে নিবে।

٨٤٢- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَعْتَقَ وَلَدَ زِنًى وَاُمَّهُ .

৮৪২। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) একটি অবৈধ সন্তান ও তার মাকে দাসত্বমুক্ত করেছিলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এই ধরনের সন্তানদের দাসত্বমুক্ত করা কোন দোষের ব্যাপার নয়, বরং ভালো কাজ। আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, তার কাছে দু'টি গোলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। এর একটি ছিলো এক দাসীর অবৈধ সন্তান এবং অপরটি ছিলো এক সৎকর্মশীল দাসীর সন্তান। এদের মধ্যে কোন্‌টি আযাদ করবে? তিনি জওয়াবে বলেন, যার মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী। অতএব আমরাও এই মত পোষণ করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণেরও এই মত।

٨٤٣- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ تُوُفِّىَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ فِىْ نَوْمٍ نَامَهُ فَاَعْتَقَتْ عَائِشَةُ رِقَابًا كَثِيْرَةً .

৮৪৩। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) ঘুমন্ত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। আয়েশা (রা) তার পক্ষ থেকে অনেকগুলো দাস আযাদ করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে গোলাম আযাদ করা কোন দোষের ব্যাপার নয়। যদি সে ওসিয়াত করে গিয়ে থাকে, তবে মৃত ব্যক্তি আযাদকৃত গোলামের ওয়ালায়ার অধিকারী হবে (এবং তা তার ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হবে)। যদি ওসিয়াত না করে গিয়ে থাকে, তবে আযাদকারী ওয়ালায়ার অধিকারী হবে এবং আল্লাহ চান তো মৃত ব্যক্তি এর সওয়াব পাবে।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ মুদাব্বির গোলাম[১৮] ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা।

٨٤٤- اَخْبَرَنَا اَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ اَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَّهَا عَنْ دُبُرٍ مِّنْهَا ثُمَّ اَنَّ عَائِشَةَ بَعْدَ ذٰلِكَ اشْتَكَتْ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَشْتَكِيَ ثُمَّ اِنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ سِنْدِيٌّ فَقَالَ لَهَا اَنْتِ مَطْبُوْبَةٌ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ وَيْلَكَ مَنْ طَبَّنِيْ قَالَ امْرَاَةٌ مِّنْ نَعْتِهَا كَذَا وَكَذَا فَوَصَفَهَا وَقَالَ اِنَّ فِيْ حَجْرِهَا الْاٰنَ صَبِيًّا قَدْ بَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اُدْعُوْا لِيْ فُلَانَةَ جَارِيَةً كَانَتْ تَخْدُمُهَا فَوَجَدُوْهَا فِيْ بَيْتِ جِيْرَانٍ لَّهُمْ فِيْ حَجْرِهَا صَبِيٌّ قَالَتِ الْاٰنَ حَتّٰى اَغْسِلَ بَوْلَ هٰذَا الصَّبِيِّ فَغَسَلَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ اَسَحَرْتِنِيْ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ لِمَ قَالَتْ اَحْبَبْتُ الْعِتْقَ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لَا تَعْتَقِيْنَ اَبَدًا ثُمَّ اَمَرَتْ عَائِشَةُ ابْنَ اُخْتِهَا اَنْ يَّبِيْعَهَا مِنَ الْاَعْرَابِ مِمَّنْ يُّسِيْءُ مَلَكَتَهَا قَالَتْ ثُمَّ ابْتَعْ لِيْ بِثَمَنِهَا رَقَبَةً ثُمَّ اَعْتِقْهَا فَقَالَتْ عَمْرَةُ فَلَبِثَتْ عَائِشَةُ مَا شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الزَّمَانِ ثُمَّ اَنَّهَا رَاَتْ فِي الْمَنَامِ اَنِ اغْتَسِلِيْ مِنْ اٰبَارٍ ثَلٰثَةٍ يَمُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا فَاِنَّكِ تُشْفَيْنَ فَدَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ فَذَكَرَتْ لَهُمْ عَائِشَةُ الَّذِيْ رَاَتْ فَانْطَلَقَا اِلٰى قَنَاتٍ فَوَجَدَا اٰبَارًا ثَلٰثَةً يَمُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا فَاسْتَقَوْا مِنْ كُلِّ بِيْرٍ مِّنْهَا ثُلُثَ شُجُبٍ حَتّٰى مَلَؤُا الشُّجُبَ مِنْ جَمِيْعِهِمْ ثُمَّ اَتَوْا بِذٰلِكَ الْمَاءِ اِلٰى عَائِشَةَ فَاغْتَسَلَتْ فِيْهِ فَشُفِيَتْ

৮৪৪। আবুর রিজাল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার মা আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান ইবনে আসআদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর স্ত্রী

---

১৮. মালিক যে গোলামের দাসত্বমুক্তি তার মৃত্যু পর্যন্ত স্থগিত রাখে অর্থাৎ মনিবের মৃত্যুর পরপর যে গোলাম দাসত্বমুক্ত হয়ে যায় তাকে মুদাব্বির গোলাম বলে (অনুবাদক)।

আয়েশা (রা) তার একটি বাঁদীকে মুদাব্বির করেছিলেন। অতঃপর তিনি রোগাক্রান্ত হলেন এবং আল্লাহ যতোদিন চাইলেন রোগাক্রান্ত থাকলেন। সিন্ধু প্রদেশের (পাকিস্তান) এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বললো, আপনাকে যাদু করা হয়েছে। আয়েশা (রা) তাকে বলেন, তোমার ক্ষতি হোক, কে আমাকে যাদু করবে? সে বললো, একটি স্ত্রীলোক, তার চেহারা ও আকৃতি এরূপ। সে তার দেহাবয়বের বর্ণনা দিলো এবং বললো, তার কোলে এই মুহূর্তে একটি শিশু রয়েছে এবং সে তার কোলে পেশাব করে দিয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, অমুক বাঁদীকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। সে তার খেদমত করতো। লোকেরা তাকে কাছেই প্রতিবেশীদের ঘরে পেয়ে গেলো। তার কোলে একটি শিশু ছিলো। সে বললো, শিশুর পেশাব ধুয়ে এখনই আসছি। অতএব সে বাচ্চার পেশাব পরিষ্কার করে আসলো। আয়েশা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে যাদু করেছো? সে বললো, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন? সে বললো, আমি দাসত্বমুক্ত হতে চাই। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি কখনো দাসত্বমুক্ত হতে পারবে না। অতঃপর তিনি তার বোনের পুত্রকে নির্দেশ দিলেন, তাকে কোন গ্রাম্য বেদুইনের কাছে বিক্রি করে দিতে, যে তাকে কষ্টের মধ্যে রাখবে। তিনি আরো বলেন, অতঃপর আমার জন্য প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে একটি গোলাম খরিদ করে তাকে আযাদ করে দাও। আমরাহ (র) বলেন, আল্লাহ যতোদিন চাইলেন তিনি এই যাদুতে আক্রান্ত থাকলেন। অতঃপর কেউ তাকে স্বপ্নের মধ্যে বললো, এমন তিনটি কূপের পানি দিয়ে গোসল করুন, যা পরস্পরের সাথে মিলিত। তবেই আপনি রোগমুক্ত হয়ে যাবেন। ইসমাঈল ইবনে আবু বাক্‌র (র) ও আবদুর রহমান ইবনে সাদ ইবনে যুরারা (র) আয়েশা (রা)-র কাছে এলেন। তিনি তাদের কাছে নিজের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন। অতএব তারা উভয়ে পানির প্রস্রবণের খোঁজে চলে গেলেন। তারা এমন তিনটি কূপ পেয়ে গেলেন যা পরস্পর সংযুক্ত। তারা প্রতিটি কূপ থেকে এক কলসের তিন ভাগের এক ভাগ করে পানি তুললেন। তিন কূপের পানিতে কলসটি পূর্ণ করে তা নিয়ে তারা আয়েশা (রা)-র কাছে ফিরে এলেন। তিনি সেই পানি দিয়ে গোসল করলেন এবং যাদুমুক্ত হয়ে গেলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে মুদাব্বির (মালিকের মৃত্যুর পর দাসত্বমুক্ত হওয়া) গোলাম বিক্রি করা জায়েয নয়। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র)-র এই মত। আমরা তাদের এই মতের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণেরও এই মত।

٨٤٥- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ مَنْ اَعْتَقَ وَلِيْدَةً عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَاِنَّ لَهُ اَنْ يَطَاَهَا وَاَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَبِيْعَهَا وَلاَ اَنْ يَهَبَهَا وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا .

৮৪৫। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছেন, কোন ব্যক্তি তার কোন বাঁদীকে মুদাব্বির বাঁদীতে পরিণত করলে সে তার

সাথে সহবাস করতে পারবে বা তাকে অন্য লোকের সাথে বিবাহ দিতে পারবে। কিন্তু সে তাকে বিক্রি করতে পারবে না এবং হেবাও করতে পারবে না। আর তার (বাঁদীর) সন্তান তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের ফিক্হবিদগণের এই মত।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ দাবি, সাক্ষী ও বংশগত সম্পর্কের দাবি।

٨٤٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَتْ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّىْ فَاَقْبِضْهُ اِلَيْكَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدٌ وَقَالَ ابْنُ اَخِىْ قَدْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ اَخِىْ فِيْهِ فَقَامَ اِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِىْ قَدْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ اَخِىْ عُتْبَةُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ ابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اِحْتَجِبِىْ مِنْهُ لَمَّا رَاٰى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَاٰهَا حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ .

৮৪৬। আয়েশা (রা) বলেন, উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস তার ভাই সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে ওসিয়াত করলো যে, 'যামআর বাঁদীর পুত্র আমার ঔরসজাত। তুমি তাকে হস্তগত করে নিও।' আয়েশা (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন সাদ (রা) তাকে হস্তগত করলেন এবং বলেন, সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার ভাই তার সম্পর্কে আমাকে ওসিয়াত করে গেছে। আব্দ ইবনে যামআ উঠে দাবি জানিয়ে বলেন, সে আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর পুত্র এবং তার ঘরেই জন্মগ্রহণ করেছে। অতঃপর তারা উভয়ে ব্যাপারটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হন। সাদ (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার ভাই উতবা তার সম্পর্কে আমাকে ওসিয়াত করে গেছে। অপরদিকে আব্দ ইবনে যামআ বলেন, সে আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর পুত্র এবং আমার পিতার বিছানায় জন্মগ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "হে আব্দ ইবনে যামআ! সে তোমারই।" অতঃপর তিনি বলেন ঃ "সন্তান যে ব্যক্তির বিছানায় জন্মগ্রহণ করে, সে তারই এবং ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড)।" অতঃপর তিনি নিজের স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন সাওদা বিনতে যামআ (রা)-কে বলেন ঃ "তুমি এই ছেলে থেকে পর্দা করবে। কেননা তার মধ্যে উতবার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।" অতএব সে কখনো তাকে দেখতে পায়নি। এ অবস্থায় সে মহান আল্লাহ্র কাছে চলে গেলো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। বাচ্চা তারই, যার বিছানায় সে ভূমিষ্ঠ হয় এবং যেনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণের এই মত।

٨٤٧- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ .

৮৪৭। জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ "সাক্ষ্যের সাথে শপথ করানোর পর রায় দিয়েছেন।"[১৯]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর বিপরীত হাদীস জানতে পেরেছি। ইবনে আবু যেব (র) বলেন, আমি ইমাম যুহরীর কাছে সাক্ষীর সাথে শপথ যুক্ত করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এটা বিদআত। আমীর মুআবিয়াই সর্বপ্রথম সাক্ষীর সংগে শপথ যুক্ত করে ফয়সালা দেয়ার বিধান চালু করেন। অথচ ইমাম যুহরী মদীনার হাদীস বিশারদদের মধ্যে অন্যদের তুলনায় অধিক হাদীস জানতেন। অনুরূপভাবে ইবনে জুরাইজ (র)-ও আতা ইবনে আবু রাবাহ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (আতা) বলেন, প্রথমদিকে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতি ছাড়া রায় দেয়া হতো না। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানই সর্বপ্রথম একজন সাক্ষী এবং তাকে শপথ করানোর পর রায় প্রদান করেন।

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ মামলা-মোকদ্দমায় শপথ করানোর বর্ণনা।

٨٤٨- اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا غَطْفَانَ بْنَ طَرِيْفٍ الْمُرِّىَّ يَقُوْلُ اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيْعٍ فِىْ دَارٍ اِلٰى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَضٰى عَلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ اَحْلِفُ لَهُ مَكَانِىْ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لاَ وَاللّٰهِ اِلاَّ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوْقِ قَالَ فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ اَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَاَبٰى اَنْ يَّحْلِفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذٰلِكَ .

৮৪৮। দাউদ ইবনুল হুসাইন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু গাতাফান ইবনে তরীফ আল-মুররী (র)-কে বলতে শুনেছেন, যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) ও ইবনে মুতী একটি ঘরের মালিকানা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হন। তারা বিষয়টি নিয়ে মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে উপস্থিত হন। তিনি যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে শপথ করতে

---

১৯. উল্লেখিত সূত্রে হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু শাব্দিক পার্থক্য সহকারে প্রায় বিশজন সাহাবীর সূত্রে তা মারফূ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে (মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, নাসাঈ, আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, বায়হাকী, দারু কুতনী ইত্যাদি)। জমহূরসহ তিন ইমামের মতে শপথসহ একজনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেয়া জায়েয, কেবল হানাফী মতে জায়েয নাই (অনুবাদক)।

বলেন। যায়েদ (রা) তাকে বলেন, আমি নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে শপথ করবো। মারওয়ান তাকে বলেন, না, আল্লাহ্‌র শপথ! যেখানে (মিম্বর) দাঁড়িয়ে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে শপথ করে বলেন যে, ঘরটি তার নিজের। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরের কাছে শপথ করতে অস্বীকৃতি জানান। এতে মারওয়ান আশ্চর্যান্বিত হন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-র মতের উপর আমল করি। যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে শপথ করা জায়েয। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) যদি এটাকে বাধ্যতামূলক মনে করতেন, তবে যে হক তার যিম্মায় ওয়াজিব ছিল, তা পূর্ণ করতে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন না। কিন্তু যে জিনিস তার যিম্মায় ওয়াজিব নয় তা আদায় করা তিনি অপছন্দ করেন। এজন্য শপথ করানোর ব্যাপারে যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী যে, তার কথা ও কাজের উপর আমল করতে হবে।

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধকের বর্ণনা।

٨٤٩- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ .

৮৪৯। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "বন্ধকী জিনিস বাজেয়াপ্ত করা যাবে না।"[২০]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। "বন্ধকী জিনিস আটকে রাখা যাবে না" কথার ব্যাখ্যা এই যে, 'কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির কাছে কোন জিনিস বন্ধক রাখার সময় বলে, আমি যদি এই সময়ের মধ্যে তোমার কাছ থেকে নেয়া মাল ফেরত দিতে পারি তবে তো ঠিক আছে, অন্যথায় এই বন্ধকী জিনিস তোমার দেয়া মালের পরিবর্তে তোমার মালিকানাধীন হয়ে যাবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ وَلاَ يَكُوْنُ لِلْمُرْتَهِنِ بِمَالِهِ .

---

২০. অর্থাৎ কোন জিনিস বন্ধক রাখার কারণে তা থেকে মূল মালিকের মালিকানা স্বত্ব বিলুপ্ত হবে না। ইবনে হিব্বান, দারু কুতনী, হাকেম ও বায়হাকীতে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مَنْ رَاهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ .

" বন্ধকী বস্তু বাজেয়াপ্ত করা যাবে না। ঐ বস্তুর আয়-উৎপাদনের মালিকও সে হবে এবং তাকেই তার ব্যয়ভার বহন করতে হবে।"

ইমাম শাফিঈ, ইবনে আবু শাইবা ও আবদুর রায্‌যাকের মুসনাদসমূহের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِىْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ .

"বন্ধকদাতার মালিকানা-স্বত্ব রহিত হয় না। বন্ধকী বস্তুর আয়-উৎপাদন সে পাবে এবং এর ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হবে।"

"বন্ধকী জিনিস বাজেয়াপ্ত করা যাবে না এবং তা বন্ধক গ্রহীতার দেয়া মালের পরিবর্তে তার মালও হবে না।"

আমরাও এই কথা বলি। ইমাম আবু হানীফা (র)-র এই মত। ইমাম মালেক (র)-ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।[২১]

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তির কাছে ঘটনার সাক্ষ্য আছে।

٨٥٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ عَمْرَةَ الْاَنْصَارِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِىَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِىْ يَاْتِىْ بِالشَّهَادَةِ اَوْ يُخْبِرُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ اَنْ يُسْئَلَهَا .

৮৫০। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম সাক্ষী সম্পর্কে অবহিত করবো না? যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় অথবা অবহিত করে, সেই উত্তম সাক্ষী।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। কোন ব্যক্তি কোন মোকদ্দমার ঘটনা সম্পর্কে সম্যক অবহিত আছে। কিন্তু বাদী বা বিবাদী কারুরই তার সম্পর্কে জানা নেই। এ অবস্থায় তাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য না ডাকা হলেও স্বেচ্ছায় গিয়ে তার প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া উচিৎ।

জাহিলী যুগের প্রথা ছিলো, কোন ব্যক্তি কোন জিনিস বন্ধক রাখার সময় বলতো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তোমার পাওনা ফেরত না দিতে পারলে এই বন্ধকী মাল তোমার মালিকানাভুক্ত হবে। অতঃপর বন্ধকদাতা মালিকের পাওনা ফেরত দিতে না পারলে বন্ধকী জিনিস গ্রহীতার মালিকানায় চলে যেতো। ইসলাম এই প্রথাকে বাতিল করে দিয়েছে। বন্ধকদাতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধক গ্রহীতার প্রাপ্য পরিশোধ করতে না পারলেও বন্ধকী জিনিসের মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরিত হবে না। মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যদি বন্ধকদাতা হাযির না হয়, তবে বন্ধক গ্রহীতা তার প্রাপ্য পাওয়া সাপেক্ষে তাকে বন্ধকী জিনিস ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। বন্ধকী জিনিস গ্রহীতার জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয় (অনুবাদক)।

২১. ইমাম মালেকের ব্যাখ্যা ঃ 'এক ব্যক্তি কোন বস্তু তার প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বন্ধক রাখলো এবং বললো, আমি এই মেয়াদের মধ্যে বন্ধক ছাড়িয়ে নিতে না পারলে তা তোমার (বন্ধক গ্রহীতার) হয়ে যাবে। এভাবে বন্ধক রাখা জায়েয নয়। আর এরূপ কথা বললেও মেয়াদশেষে বন্ধক গ্রহীতা এর মালিক হবে না এবং ঐ শর্তটি মূল্যহীন গণ্য হবে" (অনুবাদক)।

অধ্যায় ঃ ১৬

كتَابُ اللُّقْطَة

(হারানো প্রাপ্তি)

১. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের হারানো জিনিস পাওয়া গেলে তার বিধান।

٨٥١- اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِىُّ اَنَّ ضَوَالَ الْاِبِلِ كَانَتْ فِىْ زَمَنِ عُمَرَ ابِلاً مُرْسَلَةً تَنَاتِجُ لاَ يَمَسُّهَا اَحَدٌ حَتّٰى اِذَا كَانَ زَمَنُ (زَمَانُ) عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَمَرَ بِمَعْرِفَتِهَا وَتَعْرِيْفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ فَاِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا اُعْطِىَ ثَمَنُهَا .

৮৫১। ইবনে শিহাব যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। হযরত উমার (রা)-র যমানায় হারানো উট ধরে রাখা হতো না। এমনকি তা বাচ্চা প্রসব করতো, কিন্তু কেউ তাতে হাত লাগাতো না। এভাবে যখন উছমান (রা)র-র যুগ এলো তখন তিনি তা চিনে রাখার এবং হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর (মালিক না পাওয়া গেলে) তা বিক্রি করে দেয়া হতো। অতঃপর মালিক এসে গেলে তাকে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ফেরত দেয়া হতো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উভয় পন্থাই উত্তম। ইমাম চাইলে তা মুক্ত ছেড়ে দিবে এবং তার মালিক এসে তা হস্তগত করবে। যদি এর ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে অথবা তা দেখাশুনা করার মতো লোক না থাকে, তবে তা বিক্রি করে দিবে এবং এর বিক্রয়মূল্য নিজের কাছে রাখবে। অতঃপর তার মালিক এসে গেলে কোন দোষ নেই (তাকে মূল্য ফেরত দিবে)।

٨٥٢- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ اَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقْطَةً فَجَاءَ اِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ وَجَدْتُ لُقْطَةً فَمَا تَاْمُرُنِىْ فِيْهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ عَرِّفْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ زِدْ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ لاَ اٰمُرُكَ اَنْ تَاْكُلَهَا لَوْ شِئْتَ لَمْ تَاْخُذْهَا .

৮৫২। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি পথে পড়ে থাকা জিনিস পেয়ে তা নিয়ে ইবনে উমার (রা)-র কাছে এসে বলে, আমি পতিত জিনিস পেয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি করতে বলেন? ইবনে উমার (রা) বলেন, এ সম্পর্কে ঘোষণা দিতে থাকো। সে বললো, তা করেছি। তিনি বলেন, আরো ঘোষণা দিতে থাকো। সে বললো, কয়েক বার ঘোষণা দিয়েছি। তিনি বলেন, আমি তোমাকে এটা খাওয়ার নির্দেশ দিতে পারি না। তুমি ইচ্ছা করলে তা নাও তুলে নিতে পারতে (এখন এর হেফাজত করা তোমার কর্তব্য, কেননা এটা তোমার কাছে একটি আমানত)।

٨٥٣- عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَرَّفَهُ ثُمَّ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ قَالَ ثَابِتٌ لِعُمَرَ قَدْ شَغَلَنِي عَنْهُ ضَيْعَتِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ .

৮৫৩। ছাবিত ইবনুদ দাহ্‌হাক আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাররা নামক স্থানে একটি হারানো উট পেলেন এবং হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা দিলেন। অতঃপর তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি পুনরায় তাকে ঘোষণা দিতে বলেন। ছাবিত (রা) তাকে বলেন, বিভিন্ন রকম ব্যস্ততার কারণে আর ঘোষণা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। উমার (রা) তাকে বলেন, তা যেখানে পেয়েছো সেখানে নিয়ে ছেড়ে দাও।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। যদি কোন ব্যক্তি দশ দিরহাম বা তার অধিক মূল্যের হারানো জিনিস পায়, তবে সে এক বছর ধরে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা দিতে থাকবে। এর মধ্যে যদি ঐ বস্তুর মালিক পাওয়া যায় তো ভালো, অন্যথায় তা দান-খয়রাত করে দিবে। প্রাপক যদি অভাবী হয়ে থাকে তবে তা নিজেই ভোগ করতে পারবে। অতঃপর তার মালিক এসে গেলে সে ইচ্ছা করলে তার মূল্যও গ্রহণ করতে পারে অথবা তার অনুরূপ জিনিসও গ্রহণ করতে পারে। প্রাপ্ত জিনিসের মূল্য যদি দশ দিরহামের কম হয়, তবে যতো দিন প্রয়োজন মনে করে ঘোষণা দিতে থাকবে। অতঃপর উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করবে (দান-খয়রাত করবে অথবা নিজে খরচ করবে)। অতঃপর এর মালিক এসে গেলে, এ ক্ষেত্রেও পূর্বেকার নির্দেশ কার্যকর হবে। আর পড়ে পাওয়া জিনিসটি যদি সে পড়ে থাকার স্থানে রেখে আসে তবে সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায় এবং তার উপর কোন দায়িত্ব বর্তাবে না।

٨٥٤- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ .

৮৫৪। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কাবা ঘরের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসা অবস্থায় বলেন, যে ব্যক্তি হারানো জিনিস তুলে নিলো সে পথভ্রষ্ট।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। হযরত উমার (রা)-র এ কথার অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি আত্মসাৎ করার উদ্দেশে তা তুলে নেয় (তবে সে পথভ্রষ্ট)। কিন্তু যে ব্যক্তি মালিককে ফেরত দেয়ার উদ্দেশে অথবা ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশে তা তুলে নিবে, তার কোন দোষ হবে না।[১]

---

১. লুকতাহ (اللقطة) শব্দের অর্থ হারানো অবস্থায় পড়ে থাকা জিনিস, হারানো জিনিস যা পাওয়া গেছে বা তুলে নেয়া হয়েছে। হারানো গরু-ছাগল প্রভৃতি পশুকে দাল্লা (الضالة) বলে। পথে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে কোন কোন ফিক্হবিদের মত হচ্ছে, তা তুলে নেয়া জায়েয, কিন্তু স্বস্থানে পড়ে থাকতে দেয়াই উত্তম। জমহূরের মতে তা তুলে নেয়াই উত্তম, বিশেষ করে যখন তা তুলে না নিলে আত্মসাৎ হওয়ার বা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও মালিক না পাওয়া গেলে তা দান-খয়রাত করতে হবে অথবা কোন জনকল্যাণমূলক কাজে লাগাবে। প্রাপ্ত জিনিস মালিকহীন

গুপ্তধন হলে তা প্রাপক নিজে ব্যবহার করতে পারবে এবং এর এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা দিতে হবে। আমাদের দেশে হারানো পশু পাওয়া গেলে তা বেঁধে রাখতে হবে। অন্যথায় তা ফসলের ক্ষতি করবে অথবা দুষ্ট প্রকৃতির লোকের হাতে পড়লে তা আত্মসাৎ হবে।

কিন্তু তা যথাস্থানে থাকতে দেয়া অধিকতর প্রশংসনীয় বলে কখনও কখনও বলা হয়। প্রাপ্ত বস্তু তুচ্ছ বা ধ্বংসশীল না হলে এক বছর সময়ের শেষে, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈর মতে, প্রাপক এই বস্তু নিজ অধিকারে রাখতে স্বত্ববান হবে এবং তা ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে, কেবলমাত্র 'দরিদ্র ব্যক্তি' তা রাখতে ও ব্যবহার করতে পারবে। আর উক্ত সময় শেষ হওয়ার পূর্বে তা সদাকা হিসাবে দান করা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মালেকের মতে আরও উত্তম।

যদি মালিক উক্ত সময় শেষ হওয়ার পূর্বে উপস্থিত হয়, তবে সে তার মাল ফেরত পাবে। যদি সময় শেষ হওয়ার পরেও সে উপস্থিত হয় এবং তখনও মালটি প্রাপকের নিকট থাকে তবুও সে তা ফেরত পাবে। যদি প্রাপক আইন অনুসারে এর কোন ব্যবস্থা করে থাকে, তবে সে মালিকের নিকট এর মূল্যের জন্য দায়ী থাকবে। কেবল দাউদ যাহিরী এই ক্ষেত্রে মালিকের কোন দাবি স্বীকার করেননি। ইমাম মালেক (র) ও ইমাম আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বলের মতানুসারে কুড়ানো বস্তুর বর্ণনা ঠিকভাবে দিতে পারলেই মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, প্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়োজন নেই। মরুভূমিতে গৃহপালিত জীবজন্তু পাওয়া গেলে সে সম্বন্ধে বিশেষ আইন অনুসৃত হয় যা জন্তুটি বিপদাশংকামুক্ত থাকলে প্রাপকের পক্ষে বেশী কঠিন এবং বিপরীত ক্ষেত্রে প্রাপকের পক্ষে কিছুটা সহজ। মক্কার হেরেম শরীফের মধ্যে কোন বস্তু পাওয়া গেলে সে সম্বন্ধে ইমাম শাফিঈ (র) ও ইমাম আহ্‌মাদ ইবনে হাম্বলের আরও কতকগুলি বিধান আছে।

ফিক্‌হের এই ব্যবস্থা কতকগুলি হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কতক ফকীহ্‌র মতে মালিকের জন্য দুই বা তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে। প্রাচীন আইনবেত্তাগণের মতে প্রাপ্ত বস্তু হলো গচ্ছিত বস্তুর (ওয়াদীআ) ন্যায়, আবার ধর্মীয় নীতিবোধ অনুযায়ী অন্যের হারানো খেজুর পেলে তা কুড়িয়ে খাওয়া উচিত নয়। কারণ তা যাকাতের মাল হতে পারে। একটি হাদীসে মক্কায় হাজ্জীদেরকে অন্যের হারানো কোন বস্তু পেলে তা কুড়িয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

লাকীত (لقيط) ঃ কোন ব্যক্তি কর্তৃক রাস্তাঘাটে ফেলে যাওয়া শিশুকে বুঝানোর জন্য লাকীতে পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। এটা লুকতারই অন্তর্ভুক্ত। আইনের ভাষায় কোন ব্যক্তি তার মালিকানাধীন শিশুকে দারিদ্র্যের ভয়ে অথবা যেনার অভিযোগ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাস্তায় ফেলে গেলে সেই শিশুকে লাকীত বলে। পথিপার্শ্ব থেকে যে ব্যক্তি তাকে কুড়িয়ে নেয় তাকে 'মূলতাকিত' বলে। আল্লামা ইবনে হায্‌ম (র)-এর মতে কোন ব্যক্তি রাস্তায় পরিত্যক্ত শিশু দেখতে পেলে তাকে তুলে নিয়ে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করা তার অবশ্য কর্তব্য। তা একটা পুণ্যের কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "তোমরা পুণ্য ও আল্লাহভীতিমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপাচার ও সীমালংঘনমূলক কাজে সহযোগিতা করো না" (সূরা মাইদা ঃ ২)। মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ "আর যদি কেউ কাউকে জীবন দান করে, তবে সে যেন গোটা মানবজাতিকে জীবন দান করলো" (সূরা মাইদা ঃ ৩২)। সে যদি তাকে তুলে না নেয় এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় শিশুটি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ঐ ব্যক্তি চরম গুনাহগার হবে। কেননা সে একটি নিষ্পাপ শিশুকে অনাহারে, অতি ঠাণ্ডায় বা গরমে মরে যেতে অথবা হিংস্র প্রাণী কর্তৃক নিহত হতে দিয়েছে। এইজন্য সে নিঃসন্দেহে ইচ্ছাকৃতভাবে মানব হত্যাকারী। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, তাকে আল্লাহও অনুগ্রহ করেন না" (আল-মুহাল্লা, ৯খ, পৃ. ১৬২-৬)।

লাকীত-এর রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। মূলতাকিত বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি তার লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে

২. অনুচ্ছেদ ঃ শুফ্আর বর্ণনা।[২]

৮৫৫- اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ اِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ فِىْ اَرْضٍ فَلاَ شُفْعَةَ فِيْهَا وَلاَ شُفْعَةَ فِىْ بِيْرٍ وَلاَ فِىْ فَحْلِ نَخْلٍ .

৮৫৫। আবু বাক্র ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (র) থেকে বর্ণিত। উছমান ইবনে আফ্ফান (রা) বলেন, জমীর সীমা চিহ্নিত করার রাস্তা নির্মিত হয়ে যাওয়ার পর আর শুফআর দাবি করা যায় না। কূপ ও খেজুরের বাগানে শুফআর দাবি (right of preemption) চলে না।

তবে সরকার তার উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই তাকে বিধর্মীদের কাছে অর্পণ করা জায়েয নয়। সুলায়ম গোত্রের সুনায়ন ইবনে জামীলা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র খিলাফতকালে একটি মানবূয (পরিত্যক্ত শিশু) পেলেন। তিনি বলেন, আমি তা নিয়ে উমার ((রা)-র নিকট গেলাম। তিনি বলেন, কেন তুমি তা তুলে আনলে? আমি বললাম, তা পতিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, তাই আমি তুলে নিয়েছি। উমার (রা)-র ইররীফ (যে মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেয়) তাকে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! সুনায়ন একজন ভালো লোক। উমার (রা) বলেন, তাই? সে বললো, হাঁ। তিনি সুনায়নকে বলেন, যাও, সে মুক্ত-স্বাধীন, তুমি তার উত্তরাধিকারী এবং তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমাদের (সরকারের) উপর।

হাদীসটি মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদে ইমাম শাফিঈ, আবদুর রায্যাকের মুসান্নাফ, তাবারানীর মুজাম ও বায়হাকীর আল-আরিফা গ্রন্থে উল্লেখ আছে। শেষোক্ত গ্রন্থে আছে, উমার (রা) বলেন, "বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) হতে তার ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব আমাদের।" সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)–র নিকট কোন পরিত্যক্ত শিশু নিয়ে এলে তিনি তার ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ ও খাদ্য বরাদ্দ করতেন এবং অভিভাবককে তার সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। অভিভাবক প্রতি মাসে তার বরাদ্দকৃত অর্থ ও খাদ্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে তুলে নিতো। তার দুধ পানের ব্যয়ভারও তিনি বাইতুল মাল হতে বরাদ্দ করতেন।

তামীম নামক এক ব্যক্তি একটি পরিত্যক্ত শিশুসহ 'আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র নিকট আসলো। তিনি তামীমকে তার লালন-পালনের দায়িত্ব দিলেন এবং তার জন্য মাসিক ১০০ দিরহাম বরাদ্দ করলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি একটি ব্যভিচারজাত শিশুকে মাসিক ১০০ দিরহামের বিনিময়ে লালন-পালনের দায়িত্ব তামীমের উপর অর্পণ করেন।

পরিত্যক্ত শিশুর সাথে মালপত্র পাওয়া গেলে তা তারই হবে। তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যয়ভারও সরকারকে বহন করতে হবে। লাকীত যদি কন্যা সন্তান হয় তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার বিবাহের ব্যয়ভারও সরকারকে বহন করতে হতে, এমনকি তার মোহরানাও সরকারকেই পরিশোধ করতে হবে (অনুবাদক)।

২. শুফআ (الشفعة) শব্দের অর্থ মিলানো, মিশানো ও মিশ্রিতকরণ। এর পারিভাষিক অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তির অংশীদার বা প্রতিবেশী হওয়ার কারণে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি হওয়ার সময় তা ক্রয়ের অগ্রাধিকার লাভ। অংশীদারের ক্ষতি দমন করার উদ্দেশ্যে ইসলামী শরীআত শুফআর অধিকার দান করেছে। স্থাবর সম্পত্তি, ঘর-বাড়ী এবং জায়গা-জমির মধ্যে শুফআর অধিকার সীমাবদ্ধ। ইমাম শাফিঈর মতে, কেবল অংশীদারেরই শুফআর দাবি করার অধিকার আছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে, নিকট প্রতিবেশীরও এই অধিকার রয়েছে (অনুবাদক)।

٨٥٦- عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى بِالشُّفْعَةِ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيْهِ .

৮৫৬। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন জমীর ক্ষেত্রে শুফআর ফয়সালা দিয়েছেন, যা এখনো ভাগ হয়নি। ভাগ হয়ে সীমারেখা পড়ে গেলে তাতে আর শুফআর দাবি চলে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য সম্বলিত হাদীস এসেছে। প্রতিবেশীর তুলনায় শরীকদার এবং অন্যদের তুলনায় প্রতিবেশী শুফআর অধিক হকদার। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস রয়েছে।

٨٥٧- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِىُّ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ الشَّرِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِصَقَبِهِ .

৮৫৭। আশ-শারীদ ইবনে সুওয়াইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রতিবেশী শুফআর অধিক হকদার।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণেরও এই মত।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুকাতাব গোলামের বর্ণনা।[৩]

٨٥٨- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبِهِ شَيْئٌ .

৮৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, চুক্তির অর্থ সামান্য বাকি থাকা পর্যন্তও মুকাতাব গোলাম-দাসই থাকবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের সকল ফিক্‌হবিদের এই মত। সে সাক্ষ্য, হদ্দ প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু সে যতোক্ষণ মুকাতাব গোলাম থাকবে তার মালে মনিবের কোন অধিকার বর্তাবে না।

٨٥٩- اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ الْمَكِّىُّ اَنَّ مُكَاتَبًا لاِبْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَدُيُوْنَ النَّاسِ وَتَرَكَ ابْنَةً فَاَشْكَلَ عَلٰى عَامِلِ مَكَّةَ

---

৩. যে গোলাম মনিবের সাথে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা মাল দিতে পারলে দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে, তাকে মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ) গোলাম বলে। চুক্তির সমুদয় অর্থ পরিশোধ করার পর সে দাসত্বমুক্ত হয় (অনুবাদক)।

الْقَضَاءُ فِي ذٰلِكَ فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْئَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنِ ابْدَأْ بِدُيُوْنِ النَّاسِ فَاقْضِهَا ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَّالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيْهِ .

৮৫৯। হুমাইদ ইবনে কায়েস আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত। আব্বাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিলের একটি মুকাতাব গোলাম মক্কায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার যিম্মায় চুক্তির কিছু অর্থ এবং অন্যদের কিছু পাওনা বাকি ছিল। ওয়ারিস হিসাবে সে একটি কন্যা সন্তান রেখে যায়। তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া মক্কার গভর্ণরের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তিনি এ সম্পর্কে সমাধান জিজ্ঞেস করে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কাছে পত্র পাঠান। আবদুল মালেক তাকে লিখে পাঠান, প্রথমে তার ঋণ পরিশোধ করো, অতঃপর দাসত্বমুক্তির চুক্তিপত্রের অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ করো, অতঃপর যে মাল অবশিষ্ট থাকবে তা তার মেয়ে ও মনিবদের মধ্যে বণ্টন করো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের ফিক্হবিদ সাধারণও এই মত গ্রহণ করেছেন। মুকাতাব গোলাম মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে, অতঃপর দাসত্বমুক্তির চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে হবে, অতঃপর অবশিষ্ট সম্পত্তি তার স্বাধীন ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।

٨٦٠- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عِنْدِيْ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ وَعَلٰى وَلَدِهِ ثُمَّ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ بَنِيْنَ أَيَسْعَوْنَ فِيْ مُكَاتَبَةِ أَبِيْهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيْدٌ فَقَالَ لاَ بَلْ يَسْعَوْنَ فِيْ كِتَابَةِ أَبِيْهِمْ وَلاَ يُوْضَعُ عَنْهُمْ لِمَوْتِ أَبِيْهِمْ شَيْئٌ .

৮৬০। ইমাম মালেক (র) বলেন, একজন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণিত। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের এবং সুলায়মান ইবনে ইয়াসারের কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন গোলাম নিজের ও নিজ সন্তানের দাসত্ব মোচনের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অতঃপর সে মারা যায় এবং তার পুত্রগণ জীবিত থাকে। এখন তারা কি নিজেদের পিতার চুক্তির অর্থ পরিশোধ করবে না তারা গোলামই থেকে যাবে? তারা উভয়ে বলেন, তাদের পিতার চুক্তির অর্থ পরিশোধ করতে হবে। তাদের পিতার মৃত্যুর কারণে তাদের উপর থেকে এ দায়িত্ব অপসারিত হবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি এবং ইমাম আবু হানীফারও এই মত। তারা চুক্তির সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করার পর দাসত্বমুক্ত হবে।

٨٦١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا مُخْبِرٌ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُقَاطِعُ مَكَاتِبِيْهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

৮৬১। ইমাম মালেক (র) বলেন, এক ব্যক্তি আমাদের অবহিত করেছেন যে, নবী ﷺ -এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) নিজের মুকাতাব গোলামের কাছ থেকে চুক্তির কিছু অর্থ নগদ আদায় করে নিতেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা।

٨٦٢- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ إِذَا دَخَلُوْا فِيْهَا مُحَلِّلاً إِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْئٌ.

৮৬২। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবকে বলতে শুনেছি, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় কোন দোষ নেই, যদি চুক্তি এরূপ হয় যে, প্রতিযোগিতায় জিতলে প্রতিশ্রুত অর্থ পাওয়া যাবে, আর হেরে গেলে কোন জরিমানা দিতে হবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে যে জিনিসটি নিষিদ্ধ তা হচ্ছে, 'প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি পক্ষ যদি চুক্তি করে যে, তোমার ঘোড়া বিজয়ী হলে প্রতিযোগিতার অর্থ তুমিই পাবে। আর আমার ঘোড়া বিজয়ী হলে তা আমি পাবো।' কিন্তু যদি এক পক্ষ থেকে চুক্তি হয় অথবা প্রতিযোগীর সংখ্যা তিনজন হয় এবং দুইজনের পক্ষ থেকে চুক্তি হয় ও তৃতীয়জনের পক্ষ থেকে কোন চুক্তি না হয়, তবে এই ধরনের প্রতিযোগিতা জায়েয। অর্থাৎ একপক্ষ বললো, তোমার ঘোড়া বিজয়ী হলে এই অর্থ তুমিই পাবে, আর তোমার ঘোড়া হেরে গেলে তোমাকে কিছুই দিতে হবে না অথবা দুইজন তৃতীয় জনকে ঐ কথা বললো এবং তৃতীয়জন বিজয়ী হয়ে তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত অর্থ নিলো অথবা সে পরাজিত হলো, কিন্তু তাকে কিছুই দিতে হলো না, এ ধরনের প্রতিযোগিতা জায়েয।[৪] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) প্রতিযোগিতার চুক্তি বলতে এ কথাই বুঝিয়েছেন।

---

৪. যে কোন প্রতিযোগিতা একদিক থেকে শর্ত হলে বা শর্ত না থাকলে তা জায়েয। যেমন একজন বললো, তুমি বিজয়ী হলে এই অর্থ তুমি পাবে, আর পরাজিত হলে তোমাকে কিছু দিতে হবে না, এটা জায়েয। কিন্তু যদি বলা হয়, তুমি জিতলে এই পরিমাণ অর্থ আমি তোমাকে দিবো আর আমি জিতলে তুমি আমাকে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ দিবে, এই প্রতিযোগিতা জায়েয নয় (আল-মুহীত, আয-যাখীরা) (অনুবাদক)

٨٦٣- أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ اِنَّ الْقَصْوَاءَ نَاقَةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَسْبِقُ كُلَّمَا وَقَعَتْ فِيْ سِبَاقٍ فَوَقَعَتْ يَوْمًا فِيْ اِبِلٍ فَسُبِقَتْ فَكَانَتْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ (الْمُؤْمِنِيْنَ) كَابَةً اَنْ سُبِقَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَفَعُوْا شَيْئًا اَوْ اَرَادُوْا رَفْعَ شَيْءٍ وَضَعَهُ اللّٰهُ .

৮৬৩। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছেন, নবী ﷺ -এর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রী যখনই দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো, সর্বাগ্রে লক্ষ্যস্থলে পৌছে যেতো। একদিন দৌড় প্রতিযোগিতায় তা পিছনে পড়ে যায়। তার হেরে যাওয়ার কারণে মুসলমানগণ ব্যথিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "লোকেরা যখন কোন জিনিসকে উচ্চ করে দেয় বা দিতে চায়, আল্লাহ তাআলা তাকে নিচু করে দেন (মুরসাল হাদীস)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস গ্রহণ করেছি। তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা, ঘোড়া, খচ্চর, উট প্রভৃতির দৌড় প্রতিযোগিতায় কোন দোষ নেই।

অধ্যায় ঃ ১৭

اَبْوَابُ الْمُخْتَلِفَةِ

(বিবিধ প্রসঙ্গ)

[এ অধ্যায়ের হাদীসসমূহ মূল গ্রন্থে কিতাবুল লুকতাহ (হারানো প্রাপ্তি) অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এতে বিবিধ বিষয় সম্বলিত হাদীস আনা হয়েছে। শিরোনামের সাথে হাদীসের বিষয়বস্তুর কোন মিল না থাকায় পাঠকদের সুবিধার্থে আমি "বিবিধ প্রসংগ" অধ্যায় শিরোনাম যোগ করে তার অধীন বিভিন্ন বিষয়ের হাদীসসমূহ নিয়ে এসেছি। প্রয়োজনবোধে কোন কোন স্থানে উপ-শিরোনামও যোগ করেছি। অপরদিকে সূদ সম্পর্কিত অধ্যায়টি ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছি (অনুবাদক)]

বিবিধ প্রসঙ্গ

যুদ্ধাভিযান সংক্রান্ত বর্ণনা

১. অনুচ্ছেদ ঃ পাপের পরিণতি।

٨٦٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِىْ قَوْمٍ قَطُّ اِلاَّ اُلْقِىَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبُ وَلاَ فَشَا الزِّنٰى فِىْ قَوْمٍ قَطُّ اِلاَّ كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلاَ نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلاَّ قُطِعَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقُ وَلاَ حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ اِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الدَّمُ وَلاَ خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ اِلاَّ سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ .

৮৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে জাতির মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমাত) আত্মসাৎ করার প্রবণতা দেখা দেয়, সে জাতির অন্তরে আল্লাহ তাআলা ভয়ভীতি ও কাপুরুষতা সৃষ্টি করে দেন। যে জাতির মধ্যে যেনা-ব্যভিচারের বিস্তার ঘটে, তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। যে জাতি ওজন-পরিমাপে ফাঁকি দেয় তাদের রিযিক কমতে থাকে। আর যে জাতি (বিচারের বেলায় মীমাংসার ক্ষেত্রে) অন্যায় রায় দেয়, তাদের মধ্যে বিবাদ-বিশৃংখলা, অরাজকতা, রক্তপাত ও খুন-খারাবি বৃদ্ধি পায়। যে জাতি চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভংগ করে, তাদের উপর শত্রুদের বিজয়ী করে দেয়া হয়।

٨٦٥- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا اِبِلاً كَثِيْرَةً فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا .

৮৬৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজ্দ এলাকায় একটি ক্ষুদ্র সামরিক বাহিনী পাঠালেন। তারা গনীমাত হিসাবে অনেক উট পেলো। তাদের প্রত্যেকের ভাগে বারোটি উট পড়লো এবং তাদেরকে আরো একটি করে উট অতিরিক্ত দেয়া হলো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, নফল (অর্থাৎ গনীমাতের মাল থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ) দেয়ার অধিকার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য সংরক্ষিত ছিল। তিনি এর এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) থেকে অভাবী লোকদের দিতেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ .

"বলো, এই গনীমাতের মাল তো আল্লাহ ও রাসূলের" (৮ ঃ ১)।

বর্তমান কালে গনীমাতের মাল বণ্টিত হওয়ার পর আর অতিরিক্ত দেয়া যাবে না। শুধু খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) থেকে অভাবী লোকদের দেয়া যাবে।

২. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় কোন জিনিস দেয়ার বর্ণনা।

٨٦٦- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِى الشَّيْئَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَاِذَا بَلَغَ رَاْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ .

৮৬৬। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তার কাছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে আল্লাহ্‌র পথে কোন জিনিস দান করে। তিনি উত্তরে বলেন, তা যুদ্ধের মাঠ পর্যন্ত পৌছে গেলে এটা যাকে দান করা হয়েছে তার মালিকানাভুক্ত হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের মত। ইবনে উমার (রা) বলেন, ওয়াদিল কুরা (وادى القرى) পর্যন্ত পৌছে গেলেই দানকৃত জিনিস প্রদাতার হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আমাদের অপরাপর ফিক্‌হবিদের মতে, দাতা তা প্রদাতার হাতে হস্তান্তর করার সাথে সাথে তার মালিকানায় চলে যাবে।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের আনুগত্য প্রত্যাহার করার ব্যাপারে তিরস্কার এবং জামাআতবদ্ধ থাকার ফযীলাত।

٨٦٧- عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَخْرُجُ فِيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلٰوتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَاَعْمَالَكُمْ مَعَ اَعْمَالِهِمْ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ تَنْظُرُ فِى النَّصْلِ فَلاَ تَرٰى شَيْئًا تَنْظُرُ فِى الْقَدْحِ فَلاَ تَرٰى شَيْئًا تَنْظُرُ فِى الرِّيْشِ فَلاَ تَرٰى شَيْئًا وَّتَتَمَارٰى فِى الْفَوْقِ .

৮৬৭। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি (আবু সাঈদ) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের নামায এবং যাদের আমলের তুলনায় তোমাদের আমল তোমাদের কাছে তুচ্ছ মনে হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে না। তারা দীন ইসলাম থেকে এতো দ্রুত বিচ্যুত হবে যেভাবে ধনুক থেকে বাজির তীর দ্রুত ছুটে যায়। তুমি (তীর নিক্ষেপকারী) তীরের ফলার দিকে তাকাবে, কিন্তু কিছুই দেখবে না, অতঃপর পালকহীন তীরের দিকে তাকাবে কিন্তু কিছুই দেখবে না, অতঃপর তীরের পালকের দিকে তাকাবে কিন্তু কিছুই দেখবে না এবং শেষে নিম্নভাগে কিছু পাওয়ার জন্য সন্দেহ পোষণ করবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করি। ইমামের আনুগত্য প্রত্যাহার করে নেয়া বা বিদ্রোহ করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন করা অত্যাবশ্যক।

٨٦٨- اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

৮৬৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলমানদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের কেউ নয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে এবং অস্ত্র সজ্জিত হয়ে আসলে, তাকে অন্য কোন ব্যক্তি হত্যা করলে তার কিছুই হবে না (কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড হবে না)। কেননা সে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে এসে নিজের রক্তপাতকে বৈধ করে দিয়েছে।

٨٦٩- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنِى يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ اَوْ اُحَدِّثُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ كَثِيْرٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ اِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَاِيَّاكُمْ وَالْبِغْضَةَ فَاِنَّمَا هِىَ الْحَالِقَةُ .

৮৬৯। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছেন, আমি কি তোমাদের এমন জিনিস সম্পর্কে অবহিত করবো না বা বলে দিবো না, যা (নফল) নামায এবং দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম? লোকেরা বললো, হাঁ, বলুন। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তির মাঝে সন্ধি স্থাপন করে দেয়া। আর তোমরা ক্রোধ সংবরণ করো। কেননা তা ধ্বংসকারী।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের হত্যা করা নিষেধ।

٨٧٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى فِىْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ امْرَاَةً مَقْتُوْلَةً فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ وَنَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .

৮৭০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন যুদ্ধে এক নিহত স্ত্রীলোক দেখতে পেলেন। তিনি এটাকে (নারীহত্যা) অপছন্দ করেন এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। যুদ্ধে নারী, শিশু ও থুনখুনে বৃদ্ধদের হত্যা করা নিষেধ। তবে যুদ্ধে লিপ্ত নারীদের হত্যা করা জায়েয।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীর বর্ণনা।

٨٧١- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ قِبَلِ اَبِىْ مُوْسٰى فَسَئَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَاَخْبَرَهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ

عِنْدَكُمْ مِنْ مُغْرِبَةٍ خَبَرٌ قَالَ نَعَمْ رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ اِسْلاَمِهِ فَقَالَ مَاذَا فَعَلْتُمْ بِهِ قَالَ قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ قَالَ عُمَرُ فَهَلاَّ طَبَّقْتُمْ عَلَيْهِ بَيْتًا ثَلاَثًا وَاَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيْفًا فَاسْتَتَبْتُمُوْهُ لَعَلَّهُ يَتُوْبُ وَيَرْجِعُ اِلَى اَمْرِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَمْ اٰمُرْ وَلَمْ اَحْضُرْ وَلَمْ اَرْضَ اِذْ بَلَغَنِىْ .

৮৭১। আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল কারী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুহাম্মাদ) বলেন, আবু মূসা আশআরী (রা)-র পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে এলো। তিনি তার কাছে ওখানকার লোকদের হাল-অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। সে এ সম্পর্কে তাকে অবহিত করলো। উমার (রা) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কি নতুন কোন খবর আছে? সে বললো, হাঁ, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছে। তিনি বলেন, তোমরা তার সাথে কি ব্যবহার করেছো? সে বললো, আমরা তাকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করেছি। তিনি বলেন, কেন তোমরা তাকে তিন দিন একটি ঘরে বন্দী করে রাখলে না, প্রতিদিন তাকে আহার করাতে, তাকে তওবা করতে বলতে, হয়তো সে তওবা করতো এবং পুনরায় আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসতো? (অতঃপর তিনি বলেন), হে আল্লাহ! আমি (তাদের) এই নির্দেশ দেইনি, আমি উপস্থিতও ছিলাম না এবং আমার নিকট খবর পৌছলে তাতে আনন্দিতও হইনি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করলে তিন দিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে পারেন, যদি তার তওবা করার কোন সম্ভাবনা থাকে অথবা মুরতাদ নিজে তার কাছে এজন্য আবেদন করে। যদি তার তওবা করার কোন আশা না থাকে এবং সেও কোন আবেদন না করে, এ অবস্থায় তাকে (অবকাশ না দিয়ে) হত্যা করলে কোন দোষ নেই।[১]

---

১. মুরতাদ (مرتد) ঃ যে ব্যক্তি দীন ইসলাম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে কাফের অথবা নাস্তিক হয়ে যায় তাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) বলে। কুরআন মজীদে মুরতাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

“তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার দীন থেকে ফিরে যাবে এবং কুফরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করবে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে। এ ধরনের সব লোকই জাহান্নামী হবে এবং চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে” (সূরা বাকারা ঃ ২১৬)।

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ .

"হেদায়াতের পথ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যারা তা থেকে ফিরে গেছে, তাদের জন্য শয়তান এই আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাংখার মোহ তাদের জন্য দীর্ঘ করে রেখেছে" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২৫)।

যে ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরে যায়, ইসলামী আইনে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত আছে। মুরতাদের শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ .

"যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে তাকে হত্যা করো" (বুখারী ঃ কিতাবুল জিহাদ, ইতিসাম, ইসতাতাবা; আবু দাউদ ঃ কিতাবুল হুদূদ; তিরমিযী ঃ হুদূদ; নাসাঈ ঃ তাহরীম; ইবনে মাজা ঃ হুদূদ; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ঃ কিতাবুল আকদিয়া; মুসনাদে আহমাদ ঃ ১ম ও ৫ম খণ্ড)। হাদীসটি হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক, উছমান, আলী, মুআয ইবনে জাবাল, আবু মূসা আশআরী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, খালিদ ইবনে ওলীদ, যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) এবং আরো অনেক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের প্রায় সবগুলো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনটি কারণের কোন একটি ছাড়া তার রক্তপাত করা (হত্যা করা) হালাল নয়। কারণ তিনটি হচ্ছে ঃ অবৈধভাবে কাউকে হত্যা করলে, বিবাহিত অবস্থায় যেনা করলে এবং নিজের দীন ও জামাআত থেকে পৃথক হয়ে গেলে (তার উপর হত্যার দণ্ড কার্যকর হবে)" (বুখারী ঃ কিতাবুদ দিয়াত, মুসলিম ঃ কিতাবুল কাসামা ওয়াল মুহারিবীন ওয়াল কিসাস ওয়াদ দিয়াত; আবু দাউদ ঃ কিতাবুল হুদূদ)।

হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত উছমান (রা)-র সূত্রে নাসাঈ গ্রন্থে (বাব ঃ যিকরি মা ইয়াহিল্লু বিহি দামাল-মুসলিম) অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস উল্লেখ আছে। হযরত উছমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "তিনটি অপরাধের কোন একটিতে লিপ্ত না হলে কোন মুসলমানকে হত্যা করা হালাল নয়। বিবাহিত লোক যেনা করলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে, কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে হত্যা করলে তাকে কিসাস স্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এবং কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর তা পরিত্যাগ করলে তাকে হত্যা করবে" (নাসাঈ ঃ বাবুল হুকমি ফিল মুরতাদ)।

আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাকে ইয়ামনের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠান, অতঃপর মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে সহকারী হিসাবে পাঠান। তিনি সেখানে পৌঁছে বলেন, হে জনগণ! আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের দূত হিসাবে তোমাদের কাছে এসেছি। আবু মূসা (রা) তাকে হেলান দিয়ে বসার জন্য একটি বালিশ দিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো। সে পূর্বে ইহূদী ছিলো, অতঃপর মুসলমান হয়, অতঃপর ইহূদী ধর্মে ফিরে যায়। মুআয (রা) বলেন, এই ব্যক্তিকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি বসবো না। তার সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এই নির্দেশ রয়েছে। তিনি কথাগুলো তিনবার বলেন। অবশেষে তাকে হত্যা করা হলে তিনি আসন গ্রহণ করেন" (নাসাঈঃ বাব হুকমিল মুরতাদ; বুখারীঃ বাব হুকমিল মুরতাদ; আবু দাউদ ঃ কিতাবুল হুদূদ)।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। উহূদ যুদ্ধের দিন (মুসলমানদের পরাজয় হলে) একটি স্ত্রীলোক মুরতাদ হয়ে যায়। তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন ঃ "তাকে তওবা করাতে হবে। যদি সে তাতে সম্মত না হয় তবে তাকে হত্যা করবে" (বায়হাকী)।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। "উম্মে রুমান (অথবা উম্মু মারওয়ান) নাম্নী একটি স্ত্রীলোক মুরতাদ হয়ে যায়। নবী ﷺ তার সামনে ইসলাম পেশ করার নির্দেশ দিলেন। যদি সে তওবা করে তো ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করবে" (বায়হাকী, দারু কুতনী)। বায়হাকীর অপর বর্ণনায় আছে, "সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। অতএব তাকে হত্যা করা হলো।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনে আবু সাররাহ এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সচিব ছিলো। অতঃপর শয়তান তার পদস্খলন ঘটায় এবং সে (মক্কার) কাফেরদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। কিন্তু পরে হযরত উসমান (রা) তার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার আবেদন মঞ্জুর করেন" (আবু দাউদ ঃ কিতাবুল হুদূদ)। এই একই হাদীস কিছু শাব্দিক পার্থক্য সহকারে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র সূত্রে আবু দাউদের একই অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আছে।

মুরতাদের বিরুদ্ধে খোলাফায়ে রাশেদার কর্মনীতি

হযরত আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-র খিলাফতকালে উম্মে কারফা নাম্নী একটি মেয়েলোক মুরতাদ হয়ে যায়। তিনি তাকে তওবা করার নির্দেশ দেন (দারু কুতনী, বায়হাকী)।

মিসরের গভর্ণর আমর ইবনুল আস (রা) খলীফা উমার (রা)-কে লিখে পাঠান যে, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় কাফের হয়ে গেছে। সে আবার ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফের হয়ে গেছে। সে কয়েকবার এরূপ করেছে। এখন তার ইসলামকে গ্রহণ করা হবে কি না? তিনি জবাবে লিখে জানালেন, আল্লাহ যতোক্ষণ তাকে ইসলাম কবুল করান, তোমরাও ততোক্ষণ তার ইসলাম গ্রহণ করতে থাকো। তার সামনে ইসলামকে তুলে ধরো। তা মেনে নিলে তাকে ছেড়ে দাও, অন্যথায় হত্যা করো (কানযুল উম্মাল)।

কুফায় মুসায়লামা কাযযাবের দাবি প্রচার করার অপরাধে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলো। হযরত উসমান (রা)-কে এ সম্পর্কে লেখা হলে তিনি জবাব দেন যে, তাদের সামনে দীনে হক এবং কলেমা শাহাদাত পেশ করা হোক। যে ব্যক্তি তা কবুল করবে এবং মুসায়লামাকে পরিত্যাগ করবে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। আর যে ব্যক্তি মুসায়লামার দাবির উপর অবিচল থাকবে তাকে হত্যা করবে (তাহাবী ঃ কিতাবুস সিয়ার)।

হযরত আলী (রা)-র সামনে এক ব্যক্তিকে হাযির করা হলো। সে পূর্বে খৃস্টান ছিলো, পরে ইসলাম গ্রহণ করে, অতঃপর মুরতাদ হয়ে যায় (পূর্ব ধর্মে ফিরে যায়)। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার এরূপ করার কারণ কি? সে জবাবে বললো, আমি তোমাদের ধর্মের তুলনায় খৃস্টান ধর্ম উত্তম পেয়েছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, ঈসা (আ) সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? সে বললো, তিনি আমার রব অথবা বললো, তিনি আলীর রব। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন (তাহাবী ঃ কিতাবুস সিয়ার)।

এ ধরনের আরো বহু দৃষ্টান্ত হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। ফাতহুল বারী (খণ্ড ১২, পৃ. ২৩৮, ২৩৯) এবং কানযুল উম্মাল (খণ্ড ১, পৃ. ৮) গ্রন্থদ্বয়ে এ ধরনের আরো দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে। আরবের বিভিন্ন গোত্রের মুরতাদদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বাক্র (রা) ১১টি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তার প্রতিটি বাহিনীর অধিনায়কের হাতে তিনি

ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে যে নির্দেশমালা দিয়েছিলেন, তা হাফেয ইবনে কাছীরের আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে (খণ্ড ৬, পৃ. ৩১৬) হুবহু উল্লেখ আছে।

ফিক্‌হের ইমাম ও মুজতাহিদগণের ঐক্যমত

মুরতাদের শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড এ ব্যাপারে ফিক্‌হের চার ইমামও একমত। শুধু তাই নয়, গত চৌদ্দ শত বছর ধরে গোটা উম্মাতের মুজতাহিদ ইমামগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে আসছেন। ইমাম মালেক (র)-এর মাযহাব তার মুওয়াত্তা গ্রন্থে এভাবে লেখা আছে ঃ

যায়েদ ইবনে আসলাম (রা)-র সূত্র পরম্পরায় ইমাম মালেক (র) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

مَنْ غَيَّرَ دِيْنَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ .

"যে ব্যক্তি নিজের দীন পরিবর্তন করে (ইসলাম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে) তার ঘাড় উড়িয়ে দাও।"

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম মালেক (র) লিখেছেন, "আমরা যতোদূর অনুধাবন করতে পেরেছি, তাতে নবী ﷺ-এর এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে গিয়ে অন্য ধর্মের অনুসারী হয়ে যায়, কিন্তু তা গোপন রেখে ইসলামের কথা প্রকাশ করে, তার এ অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে হত্যা করতে হবে এবং তওবা করার আহ্বান জানানোর প্রয়োজন নেই। কেননা এ ধরনের লোকের তওবার উপর নির্ভর করা যায় না। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে দীন ইসলাম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্মের অনুসারী হয়ে যায়, তাকে প্রথমে তওবা করে ফিরে আসার আহ্বান জানাতে হবে। সে যদি তওবা করে তো ভালো, অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে" (কিতাবুল আকদিয়া, বাবুল কাদা ফী মান ইরতাদ্দা আনিল ইসলাম)।

হাম্বলী মাযহাবের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ফিক্‌হের গ্রন্থ আল-মুগনী (المغنى)-তে লেখা আছে ঃ "ইমাম আহমাদের মত এই যে, যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক নারী অথবা পুরুষ সজ্ঞানে ইসলাম গ্রহণ করার পর তা পরিত্যাগ করে, তবে তাকে তওবা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসার জন্য তিন দিনের অবকাশ দিতে হবে। অতঃপর সে যদি তওবা না করে তবে তাকে হত্যা করতে হবে। হাসান বসরী, যুহরী, ইবরাহীম নাখঈ, মাকহূল, হাম্মাদ, মালেক, লাইছ, আওযাঈ, শাফিঈ এবং ইসহাক ইবনে রাহ্‌ওয়ায়-এরও এই মত" (১০ খ., পৃ. ৭৪)।

হানাফী মাযহাবের ফিক্‌হ গ্রন্থ হিদায়ায় (الهداية) শাফিঈ মাযহাবের মত এভাবে তুলে ধরা হয়েছেঃ "ইমাম শাফিঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম (বা তার বিচার বিভাগ) মুরতাদকে তওবা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসার জন্য তিন দিনের অবকাশ দিবেন। গ্রেপ্তার করার সাথে সাথেই তাকে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা কোন মুসলমান সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হয়েও মুরতাদ হতে পারে। অতএব তাকে চিন্তা-ভাবনা করার কিছু সময়-সুযোগ অবশ্যই দেয়া উচিৎ। আর এজন্য আমরা তিন দিনের অবকাশই যথেষ্ট মনে করি" (বাব ঃ আহকামিল মুরতাদ্দীন)।

এ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের রায় ইমাম তাহাবী তার শারহু মাআনিল আছার(شرح معانى الاثار) গ্রন্থে এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ "ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে যাওয়া (মুরতাদ) ব্যক্তি সম্পর্কে উম্মাতের ফিক্‌হবিদদের মধ্যে কেবল এ বিষয় মতভেদ আছে যে, তাকে তওবা করার সুযোগ দেয়া হবে কি না। একদল ফিক্‌হবিদ বলেন, ইমাম যদি তাকে তওবা করে ফিরে আসতে বলেন, তবে এটা খুবই ভালো। অতঃপর সে যদি তওবা করে তবে তাকে ছেড়ে দিতে হবে, অন্যথায় হত্যা করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (র) উপরোক্ত মত ব্যক্তকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অপর দল বলেন, তাকে তওবা করে ফিরে আসার আহ্বান জানানোর প্রয়োজন নেই।

পোশাক-পরিচ্ছদ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ রেশমী বস্ত্র পরিধান (পুরুষদের জন্য) নিষিদ্ধ।

৮৭২- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَاٰى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هٰذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوُفُوْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَاَعْطٰى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِىْ حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَّا قُلْتَ قَالَ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ اَخًا لَهُ مِنْ اُمِّهِ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ .

তাদের মতে মুরতাদ এবং শত্রু রাষ্ট্রের কাফের দুশমনদের অবস্থা একই। শত্রু রাষ্ট্রের যেসব কাফের পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত পৌছে গেছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানোর কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য যাদের পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত পৌছেনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতে হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দীন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত মুরতাদ হয়েছে তাকে ইসলামের সঠিক ধারণা দেয়ার মাধ্যমে পুনরায় দীনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বুঝেশুনেই মুরতাদ হয়েছে তাকে তওবা করার আহ্বান না জানিয়েই হত্যা করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফের একটি কথাও এ মতের সমর্থক। তিনি 'কিতাবুল ইমলায়' লিখেছেন, আমি মুরতাদকে হত্যা করবো এবং তার কাছে তওবার দাবি করবো না। হাঁ, যদি সে নিজেই অবিলম্বে তওবা করে, তবে আমি তাকে ছেড়ে দিবো এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র হাতে ন্যস্ত করবো"

كتاب الاسير بحث استابة المرتد .

হিদায়া গ্রন্থে মুরতাদ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, "কোন ব্যক্তি ইসলাম থেকে ফিরে গেলে (العياذ بالله) তার সামনে ইসলামকে পেশ করতে হবে। এ ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ থাকলে তা দূরীভূত করার চেষ্টা করবে। কেননা তার কোন সংশয়ে পতিত হওয়াটা খুবই সম্ভব এবং আমাদের উচিৎ তার এই সংশয় দূর করে দেয়া। তাহলে তার একটি খারাপ পরিণতি (হত্যা) একটি শুভ পরিণতির (পুনর্বার ইসলাম গ্রহণ) দ্বারা দূর হতে পারে। কিন্তু প্রবীণ ফিক্‌হবিদদের মতে তার সামনে ইসলাম পেশ করা বাধ্যতামূলক নয়। কারণ সে ইসলামের দাওয়াত পূর্বেই পেয়ে গেছে" (বাব ঃ আহকামিল মুরতাদ্দীন)।

ইমাম আবু হানীফার মতে, স্ত্রীলোক মুরতাদ হলে তাকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিতে হবে।

এরপর আর কারো সন্দেহ-সংশয় অবশিষ্ট থাকার কথা নয় যে, ইসলামী আইনে মুরতাদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় এবং চার খলীফার শাসনামলে সুস্পষ্টভাবে এই আইন কার্যকর করা হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি। আর এই দীর্ঘ কালেও মুসলিম উম্মাতের ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মুরতাদের শাস্তি সম্পর্কে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে (অনুবাদক)।

৮৭২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদে নববীর দরজায় রেশমী কাপড় বিক্রি হতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যদি এই রেশমী বস্ত্র কিনে নিতেন এবং জুমুআর দিন ও প্রতিনিধিদল আগমন উপলক্ষে তা পরিধান করতেন। তিনি বলেন ঃ "আখেরাতে যাদের কোন অংশ নেই কেবল তারাই এই পোশাক পরতে পারে।" পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই ধরনের কতগুলো রেশমী কাপড় আসে। তিনি তা থেকে উমার (রা)-কে একটি কাপড় উপঢৌকন দেন। তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে এই কাপড় পরিধান করতে দিচ্ছেন অথচ ইতিপূর্বে আপনি উতারিদের (এক ব্যক্তির নাম) রেশমী কাপড় সম্পর্কে এই কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "আমি তো এ কাপড় তোমার পরিধানের জন্য দেইনি। অতএব উমার (রা) মক্কায় তার মুশরিক বৈপিত্রেয় ভাইকে তা দান করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মুসলিম পুরুষদের জন্য রেশমের যাবতীয় পোশাক এবং স্বর্ণালংকার পরিধান করা জায়েয্ নয়, চাই প্রাপ্তবয়স্ক হোক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক। কিন্তু মহিলাদের তা পরিধান করায় কোন দোষ নেই। অনন্তর শত্রু রাষ্ট্রের বা অমুসলিম রাষ্ট্রের মুশরিক নাগরিকদের তা উপঢৌকন দেয়ায়ও কোন দোষ নেই। কিন্তু তাদেরকে যুদ্ধাস্ত্র, লৌহবর্ম ইত্যাদি উপঢৌকন দেয়া জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্হবিদ সাধারণেরও এই মত।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের জন্য সোনার আংটি পরিধান নিষিদ্ধ।

٨٧٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اَلْبَسُ هٰذَا الْخَاتَمَ فَنَبَذَهُ وَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا قَالَ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ .

৮৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার একটি আংটি বানালেন। অতঃপর (একদিন মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে) বলেন ঃ "আমি এই আংটি পরিধান করতাম।" অতঃপর তিনি তা ফেলে দিয়ে বলেন ঃ "আমি আর কখনো তা পরিধান করবো না।"[২] উপস্থিত লোকজনও স্ব স্ব আংটি খুলে ফেলে দিলো।

---

২. বুখারী-মুসলিমের বর্ণনায় আরো আছে, "অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার আংটি বানিয়ে তা পরিধান করেন। লোকজনও রূপার আংটি বানিয়ে নেয়। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আবু বাক্র (রা) এই আংটি পরিধান করেন, অতঃপর উমার (রা), অতঃপর উছমান (রা)। অতঃপর তার থেকে তা আরীশ নামক কূপে পড়ে যায়।" অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তা আর পাওয়া যায়নি এবং এরপর থেকেই হযরত উছমান (রা)-র ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয় (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। পুরুষ লোকের জন্য সোনা, লোহা ও তামার আংটি ব্যবহার জায়েয নয়। তারা কেবল রূপার আংটি পরিধান করবে।[৩] কিন্তু স্ত্রীলোকদের জন্য সোনার আংটি পরিধান করায় কোন দোষ নেই।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ কারো পশুপালের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় মালিকের অনুমতি না নিয়ে দুধ দোহন করা।

٨٧٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحْتَلِبَنَّ اَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِءٍ بِغَيْرِ اِذْنِه اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تُؤْتٰى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيَنْتَقِلُ (فَيَنْقُلُ) طَعَامَهُ فَاِنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَتَهُمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِءٍ بِغَيْرِ اِذْنِه .

৮৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন অপর ব্যক্তির পশুর দুধ তার অনুমতি ব্যতীত দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, কোন ব্যক্তি তার খাদ্যশস্যের গোলায় প্রবেশ করে তা ভেংগেচুরে সেখান থেকে খাদ্যশস্য লুটে নিয়ে যাক? বরং এতে তোমরা দুঃখিতই হবে। তার পশুর পালের দুধ তার খাদ্য। অতএব তোমাদের কেউ যেন অপর কারো পশুর দুধ তার অনুমতি ছাড়া দোহন না করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। কোন ব্যক্তির পশুপালের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার অনুমতি না নিয়ে তার দুধ দোহন করা কারো পক্ষে জায়েয নয়। অনুরূপভাবে কারো খেজুর বাগান বা অন্য কোন ফলের বাগানের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় মালিকের অনুমতি ব্যতীত ফল ছিড়বেও না এবং খাবেও না। কিন্তু দুর্দশায় পতিত হলে মালিকের অনুমতি ব্যতীত দুধ দোহন করে পান করা বা ফল ছিড়ে খাওয়া যেতে পারে। তবে মালিককে বিনিময় দিবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

---

৩. আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলো। তার হাতের আংগুলে লোহার আংটি পরিহিত ছিলো। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "কি ব্যাপার! আমি তোমাকে দোযখীদের অলংকার পরিহিত দেখছি?" একথা শুনে সে আংটিটি ফেলে দিলো। অতঃপর সে একটি পিতল বা তামার আংটি পরে আসলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "কি ব্যাপার! আমি তোমার নিকট থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি?" এবারও সে আংটিটি ফেলে দিলো। অতঃপর সে একটি সোনার আংটি পরিধান করে এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "কি ব্যাপার! আমি তোমাকে বেহেশতবাসীদের অলংকার পরিহিত অবস্থায় দেখছি?" তখন সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কিসের আংটি পরবো? তিনি বলেন ঃ "রূপার আংটি, যার ওজন এক মিসকালের (সাড়ে চার মাসা বা অর্ধ তোলা) কম হবে" (আবু দাউদ, তিরমিযী) (অনুবাদক)।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীদের (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) মক্কা-মদীনায় প্রবেশ এবং তা নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা।

٨٧٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ لِلنَّصَارٰى وَالْيَهُوْدِ وَالْمَجُوْسِ بِالْمَدِيْنَةِ اِقَامَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَتَسَوَّقُوْنَ وَيَقْضُوْنَ حَوَائِجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ يُقِيْمُ بَعْدَ ذٰلِكَ .

৮৭৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইহূদী, খৃস্টান ও মাজূসীদের মদীনায় তিন দিন অবস্থান করার অনুমতি দিতেন, যাতে তারা নিজেদের কেনাকাটা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করে নিতে পারে। তাদের কেউই তিন দিনের অতিরিক্ত সময় মদীনায় অবস্থান করতো না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মক্কা-মদীনা এবং আশেপাশের এলাকা জাযীরাতুল আরবের অন্তর্ভুক্ত। আমরা নবী ﷺ-এর হাদীস থেকে জানতে পেরেছি, তিনি বলেছেন ঃ "আরব উপদ্বীপে পাশাপাশি দু'টি ধর্ম বর্তমান থাকবে না।" এ হাদীসের ভিত্তিতে হযরত উমার (রা) আরব উপদ্বীপ থেকে সেইসব লোকের উচ্ছেদ করেন যারা ছিলো অমুসলিম।

٨٧٦- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَبْقَيَنَّ دِيْنَانِ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ .

৮৭৬। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আরব উপদ্বীপে পাশাপাশি দু'টি ধর্মের অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকবে না।[৪]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই নির্দেশ বাণীকে পূর্ণরূপে কার্যকর করেছেন। তিনি ইহূদী-খৃস্টানদের আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করেছেন।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসা মাকরূহ।

٨٧٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لاَ يُقِيْمُ اَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَّجْلِسِهِ فَيَجْلِسُ فِيْهِ .

---

৪. এখানে হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা), আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে (অনুবাদক)।

৮৭৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ তোমাদের কেউ যেন অপর ব্যক্তিকে তার বসার স্থান থেকে তুলে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। কোন মুসলমানের পক্ষে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে এরূপ আচরণ করা মোটেই ঠিক নয় যে, সে তাকে তার বসার স্থান থেকে তুলে দিয়ে নিজে সেখানে বসবে।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ ঝাড়-ফুঁকের বর্ণনা।

٨٧٨- عَنْ عَمْرَةَ بِنْت عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ تَشْتَكِىْ وَيَهُوْدِيَّةٌ تَرْقِيْهَا فَقَالَ اِرْقِيْهَا بِكِتَابِ اللّٰهِ .

৮৭৮। আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) আয়েশা (রা)-র ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং এক ইহূদী মহিলা তাকে ঝাড়-ফুঁক করছিলো। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাব পড়ে তুমি তাকে ঝাড়-ফুঁক করো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। কুরআনের আয়াত পড়ে অথবা এমন কিছু পাঠ করে যার মধ্যে আল্লাহ্‌র যিকির রয়েছে, ঝাড়-ফুঁক করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কথার অর্থ বোধগম্য নয় তা দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা ঠিক নয়।

٨٧٩- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَ اُمِّ سَلَمَةَ وَفِى الْبَيْتِ صَبِىٌّ يَبْكِىْ فَذَكَرُوْا بِهِ الْعَيْنَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَلاَ تَسْتَرْقُوْنَ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ .

৮৭৯। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামা (রা)-র ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন ঘরে একটি শিশু কাঁদছিলো। লোকেরা বললো, তার উপর বদনজর লেগেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "বদনজর দূর হওয়ার দোয়া পড়ে তাকে ঝাড়-ফুঁক করো না কেন?"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। আমাদের মতে ঝাড়-ফুঁক করায় কোন দোষ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, এর মধ্যে আল্লাহ্‌র যিকির থাকতে হবে।

٨٨٠- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُثْمَانُ وَبِىْ وَجَعٌ حَتّٰى كَادَ يُهْلِكُنِىْ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِمْسَحْهُ بِيَمِيْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِىْ فَلَمْ اَزَلْ بَعْدُ اٰمُرُ بِهِ اَهْلِىْ وَغَيْرَهُمْ .

৮৮০। উছমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলেন। উছমান (রা) আরো বলেন, আমার ব্যথার ব্যারাম ছিলো। তাতে আমি প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তোমার ডান হাত দিয়ে ব্যথার স্থান সাতবার মালিশ করো এবং বলো, "আউযু বি-ইয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আজিদু।"[৫] অতএব আমি তাই করলাম এবং আল্লাহ তাআলা আমার ব্যথা দূর করে দিলেন। এরপর থেকে আমি নিজের পরিবার-পরিজনকে এবং অন্যদের এরূপ তদবীর করার পরামর্শ দিয়ে আসছি।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ ফাল গ্রহণ করা এবং ভালো নাম রাখা।

٨٨١- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلِقْحَةِ عِنْدَهُ مَنْ يَحْلُبُ هٰذِهِ النَّاقَةَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ فَقَالَ لَهُ مُرَّةٌ قَالَ اجْلِسْ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْلُبُ هٰذِهِ النَّاقَةَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ قَالَ حَرْبٌ قَالَ اجْلِسْ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْلُبُ هٰذِهِ النَّاقَةَ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ يَعِيْشُ قَالَ اُحْلُبْ .

৮৮১। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর নিকটে উপস্থিত একটি উষ্ট্রী সম্পর্কে বলেন ঃ উষ্ট্রীটি কে দোহন করবে? এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমার নাম কি? সে তাকে জানালো, মুররা। তিনি বলেন ঃ বসো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ উষ্ট্রীটি কে দোহন করতে পারে? এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নাম কি? সে বললো, হারব। তিনি বলেন ঃ বসো। তিনি পুনরায় বললেনঃ উষ্ট্রীটি কে দোহন করতে পারে? অপর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। তিনি বলেন ঃ তোমার নাম কি? সে বললো, ইয়াঈশ। তিনি বলেন ঃ দোহন করো।

পানাহারের শিষ্টাচার

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা।

٨٨٢- اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِشُرْبِ الْاِنْسَانِ وَهُوَ قَائِمٌ بَاْسًا .

৮৮২। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) এবং তাঁর অপর সাহাবী সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) মানুষের দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা দূষণীয় মনে করতেন না।

---

৫. "আমি আমার ব্যথার কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র সম্মান, মর্যাদা ও কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি" (অনুবাদক)।

٨٨٣- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنِىْ مُخْبِرٌ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ كَانُوْا يَشْرَبُوْنَ قِيَامًا .

৮৮৩। ইমাম মালেক (র) বলেন, এক ব্যক্তি আমাকে অবহিত করেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), উছমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) এবং আলী ইবনে আবু তালিব (রা) দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদেরও এই মত। দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করায় কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণেরও এই মত।[৬]

---

৬. দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করা এবং আহার করা সম্পর্কে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের হাদীস রয়েছে। নায্‌যাল (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কূফা মসজিদের দরজায় হযরত আলী (রা)-এর নিকট পানি আনা হলো। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করেন, অতঃপর বলেন, কোন কোন লোক দাঁড়িয়ে পানি পান করে না। তোমরা আমাকে যেরূপ করতে দেখলে, আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তদ্রূপ করতে দেখেছি" (বুখারী, আবু দাউদ)।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "নবী ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় যমযমের পানি পান করেছেন" (বুখারী, তিরমিযী)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা হাঁটতাম আর আহার করতাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করতাম" (তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার (পিতার) দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আমর) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়ানো ও বসা উভয় অবস্থায় পানি পান করতে দেখেছি" (তিরমিযী)।

অপরদিকে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। "রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন" (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মুসলিম)। সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ (রা) ও আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তিরমিযীতে আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসের শেষে আছে ঃ "অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, দাঁড়িয়ে আহার করার ব্যাপারে (আপনার কি মত)? তিনি বলেন ঃ তা তো আরো অধিক খারাপ।

আল-জারূদ ইবনে আলা (রা) থেকে বর্ণিত। "নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন" (তিরমিযী)।

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে দেখে বলেন ঃ পানি রেখে দাও। সে বললো, কেন? তিনি বলেন ঃ তোমাদের সাথে বিড়াল একত্রে পানি পান করলে তুমি কি খুশি হবে? সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ তোমার সাথে বিড়ালের চেয়েও নিকৃষ্ট জীব শয়তান পানি পান করেছে।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে একদল বিশেষজ্ঞ আলেম দাঁড়িয়ে পানি পান করা মাকরূহ বলেছেন এবং অপর দল জায়েয বলেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম বায়হাকী, নববী, আইনী, সুয়ূতী প্রমুখ ভারসাম্যপূর্ণ মত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ তানযিহী পর্যায়ের এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করার বৈধতা প্রকাশের জন্য তিনি দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন (অনুবাদক)।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ রূপার পাত্রে পান করা।

٨٨٤- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ .

৮৮৪। নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে চুমুকে চুমুকে দোযখের আগুন পান করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। সোনা-রূপার পাত্রে পানীয় পান করা মাকরূহ। তবে আমাদের মতে রূপা দিয়ে কারুকার্য করা পাত্রে পানি পান করায় দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণেরও এই মত।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতে পানাহার করা।

٨٨٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ .

৮৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন আহার করে, সে যেন ডান হাতে আহার করে এবং ডান হাতে পান করে। কেননা শয়তান বাঁ হাতে আহার করে এবং বাঁ হাতে পান করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। অসুস্থতা বা অন্য কোন সংগত কারণ ছাড়া বাঁ হাতের সাহায্যে পানাহার করা জায়েয নয়।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ নিজে পান করার পর ডান দিকের ব্যক্তিকে পান করতে দেয়া।

٨٨٦- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ ثُمَّ قَالَ الْيَمِينُ فَالْيَمِينُ .

৮৮৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দুধ আনা হলো। এর সাথে পানি মেশানো ছিলো। তার ডানপাশে ছিলো এক বেদুইন এবং বাঁপাশে ছিলেন আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)। তিনি দুধ পান করার পর বেদুইনকে পান করতে দিলেন, অতঃপর বলেন ঃ "ডান পাশের ব্যক্তি, অতঃপর ডান পাশের ব্যক্তি" (অর্থাৎ ডান পাশের ব্যক্তিকে দিতে হবে, অতঃপর সে পান করে তার ডান পাশের ব্যক্তিকে দিবে)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি।

٨٨٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ اَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اَتَاْذَنُ لِيْ فِيْ اَنْ اُعْطِيَهُ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ لَا اُوْثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ اَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ .

৮৮৭। সাহ্ল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ-এর সামনে পানীয় দ্রব্য আনা হলো। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডানপাশে ছিলো একটি যুবক ছেলে এবং বাঁপাশে ছিলো কয়েকজন প্রবীণ লোক। তিনি যুবককে বলেন, "তুমি কি এই পানীয় (তোমার আগে) এদের দেয়ার জন্য আমাকে অনুমতি দিবে?" সে বললো, আল্লাহ্র শপথ! আমি আপনার মুখ লাগানো জিনিসে (আমার আগে) অন্য কাউকে শরীক হতে দিবো না। রাবী বলেন, অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ পানপাত্রটি যুবকের হাতে দিলেন।[৭]

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ দাওয়াত কবুল করার ফযীলাত।

٨٨٨- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا .

৮৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কাউকে বিবাহ ভোজের অনুষ্ঠানে ডাকা হলে সে যেন তাতে অংশগ্রহণ করে।

٨٨٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِيْنُ وَمَنْ لَّمْ يَاْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৮৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, যে বিবাহ ভোজের অনুষ্ঠানে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের বাদ দেয়া হয়, তার চেয়ে নিকৃষ্ট কোন বিবাহভোজ নেই। যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না, সে প্রকারান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে।

٨٩٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ خَيَّاطًا دَعٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى طَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ اِلٰى رَسُوْلِ

---

৭. আবু ইয়ালার মুসনাদে সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণিত আছে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَسْقٰى قَالَ ابْدَؤُوْا بِالْكُبَرَاءِ اَوْ قَالَ بِالْاَكَابِرِ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পানীয় দ্রব্য উপস্থিত হলে তিনি বলতেন ঃ "বয়স্কদের দিক থেকে বণ্টন শুরু করো।" এসব নির্দেশ ফরয পর্যায়ের নয়, বরং সুন্নাত পর্যায়ের এবং শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত (অনুবাদক)।

اللّٰهِ ﷺ خُبْزًا مِّنْ شَعِيرٍ وَّمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ قَالَ اَنَسٌ فَرَاَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ الصَّحْفَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ .

৮৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক দর্জী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খাওয়ার দাওয়াত দিলো। আমি তাঁর সাথে দাওয়াতে গেলাম। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বার্লির রুটি এবং লাউয়ের তরকারী পেশ করলো। আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তরকারীর পাত্র থেকে বেছে বেছে লাউ তুলে নিচ্ছেন। আমিও সেদিন থেকে লাউ তরকারী পছন্দ করে আসছি।

٨٩١- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ لِاُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا اَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْئٍ قَالَتْ نَعَمْ فَاَخْرَجَتْ اَقْرَاصًا مِّنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ اَخَذَتْ خِمَارًا لَّهَا ثُمَّ لَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِىْ وَرَدَّتْنِىْ بِبَعْضِهِ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِىْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ بِطَعَامٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوْا قَالَ فَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ رَجَعْتُ اِلَى اَبِىْ طَلْحَةَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ هُوَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى دَخَلَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّىْ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَجَاءَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ قَالَ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَاَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُوْلَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ حَتّٰى اَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَهُمْ سَبْعُوْنَ اَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلًا .

৮৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা (রা) উম্মে সুলাইম (রা)-কে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম এবং তাঁকে ক্ষুধার্ত মনে হলো। তোমার কাছে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? তিনি বলেন, হাঁ আছে। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর তিনি বার্লির কয়েকটি রুটি বের করলেন এবং তা নিজের দোপাট্টার এক দিকে বাঁধলেন এবং অপর দিক আমার কাছে দিলেন। অতঃপর তিনি রুটির পুটুলী আমার বগলে দাবিয়ে দিলেন। অতঃপর আমাকে তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পাঠালেন। আমি তা নিয়ে গেলাম এবং তাঁকে মসজিদে উপবিষ্ট পেলাম। তাঁর কাছে আরো লোক উপস্থিত ছিলো। আমি তাদের কাছে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন ঃ তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ খাবার নিয়ে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি তাঁর কাছে উপস্থিত লোকদের বলেন ঃ উঠো। অতএব সবাই উঠে রওয়ানা হলো। আমি তাদের আগে আগে আসছিলাম। আমি আবু তালহা (রা)-র কাছে ফিরে এসে ঘটনা সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। আবু তালহা (রা) বলেন, হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে আসছেন। কিন্তু তাদের সকলকে আহার করানোর মতো খাদ্য তো আমাদের কাছে নেই। এখন কি করা যায়? উম্মে সুলাইম (রা) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। অতঃপর আবু তালহা (রা) অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মিলিত হন। তাঁরা উভয়ে এসে বাড়িতে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে উম্মে সুলাইম! তোমার কাছে যা কিছু আছে নিয়ে এসো। অতএব তিনি সেই রুটিগুলো নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুটিগুলো টুকরা টুকরা করার নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তা টুকরা করা হলো। উম্মে সুলাইম (রা) তার উপর ঘি ঢেলে দিলেন এবং তা দিয়ে পায়েশের মতো একটা কিছু তৈরি করলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র মর্জি মাফিক রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবারের উপর কিছু পড়লেন। অতঃপর তিনি দশজন করে লোক ডাকার নির্দেশ দিলেন। অতএব দশজন করে লোক ডাকা হলো। তারা তৃপ্তি সহকারে আহার করলো, অতঃপর বের হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি আরো দশজনকে আসার অনুমতি দিতে বলেন এবং তদনুযায়ী দশজন লোক ডাকা হলো। তারাও তৃপ্তি সহকারে আহার করে বের হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি আরো দশজনকে আসার অনুমতি দিতে বলেন এবং তদনুযায়ী দশজনকে ডাকা হলো। এভাবে দলের সব লোক তৃপ্তি সহকারে আহার করলো। তাদের সংখ্যা ছিলো সত্তর কি আশি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। সাধারণ লোক দাওয়াত দিলে তা কবুল করা উচিৎ, প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়। কিন্তু কোন ওজর থাকলে স্বতন্ত্র কথা। তবে বিশিষ্ট লোক দাওয়াত দিলে তা কবুল করা বা না করার এখতিয়ার রয়েছে।

٨٩٢–عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافٍ لِلثَّلٰثَةِ وَطَعَامُ الثَّلٰثَةِ كَافٍ لِلْاَرْبَعَةِ .

৮৯২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দু'জনের পরিমাণ খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের পরিমাণ খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার ফযীলাত।

٨٩٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلَامِ ثُمَّ اَصَابَهُ وَعَكٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ فَاَبٰى فَخَرَجَ الْاَعْرَابِىُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَالْكِيْرِ تَنْفِىْ خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا .

৮৯৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণের বাইআত করলো।[৮] অতঃপর সে মদীনার জ্বরে আক্রান্ত হলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললো, আমার বাইআত ছিন্ন করুন। কিন্তু তিনি তার কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। সে পুনরায় এসে বললো, আমার বাইআত ছিন্ন করুন। তিনি এবারও তার কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। সে পুনর্বার এসে বললো, আমার বাইআত ছিন্ন করুন। তিনি এবারও তার কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর বেদুইন (মদীনা থেকে) চলে গেলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মদীনা হলো হাপরের ন্যায়। তা নিজের মধ্য থেকে ময়লা দূর করে দেয় এবং পবিত্র জিনিসগুলো নিজের ভিতরে রেখে দেয়।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কুকুর পোষা।

٨٩٤- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَبِىْ زُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لَاَ يُغْنِىْ بِهِ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ قَالَ (السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ) قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِىْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَرَبِّ هٰذِهِ الْمَسْجِدِ .

৮৯৪। সুফিয়ান ইবনে আবু যুহাইর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "কৃষিক্ষেত অথবা মেষপাল পাহারা দেয়ার প্রয়োজন ব্যতীত কোন ব্যক্তি কুকুর পোষলে

---

৮. হাফেজ ইবনে হাজার (র) বলেন, আমরা ব্যক্তির নাম উদ্ধার করতে পারিনি। তবে আল্লামা যামাখশারী তার রবীউল আবরার গ্রন্থে এই ব্যক্তির নাম কায়েস ইবনে আবু হাযিম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার একথা স্বীকার করে নেয়া মুশকিল। কেননা তিনি একজন বিখ্যাত তাবিঈ এবং হিজরত করে মদীনায় পৌছার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেন (অনুবাদক)।

প্রতিদিন তার আমল থেকে একটি করে কীরাত[৯] ঘাটতি হতে থাকে।" সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি (সুফিয়ান) কি সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে একথা শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, কাবার প্রভুর শপথ এবং এই মসজিদের (মসজিদে নববী) প্রভুর শপথ।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন প্রয়োজন ব্যতীত কুকুর পোষা মাকরূহ। কিন্তু বাড়ি-ঘড়, মেষ-বকরীর পাল এবং কৃষি জমীর পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্যে কুকুর পোষায় দোষ নেই।

٨٩٥- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِ الْبَيْتِ الْقَاصِيْ فِي الْكَلْبِ يَتَّخِذُوْنَهُ .

৮৯৫। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘনবসতি থেকে দূরে বসবাসকারী পরিবারসমূহকে কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ঘর-বাড়ির হেফাজতের জন্য এই অনুমতি দেয়া হয়েছে।

٨٩٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ .

৮৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কুকুর পোষে, তার আমল থেকে প্রতিদিন দুই কীরাত করে কাটা যায়। তবে কৃষিক্ষেত পাহারা দেয়ার কুকুর এবং শিকারী কুকুর পোষা জায়েয।

শিষ্টাচার, চারিত্রিক দোষত্রুটি ও সৌন্দর্য

২০. অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা বলা, অন্যের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা, তার দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো এবং চোগলখোরী করা মাকরূহ।

٨٩٧- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَئَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكْذِبُ امْرَاَتِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ خَيْرَ فِي الْكَذِبِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعِدُهَا وَاَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ .

৮৯৭। আতা ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি আমার স্ত্রীর সাথে মিথ্যা বলতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ

৯. কীরাত শব্দের অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এটা মানুষের কৃতকর্ম পরিমাপের একটি একক। আমল ঘাটতি হওয়ার অর্থ, কাজের সওয়াব ও পুরস্কারের মধ্যে কমতি হওয়া (অনুবাদক)।

বলেন ঃ মিথ্যা বলার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি তার সাথে ওয়াদা করবো (যে, এটা করবো, এটা বানিয়ে দিবো)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এতে তোমার কোন দোষ হবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। হাসি-ঠাট্টার ছলেই মিথ্যা বলা হোক অথবা প্রকৃতই মিথ্যা বলা হোক, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। মিথ্যা বলার যদি কোন সুযোগ থেকেই থাকে, তবে তা কেবল একটি অবস্থায়। কোন ব্যক্তির উপর থেকে কারো জুলুম-নির্যাতন প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা যায়। আমরা আশা করি এতে কোন দোষ হবে না।[১০]

---

১০. সত্যবাদিতা ও সারল্য ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যাচার একটি ঘৃণ্যতম নৈতিক অপরাধ। কিন্তু বাস্তব জীবনের এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় ব্যাপার রয়েছে, যার জন্য শরীআতে মিথ্যার শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি, বরং কোন কোন অবস্থায় মিথ্যা বলা অপরিহার্য বলে ফতোয়া (فتوى) পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। লোকদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন, ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তি এবং দাম্পত্য সম্পর্কের সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য যদি কেবল সত্যকে গোপন করেই কাজ সমাধা না হয়, তবে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার পরিষ্কার অনুমতিও শরীআত দান করেছে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোন সৈনিক শত্রুবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যায় এবং তারা যদি তার কাছ থেকে মুসলিম বাহিনীর অবস্থান ও তাদের গোপন তথ্য জানতে চায়, তখন আসল তথ্য বলে দেয়া গুনাহ এবং শত্রুর কাছে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে নিজেদের বাহিনীকে রক্ষা করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে যদি কোন স্বৈরাচারী যালেম কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায় এবং ঐ বেচারা কোথাও আত্মগোপন করে থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে সত্য কথা বলে তার গোপন অবস্থান জানিয়ে দেয়া গুনাহ এবং মিথ্যা বলে তার জান বাঁচানো ওয়াজিব। এ সম্পর্কে শরীআতের নির্দেশ নিম্নরূপ ঃ

উকবা ইবনে আবু মুঈতের কন্যা উম্মে কুলছূম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপন করে দেয়ার জন্য এবং কল্যাণ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, সে মিথ্যাবাদী নয়" (বুখারী, মুসলিম)। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আরো আছে, রাবী বলেন, "মানুষের কথোপকথনে মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে বলে শুনিনি। কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়া হয়েছে ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে, মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপনে এবং স্ত্রীর কাছে স্বামীর কথনে ও স্বামীর কাছে স্ত্রীর কথনে" (বুখারী, কিতাবুস সুলহি; মুসলিম, কিতাবুল বিররি; আবু দাঊদ, কিতাবুল আদাব; তিরমিযী, কিতাবুল বিররি)।

ইয়াযীদ কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ "মিথ্যা বলা জায়েয নয়। কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রে তার অনুমতি আছে। স্ত্রীকে খুশি করার জন্য স্বামীর বক্তব্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া এবং লোকদের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া" (আবু দাঊদ, তিরমিযী)।

এর বাস্তব উদাহরণও হাদীসের গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। "ইহূদী নেতা কাব ইবনে আশরাফের হত্যার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা)-কে নিয়োগ করলেন, তখন তিনি অনুমতি চাইলেন, যদি কিছু মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন হয় নিতে পারবো কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিষ্কার বাক্যে তাকে এর অনুমতি দেন" (বুখারী, বাবুল কিযবি ফিল হারব এবং বাবুল ফিতক বি-আহলিল হারব)।

৮৯৮- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَنَافَسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُوْنُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا .

৮৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা অলিক ধারণা-অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কেননা খারাপ ধারণা-অনুমান হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য মিথ্যা কথা। তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না, গর্ব ও অহংকার করো না, একে অপরের প্রতি ঘৃণা রেখো না এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।

৮৯৯-عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِى يَاْتِى هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ .

৮৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ দ্বিমুখী চরিত্রের লোকেরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এরা এক দলের কাছে এসে এক ধরনের কথা বলে, আবার অন্যদের কাছে গিয়ে অন্য ধরনের কথা বলে।

"খায়বারের যুদ্ধ চলাকালে হাজ্জাজ ইবনে ঈলাত (রা) মক্কাবাসীদের কব্জা থেকে নিজের মালপত্র বের করে নিয়ে আসার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকেও এর অনুমতি দিলেন" (মুসনাদে আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)।

এসব হাদীস এবং নযীরের ভিত্তিতে ফিক্‌হবিদগণ এবং হাদীসবেত্তাগণ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তাও দেখে নেয়া প্রয়োজন। আল্লামা ইবনে হাজার আল-আসকালানী (র) বলেন, "বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন যে, কঠিন প্রয়োজন দেখা দিলে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া জায়েয। যেমন কোন স্বৈরাচারী জালেম যদি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায় এবং সেই দুর্বল ও নির্যাতিত ব্যক্তি কারো কাছে আত্মগোপন করে থাকে, তাহলে আশ্রয়দাতার এই অধিকার রয়েছে যে, সে তার কাছে ঐ ব্যক্তির উপস্থিতির কথা অস্বীকার করবে। প্রয়োজনবোধে সে মিথ্যা শপথও করতে পারবে। এজন্য সে গুনাহগার হবে না" (ফাতহুল বারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯০)।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়া (র) হাজ্জাজ ইবনে ঈলাত আস-সুলামী (রা)-র ঘটনা বর্ণনা করার পর তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন ঃ "এ থেকে জানা গেলো যে, কোন ব্যক্তি তার নিজের অথবা অন্যের জন্য মিথ্যা বলতে পারে, যদি তার ফলে অপর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং এই মিথ্যার সাহায্যে তার ন্যায্য অধিকার আদায় করে" (যাদুল মাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৩)।

আল্লামা ইমাম নববী (র) তার 'রিয়াদুস সালেহীন' কিতাবে (অনুচ্ছেদ ঃ মিথ্যা বলা হারাম) হাদীসসমূহ থেকে যুক্তি-প্রমাণ গ্রহণ করতে গিয়ে নিম্নোক্ত মূলনীতি বর্ণনা করেছেন ঃ "যে কোন সৎ উদ্দেশ্য যা মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ছাড়াই অর্জন করা সম্ভব, তা অর্জনের জন্য মিথ্যা বলা হারাম। কিন্তু তা যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয়া ছাড়া অর্জন করা সম্ভব না হয়, তবে মিথ্যা বলা জায়েয। আর এই উদ্দেশ্য অর্জন যদি মুবাহ পর্যায়ের হয়ে থাকে, তবে এর জন্য মিথ্যা বলাও মুবাহ। আর তা অর্জন করা যদি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে থাকে, তবে এর জন্য মিথ্যা কথা বলাও অত্যাবশ্যক" (অনুবাদক)।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের কাছে কিছু প্রার্থনা করা এবং দান-খয়রাত গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকা।

٩٠٠- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِّنَ الْأَنْصَارِ سَئَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَئَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَئَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى أَنْفَدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُنْ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَمْ أَدَّخِرْهُ عَنْكُمْ مَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ .

৯০০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারদের মধ্য থেকে কতক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু প্রার্থনা করলো। তিনি তাদের তা দিলেন। তারা পুনরায় তাঁর কাছে প্রার্থনা করলো। তিনিও আবারও তাদের দিলেন। তারা পুনরায় তাঁর নিকট প্রার্থনা করলো। তিনি এবারও তাদের দিলেন। এভাবে দিতে দিতে তাঁর কাছে যা ছিলো সবই শেষ হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমার কাছে যা কিছু মাল ছিলো আমি তোমাদের না দিয়ে তা আমার কাছে জমা করে রাখিনি। যে ব্যক্তি যাঞ্চা করা থেকে বাঁচতে চায়, আল্লাহ তাকে তা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর যে ব্যক্তি স্বনির্ভর হতে চায় আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর করেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায় আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দান করেন। আল্লাহ্র দেয়া জিনিসসমূহের মধ্যে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম এবং প্রশস্ত কোন জিনিস নেই।

٩٠١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ سَئَلَهُ أَبْعِرَةً مِّنَ الصَّدَقَةِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِيْ وَجْهِهِ وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِيْ وَجْهِهِ أَنْ يَّحْمَرَّ عَيْنَاهُ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ يَسْئَلُوْنِيْ مَا لَا يَصْلُحُ لِيْ وَلَا لَهُ فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِيْ وَلَا لَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا أَسْئَلُكَ مِنْهَا شَيْئًا أَبَدًا .

৯০১। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্র (র) থেকে তার পিতার (আবু বাক্র ইবনে আবদুর রহমান) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল আশহাল গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকাত বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ করেন। সে কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে তাঁর কাছে যাকাতের কিছু উট প্রার্থনা করে। রাবী (আবু বাক্র) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই অসন্তুষ্ট হন, এমনকি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠে। আর তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন এই ছিলো যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেতো। অতঃপর তিনি বলেন ঃ "এই ব্যক্তি আমার কাছে

এমন জিনিস চাচ্ছে যা আমার জন্যও সংগত নয় এবং তার জন্যও সংগত নয়। আমি যদি তাকে এটা না দেই তবে তা আমার কাছে খারাপ লাগবে। আর আমি যদি তাকে তা দেই তবে তাকে এমন জিনিস দিবো, যা আমার জন্যও জায়েয নয় এবং তার জন্যও জায়েয নয়।" তখন সে বললো, এ ধরনের কোন জিনিস আমি আর কখনো আপনার কাছে প্রার্থনা করবো না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যাকাতের মাল থেকে ধনী লোকদের কিছু দেয়া জায়েয নয়। আমাদের মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে একথা এজন্য বলেছেন যে, সে ধনবান ছিলো। সে যদি গরীব হতো, তবে তিনি অবশ্যই তাকে কিছু দিতেন।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে চিঠি লিখলে কিভাবে শুরু করবে।

٩٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يُبَايِعُهُ فَكَتَبَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَمَّا بَعْدُ لِعَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ فَاِنِّىْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ وَاُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلٰى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ .

৯০২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমাইয়া-রাজ আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানকে নিজের বাইআত সম্পর্কিত চিঠি এভাবে লিখেন ঃ "বিসমিল্লাহির রহ্মানির রাহীম। আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি সালাত পাঠের পর (লেখা হলো), আবদুল্লাহ ইবনে উমারের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র বান্দা এবং আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালেকের নামে এই পত্র। আস্সালামু আলাইকা (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। আমি সেই মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি আল্লাহ্র বিধান এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী যথাসাধ্য আপনার নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করার অংগিকার করছি।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে চিঠি লেখার সময় নিজের নামের পূর্বে প্রাপকের নাম লিখলে তাতে দোষ নেই।

٩٠٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰى مُعَاوِيَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لِعَبْدِ اللّٰهِ مُعَاوِيَةَ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الخ وَقَالَ وَلاَ بَاْسَ بِاَنْ يَّبْدَاَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ قَبْلَ نَفْسِهِ فِى الْكِتَابِ .

৯০৩। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আমীর মুআবিয়া (রা)-কে চিঠি লিখলেন ঃ "বিসমিল্লাহির রহ্মানির রাহীম"। যায়েদ ইবনে ছাবিতের তরফ থেকে আল্লাহ্র বান্দা আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়াকে....।" যায়েদ (রা) বলেন, পত্র প্রেরক যদি তার নিজের নামের পূর্বে প্রাপকের নাম লিখে তাতে দোষ নেই।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ অপরের বাড়িতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি প্রার্থনা করা।

٩٠٤-عَنْ عَطَا بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَئَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْتَاْذِنُ عَلٰى اُمِّىْ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ مَعَهَا فِى الْبَيْتِ قَالَ اسْتَاْذِنْ عَلَيْهَا قَالَ اِنِّىْ اَخْدُمُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لاَ قَالَ فَاسْتَاْذِنْ عَلَيْهَا .

৯০৪। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি আমার মায়ের কাছে যেতেও তার অনুমতি চাইবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ। সে বললো, আমি যদি একই ঘরে তার সাথে একত্রে বসবাস করি? তিনি বলেন ঃ "তবুও তার কাছে অনুমতি চাইবে।" সে বললো, আমি তার খেদমত করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তুমি কি তোমার মাকে অনাবৃত অবস্থায় দেখা পছন্দ করবে?" সে বললো, না। তিনি বলেন ঃ "তবে তার কাছেও অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো"।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। অনুমতি নিয়ে ভিতর বাড়িতে প্রবেশ করা উতি উত্তম। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অপর ব্যক্তির কাছে তার অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা উচিত।[১১]

---

১১. অন্য লোকের বাড়ীতে, এমনকি আপনজনদের কাছেও অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা ইসলামী শিষ্টাচার ও সভ্যতা-ভব্যতার অংশ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অপরের ঘরে তাদের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত এবং তাদের সালাম না দেয়া পর্যন্ত প্রবেশ করো না। এই নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আশা করা যায় তোমরা এর প্রতি খেয়াল রাখবে। তোমরা সেখানে যদি কাউকে না পাও, তবে ঘরে প্রবেশ করো না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের অনুমতি না দেয়া হবে। আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাও। এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম কর্মনীতি। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ্‌ তা ভালোভাবেই জানেন" (সূরা নূর ঃ ২৭, ২৮)।

অবশ্য কারো ঘরে কোন আকস্মিক বিপদ দেখা দিলে তখন অনুমতি নেয়ার এই নির্দেশ প্রযোজ্য নয়। যেমন কারো বাড়িতে যদি আগুন লেগে যায় অথবা চোর-ডাকাত ঢুকে পড়ে ইত্যাতি। নিজেদের সন্তানদের অনুমতি প্রার্থনা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ .

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে ছবি রাখা এবং পশুর গলায় ঘন্টা বাঁধা মাকরূহ।

٩٠٥-عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْعِيْرُ الَّتِىْ فِيْهَا جَرَسٌ لاَ تَصْحَبُهَا الْمَلاَئِكَةُ .

৯০৫। উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে কাফেলায় ঘণ্টাধ্বনি আছে রহমাতের ফেরেশতাগণ তার সাথী হন না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে এই নির্দেশ যুদ্ধকালীন সফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা তাতে ঘণ্টাধ্বনির সাহায্যে শত্রুবাহিনী মুসলিম বাহিনীর আগমন (ও অবস্থান) টের পেয়ে যেতে পারে।

٩٠٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى أَبِىْ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِىِّ يَعُوْدُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَدَعَا أَبُوْ طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ لِمَ تَنْزِعُهُ قَالَ لِأَنَّ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ قَالَ سَهْلٌ أَوَلَمْ يَقُلْ إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِىْ ثَوْبٍ قَالَ وَلٰكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِىْ .

৯০৬। আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অসুস্থ আবু তালহা আল-আনসারী (রা)-কে দেখতে গেলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে তাঁর কাছে সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রা)-কে উপস্থিত পেলেন। আবু তালহা (রা) একটি লোক ডাকলেন এবং নিজ বিছানার নিচের গদি টেনে বের করে নিতে বলেন। সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ (রা) বলেন, তা টানছেন কেন? তিনি বলেন, কারণ এতে ছবি আঁকা আছে। আর এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তা তোমার জানা আছে। সাহ্‌ল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এও বলেননি

"আর তোমাদের শিশুরা যখন বুদ্ধির পরিপক্কতায় পৌঁছে যাবে, তখন তারা যেন (পিতা-মাতার প্রকোষ্ঠে) তেমনিভাবে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে যেমন তাদের বড়োরা অনুমতি নিয়ে এসে থাকে" (সূরা নূর ঃ ৫৯)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "নিজেদের মা-বোনদের নিকট প্রবেশ করতে হলেও তোমরা অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো" (তাফসীরে ইবনে কাছীর)। তিনি এপর্যন্ত বলেছেন যে, "নিজের ঘরে নিজ স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করার সময়ও অন্তত গলা খাঁকারি দিয়ে প্রবেশ করা উচিৎ। তার স্ত্রী যয়নব (রা) বলেন, তিনি যখনই ঘরে আসতে থাকতেন, তখন পূর্বেই এমন কিছু শব্দ করতেন, যার সাহায্যে তার আগমন টের পাওয়া যেতো। হঠাৎ করে ঘরে প্রবেশ করা তিনি পছন্দ করতেন না" (তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী) (অনুবাদক)।

যে, কাপড়ের উপর ছবি অংকিত থাকলে তাতে কোন দোষ নেই? আবু তালহা (রা) বলেন, কিন্তু আমার মতে এ থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম।[১২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। যদি বিছানার চাদর, সতরঞ্জি, কার্পেট, বালিশ ইত্যাদির উপর ছবি অংকিত থাকে তবে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু দরজা-জানালার পর্দা এবং যেসব কাপড় ঝুলানো অবস্থায় থাকে তাতে ছবি অংকিত থাকা মাকরূহ। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণের এই মত।

---

১২. বিচরণশীল জীবজন্তুর ছবি অংকন করা মূলতই হারাম। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে। আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ছবি এবং প্রতিকৃতি অংকনকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন (বুখারী)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ছবি বানায় তাকে আযাব দেয়া হবে এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে বাধ্য করা হবে। অথচ সে তা করতে কখনো সক্ষম হবে না" (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে ছবি ও প্রতিকৃতি নির্মাণকারীগণ" (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ "যারা এই প্রতিকৃতি বানায় তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা কিছু বানিয়েছো তা জীবন্ত করে দাও" (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যেসব লোককে সবচেয়ে মর্মান্তিক শাস্তি দেয়া হবে, তাদের মধ্যে সেইসব লোকও রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছে" (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ছবি রাখতেও নিষেধ করেছেন এবং ছবি তৈরী করতেও নিষেধ করেছেন" (তিরমিযী)।

তবে গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, প্রাণহীন বস্তু, প্রাকৃতিক দৃশ্য, চাঁদ, সূর্য, তারকা, সৌরমণ্ডল, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির ছবি অংকন করা জায়েয। সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র) বলেন, এক ব্যক্তি এসে ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে বললো যে, সে নিজ শ্রমে উপার্জন করে সংসার চালায় এবং তার পেশা হচ্ছে চিত্রাংকন। ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি প্রতিকৃতি নির্মাণ করে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন এবং যতোক্ষণ পর্যন্ত সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে না পারবে, ততোক্ষণ তাকে ছেড়ে দেয়া হবে না। অথচ সে কখনও তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না।" একথা শুনে তার খুব রাগ হলো এবং তার চেহারার বর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তোমাকে যদি ছবি বানাতেই হয়, তবে এই গাছটির ছবি বানাও অথবা কোন প্রাণহীন জিনিসের ছবি বানাও (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ)। বর্তমান কালের একদল ফিক্‌হবিদ তামদ্দুনিক প্রয়োজনে সীমিত পর্যায়ে ছবি নির্মাণের অনুমতি ব্যক্ত করেছেন। যেমন পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র, ডকুমেন্টারী ছবি ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য ঃ তাফসীর গ্রন্থসমূহে সূরা সাবা-এর ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা, তাফহীমুল কুরআনে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা (২০ নং টীকা)। ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০; উমদাতুল কারী ২২ খণ্ড, পৃ. ৭০; শরহে নববী (মুসলিমের শরাহ), ১৫ খণ্ড, পৃ. ৮১-২; ইসলামে হালাল-হারামের বিধান, আল্লামা কারদাবী, পৃ.১৫১-১৮২ এবং ফিকহের গ্রন্থসমূহের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়। এমনকি ইহূদী-খৃষ্টান ধর্মেও ছবি এবং প্রতিকৃতি নির্মাণ হারাম। এজন্য বাইবেলের নিম্নোক্ত স্থানসমূহ পাঠ করা যেতে পারে ঃ যাত্রাপুস্তক, অধ্যায় ২০, আয়াত ৪, লেবীয় পুস্তক, অধ্যায় ২৬, আয়াত ১, দ্বিতীয় বিবরণ, অধ্যায় ৪, আয়াত ১৫-১৮, অধ্যায় ২৭, আয়াত ১৫ (অনুবাদক)।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ দাবা (chess) পাশা (dicc) এবং এক প্রকার অক্ষ খেলা (backgammon)।

٩٠٧- عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ .

৯০৭। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি দাবা এবং অক্ষ খেলা খেললো, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করলো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দাবা, পাশা, অক্ষখেলা বা এ ধরনের অন্য সব খেলার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ জায়েয খেলাধূলা উপভোগ করা।

٩٠٨- أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ صَوْتَ أُنَاسٍ يَلْعَبُونَ مِنَ الْحَبَشِ وَغَيْرِهِمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتُحِبِّيْنَ أَنْ تَرَى لَعِبَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَاؤُا وَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ النَّاسِ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْبَابِ وَمَدَّ يَدَهُ وَوَضَعْتُ ذَقْنِى عَلَى يَدِهِ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ وَأَنَا أَنْظُرُ قَالَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ حَسْبُكِ قَالَتْ وَأَسْكُتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ لِى حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ فَانْصَرَفُوا .

৯০৮। আবুন-নাদর (র) থেকে এমন এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত, যিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি আশূরার দিন আবিসিনীয় এবং অন্যান্য লোকের খেলার শব্দ শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হাঁ। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন এবং তারা আসলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং বাহু প্রসারিত করে দিয়ে দুই হাতের তালু দরজার উপর রাখলেন। আমি আমার থুতনি তাঁর হাতের উপর রাখলাম। খেলোয়াড়গণ তাদের খেলা শুরু করলো এবং আমি তা দেখতে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলতে থাকলেন ঃ তোমার দেখা হয়েছে কি? কিন্তু আমি দুই অথবা তিনবার তাঁর কথার জওয়াব না দিয়ে চুপচাপ খেলা উপভোগ করতে থাকলাম। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমার দেখা শেষ হয়েছে? আমি বললাম, হাঁ। অতএব তিনি তাদেরকে ইশারা করলে তারা চলে গেলো।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলার নিজ চুল অপর কোন মহিলার চুলের সাথে সংযুক্ত করা।

٩٠٩- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِىْ يَدِ حَرَسِىٍّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذَا وَيَقُوْلُ اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاءُهُمْ .

৯০৯। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আমীর মুআবিয়া (রা) যে বছর হজ্জ করেন, তিনি তাকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? তিনি চুলের একটি গোছা চৌকিদারের হাত থেকে নিয়ে বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এগুলো নিষিদ্ধ করতে শুনেছি।" তিনি আরো বলেছেন ঃ "ইসরাঈল (ইহুদী) জাতির লোকদের পতন তখনই শুরু হয়, যখন তাদের মেয়েরা এ ধরনের পরচুলা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। পরচুলা ব্যবহার করা বা এক মহিলার চুল অপর মহিলার চুলের সাথে সংযুক্ত করা মাকরূহ। তবে মাথার চুলের সাথে পশম সংযুক্ত করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু মানুষের চুল সংযুক্ত করা ঠিক নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণেরও এই মত।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ শাফাআত সম্পর্কিত বর্ণনা।

٩١٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ فَاَرِيْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْ اَخْتَبِىَ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لِّاُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৯১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ প্রত্যেক নবীর একটি দোয়া কবুল হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র মর্জি আমি আমার দোয়া উম্মাতের শাফাআতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মুলতবি রাখতে চাই।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ লোকদের সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার।

٩١١- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْمِسْكِ الْمُفَتَّتِ الْيَابِسِ .

৯১১। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) শুকনা মৃগনাভি ঘর্ষণ করে সুগন্ধি বানিয়ে তা ব্যবহার করতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। জীবিত বা মৃত লোকদের দেহে মৃগনাভি লাগানোয় কোন দোষ নেই।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ বদদোয়া করার বর্ণনা।

٩١٢- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَصْحَابَ بِيْرِ مَعُوْنَةَ ثَلاَثِيْنَ غَدَاةً يَدْعُوْ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ أَنَسٌ نَزَلَ فِي الَّذِيْنَ قُتِلُوْا بِبِيْرِ مَعُوْنَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا وَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ .

৯১২। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, যেসব লোক বীরে মাউনা নামক কূপের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের (ষড়যন্ত্রমূলকভাবে) হত্যা করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধারে তিরিশ দিন (ফজরের নামাযে) তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করেন। তিনি রিল, যাকওয়ান ও উসাইয়্যা গোত্রত্রয়কে বদদোয়া করেন। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।[১৩] আনাস (রা) বলেন, বীরে মাউনার শহীদদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিলো, তা আমরা পাঠও করেছি। পরে তা মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। আয়াত ছিল নিম্নরূপ ঃ "আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের জাতির কাছে খবর পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।"

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের জওয়াব দেয়া।

٩١٣- أَخْبَرَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ الْقَارِئُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَيَقُوْلُ مِثْلَ مَا يُقَالُ .

৯১৩। আবু জাফর আল-কারী (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। তাকে যখন সালাম দেয়া হতো এবং বলা হতো, আসসালামু আলাইকুম, তখন তিনি উত্তরে অনুরূপ কথা (ওয়া আলাইকুমুস সালাম) বলতেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, অনুরূপভাবে সালামের আদান-প্রদানে কোন দোষ নেই। তবে রহমাত ও বরকতের শব্দ (ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু) বাড়িয়ে বলা আরো উত্তম।

---

১৩. উল্লেখিত গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা জানায় এবং ইসলামী শরীআতের বিধান শেখানোর জন্য তাঁর কাছে কয়েকজন শিক্ষক চায়। তিনি সাবাহীদের মধ্য থেকে ৭০জন (মতান্তরে ৮০জন বা ৪০জন) শিক্ষিত সাহাবীকে তাদের সাথে পাঠান। তারা মক্কা ও উসফানের মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছলে উল্লেখিত গোত্রসমূহ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তৃতীয় হিজরীর সফর মাসে এই মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং একাধারে তিরিশ দিন ফরজ নামাযে 'কুনূতে নাযিলা' পড়ে তাদের বদদোয়া করেন (অনুবাদক)।

٩١٤- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ يَاتِىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُوْ مَعَهُ اِلَى السُّوْقِ قَالَ وَاِذَا غَدَوْنَا اِلَى السُّوْقِ لَمْ يَمُرُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَلٰى سَقَّاطٍ وَلاَ صَاحِبِ بَيْعٍ وَلاَ مِسْكِيْنٍ وَلاَ اَحَدٍ اِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ بْنُ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَجِئْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِىْ اِلَى السُّوْقِ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَصْنَعُ فِى السُّوْقِ وَلاَ تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلاَ تَسْئَلُ عَنِ السِّلَعِ وَلاَ تُسَاوِمُ بِهَا وَلاَ تَجْلِسُ فِىْ مَجْلِسِ السُّوْقِ اِجْلِسْ بِنَا هٰهُنَا نَتَحَدَّثُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَا اَبَا بَطْنٍ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ اِنَّمَا نَغْدُوْ لِاَجْلِ السَّلاَمِ نُسَلِّمُ عَلٰى مَنْ لَقِيْنَا .

৯১৪। ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (র) থেকে বর্ণিত। তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কাব (র) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র কাছে আসতেন এবং তার সাথে একত্রে বাজারে যেতেন। তিনি বলেন, আমরা যখন বাজারে প্রবেশ করতাম তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বিক্রেতা, ব্যবসায়ী, ফকীর-মিসকীন যার কাছ দিয়েই যেতেন তাকে সালাম দিতেন। তুফাইল (র) বলেন, অতএব একদিন আমি তার কাছে এলাম এবং তিনি আমাকে নিয়ে বাজারে রওয়ানা হলেন। আমি বললাম, বাজারে গিয়ে কি করবেন? অথচ আপনি বাজারে গিয়ে কোন দোকানে বসেন না, জিনিস-পত্রের দামও জিজ্ঞেস করেন না, কেনাকাটাও করেন না এবং বাজারের কোন মজলিসেও বসেন না। বরং আপনি আমাদের নিয়ে এখানে বসুন, আমরা কথাবার্তা বলি। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, হে ভূঁড়িওয়ালা (তার পেট বড়ো ছিলো)! আমরা তো সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে যাই। যার সাথেই দেখা হয় আমরা তাকেই সালাম দেই।

٩١٥- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَحَدُهُمْ فَاِنَّمَا يَقُوْلُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُوْلُوْا عَلَيْكَ .

৯১৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইহূদীরা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে সালাম দেয় তখন বলে, আস্‌সামু আলাইকুম (তোমাদের ক্ষতি হোক)। তোমরা জওয়াবে বলো, ওয়াআলাইকা (তোমাদের উপরই)।

٩١٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَمَانِيٌّ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذٰلِكَ اَيْضًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ هٰذَا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ قَالُوا هٰذَا الْيَمَانِيُّ الَّذِي يَغْشَاكَ فَعَرَّفُوهُ اِيَّاهُ حَتّٰى عَرَفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ السَّلَامَ انْتَهٰى اِلَى الْبَرَكَةِ .

৯১৬। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে বসা ছিলাম। এ সময় ইয়ামানের এক ব্যক্তি তার কাছে প্রবেশ করলো এবং বললো, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। সে এর সাথে আরো কিছু যোগ করলো। ইবনে আব্বাস (রা) জিজ্ঞেস করলেন, এই ব্যক্তি কে? ঐ সময় তার দৃষ্টিশক্তি (বার্ধক্যের কারণে) ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিলো। লোকেরা বললো, ইয়ামনের সেই ব্যক্তি, যে আপনার কাছে আসা-যাওয়া করে। তারা তার কিছু পরিচয়ও দিলো। অতঃপর তিনি তাকে চিনতে পারলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সালাম 'বরকত' (শব্দ) পর্যন্ত শেষ হয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্' পর্যন্ত বলেই থেমে যেতে হবে। কেননা সুন্নাতের অনুসরণ করাই উত্তম।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ দোয়া চাওয়ার বর্ণনা।

٩١٧- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ وَقَالَ رَاٰنِي ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَدْعُوْ فَاُشِيْرُ بِاِصْبَعَيَّ اِصْبَعٍ مِّنْ كُلِّ يَدٍ فَنَهَانِيْ .

৯১৭। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমাকে দোয়া করতে দেখলেন। আমি দুই হাতের দুই আংগুল দিয়ে ইশারা করেছিলাম। তিনি আমাকে (এরূপ করতে) নিষেধ করলেন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা ইবনে উমার (রা)-র কথার উপর আমল করি। শুধু এক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতে হবে।[১৪]

---

১৪. অর্থাৎ তাশাহ্হুদে اشهد ان لا اله الا الله পড়ার সময় ডান হাতের শাহাদাত আংগুল (তর্জনী) উত্তোলন করা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল নিম্নরূপ ঃ আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। "নবী ﷺ যখন তাশাহ্হুদ পড়তেন, তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন (আবু দাউদ, নাসাঈ)। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "নিশ্চয় এটা (তর্জনী দ্বারা ইশারা) করা শয়তানের প্রতি লোহার তীর নিক্ষেপ অপেক্ষাও কঠিন" (মুসনাদে আহমাদ)।

٩١٨- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَالَ بِيَدِهِ فَرَفَعَهَا اِلَى السَّمَاءِ .

৯১৮। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছেন, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সন্তানের দোয়ার বরকতে তার মর্যাদা বর্ধিত করা হয়। তিনি এই উন্নতিকে আসমানের দিকে হাতের ইশারার মাধ্যমে প্রকাশ করতেন।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলিম ভাইকে পরিত্যাগ করা গুনাহ।

٩١٩- عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَعْرِضُ هٰذَا وَيَعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمُ الَّذِيْ يَبْدَاُ بِالسَّلاَمِ .

৯১৯। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইয়ের উপর রাগ করে তার সাথে একাধারে তিন দিন সাক্ষাত করা থেকে বিরত থাকা এবং পথে দেখা হলে পরস্পর মুখ ফিরিয়ে নেয়া জায়েয নয়। এদের উভয়ের মধ্যে যে আগে সালাম দেয়া শুরু করবে সে-ই উত্তম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। দুই মুসলিম ভাইয়ের জন্য পরস্পরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তিন দিনের অধিক সাক্ষাত থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ দীনের কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া এবং একজনের বিরুদ্ধে অপরজনের কাফের বলে সাক্ষ্য দেয়া।

٩٢٠- اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ مَنْ جَعَلَ دِيْنَهُ غَرَضًا لِّلْخُصُوْمَاتِ اَكْثَرَ التَّنَقُّلَ (النَّقْلَ) .

ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (আরবী নব্বই-এর বন্ধনের ন্যায়) ডান হাতের কণিষ্ঠা ও অনামিকা আংগুল বন্ধ করলেন ও (মধ্যমা ও বৃদ্ধা আংগুলের সাহায্যে) একটি বৃত্ত করলেন এবং তর্জনী উত্তোলন করলেন। এ সময় আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি তাশাহ্হুদ পড়তে পড়তে (ইশারার জন্য) তর্জনী নাড়ছেন (আবু দাউদ, দারিমী)। আবু হুমাইদ (রা) বলেন, "তাশাহ্হুদ পাঠের সময় নবী ﷺ তর্জনী দিয়ে ইশারা করতন" (তিরমিযী)। ইবনে উমার (রা) বলেন, "নবী ﷺ তর্জনী দ্বারা (তাশাহ্হুদ পাঠের সময়) ইশারা করতেন (তিরমিযী)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "এক ব্যক্তি (সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস) দুই হাতের দুই আংগুল দিয়ে ইশারা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেনঃ আরে একটি, একটি" (তিরমিযী, নাসাঈ, বায়হাকী)। চার মাযহাবের ইমামগণ ও মুহাদ্দিসগণ এসব হাদীসের উপর আমল করেন (অনুবাদক)।

৯২০। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন, যে ব্যক্তি ঝগড়ার উদ্দেশ্যে নিজের দীনকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে, সে কখনো এই ধর্মে, কখনো ঐ ধর্মে গিয়ে পতিত হয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। দীনকে ঝগড়ার হাতিয়ারে পরিণত করা উচিৎ নয়।

٩٢١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَإٍ قَالَ لِاَخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا .

৯২১। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কাফের বললে তা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন মুসলমানের পক্ষে অপর মুসলমানকে কোন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফের বলা মোটেই সংগত নয়, তা সে কবীরা গুনায়ই লিপ্ত হোক না কেন। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণের এই মত।

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ রসুন খাওয়া মাকরূহ।

٩٢٢-اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ وَفِىْ رِوَايَةِ الْخَبِيْثَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا يُؤْذِيْنَا بِرِيْحِ الثُّوْمِ.

৯২২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই নিকৃষ্ট গাছের তরকারী (রসুন) খায়, সে যেন আমাদের মসজিদের কাছেও না আসে। কারণ রসুনের গন্ধে আমাদের কষ্ট হয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দুর্গন্ধের কারণেই রসুন খাওয়া মাকরূহ। যদি রান্না করে এর গন্ধ দূর করা হয় তবে তা খেতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণের এই মত।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নের বর্ণনা।

٩٢٣- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمُ الشَّيْئَ يَكْرَهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ اِذَا اسْتَيْقَظَ وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لَنْ تَضُرُّهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

৯২৩। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ ভালো স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে দেখানো

হয়। তোমাদের কেউ অশুভ স্বপ্ন দেখলে সে জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে নিজের বাঁদিকে তিনবার থুথু ফেলবে এবং এর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তায়ালার মর্জি হলে তার কোন ক্ষতি হবে না।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন মাসায়েল সম্পর্কিত হাদীস।

٩٢٤- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلاَتَيْنِ وَعَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ فَاَمَّا الْبَيْعَتَانِ الْمُنَابَذَةُ وَالْمُلاَمَسَةُ وَاَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالْاحْتِبَاءُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِه وَاَمَّا الصَّلاَتَانِ فَالصَّلوٰةُ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَالصَّلوٰةُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ وَاَمَّا الصِّيَامَانِ فَصِيَامُ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ .

৯২৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ ক্রয়-বিক্রয়ের দু'টি পদ্ধতি, বস্ত্র পরিধানের দু'টি প্রণালী, দুই সময়ে নামায পড়া এবং দুই দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ করেছেন। ক্রয়-বিক্রয়ের নিষিদ্ধ পদ্ধতি দু'টি হচ্ছে, মুনাবাযা ও মুলামাসা।[১৫] বস্ত্র পরিধানের নিষিদ্ধ প্রণালী দু'টি হচ্ছে, অন্য কোন কাপড় পরা ব্যতিরেকে শুধু একটি চাদরে সর্ব শরীর আবৃত করা এবং চাদরের একদিক কাঁধের উপর তুলে রাখা। অপরটি হচ্ছে, লুংগি জাতীয় কাপড় পরিধান করে হাঁটুদ্বয় খাড়া করে বসা। এতে গুপ্তাংগ অনাবৃত হয়ে যেতে পারে। আর যে দুই সময়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ (মাকরূহ) তা হচ্ছে আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামায পড়া (মাকরূহ)। আর যে দুই দিন রোযা রাখা নিষেধ তা হচ্ছে, ঈদুল ফিতরের দিন এবং ঈদুল আযহার দিন।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের গোটা বক্তব্যের উপর আমল করি। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

٩٢٥- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنِى مُخْبِرٌ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ يُوْصِى رَجُلاً لاَ تَعْتَرِضْ فِيْمَا لاَ يَعْنِيْكَ وَاَعْزِلْ عَدُوَّكَ وَاحْذَرْ خَلِيْلَكَ الاَّ الْاَمِيْنَ وَلاَ اَمِيْنَ الاَّ

---

১৫. মুনাবাযা এই যে, কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা চলাকালে ক্রেতা বা বিক্রেতা যে কোন একজন অপরজনের দিকে কোন কিছু ছুড়ে মারলেই তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে, পণ্যদ্রব্য দেখার সুযোগ থাকবে না এবং উভয়ের সম্মতিরও প্রয়োজন বোধ করা হবে না। 'মুলামাসা' হচ্ছে, রাতে বা দিনে ক্রেতা বিক্রেতার কাপড় স্পর্শ করলেই তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে, তা দেখে বিবেচনা করার সুযোগ থাকবে না। জাহিলী আরবে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন ছিলো। ইসলামে তা বাতিল করা হয় (অনুবাদক)।

مَنْ خَشِىَ اللّٰهَ وَلاَ تَصْحَبْ فَاجِراً كَىْ تَتَعَلَّمَ مِنْ فُجُوْرِهِ وَلاَ تُفْشِ اِلَيْهِ سِرَّكَ وَاسْتَشِرْ فِىْ اَمْرِكَ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ .

৯২৫। ইমাম মালেক (র)-কে এক ব্যক্তি অবহিত করেন যে, হযরত উমার (রা) এক ব্যক্তিকে ওসিয়াত করেছিলেন ঃ "যে কাজে কোন লাভ নেই তাতে মগ্ন হবে না, শত্রুর কাছ থেকে দূরে থাকবে, নিজের বন্ধুকে ভয় করবে, তবে বিশ্বস্ত বন্ধুর কথা স্বতন্ত্র। আর বিশ্বস্ত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্কে ভয় করে। দুশ্চরিত্র লোকের কাছে বসবে না। অসম্ভব নয় যে, তুমি তার খারাপ কার্যকলাপ শিখে ফেলবে। তার কাছে নিজের গোপন কথা বলবে না। নিজের ব্যাপারসমূহে এমন লোকদের সাথে পরামর্শ করবে যারা মহান আল্লাহ্কে ভয় করে।

٩٢٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّاكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ وَيَمْشِىْ فِىْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَاَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ اَوْ يَحْتَبِىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ .

৯২৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তিকে বাম হাতে আহার করতে, এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাঁটতে, এক কাপড়ে গোটা শরীর ঢাকতে এবং একটি কাপড় পরিধান করে হাঁটু খাড়া করে বসতে নিষেধ করেছেন। কেননা এতে গুপ্তাংগ অনাবৃত হয়ে যেতে পারে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বাম হাতে আহার করা এবং এক কাপড়ে গোটা দেহ ঢাকা মাকরূহ। অর্থাৎ একটি কাপড় দিয়ে শরীর এমনভাবে লেপ্টে নেয়া যে, কোন দিক থেকে কাপড় উঠে গেলে সতর খুলে যাবে। একটি কাপড় পরে হাঁটু খাড়া করে বসাও মাকরূহ।

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ ধার্মিকতা, কৃচ্ছ্রতা, অল্পে তুষ্টি ও সরলতা।

٩٢٧- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْتِىْ قُبَاءَ رَاكِبًا وَّمَاشِيًا .

৯২৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো পদব্রজে আবার কখনো সাওয়ারীতে চড়ে কুবা পল্লীতে আসতেন।

٩٢٨- اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ قَالَ اَنَسٌ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ رَقَّعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلاَثٍ لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَقَالَ اَنَسٌ وَقَدْ رَاَيْتُ

يَطْرَحُ لَهُ صَاعَ تَمْرٍ فَيَاكُلُهُ حَتَّى يَاكُلَ حَشْفَهُ قَالَ اَنَسٌ وَقَدْ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمًا وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ بَخٍ بَخٍ وَاللّٰهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ لَتَتَّقِيَنَّ اللّٰهَ اَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ قَالَ اَنَسٌ وَسَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ سَئَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ كَيْفَ اَنْتَ قَالَ الرَّجُلُ اَحْمَدُ اللّٰهَ اِلَيْكَ قَالَ عُمَرُ هٰذِهِ اَرَدْتُ مِنْكَ .

৯২৮। ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (র) থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক (রা) তাকে নিম্নের চারটি হাদীস সম্পর্কে অবহিত করেন। আনাস (রা) বলেন ঃ (১) হযরত উমার (রা) মুসলিম জনগণের খলীফা থাকা অবস্থায় আমি তার পরিহিত জামার উপরাংশে এবং নিম্নাংশে তিনটি তালি দেখেছি। (২) আমি উমার (রা)-কে দেখেছি, তার সামনে এক সা' (সাড়ে তিন সের) খেজুর রাখা হতো। তিনি সব খেজুর খেয়ে নিতেন, এমনকি নিম্ন মানের খেজুরটিও। (৩) আমি একদিন তার সাথে বের হলাম। তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। তার ও আমার মাঝে একটি দেয়াল প্রতিবন্ধক ছিলো। বাগানের মধ্যে আমি তাকে (নিজকে লক্ষ্য করে) বলতে শুনেছি, আহ! হে মুমিনদের আমীর উমার, আল্লাহ্র শপথ! হে খাত্তাবের পুত্র, আল্লাহ্কে ভয় করো। অন্যথায় আল্লাহ তোমাকে শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। (৪) এক ব্যক্তি এসে উমার (রা)-কে সালাম দিলো। তিনি সালামের জওয়াব দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কেমন আছো? সে বললো, আমি আপনার কাছে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করছি। উমার (রা) বলেন, তোমার কাছে এটাই আশা করেছি।

٩٢٩- اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبْعَثُ اِلَيْنَا بِاَحْظَائِنَا مِنَ الْاَكَارِعِ وَالرُّؤُسِ .

৯২৯। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উরওয়া) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (যখন কোন পশু যবেহ করতেন) আমাদের জন্য মাথা অথবা পা পাঠিয়ে দিতেন।

٩٣٠- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَسْلَمَ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُرِيْدُ الشَّامَ حَتَّى اِذَا دَنٰى مِنَ الشَّامِ اَنَاخَ عُمَرُ وَذَهَبَ لِحَاجَةٍ (لِحَاجَتِه) قَالَ اَسْلَمُ فَطَرَحْتُ فَرْوَتِي بَيْنَ شِقَّيْ رَحْلِيْ فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ عَمَدَ اِلٰى بَعِيْرِيْ فَرَكِبَهُ عَلَى الْفَرْوِ وَرَكِبَ اَسْلَمُ بَعِيْرَهُ فَخَرَجَا يَسِيْرَانِ حَتّٰى

لَقِيَهُمَا اَهْلُ الْاَرْضِ يَتَلَقَّوْنَ (يَبْتَغُوْنَ) عُمَرَ قَالَ اَسْلَمُ فَلَمَّا دَنَوْا مِنَّا اَشَرْتُ لَهُمْ اِلَى عُمَرَ فَجَعَلُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ بَيْنَهُمْ قَالَ عُمَرُ تَطْمَحُ اَبْصَارُهُمْ اِلَى مَرَاكِبِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ يُرِيْدُ مَرَاكِبَ الْعَجَمِ .

৯৩০। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র মুক্তদাস আসলামকে বলতে শুনেছি, আমি উমার ইবনুল খাত্তাবের সাথে সিরিয়া যাওয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন সিরিয়ার কাছাকাছি পৌছলাম, উমার (রা) তার উট বসিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলেন। আসলাম (র) বলেন, আমি আমার মাথার পশমী আবরণ খুলে হাওদার মধ্যে রেখে দিলাম। উমার (রা) ফিরে এসে আমার উটের দিকে গেলেন এবং তাতে সওয়ার হয়ে আমার মস্তকাবরণের উপর বসলেন। আর আসলাম তার উটে সওয়ার হলেন। অতঃপর তারা সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। তাদেরকে সেখানকার যারা স্বাগত জানাতে এসেছিলো, তারা এ অবস্থায় তাদের সাথে মিলিত হলো। তারা যখন আমার দিকে অগ্রসর হলো আমি তাদেরকে ইশারায় হযরত উমারকে দেখিয়ে দিলাম। তারা পরস্পর কানাঘুষা করতে লাগলো। উমার (রা) বলেন, এই লোকেরা এমন সওয়ারীর অপেক্ষা করছিলো, আখেরাতে যাদের কোন অংশ নেই। তিনি একথার দ্বারা অনারব অমুসলিম নেতাদের দিকে ইংগিত করেন।

٩٣١- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَاْكُلُ خُبْزًا مَفْتُوْتًا بِسَمْنٍ فَدَعَا رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَجَعَلَ يَاْكُلُ وَيَتَتَبَّعُ بِاللُّقْمَةِ وَضَرَّ الصَّحْفَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَاَنَّكَ مُقْفِرٌ قَالَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُ سَمْنًا وَلاَ رَاَيْتُ اٰكِلاً بِهِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ عُمَرُ لاَ اٰكُلُ السَّمْنَ حَتّٰى يُحْيَى النَّاسُ مِنْ اَوَّلِ مَا اُحْيُوْا .

৯৩১। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ঘি-র সাথে রুটি চূর্ণ করে মিশিয়ে খেতেন। তিনি এক বেদুইনকে (খাওয়ার জন্য) ডাকলেন। সে খাবার গ্রাসের সাথে পেয়ালার ময়লাও খেতে লাগলো। উমার (রা) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অনাহারী ছিলে? সে বললো, আল্লাহ্র শপথ! এতো দিন যাবত আমি কখনো ঘি দেখিনি এবং কাউকে তা খেতেও দেখিনি। উমার (রা) বলেন, আমিও আর কখনো ঘি খাবো না, যতোক্ষণ লোকেরা পূর্বের মতো তৃপ্তি সহকারে ঘি খাওয়ার সুযোগ না পাবে।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা।

٩٣٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا اَعْدَدْتَّ لَهَا قَالَ لاَ شَيْئَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَقَلِيْلُ الصِّيَامِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنِّىْ لَاُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ .

৯৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ "তুমি এজন্য কি পাথেয় সংগ্রহ করেছো?" সে বললো, কিছুই না। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সামান্য পরিমাণ নামায পড়ি এবং সামান্য রোযা রাখি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অবশ্যই ভালোবাসি। তিনি বলেন ঃ "তুমি যাদের ভালোবাসো তাদের সাথেই থাকার সুযোগ পাবে।"

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ ভালো কথা এবং দান-খয়রাতের ফযীলাত।

٩٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِالطَّوَّافِ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةَ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوْا فَمَا الْمِسْكِيْنُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ مَا عِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْئَلُ النَّاسَ .

৯৩৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক গ্রাস বা দুই গ্রাস খাবারের জন্য অথবা একটি বা দু'টি খেজুরের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় প্রকৃতপক্ষে সে মিসকীন নয়। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে মিসকীন কে? তিনি বলেন ঃ মিসকীন সেই ব্যক্তি যার কাছে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ নেই, না তাকে চিনতে পেরে কেউ সাহায্য করতে পারে, আর না সে পথে দাঁড়িয়ে লোকজনের কাছে ভিক্ষা চায়।"[১৬]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এই ধরনের ব্যক্তিই সাহায্য ও দান-খয়রাত পাওয়ার ব্যাপারে অধিক অগ্রগণ্য। এদের কাউকে যাকাত দিলে তা জায়েয (যথেষ্ট) হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণের এই মত।

٩٣٤- عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَدَّتِه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ اِحْدَيْكُنْ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعُ شَاةٍ مُحْرَقٌ .

---

১৬. 'মিসকীন' (مسكين) ও 'মাসকানাত' (مسكنة) শব্দের মধ্যে অক্ষমতা, ক্লান্তি-শ্রান্তি, বিপদ-দুর্বিপাক, সহায়-সম্বলহীনতা ও লাঞ্ছনার অর্থ শামিল রয়েছে। এ হিসাবে মিসকীন বলতে এমন লোকদের বুঝায়, যারা সাধারণ অভাবগ্রস্ত লোকদের তুলনায় অধিক বেশী দুর্দশাগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে এমন সব লোককে যাকাত ও দান-খয়রাত পাওয়ার অধিকরী বলেছেন, যাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুরূপ উপায়-উপকরণ নাই এবং খুবই কষ্টকর অবস্থায় দিন কাটায়। কিন্তু তাদের আত্মসম্মানবোধ তাদেরকে কারো সামনে হস্ত প্রসারিত করতে দেয় না এবং তাদের বাহ্যিক অবস্থাও এমন যে, তাদের দেখে কেউ তাদের অভাবগ্রস্ত মনে করে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না। অন্য কথায় একজন গরীব ভদ্রলোক (অনুবাদক)।

৯৩৪। মুআয ইবনে আমর ইবনে সাঈদ (র) থেকে তার দাদীর (হাওয়া বিনতে ইয়াযীদ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে ঈমানদার মহিলাগণ! তোমাদের কেউ যেন নিজ প্রতিবেশীকে তুচ্ছ মনে না করে। তা ছাগলের রান্না করা একটি পায়ের ক্ষুর উপঢৌকন পাঠালেও নয়।[১৭]

৯৩৫-عَنْ اَبِى بُجَيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ ثُمَّ الْحَارِثِىِّ عَنْ جَدَّتِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رُدُّوا الْمِسْكِيْنَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُّحْرَقٍ .

৯৩৫। আবু বুজাইদ আল-আনসারী (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মিসকীনদের দান করো তা ছাগলের পোড়া ক্ষুর হলেও (অর্থাৎ রিক্তহস্তে ফিরিয়ে দিও না, সামান্য হলেও কিছু দান করো)।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ জীবে দয়া।

৯৩৬-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِىْ بِطَرِيْقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِيْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاذَا كَلْبٌ يَّلْهَثُ يَاكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِىْ بَلَغَ بِىْ فَنَزَلَ الْبِيْرَ فَمَلَاَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَ الْخُفَّ بِفِيْهِ حَتّٰى رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لَاَجْرًا قَالَ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ .

৯৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সে পিপাসার্ত হলো এবং একটি কূপ দেখতে পেয়ে তার মধ্যে নামলো। অতঃপর পানি পান করে উপরে উঠে এসে দেখতে পেলো যে, একটি কুকুর পিপাসার্ত হয়ে কাদামাটি চাটছে। সে বললো, আমার যেরূপ পিপাসা লেগেছিলো, কুকুরটিও অনুরূপ পিপাসার্ত হয়ে পড়েছে। সে পুনরায় কূপের মধ্যে নেমে নিজ পায়ের মোজায় পানি ভর্তি করে তা মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে উপরে উঠে এলো, অতঃপর কুকুরকে পানি পান করালো। আল্লাহ তার এই কাজের মর্যাদা দিলেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পশুর প্রতি যত্ন নিলেও কি আমরা সওয়াবের অধিকারী হবো? তিনি বলেন ঃ যে কোন জীবন্ত প্রাণীর সেবায় অবশ্যই সওয়াব রয়েছে।[১৮]

---

১৭. "মুওয়াত্তা ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনাকারীদের পারম্পর্য নিম্নরূপ ঃ "মালেক, যায়েদ, আমর ইবনে সাদ ইবনে মুআয, নিজ দাদীর সূত্রে" এবং এটাই সঠিক। মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ (র) ঃ মালেক, যায়েদ, মুআয ইবনে আমর ইবনে সাঈদ, নিজ দাদীর সূত্রে (অনুবাদক)।

১৮. হাদীসটি সহীহ বুখারীর 'কিতাবুল আদাব' শীর্ষক অধ্যায়েও উল্লেখ আছে। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি (সৃষ্টির প্রতি) দয়া করে না, তার প্রতিও (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) দয়া করা হয় না" (ঐ)। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর অধিকার।

৯৩৭- عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِيْنِي بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ لَيُوَرِّثَنَّهُ (لَيُوَرِّثُهُ) .

৯৩৭। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছিঃ জিবরীল (আ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকলেন। এমনকি আমার মনে হলো, হয়তো তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।[১৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "দয়া-অনুগ্রহকারীদের প্রতি দয়াময় রহমান অনুগ্রহ করেন। অতএব যারা আছে জমীনে, তাদের প্রতি দয়া করো তবে যিনি আছেন আসমানে তিনি তোমার উপর দয়া করবেন" (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিলো এবং এ অবস্থায় তা মারা যায়। এ কারণে সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সে যখন তা বেঁধে রেখেছিলো, তখন এটাকে খেতেও দেয়নি, পান করতেও দেয়নি এবং বন্ধনমুক্তও করে দেয়নি যে, তা জমীনের পোকা-মাকড় খেতে পারতো" (বুখারী, মুসলিম)। ইবনে উমার (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন জীবন্ত প্রাণীকে চাঁদমারীর লক্ষ্যবস্তু বানায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর অভিসম্পাত করেছেন" (বুখারী, মুসলিম)। আনাস (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন চতুষ্পদ জন্তুকে চাঁদমারীর লক্ষ্যবস্তু বানাতে নিষেধ করেছেন" (বুখারী, মুসলিম)। সাহল ইবনে হানযালা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি উটের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পান যে, এর পেট পিঠের সাথে লেগে গেছে। তিনি বলেন ঃ "এসব নির্বাক জীবজন্তুর ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করো। উত্তম পন্থায় এর পিঠে সওয়ার হও এবং একে পরিমিত খাদ্য দাও" (আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য এক আনসার ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করেন। একটি উট তাকে দেখতে পেয়ে দু'চোখের পানি ছেড়ে দিলো। নবী ﷺ উটের কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলালে উট তার কান্না বন্ধ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ডেকে ডেকে বলেন ঃ কে এই উটের মালিক কে এই উটের মালিক? এক আনসার যুবক এগিয়ে এসে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার উট। তিনি বলেন, যে আল্লাহ তোমাকে এই নির্বাক পশুর মালিক বানিয়েছেন, তুমি কি এর সম্পর্কে তাঁকে ভয় করছো না? উট আমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, তুমি খাদ্য না দিয়ে একে মেরে ফেলছো এবং চলৎশক্তিহীন করে দিয়েছো" (আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ) (অনুবাদক)।

১৯. কুরআন মজীদেও প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে (দ্র. সূরা নিসা ঃ ৩৬)। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেয়া, তাদের উপঢৌকন দেয়া ইত্যাদির নির্দেশ দিয়েছেন। আবু যার আল-গিফারী (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "হে আবু যার! যখন তুমি তরকারী রান্না করো, তাতে পানি দিয়ে ঝোল বাড়িয়ে দাও এবং তা থেকে তোমার প্রতিবেশীকেও পৌঁছাও" (মুসলিম)।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী ﷺ বলেন ঃ "আল্লাহ্র শপথ! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহ্র শপথ! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহ্র শপথ! সেই ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বলেন ঃ "যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়" (বুখারী, মুসলিম)। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছেঃ "সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানের কথা লিখে রাখা।

٩٣٨- اَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ اِلَى اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ اَنِ انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ سُنَّتِه اَوْ حَدِيْثِ عُمَرَ اَوْ نَحْوِ هٰذَا فَاكْتُبْهُ لِىْ فَاِنِّىْ قَدْ خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ .

৯৩৮। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) আবু বাক্‌র ইবনে আমর ইবনে হাযমকে লিখে পাঠান ঃ দেখো, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস অথবা তাঁর সুন্নাত অথবা উমার (রা) এবং অপর খলীফাগণের হাদীস যা পাওয়া যায় তা আমার জন্য লিখে রাখো। কেননা আমি ইল্‌ম শেষ হয়ে যাওয়ার এবং আলেমদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার আশংকা করছি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস গ্রহণ করেছি। জ্ঞানের কথা লিখে রাখায় আমরা কোন দোষ মনে করি না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ চুলে কলপ ব্যবহার করা।

٩٣٩-عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ كَانَ جَلِيْسًا لَنَا وَكَانَ اَبْيَضُ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهَا فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ هٰذَا اَحْسَنُ فَقَالَ اِنَّ اُمِّىْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَرْسَلَتْ اِلَىَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ فَاَقْسَمَتْ عَلَىَّ لَاَصْبُغَنَّ فَاَخْبَرَتْنِىْ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَانَ يَصْبُغُ.

৯৩৯। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ ইবনে আব্‌দে ইয়াগূছ আমাদের সহযোগী ছিলেন। তার দাড়ি ও মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিলো। একদিন ভোরবেলা তিনি চুলে লাল কলপ লাগানো অবস্থায় তাদের নিকট আসলেন। লোকেরা বললো, এটা সর্বোত্তম। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমার মা অর্থাৎ নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) গত রাতে তার বাঁদী নুখায়লার মাধ্যমে শপথ দিয়ে বলে পাঠান যে, আমি যেন অবশ্যই চুলে কলপ লাগাই। তিনি আমাকে আরো অবহিত করেন যে, আবু বাক্‌র (রা) চুলে কলপ লাগাতেন।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়" (বুখারী, মুসলিম)।

আবু শুরায়হ আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে, সে যেন নিজ প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে" (মুসলিম)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহর কাছে উত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীর কল্যাণকামী (তিরমিযী) (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মতে, এক প্রকারের সুগন্ধি ঘাস, মেহেদী এবং হলুদ বর্ণের কলপ ব্যবহারে কোন দোষ নেই। অথবা চুল সাদা অবস্থায় রেখে দেয়ায়ও দোষ নেই। এর সবগুলো পন্থাই উত্তম।[২০]

٩٤٠- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ اِنَّ لِىْ يَتِيْمًا وَلَهُ اِبِلٌ فَاَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ اِبِلِه قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنْ كُنْتَ تَبْغِىْ ضَالَّةَ اِبِلِه وَتَهْنَاُ جَرْبَاهَا وَتُلِيْطُ حَوْضَهَا وَتَسْقِيْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا فَاَشْرِبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَلاَ نَاهِكٍ فِىْ حَلْبٍ .

---

২০. মাথা ও দাড়ির চুলে হলুদ বা লাল রং-এর কলপ ব্যবহার করা জায়েয। কিন্তু জাফরান (গাঢ় পীতবর্ণ) এবং কালো কলপ (খেযাব) ব্যবহার সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "শেষ যামানায় এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যারা কালো কলপ ব্যবহার করবে। তারা বেহেশতের সুবাসও পাবে না (আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)। আল্লামা ইবনুল জাওযী (র) এ হাদীসের সনদ দুর্বল প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) এবং হুসাইন ইবনে আলী (রা) কালো কলপ ব্যবহার করেছেন বলে উল্লেখ আছে। উকবা ইবনে আমের (রা), হাসান (রা) এবং জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-ও কালো কলপ ব্যবহার জায়েয বলেছেন। এর জওয়াবে বলা হয়েছে, হয়তো তারা নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) কাতাম (কালো রস নিঃসারী এক প্রকার ঘাস) ও মেহেদির খেযাব ব্যবহার করতেন এবং উমার ফারূক (রা) কেবল মেহেদীর খেযাব ব্যবহার করতেন। এতে জানা গেল যে, আবু বাক্‌র (রা) সব সময় উভয় বস্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত খেযাব ব্যবহার করতেন। কারণ শুধু কাতামের রং ব্যবহারে চুল কালো বর্ণ ধারণ করে এবং তা নিষিদ্ধ ও খুব নিন্দনীয় যা অন্য হাদীস থেকে জানা যায় (কারামাত আলী জৌনপুরী)।

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক সাহেব তাঁর বাংলা (অনূদিত) বুখারী ৬ষ্ঠ খণ্ডের (২৫১ নং পৃষ্ঠায়) ২২৬৯ নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ﷺ বলেছেন, ইহুদী-নাসারাগণ চুল-দাড়িতে রং ব্যবহার করে না, তোমরা তাদের রীতি বর্জন করে চলো (সহীহ মুসলিম ও তিরমিযীতেও উদ্ধৃত)।

ব্যাখ্যা ঃ এই হাদীসে চুল-দাড়ি রং করতে বলা হয়েছে, কিন্তু বিশেষ রঙ্গের উল্লেখ হয় নাই, এতদ্দৃষ্টে এক শ্রেণীর আলেম বিনা দ্বিধায় কালো রং কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলেছেন। কিন্তু মুসলিম শরীফে কালো খেযাব নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ থাকায় অপর এক শ্রেণীর আলেম তা নাজায়েয বলেছেন। উভয় হাদীসের সামঞ্জস্য বিধানকল্পে এক শ্রেণীর আলেম বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে শেহাব যুহরীর বিবৃতি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন–

كنا نخضب السواد اذا كان الوجه جديدا فلما نقص الوجه والاسنان تركناه.

অর্থ ঃ "আমরা কালো খেজাব ব্যবহার করতাম যাবত চেহারার উপর ভাঙ্গন সৃষ্টি না হত। আর যখন চেহারার উপর ভাঙ্গন এসে যেত এবং দাঁতও খসিয়ে পড়ত তখন কালো খেজাব বর্জন করতাম" (ফতহুল বারী, ২-০২)।

৯৪০। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, আমি কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে এসে বললো, আমার কাছে একটি ইয়াতীম ছেলে আছে এবং তার উট আছে। আমি তার উটের দুধ পান করি। ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বলেন, তার উট হারিয়ে গেলে যদি তুমি তা খোঁজ করে থাকো, এর খোসপাঁচরার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকো এবং এর পানির পাত্র পরিষ্কার করে পানি পান করার দিনে এর পানি পানের ব্যবস্থা করে থাকো, তবে তুমি এর দুধ পান করতে পারো। কিন্তু এমনভাবে দুধ পান করবে না যার ফলে এর বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে এবং উষ্ট্রীও অধিক দুধ দোহনের ফলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

সাহাবীগণের মধ্যে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), ওকবা ইবনে আমের (রা), হাসান (রা) এবং হোসাইন (রা) কালো খেজাব ব্যবহার জায়েয বলতেন (শায়খুল হাদীস)।

কালো রং-এর খেযাব (চুলের কলপ) ব্যতীত অন্যান্য রং-এর খেযাব ব্যবহার বৈধ হওয়ার বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। যারা কালো খেযাব ব্যবহার বৈধ মনে করেন তাদের মধ্যে আবু বাক্র (রা), সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), আবু হুরায়রা (রা), উসমান ইবনে আফফান (রা), উকবা ইবনে আমের (রা), ইমাম হাসান (রা), ইমাম হুসাইন (রা) ও জারীর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীগণের মধ্যে ইবনে শিহাব যুহরী, ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) এই মত সমর্থন করেছেন। ইমাম নববী (র) কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ তাহ্রীম বলেছেন। বস্তুত কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ তানযিহী পর্যায়ের। ইমাম তাবারানী (র) বলেন, "এখানে খেযাব ব্যবহারের নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা কোনটিই অপরিহার্যরূপে পালনীয় পর্যায়ের নয় এবং এটাই সর্বজন স্বীকৃত মত। এ কারণেই এই বিষয়ে পরস্পর ভিন্নমত পোষণকারীগণ একে অপরের সমালোচনা করেননি" (সহীহ মুসলিমের নববীকৃত ভাষ্য দ্র.)।

কালো খেযাব ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ তাহ্রীমের পর্যায়ভুক্ত হলে খেযাব না লাগিয়ে চুল-দাড়ি সাদা রাখাও মাকরূহ তাহ্রীমের পর্যায়ভুক্ত হতো। কারণ হাদীসে সাদা চুল-দাড়ি খেযাব ব্যবহার করে ভিন্ন রং-এ পরিবর্তনের নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু কোন আলেমই চুল-দাড়ি সাদা রাখাকে মাকরূহ বলেননি। কালো খেযাব ব্যবহারের অনুকূলেও রাসূলুল্লাহ (রা)-এর বাণী এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা যা দিয়ে চুল রংগিন করো তার মধ্যে কালো খেযাব খুবই উত্তম, তাতে তোমাদের প্রতি নারীদের আকর্ষণ আছে এবং জিহাদে তা কাফেরদের জন্য ভীতি সৃষ্টিকর (ইবনে মাজা, কিতাবুল লিবাস, বাবুল খিদাব বিস-সাওয়াদ)।

ফাতাওয়া আলমগীরীতে বলা হয়েছে ঃ বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এই বিষয়ে একমত যে, পুরুষের জন্য লাল রং-এর খেযাব ব্যবহার সুন্নাত এবং তা মুসলমানদের পরিচয়বাহী চিহ্ন (আলামত)। আর শত্রুবাহিনীর মধ্যে আতংক সৃষ্টির জন্য মুসলিম সৈনিকদের জন্য কালো খেযাব ব্যবহার প্রশংসনীয়। আর নারীদের জন্য আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে কারো কালো খেযাব ব্যবহার মাকরূহ, অবশ্য কতক বিশেষজ্ঞ আলেম তা সাধারণভাবেই জায়েয হিসেবে অনুমোদন করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, নারীরা যেমন পুরুষদের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্যচর্চা পছন্দ করে, আমিও তেমন তাদের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্যচর্চা পছন্দ করি (যাখীরা)। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে হেনা, কাতাম (কালো রংবাহী উদ্ভিজ্য) ও ওয়াসমা দ্বারা দাড়ি ও মাথার চুল খেযাব করা উত্তম। যুদ্ধাবস্থা ছাড়াও সাধারণ অবস্থায় সর্বাধিক সহীহ মত অনুযায়ী তা দূষণীয় নয় (আল-যীনাহ, ৫ খ., পৃ. ৩৫৯; আরও দ্র. আল-মাওসূআতুল ফিক্হিয়া, ২ খ., পৃ. ২৮০; মোল্লা আলী আল-কারীকৃত মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থ আল-মিরকাত, পোশাক অধ্যায়, ৮ খ., পৃ. ৩০৪ প.) (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, হযরত উমার (রা) ইয়াতীমের উল্লেখপূর্বক বলেছেন, পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক যদি ধনবান হয় তবে সে তার মাল ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকবে এবং ঋণ গ্রহণ করলে উত্তম পন্থায় পরিশোধ করবে। অভিভাবক গরীব হলে শরীআতের নিয়ম অনুযায়ী সে তার মাল থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। আমরা জানতে পেরেছি যে, নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ .

"ইয়াতীমের পৃষ্ঠপোষক ধনী হলে পরহেযগারী অবলম্বন করবে, আর গরীব হলে প্রচলিত নিয়মে ভাতা গ্রহণ করবে" (নিসা ঃ ৫)–এর ব্যাখ্যায় সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেছেন, সম্পদশালী অভিভাবক অবশ্যই ইয়াতীমের মাল ভোগ করা থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু গরীব অভিভাবক তার মাল থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে শরীআত নির্ধারিত পন্থায় ভোগ করবে।

٩٤١- اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَوْصِنِىْ اِلٰى يَتِيْمٍ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِيَنَّ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْتَقْرِضْ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا .

৯৪১। সিলা ইবনে যুফার (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র কাছে এসে বললো, আমাকে ইয়াতীমের ব্যাপারে উপদেশ দিন। তিনি বলেন, তার মালের সামান্য পরিমাণও খরিদ করো না এবং তার মাল থেকে সামান্য পরিমাণ ঋণও নিও না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ইয়াতীমের মাল ব্যবহার থেকে দূরে থাকাই আমাদের কাছে উত্তম। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্হবিদ সাধারণেরও এই মত।[২১]

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ একের লজ্জাস্থানের প্রতি অপরের তাকানো নিষেধ।

٩٤٢- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ بَيْنَا (بَيْنَمَا) اَنَا اَغْتَسِلُ وَيَتِيْمٌ كَانَ فِىْ حَجْرِ اَبِىْ يَصُبُّ اَحَدُنَا عَلٰى صَاحِبِهِ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا عَامِرٌ وَنَحْنُ كَذٰلِكَ فَقَالَ يَنْظُرُ بَعْضُكُمْ اِلٰى عَوْرَةِ بَعْضٍ وَاللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ

---

২১. কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল খায় তারা দোযখের আগুন দিয়ে নিজেদের পেট ভর্তি করে" (নিসা ঃ ১০)। ইয়াতীমের সাথে সদয় ব্যবহার ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান জানার জন্য কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত স্থানগুলো দ্রষ্টব্য ঃ বাকারা ঃ ৮৩, ১৭৭, ২১৫, ২২০; নিসা ঃ ২, ৩, ৬, ৮, ১০, ৩৬, ১২৭, ১২৮; আনআম ঃ ১৫২; আনফাল ঃ ৪১; ইসরা ঃ ৩৪; কাহ্ফ ঃ ৮২; হাশর ঃ ৭; দাহ্র ঃ ৮; ফাজ্র ঃ ১৭; বালাদ ঃ ১৫; দোহা ঃ ৬, ৯ ; মাউন ২ প্রভৃতি আয়াত (অনুবাদক)।

لَأَحْسَبُكُمْ خَيْرًا مِّنَّا قُلْتَ قَوْمٌ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوْلَدُوا فِي شَيْئٍ مِّنَ الْجَاهِلِيَّةِ وَاللّٰهِ لَأَظُنُّكُمْ الْخَلَفَ .

৯৪২। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমের (র)-কে বলতে শুনেছি, একদা আমি এবং আমার পিতার তত্ত্বাবধানাধীন এক ইয়াতীম একত্রে গোসল করছিলাম। আমরা পরস্পরের শরীরে পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। আমার পিতা আমের (র) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তখন আমরা গোসলরত ছিলাম। তিনি বলেন, তোমরা পরস্পরের লজ্জাস্থান দেখছো। আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাদের উভয়কে আমাদের চেয়ে উত্তম মনে করতাম। আমি বলতাম, এরা এমন একটি দল যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে, জাহিলী যুগে জন্মগ্রহণ করেনি (যে, ইসলামের শিষ্টাচার সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারে)। আল্লাহ্র শপথ! এখন তো আমি তোমাদের অযোগ্য উত্তরসুরি মনে করবো।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সতরের দিকে তাকানো জায়েয নয়, কিন্তু চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে তাকানো যেতে পারে।[২২]

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা নিষেধ।

٩٤٣-عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ أَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَّاحِدٍ قَالَ فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيْكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ قَالَ فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ قَالَ فَأَهْرِقْهَا .

৯৪৩। আবুল মুছান্না আল-জুহানী (র) বলেন, আমি মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) তার কাছে এলেন। মারওয়ান বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পানপাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করতে শুনেছি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, হাঁ। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এক নিঃশ্বাসে পানি পান করে তৃপ্ত হতে পারি না। তিনি বলেন ঃ "তোমার মুখ থেকে পানপাত্র সরিয়ে নাও, অতঃপর নিঃশ্বাস গ্রহণ করো।" সে বললো, আমি পানির মধ্যে খড়কুটা বা ময়লা দেখতে পাই। তিনি বলেন ঃ "পানি ফেলে দাও"।

---

২২. চিকিৎসা বা অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজনে নারী-পুরুষের সতরের দিকে তাকানো জায়েয। যেমন ইনজেকশন দেয়া, আহত স্থানে সেলাই, ব্যান্ডেজ, ঔষধ ইত্যাদি দেয়া, অস্ত্রপচারের প্রয়োজন হলে বা সন্তান প্রসবের সময় এবং নপুংসক কিনা তা নির্ণয়ের জন্য লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো জায়েয। এক্ষেত্রে ইসলামী আইনের মূলনীতি হলো ঃ الضرورات تبيح المحظورات "প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে" (অনুবাদক)।

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সাথে করমর্দন (মুসাফাহা) করা নিষেধ।

٩٤٤- عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ نُبَايِعُكَ عَلٰى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِي وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا وَلاَ نَأْتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيْهِ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَأَرْجُلِنَا وَلاَ نَعْصِيْكَ فِي مَعْرُوْفٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا هَلُمَّ نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ إِنِّيْ لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ وَإِنَّمَا قَوْلِيْ لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِيْ لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلَ قَوْلِيْ لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ .

৯৪৪। উমাইমা বিনতে রুকাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদল মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বাইআত হওয়ার জন্য আসলাম। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনার কাছে এই কথার উপর বাইআত হচ্ছি যে, আমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করবো না, চুরি করবো না, যেনা করবো না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবো না, কারো উপর যেনার অপবাদ আরোপ করবো না এবং ভালো কাজে আপনার বিরোধিতা করবো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "যতোদূর তোমাদের শক্তি এবং সাধ্যে কুলায়।" আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের উপর আমাদের নিজেদের তুলনায় অধিক দয়াপরবশ। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন, আমরা আপনার কাছে বাইআত হই। তিনি বলেন ঃ "আমি কখনো মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না। এক শত মহিলার কাছে আমার কথা একজন মহিলাকে বলা কথার অনুরূপ"।[২৩]

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের মর্যাদা।

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র মর্যাদা।

٩٤٥- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ لَقَدْ جَمَعَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ .

---

২৩. মহিলাদের বাইআত সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "হে নবী! তোমার নিকট মুমিন মহিলারা যদি একথার উপর বাইআত হওয়ার জন্য আসে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, নিজেদের সামনে কোন মিথ্যা (যেনা বা গোপন প্রণয়ের) অপবাদ রচনা করে আনবে না এবং কোন ন্যায়ানুগ কাজে তোমার অবাধ্য হবে না, তবে তুমি তাদের বাইআত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২)। এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, নারী-পুরুষের পরস্পর মুসাফাহা (করমর্দন) করা নিষিদ্ধ। অবশ্য পুরুষদের পরস্পর এবং নারীদের পরস্পর মুসাফাহা করা সুন্নাত (অনুবাদক)।

৯৪৫। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, আমি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন যে, "তাঁর পিতা-মাতা আমার জন্য উৎসর্গ হোক"।

উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-র মর্যাদা।

٩٤٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِىْ اِمْرَتِهٖ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنْ تَطْعَنُوْا فِىْ اِمْرَتِهٖ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِىْ اِمْرَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْاِمْرَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ مِنْ بَعْدِهٖ .

৯৪৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সেনাবাহিনী (এক যুদ্ধে) পাঠান এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-কে তাদের সেনাপতি নিয়োগ করেন। লোকেরা তার সেনাপতিত্বের ব্যাপারে আপত্তি তুললো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ "তোমরা তার নেতৃত্বের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছো এবং তোমরা তার পিতার নেতৃত্বের বেলায়ও আপত্তি তুলেছিলে। আল্লাহ্‌র শপথ! তার মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা ছিলো এবং তার পরে (যায়েদ ইবনে হারিছার পর) লোকদের মধ্যে উসামা আমার কাছে অধিক প্রিয়।"

আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র মর্যাদা।

٩٤٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بَيْنَ اَنْ يُّؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهٗ فَاخْتَارَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَهٗ فَبَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا قَالَ فَعَجِبْنَا لَهٗ وَقَالَ النَّاسُ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِخَبَرِ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَهُوَ يَقُوْلُ فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اَعْلَمَنَا بِهٖ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اٰمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهٖ وَمَالِهٖ اَبُوْ بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ وَلَا يُبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ اِلَّا خَوْخَةَ اَبِىْ بَكْرٍ .

৯৪৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (মসজিদের) মিম্বারের উপর বসলেন, অতঃপর বলেন ঃ "আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার সৌন্দর্য ও বিলাস সামগ্রী অথবা তাঁর নিকট রক্ষিত জিনিসের যে কোন একটি বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিলেন।

বান্দা নিজের জন্য আল্লাহ্র কাছে রক্ষিত জিনিস বেছে নিলো।" একথা শুনে আবু বাক্র (রা) কেঁদে দিলেন এবং বললেন, আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হোক। রাবী বলেন, তার একথায় আমরা আশ্চর্য বোধ করলাম। লোকেরা বললো, এই বৃদ্ধের কাণ্ড দেখো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বান্দা সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন, আর এই বৃদ্ধ বলছেন, আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে (দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোন একটি বেছে নেয়ার) এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। একথা আবু বাক্র (রা) আমাদের চেয়ে অধিক ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "লোকদের মধ্যে আবু বাক্রই সম্পদ দিয়ে এবং সংগ দিয়ে আমার উপর সর্বাধিক অনুগ্রহ করেছে। আমি যদি কোন ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তবে অবশ্যই আবু বাক্রকে বন্ধু বানাতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকবে। মসজিদে (নববীতে) আবু বাক্রের জানালা ছাড়া আর কারো জানালা অবশিষ্ট থাকবে না।"

ছাবেত ইবনে কায়েস আল-আনসারী (রা)-র মর্যাদা।

٩٤٨- عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اَكُوْنَ قَدْ هَلَكْتُ قَالَ لِمَ قَالَ نَهَانَا اللّٰهُ اَنْ نُحِبَّ اَنْ نُحْمَدَ بِمَا لَمْ نَفْعَلْ وَاَنَا امْرُءٌ اُحِبُّ الْحَمْدَ وَنَهَانَا عَنِ الْخُيَلاَءِ وَاَنَا امْرُءٌ اُحِبُّ الْجَمَالَ وَنَهَانَا اللّٰهُ اَنْ نَرْفَعَ اَصْوَاتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ وَاَنَا رَجُلٌ جَهِيْرُ الصَّوْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا ثَابِتُ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَعِيْشَ حَمِيْدًا وَتُقْتَلَ شَهِيْدًا وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ .

৯৪৮। ছাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস আল-আনসারী (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার আশংকা হচ্ছে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঃ "কেন?" ছাবেত (রা) বলেন, আমরা যে কাজ করিনি তার জন্য প্রশংসিত হলে তাতে খুশি হতে আল্লাহ আমাদের নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি এমন মানুষ যে, এরূপ ক্ষেত্রে প্রশংসা পাওয়া পছন্দ করি। আল্লাহ আমাদের অহংকার করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি সৌন্দর্য পছন্দ করি। আপনার সামনে আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ না করার জন্য আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর খুবই মোটা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "হে ছাবেত! তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে, তুমি এমনভাবে জীবিত থাকবে যে, তোমার প্রশংসা করা হবে, আর তুমি নিহত হয়ে শহীদ হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে?

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর দৈহিক গঠন।

٩٤٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْهَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالْاَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالْاٰدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ

بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِىْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

৯৪৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (দৈহিক গড়নে) খুব লম্বাটেও ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না, চুনের মতো সাদাও ছিলেন না, আবার একেবারে গমের রং-এর মতোও ছিলেন না, তাঁর চুল সম্পূর্ণ কোঁকড়ানোও ছিলো না এবং সোজাও ছিলো না। আল্লাহ তাআলা তাঁকে চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত দান করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় দশ বছর এবং মদীনায় দশ বছর কাটান। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে ষাট বছর বয়সে নিজের কাছে তুলে নেন। তখনও তাঁর মাথা ও দাড়ির চুল পাকেনি, মাত্র বিশটি পাকা চুল ছিলো।[২৪]

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর এবং তা যিয়ারত করা মুস্তাহাব।

٩٥٠- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَوْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ جَاءَ قَبْرَ النَّبِىِّ ﷺ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَدَعَا ثُمَّ انْصَرَفَ .

৯৫০। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) যখন সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন অথবা সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন প্রথমে নবী ﷺ -এর কবরের কাছে আসতেন, অতঃপর তাঁর প্রতি দোয়া-দুরূদ পাঠ করতেন, অতঃপর চলে যেতেন।

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা।

٩٥١-عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ .

৯৫১। আলী ইবনে হুসাইন (র) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ কোন ব্যক্তির সুন্দরতম ইসলাম হচ্ছে তার অযথা ও অনর্থক কার্যকলাপ পরিহার করা।

---

২৪. হযরত মুআবিয়া (রা)-সহ একদল সাহাবীর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এই মতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এদিক থেকে হিসাব করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় ১৩ বছর অতিবাহিত করেন। অপরদিকে হযরত আয়েশা (রা), আনাস (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা)-র বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৬০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তাঁর দাড়ির মাত্র কয়েকটি চুল পেকেছিলো। একই গ্রন্থে আনাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত আছে, তাঁর দাড়িতে মাত্র কয়েকটি সাদা চুল ছিলো। আনাস (রা)-র সূত্রে ইবনে সাদের বর্ণনায় আছে, তাঁর মাথা ও দাড়িতে ১৭ অথবা ১৮টি সাদা চুল ছিলো (অনুবাদক)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তির অবান্তর ও নিষ্ফল কথাবার্তা ও আচরণ পরিত্যাগ করা উচিত।

٩٥٢- عَنْ يَزِيْدَ بْنِ طَلْحَةَ الرُّكَانِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقَ الْاِسْلَامِ الْحَيَاءُ .

৯৫২। ইয়াযীদ ইবনে তালহা আর-রুকানী (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ প্রতিটি ধর্মের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (তার অনুসারীদের) লজ্জাশীলতা।

٩٥٣-اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا مُخْبِرٌ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ يَّعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ.

৯৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তার ভাইকে লজ্জাশীলতা সম্পর্কে (সম্ভবত পরিত্যাগ করার) উপদেশ দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জাশীলতা ঈমানের অংগ।

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার।

٩٥٤- عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مُحْصِنٍ اَنَّ عَمَّةً لَهُ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّمَا زَعَمَتْ اَنَّهُ قَالَ لَهَا اَذَاتُ زَوْجٍ اَنْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَزَعَمَتْ اَنَّهُ قَالَ لَهَا كَيْفَ اَنْتِ لَهُ فَقَالَتْ مَا اٰلُوْهُ اِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَانْظُرِىْ اَيْنَ اَنْتِ مِنْهُ فَاِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ اَوْ نَارُكِ .

৯৫৪। হুসাইন ইবনে মুহসিন (র) থেকে বর্ণিত। তার ফুফু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, তার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমার কি স্বামী আছে?" তিনি বলেন, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তার সাথে তোমার কিরূপ সম্পর্ক? তিনি বলেন, আমি (তার খেদমত করতে এবং তাকে সন্তুষ্ট করতে) চেষ্টার ত্রুটি করি না, যদি কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ " লক্ষ্য রেখো, তুমি কোথায় আছো। সে-ই তোমার বেহেশ্‌ত অথবা দোযখ।"

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানদারি করা।

٩٥٥- عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمًا وَّلَيْلَةً وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّثْوِىَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ .

৯৫৫। আবু শুরায়হ্ আল-কাবী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের আদর-যত্ন করে। সে এক রাত ও একদিন তার মেহমানদারি করবে। আর মেহমানদারি তিন দিনের বেশী নয়। এর পরও মেহমানদারি করা হলে তা সদাকা হিসাবে গণ্য হবে। আতিথ্য প্রদর্শনকারীর কষ্ট হতে পারে, এরূপ পরিমাণ সময় তার বাড়ীতে মেহমানের অবস্থান করা বৈধ নয়।

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচির জওয়াব দেয়া।

٩٥٦- اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَشَمِّتْهُ ثُمَّ اِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ثُمَّ اِنْ عَطَسَ فَقُلْ لَهُ اِنَّكَ مَضْنُوْنٌكَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ لاَ اَدْرِىْ اَبَعْدَ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ .

৯৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র ইবনে আমর ইবনে হাযম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে তার (আলহামদু লিল্লাহ-এর) জওয়াব দাও (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলো)। সে আবার হাঁচি দিলে আবার জওয়াব দাও, আবার হাঁচি দিলে আবার জওয়াব দাও। আবার হাঁচি দিলে বলো, তোমার শ্লেষ্মা আছে (ঠাণ্ডা লেগেছে)। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (র) বলেন, এ কথাটি তিনি (আবু বাক্‌র) তৃতীয় বারের পর বলেছেন না চতুর্থ বারের পর, তা আমার মনে নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে তার জওয়াব দাও। আবার হাঁচি দিলে আবার জওয়াব দাও। দুই-তিনবার হাঁচি দেয়ার পরও জওয়াব না দিলে তাও জায়েয, যদি আগেই একবার জওয়াব দেয়া হয়ে থাকে।[২৫]

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে পলায়ন।

٩٥٧-عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ هٰذَا الطَّاعُوْنَ رِجْزٌ اُرْسِلَ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَوْ اُرْسِلَ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ شَكَّ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ فِىْ اَيِّهِمَا قَالَ فَاِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِ وَاِنْ وَقَعَ فِىْ اَرْضٍ فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِّنْهُ.

৯৫৭। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "মহামারী একটা অভিশাপ, যা তোমাদের পূর্বেকার জাতির উপর নাযিল করা হয়েছিলো অথবা ইসরাঈল

---

২৫. হানাফী মাযহাবমতে হাঁচিদাতা যদি "আলহামদু লিল্লাহ" বলে তবে তার জওয়াবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ " বলা ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি হাঁচি দেয়ার পর আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলে তুমি তার জওয়াব দাও। কিন্তু সে প্রশংসা না করলে তুমি জওয়াব দিও না" (ইমাম বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ) (অনুবাদক)।

জাতির উপর নাযিল করা হয়েছিলো।" অধস্তন রাবী ইবনুল মুনকাদির (র) সন্দেহে পতিত হয়েছেন যে, তার উর্ধতন রাবী আমের ইবনে আবু ওয়াক্কাস (র) দু'টি কথার কোনটি বলেছেন। "অতএব কোন এলাকা মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার কথা শুনতে পেলে তোমরা সেখানে যাবে না। আর যদি তোমাদের এলাকায় তার প্রাদুর্ভাব হয় তবে সেখান থেকে পলায়ন করবে না।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটি একটি প্রসিদ্ধ হাদীস, একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অতএব কোথাও মহামারীর প্রাদুর্ভাব হলে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সেখানে না যাওয়ায় কোন ক্ষতি নেই।

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ গীবত এবং মিথ্যা অপবাদ।

٩٥٨- عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبِ الْمَخْزُوْمِيِّ اَنَّ رَجُلاً سَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْغِيْبَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ اَنْ يَّسْمَعَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ كَانَ حَقًّا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قُلْتَ بَاطِلاً فَذٰلِكَ الْبُهْتَانُ .

৯৫৮। মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব আল-মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলো, গীবত কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তুমি কোন ব্যক্তির এমনভাবে উল্লেখ করলে যা শুনলে সে অপছন্দ করবে।" সে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! তা যদি সত্য হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তুমি যদি (তার সম্পর্কে) মিথ্যা বলে থাকো, তবে তা হবে অপবাদ।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীসের উপর আমল করি। কোন মুসলমানের পক্ষে তার অপর মুসলমান ভাইয়ের দোষত্রুটি বর্ণনা করা, যা সে অপছন্দ করবে, ভালো কাজ নয়। কিন্তু কুপ্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত লোক, যারা বদকাজের জন্য কুখ্যাত হয়ে আছে অথবা যেসব ফাসেক প্রকাশ্যে দুষ্কর্ম করে বেড়ায়, তাদের কর্মকাণ্ড প্রকাশ করে দেওয়ায় কোন দোষ নেই। তবে কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে এমন সব দোষের কথা বলে বেড়ানো, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রকাশ্য মিথ্যা অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে।

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন কাজের বর্ণনা।

٩٥٩-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَغْلِقُوا الْبَابَ وَاَوْكُوا السِّقَاءَ وَاَكْفِئُوا الْاِنَاءَ اَوْ خَمِّرُوا الْاِنَاءَ وَاَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ غَلَقًا وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً وَلاَ يَكْشِفُ اِنَاءً وَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ (بُيُوْتَهُمْ) .

৯৫৯। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ (রাতের বেলা) ঘরের দরজা বন্ধ করে দাও, পানির কলসের মুখ বেঁধে দাও, পাত্রের মুখ ঢেকে দাও অথবা বলেছেন, কাপড় বেঁধে দাও এবং বাতি নিভিয়ে দাও। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না এবং মুখ বাঁধা কলস ও ঢাকা পাত্রও খুলতে পারে না। ইঁদুর লোকদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

٩٦٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ يَاْكُلُ فِىْ مِعًا وَالْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ .

৯৬০। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মুসলমান এক অন্ত্রে খায় এবং কাফের সাত অন্ত্রে খায়।

٩٦١-عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ السَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالَّذِىْ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ كَالَّذِىْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ .

৯৬১। সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (র) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ বিধবা ও মিসকীনদের সেবাকারী আল্লাহ্র পথের সৈনিক অথবা দিনে রোযা পালনকারী ও রাতে নফল নামায আদায়কারীর সমান (মর্যাদার অধিকারী)।

٩٦٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৯৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٩٦٣-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.

৯৬৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ সাধন করতে চান তাকে বিপদে নিক্ষেপ করেন।

٩٦٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشُّؤْمَ فِى الْمَرْاَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ .

৯৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ নারী, বাড়ি ও ঘোড়ার মধ্যে অশুভ লক্ষণ রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

اِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِىْ شَيْئٍ فَفِى الدَّارِ وَالْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ .

"কোন জিনিসের মধ্যে যদি অশুভ লক্ষণ থাকতো, তবে তা নারী, বাড়ি ও ঘোড়ার মধ্যেই থাকতো।[২৬]

٩٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِالسُّوْقِ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ اَنْ يُنَاجِيَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِىْ يُرِيْدُ اَنْ يُنَاجِيَهُ فَدَعَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلاً اٰخَرَ حَتّٰى كُنَّا اَرْبَعَةً قَالَ فَقَالَ لِىْ وَلِلرَّجُلِ الَّذِىْ اِسْتَرْخِيَا شَيْئًا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَتَنَاجٰى اِثْنَانِ دُوْنَ وَاحِدٍ .

৯৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সাথে বাজারের মধ্যে খালিদ ইবনে উকবা (রা)-র ঘরের কাছে ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে তার সাথে গোপনে কিছু কথা বলতে চাইলো। সেখানে তার সাথে আমি এবং এই ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিলো না। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) অপর এক ব্যক্তিকে ডাকলেন। এখন আমাদের সংখ্যা হলো চার। ইবনে উমার (রা) আমাকে এবং এই শেষোক্ত

---

২৬. আবু হাসান আল-আরাজ (র) বলেন, দুই ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে এসে বললো, আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, ঃ " কুলক্ষণ শুধু স্ত্রীলোক, ঘোড়া ও ঘরের মধ্যে রয়েছে।" একথার উপর আয়েশা (রা) বলেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি আবুল কাসিম (মুহাম্মাদ) ﷺ-এর উপর কুরআন নাযিল করেছেন! তিনি তো একথা বলতেন না। বরং তিনি বলতেন ঃ "জাহিলী যুগের লোকেরা স্ত্রীলোক, ঘোড়া এবং ঘরের মধ্যে কুলক্ষণ রয়েছে বলে বিশ্বাস করতো"। অতঃপর আয়েশা (রা) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ .

"এমন কোন বিপদ নেই যা পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের উপর আপতিত হয়, আর আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বে একটি কিতাবে লিখে রাখিনি। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই সহজ" (সূরা হাদীদ ঃ ২২) (মুসনাদে আহমাদ)। আয়েশা (রা)-র বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহিলী যুগের লোকদের এই অমূলক ধারণা-বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করেছেন। অন্যথায় তিনি মহিলাদের যে মর্যাদা দিয়েছেন তাতে তাদের সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মন্তব্য কল্পনা করা যায় না। তিনি তো কন্যা সন্তানদের লালন-পালনকে বেহেশতে যাওয়ার উপায় হিসাবে ঘোষণা করেছেন। ঘোড়া সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ "ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।" অতএব কোন নারী, বাড়ী বা পশুর মধ্যে ক্ষতিকর কিছু দৃষ্টিগোচর হলে তার ভিন্নতর কারণ থাকতে পারে। যেমন কোন বাড়ির মাটির মধ্যে এমন কোন পদার্থ মিশ্রিত থাকতে পারে যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। অনুরূপভাবে কোন নারীর দেহে এমন কোন উপাদান থাকতে পারে যা কোন পুরুষলোকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর (অনুবাদক)।

ব্যক্তিকে বললেন, তোমরা দু'জন একটু দূরে সরে যাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ "দুই ব্যক্তি একজনকে একাকী রেখে যেন কানকথা না বলে।"

٩٦٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرَةِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَاِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُوْنِىْ مَا هِىَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِىْ شَجَرِ الْبَوَادِىْ فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالُوْا حَدِّثْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هِىَ قَالَ النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِالَّذِىْ وَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ لَاَنْ تَكُوْنَ قُلْتَهَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لِىْ كَذَا وَكَذَا .

৯৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝড়ে না। তা মুসলিম ব্যক্তির অনুরূপ। বলো, সেই গাছ কোনটি?" আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, লোকেরা বন–জংগলের গাছের কথা চিন্তা করতে লাগলো। আমার মনে ধারণা জাগলো যে, তা খেজুর গাছ। কিন্তু তা প্রকাশ করতে আমি সংকোচ বোধ করলাম। লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের বলে দিন, সেটি কি গাছ? তিনি বলেন ঃ 'খেজুর গাছ।' আবদুল্লাহ (রা) বলেন, পরে আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে আমার মনের কথাটি খুলে বললাম। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি যদি তা বলে দিতে তবে তা আমার কাছে এতো এতো পরিমাণ (অঢেল) সম্পদ থাকার চেয়েও আনন্দের বিষয় হতো।

٩٦٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غِفَارٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৯৬৭। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, আসলাম গোত্রকে আল্লাহ হেফাজতে রেখেছেন এবং উসাইয়্যা গোত্রের লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।[২৭]

---

২৭. আবু যার গিফারী (রা) গিফার গোত্রের লোক ছিলেন। জাহিলী যুগে এই গোত্রের লোকেরা হাজীদের মালপত্র চুরি করতো। তারা ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই বদনামী দূরীভূত হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন। আসলাম গোত্রের লোকেরা বিনা যুদ্ধেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। গিফার গোত্রের লোকেরাও স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। তাই আল্লাহ্‌র রাসূল তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন। উসাইয়্যা গোত্রের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে বিরে মাউনা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্তরজন সাহাবীকে নির্মমভাবে হত্যা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোপানলে পতিত হয় (অনুবাদক)।

٩٦٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا حِيْنَ نُبَايِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ .

৯৬৮। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (নির্দেশ) শোনা ও আনুগত্য করার জন্য বাইআত হতাম তখন তিনি আমাদের বলতেনঃ "তোমাদের সামর্থ্যে যতোদূর কুলায়।"

٩٦٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ لاَ تَدْخُلُوْا عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِيْنَ الاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَانْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ يُصِيْبُكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ .

৯৬৯। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজর-এর অধিবাসীদের সম্পর্কে বলেন ঃ "আল্লাহ্র গযবে নিপতিত এই জাতির এলাকায় তোমরা প্রবেশ করো না, কিন্তু ক্রন্দনরত অবস্থায় (প্রবেশ করো)। যদি কাঁদতে না পারো তবে সেখানে যেও না। কেননা হয়তো তোমাদের উপরও এদের অনুরূপ গযব এসে পড়তে পারে।[২৮]

٩٧٠- عَنْ اَبِيْ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ اَدْرَكْتُ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُوْنَ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْمَعْلُوْمَةِ الْمَعْرُوْفَةِ اَنْ تَرَى الرَّجُلَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لاَ يَشُكُّ مَنْ رَاٰهُ اَنْ يَّدْخُلَ لِسُوْءٍ غَيْرَ اَنَّ الْجُدُرَ تُوَارِيْهِ .

৯৭০। আবু মুহায়রীয (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবীকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি আলামত এই যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে কারো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখবে। সে যে দুষ্কর্ম করার জন্য ঘরে প্রবেশ করছে তাতে তার কোন সন্দেহ থাকবে না। দর্শনকারীও প্রবেশকারীর মাঝে কেবল দেয়ালের প্রতিবন্ধক থাকবে।

---

২৮. হিজর-এর অধিবাসী (اصحاب الحجر) বলতে সামূদ জাতিকে বুঝানো হয়েছে। হযরত সালেহ (আ)-কে তাদের হেদায়াতের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু তারা তাঁকে অমান্য করে এবং তাঁর উষ্ট্রী হত্যা করে, যা তাদের জন্য নিদর্শন হিসাবে পাঠানো হয়েছিলো। অতঃপর আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেন। এই ধ্বংসাবশেষ মদীনা শহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান আল-উলা শহরের কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটি বর্তমানেও আল-হিজর নামে পরিচিত। মদীনা ও তাবূকের মাঝখানে হেজাজ রেলপথে 'মাদায়েন সালেহ' নামে এখানে একটি রেলস্টেশনও রয়েছে। এটাই ছিলো সামূদ জাতির কেন্দ্রস্থল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থানে অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন (অনুবাদক)।

٩٧١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا عَمِّيْ أَبُوْ سُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ النَّاسُ إِلَيْهِ الاَّ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ .

৯৭১। আবু সুহাইল (র) বলেন, আমি আমার পিতা (মালেক ইবনে আবু আমের আল-আসবাহী)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি নামাযের আযান ছাড়া আর কোন জিনিসই এমন দেখছি না, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের মতো অবিকল ও অবিকৃত অবস্থায় কায়েম আছে।

٩٧٢-أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا لِيْ مُخْبِرٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنِّيْ أُنْسٰى لِأَسُنَّ.

৯৭২। ইমাম মালেক (র) বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আমাকে ভুলিয়ে দেয়া (ভুলে যাওয়া, মনে না থাকা) হয়, যাতে আমি (ভুল হয়ে গেলে কি করতে হবে সেই) সুন্নাত প্রবর্তন করতে পারি।

٩٧٣- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدٰى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى .

৯৭৩। উবাদা ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার (উতবা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে নববীতে তাঁর এক হাত অপর হাতের উপর রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।

٩٧٤- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ كَانَا يَفْعَلاَنِ ذٰلِكَ .

৯৭৪। ইবনে শিহাব (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং উছমান (রা)-ও তাই করতেন।[২৯]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এরূপ শোয়ায় আমরা দোষ মনে করি না। ইমাম আবু হানীফারও এই মত।

---

২৯. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, এভাবে শো য়া যে জায়েয, তা দেখানো ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য। অন্যথায় সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের (রা) -র সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ "এক হাতের উপর অপর হাত রেখে চিৎ হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন।" ইমাম বায়হাকী ও মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী (র) বলেন, সতর আনাবৃত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে এভাবে শয়ন করবে না, আর এই আশংকা না থাকলে এভাবে শোয়ায় দোষ নেই। দু'টি হাদীসের যে কোন একটিকে মানসূখ (রহিত) সাব্যস্ত করার চেয়ে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করাই উত্তম। দুই পায়ের একটি অপরটির উপর রেখে এভাবে শোয়ার ক্ষেত্রেও একই হুকুম। ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার, উসামা, উছমান, আনাস (রা), হাসান বসরী, ইবনুল মুসাইয়্যাব, শাবী (র) প্রমুখের মতে এভাবে শোয়ায় কোন দোষ নেই। অরপদিকে ইবনে আব্বাস, কাব ইবনে উজরা (রা) ইবনে সীরীন, মুজাহিদ, তাউস, নাখঈ প্রমুখ এভাবে শোয়া মাকরূহ বলেছেন (উমদাতুল কারী) (অনুবাদক)।

٩٧٥- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ قِيْلَ لِعَائِشَةَ لَوْ دُفِنْتِ مَعَهُمْ قَالَ قَالَتْ اِنِّىْ اِذاً لأَنَا الْمُبْتَدِئَةُ بِعَمَلِىْ .

৯৭৫। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, আয়েশা (রা)-কে বলা হলো, আপনাকেও যদি তাঁদের (নবী ﷺ ও আবু বাক্‌র) সাথে দাফন করা হয় (অর্থাৎ আপনি যদি এই ওসিয়াত করে যেতেন)। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) বললেন, তাহলে আমিই প্রথম ওসিয়াতকারী হতাম (অন্যরা একাজ করলে, আমিও করতাম)।

٩٧٦- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ قَالَ سَلَمَةُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَا شَأْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَمْ يُدْفَنْ مَعَهُمْ فَسَكَتَ ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ اِنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَوْمَئِذٍ مُتَشَاغِلِيْنَ .

৯৭৬। ইমাম মালেক (র) বলেন, সালামা (র) উমার ইবনে আবদুল্লাকে বলেন, উছমান ইবনে আফফান (রা)-কে তাদের (রাসূল ﷺ, আবু বাক্‌র ও উমার) সাথে দাফন করা হয়নি কেন? তিনি এর জবাবদানে বিরত থাকলেন। সালামা পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন। উমার ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, লোকজন সেদিন গোলযোগে জর্জরিত ছিলো।

٩٧٧- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ وُقِّىَ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ وَاَعَادَ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ مَنْ وُقِّىَ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ .

৯৭৭। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ "যে ব্যক্তি দু'টি জিনিসের খারাবী থেকে বেঁচে থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।" তিনি একথা তিনবার বলেছেন যে, যে ব্যক্তি দু'টি জিনিসের দুষ্কৃতি থেকে দূরে থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। এর একটি যা দুই চোয়ালের মাঝখানে অবস্থিত (মুখ) এবং অপরটি যা দুই পায়ের মাঝখানে অবস্থিত (যৌনাংগ)।

٩٧٨- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ كَانَ يَقُوْلُ لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَتَقْسُو قُلُوْبُكُمْ فَاِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِىَ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلٰكِنْ لاَّ تَعْلَمُوْنَ وَلاَ تَنْظُرُوْا فِىْ ذُنُوْبِ النَّاسِ كَاَنَّكُمْ اَرْبَابٌ وَانْظُرُوْا فِيْهَا كَاَنَّكُمْ عَبِيْدٌ فَاِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًى وَّمُعَافٍ فَارْحَمُوْا اَهْلَ الْبَلاَءِ وَاحْمَدُوا اللّٰهَ تَعَالٰى عَلَى الْعَافِيَةِ .

৯৭৮। ইমাম মালেক (র) বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) বলতেন ঃ "আল্লাহ্‌র যিকির ছাড়া অন্য কথা বেশী বলো না। কেননা তাতে অন্তর পাষাণ হয়ে

যায় এবং পাষাণ হৃদয় আল্লাহ্‌র রহমাত থেকে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু তোমরা তা জানো না। লোকদের গুনাহসমূহ এমন দৃষ্টিতে দেখো না যেন তোমরা সর্বময় কর্তা, বরং এভাবে দেখো যেন তোমরা দাসানুদাস। কেননা অধিকাংশ লোকই গুনাহে জড়িয়ে পড়ে এবং তাদের ক্ষমাও করা হয়। তোমরা এই অপরাধী লোকদের দয়ার দৃষ্টিতে দেখো এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তিনিই তোমাদের নিরাপদ রাখেন।"

٩٧٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ السَّفْرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضٰى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلٰى أَهْلِهِ .

৯৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ সফর হচ্ছে এক প্রকার শাস্তি। তা তোমাদের সফরকারী ব্যক্তিকে ঘুম, পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত রাখে। অতএব তোমাদের কারো উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে সে যেন দ্রুত সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে।

٩٨٠- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا أَقْوٰى عَلٰى هٰذَا الْأَمْرِ مِنِّيْ لَكَانَ أَنْ أُقَدَّمَ فَيُضْرَبَ عُنُقِيْ أَهْوَنَ عَلَيَّ فَمَنْ وَلِيَ هٰذَا الْأَمْرَ بَعْدِيْ فَلْيَعْلَمْ أَنْ سَيَرُدَّهُ عَنْهُ الْقَرِيْبُ وَالْبَعِيْدُ وَأَيْمُ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُ لَأُقَاتِلُ النَّاسَ عَنْ نَفْسِيْ .

৯৮০। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, আমি যদি জানতে পারতাম, কোন ব্যক্তি খিলাফতের দায়িত্বভার বহন করতে আমার তুলনায় অধিক যোগ্য, আর এ অবস্থায় আমাকে (জল্লাদের সামনে) হত্যার জন্য ঠেলে দেয়া হতো, তবে তা খিলাফতের ভারবোঝা বহন করার তুলনায় আমার জন্য সহজতর হতো। আমার পরে যার উপর এই দায়িত্বভার অর্পণ করা হবে, তার জেনে রাখা উচিৎ যে, তার উপর নিকট ও দূর থেকে আরোপিত অভিযোগসমূহ তাকে খণ্ডন করতে হবে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি হলে (নিজের উপর আরোপিত অভিযোগসমূহ খণ্ডন করতে) লোকজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতাম।

٩٨١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنِيْ مُخْبِرٌ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ النَّاسُ وَرَقًا لَا شَوْكَ فِيْهِ وَهُمُ الْيَوْمَ شَوْكٌ لَا وَرَقَ فِيْهِ إِنْ تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوْكَ وَإِنْ نَقَدْتَهُمْ نَقَدُوْكَ ۔

৯৮১। আবু দারদা (রা) বলেন, আগেকার লোকেরা ছিলো গাছের পাতার মতো, যাতে কোন কাঁটা ছিলো না। আর আজকের লোকেরা কাঁটা আর কাঁটা, যার মধ্যে কোন পাতা নেই। তুমি

যদি তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও (তাদের সাথে মতবিরোধ না করো), তবে তারা কিন্তু তোমাকে ছাড়বে না। আর তুমি যদি তাদের সমালোচনা করো, তবে তারাও তোমার সমালোচনা করবে।

٩٨٢- اَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ كَانَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَوَّلُ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ وَاَوَّلُ النَّاسِ (مَنْ) اخْتَتَنَ وَاَوَّلُ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ وَاَوَّلُ النَّاسِ رَاَى الشَّيْبَ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هٰذَا فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَارٌ يَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِىْ وَقَاراً .

৯৮২। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালামই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি মেহমানদারি করেন। তিনিই সর্বপ্রথম নিজের খতনা করেন এবং গোঁফ খাটো করেন। তিনিই সর্বপ্রথম নিজের মাথায় সাদা চুল দেখে বলেন, হে প্রভু! এ কি জিনিস? আল্লাহ তাআলা বলেন, হে ইবরাহীম! এ হচ্ছে গাম্ভীর্য ও মাহাত্ম। তিনি বলেন, হে প্রভু! আমার মাহাত্ম ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করে দাও।"

٩٨٣- عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَهْبِطُ مِنْ ثَنِيَّةِ هَرْشٰى مَاشِيًا عَلَيْهِ ثَوْبٌ اَسْوَدُ .

৯৮৩। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি যেন মূসা আলাইহিস সালামকে একটি কালো কাপড় পরিহিত অবস্থায় হারশা পর্বতের চূড়া থেকে হেঁটে হেঁটে নামতে দেখছি।

٩٨٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ اِلاَّ اَنْ يُقْطِعَ لِاِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِىْ اُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ .

৯৮৪। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদের মধ্যে বাহরাইনের জমি বণ্টন করে দেয়ার জন্য তাদের ডাকলেন। তারা বলেন, আল্লাহ্র শপথ! যতোক্ষণ আমাদের কুরাইশ মুহাজির ভাইদের ভাগে আমাদের সমান পরিমাণ অংশ না পড়বে ততোক্ষণ আমরা তা গ্রহণ করবো না। কথাটি তারা দুই অথবা তিনবার বলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ 'অচিরেই তোমরা পার্থিব স্বার্থ হাসিলের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করবে। আমার সাথে সাক্ষাত না করা পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে।"

৯৮৫- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِامْرِءٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ .

৯৮৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ "যাবতীয় কাজ নিয়াতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক মানুষ তার নিয়াত অনুযায়ী ফল পাবে। অতএব যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হবে পার্থিব স্বার্থ লাভের দিকে, সে তার সাক্ষাত পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করার নিয়াতে হিজরত করে, তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে, যার দিকে সে হিজরত করেছে।[৩০]

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঘী-এর মধ্যে ইঁদুর পতিত হলে।

৯৮৬- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ وَقَعَتْ فِىْ سَمْنٍ فَمَاتَتْ قَالَ خُذُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا مِنَ السَّمْنِ فَاطْرَحُوْهُ .

---

৩০. সহীহ বুখারীর সাত স্থানে হাদীসটি সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহেও তা সন্নিবেশিত হয়েছে ঃ মুসলিম (জিহাদ, ইমারাত), আবু দাউদ (তালাক), তিরমিযী (হুদূদ), নাসাঈ (ঈমান, তাহারাত, ইতাক, তালাক), ইবনে মাজা (যুহ্‌দ), মুসনাদে আহমাদ, দারুকুতনী, ইবনে হিব্বান ও বায়হাকী। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর ভাষায় ইমাম মালিকের "মুওয়াত্তা" ছাড়া আর সকল প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি সংকলিত হয়েছে। সব জায়গায়ই হযরত উমার (রা)-এর রাবী। অপর কোন সাহাবীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি। এটা মুতাওয়াতির হাদীস না হলেও আশ্চর্যজনকভাবে তা প্রসিদ্ধ ও সর্বজন জ্ঞাত হাদীস।

নিয়াত (النية) শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা, সংকল্প, স্পৃহা, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ইত্যাদি। এর পারিভাষিক অর্থ, "আল্লাহ্‌র সন্তোষলাভ ও তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করার দিকে হৃদয়-মনের লক্ষ্য আরোপ ও উদ্যোগ গ্রহণ" (আল-ফাতহুর রব্বানী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭)। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন, "তোমাদের মনের দ্বারা কোন জিনিসের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা এবং নিজের দ্বারা এর বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়া।" আল্লামা বায়যাবী বলেন, "বর্তমান কি ভবিষ্যতের কোন উপকার লাভ অথবা কোন ক্ষতির প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অনুকূল কাজ করার জন্য মনের উদ্যোগ-উদ্বোধনকেই বলা হয় নিয়াত" (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩)। আল্লামা খাত্তাবী এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন, " সকল কাজই নিয়াতের উপর নির্ভরশীল", তার অর্থ যাবতীয় কাজের বিশুদ্ধতা এবং এর ফললাভ নিয়াত অনুযায়ী হয়ে থাকে। কারণ নিয়াতই মানুষের কাজের দিক নির্দেশ করে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নিয়াত ছাড়া মূল কাজটিই অসম্পাদিত থেকে যায়। কেননা কাজ তো করলেই হয়, নিয়াত না করলেও তা সংঘটিত হতে পারে (মাআলিমুস সুনান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৪)।

এ হাদীস থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, ইবাদতের সমস্ত কাজেই নিয়াত এক শর্তবিশেষ। নিয়াতহীন, উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন ইবাদত করলে তা ইবাদত হিসাবে গণ্য হতে পারে না (ফাতহুর রব্বানী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯) (অনুবাদক)।

৯৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। ঘী-র মধ্যে ইঁদুর পড়ে মারা গেলে নবী ﷺ -এর কাছে তার বিধান জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেনঃ "ইঁদুর এবং এর চারপাশের ঘী তুলে ফেলে দাও।"

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করি। ঘী যদি জমাটবদ্ধ থাকে তবে ইঁদুর ও এর চারপাশের ঘী তুলে ফেলে দিতে হবে এবং অবশিষ্ট ঘী খাওয়া যাবে। কিন্তু তা যদি তরল হয় তবে তা খাওয়া যাবে না। তা বাতি জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণের এই মত।

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত জন্তুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা।

৯৮৭-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دُبِغَ الْاِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ .

৯৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর তা পাক হয়ে যায়।

৯৮৮- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ .

৯৮৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন যে, (হালাল) মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর তা কাজে লাগানো যেতে পারে।

৯৮৯- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ كَانَ اَعْطَاهَا مَوْلًى لِمَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ مَيْتَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حَرُمَ اَكْلُهَا .

৯৮৯। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে (মুরসাল সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি মৃত বকরীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এটা তাঁর স্ত্রী মাইমূনা (রা)-র এক মুক্তদাসকে দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এর চামড়া তোমরা কাজে লাগাওনি কেন? লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা তো মৃত জীব। তিনি বলেন ঃ এটা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করাই কেবল হারাম।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস গ্রহণ করেছি। মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর তা পাক হয়ে যায়। প্রক্রিয়াজাত করাই হচ্ছে তা পবিত্র করা। তা কাজে লাগানোয় কোন দোষ নেই। তা বিক্রি করায়ও কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণের এই মত।[৩১]

---

৩১. জমহূর আলেমদের মতে মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর তা পাক হয়ে যায় এবং তা কাজে লাগানো জায়েয। তারা এ থেকে মানুষের চামড়া (তার মর্যাদার কারণে) এবং শূকর ও কুকুরের চামড়া (তা মূলগতভাবেই হারাম ও নাপাক হওয়ার কারণে) এই নির্দেশের বাইরে রেখেছেন। তা প্রক্রিয়াজাত করার পরও হারাম থেকে যায় এবং তার ব্যবহার জায়েয নয়। হানাফী

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ রক্তমোক্ষণ কার্যের পারিশ্রমিক।

৯৯০- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَمَ اَبُوْ طَيْبَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَاهُ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُّخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ .

৯৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবু তাইবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রক্তমোক্ষণ করলেন। তিনি তাকে এক সা (সাড়ে তিন সের) খেজুর দিলেন এবং তার মালিক পরিবারকে তার উপর ধার্যকৃত রোজগারের পরিমাণ কমিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[৩২]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এ হাদীস গ্রহণ করেছি। রক্তমোক্ষণকারীকে তার পারিশ্রমিক দেয়ায় কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফার এই মত।

৯৯১- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمَمْلُوْكُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ لاَ يُصْلِحُ لِلْمَمْلُوْكِ اَنْ يُّنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ اِذْنِ سَيِّدِهِ اِلاَّ اَنْ يَّاكُلَ اَوْ يَكْتَسِيَ اَوْ يُنْفِقَ بِالْمَعْرُوْفِ .

৯৯১। ইবনে উমার (রা) বলেন, ক্রীতদাস ও তার সম্পদের মালিক হচ্ছে তার মনিব। তার অনুমতি ছাড়া এই মাল থেকে খরচ করা তার জন্য জায়েয নয়। কিন্তু খাওয়া-পরার জন্য এবং ন্যায়সংগতভাবে তা থেকে (মনিবের অনুমতি ছাড়াও) নিজের জন্য খরচ করতে পারবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র)-ও এই মত পোষণ করেন। তবে তার মতে, 'খাদ্যদ্রব্য থেকে অন্যকে খাওয়ানো এবং জন্তুযান অন্যকে ধার দেয়া তার জন্য জায়েয।' কিন্তু একটি দিরহাম অথবা দীনার অথবা কাপড় কাউকে দান করা তার জন্য জায়েয নয়।

আলেমদের এই মত। আওযাঈ, ইবনুল মুবারক ও ইসহাকের মতে, যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, কেবল সেগুলোর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পর ব্যবহার করা জায়েয। অপরদিকে উমার, ইবনে উমার ও আয়েশা (রা)-র মতে মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পরও তা পাক হয় না, নাপাকই থেকে যায়। ইমাম আহমাদও প্রথমে এই মত পোষণ করতেন। পরে তিনি জমহূরের মত গ্রহণ করেন। ইমাম যুহরীর মতে মৃত জীবের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার পূর্বেই কাজে লাগানো জায়েয। এখানে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, মৃত জীবের গোশত খাওয়াই হারাম করা হয়েছে। কিন্তু এর কোন অংগ (যেমন হাড়, শিং ইত্যাদি) কাজে লাগানো নাজায়েয নয় (অনুবাদক)।

৩২. রক্তমোক্ষণ সম্পর্কে যে নেতিবাচক নির্দেশ সম্বলিত হাদীস (তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ ও আসহাবে সুনান) রয়েছে, জমহূর আলেম ও আবু হানীফার মতে তা মাকরূহ পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা বুঝায় (অনুবাদক)।

৯৯২– عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تِسْعُ صِحَافٍ يَبْعَثُ بِهَا اِلَى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ كَانَتِ الطُّرْفَةُ اَوِ الْفَاكِهَةُ اَوِ الْقِسْمُ وَكَانَ يَبْعَثُ بِاٰخِرِهِنَّ صَحْفَةً اِلَى حَفْصَةَ فَاِنْ كَانَ قِلَّةٌ اَوْ نُقْصَانٌ كَانَ بِهَا .

৯৯২। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নয়টি খাবারের থালা ছিলো। তিনি যখন তার (খিলাফতকালে) নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের কাছে ফল, খাবার অথবা গোশত উপঢৌকন পাঠাতেন, তখন সর্বশেষ থালাটি যেতো (তার কন্যা) হাফসা (রা)-র ঘরে। যদি তাতে স্বল্পতা দেখা দিতো অথবা কোন ত্রুটি লক্ষ্য করা যেতো, তবে তা তার ভাগেই পড়তো (কারণ কন্যার পক্ষ থেকে আপত্তি বা অভিমানের আশংকা ছিলো না)।

৯৯৩– عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ يَعْنِيْ فِتْنَةَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ اَحَدٌ ثُمَّ وَقَعَتْ فِتْنَةُ الْحَرَّةِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ اَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ اَحَدٌ فَاِنْ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ لَمْ يَبْقَ بِالنَّاسِ طَبَاخٌ .

৯৯৩। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছেন, হযরত উছমান (রা)-র হত্যার বিপর্যয় ও বিশৃংখলা (৩৫ হি.) দেখা দিলে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের কেউই বাকী থাকলেন না (সবাই গোলযোগে জড়িয়ে পড়লেন)। অতঃপর হাররা-র মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হলে হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে উপস্থিত সাহাবীদের কেউ (তার আক্রমণ থেকে) বেঁচে থাকতে পারেননি। অতঃপর তৃতীয় কোন গোলযোগ দেখা দিলে কোন জ্ঞানবান ও প্রতিভাবান ব্যক্তিই অবশিষ্ট থাকবে না।[৩৩]

---

৩৩. গোলযোগ ও বিশৃংলাই অশান্তি, বিপর্যয় ও দুর্ভাগ্যের প্রসূতি। এর ফলে সমাজের শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নতি চরমভাবে ব্যাহত হয়। এর প্রতিক্রিয়া এতোই ব্যাপক যে, তার পরবর্তী যুগ আরো নিকৃষ্টতর হয়ে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে একটি সমাজ, একটি জাতি ও একটি আদর্শের পতন ঘটে। কালের ইতিহাস এর সাক্ষী।

হাররা (الحرة) মদীনা শহরের উপকণ্ঠে একটি প্রস্তরময় এলাকার নাম। কারবালার প্রান্তরে হযরত হুসাইন (রা) পরিবার-পরিজনসহ অসহায় অবস্থায় নির্মমভাবে ইয়াযীদ বাহিনীর হাতে নিহত হলে গোটা মুসলিম জাহানে ত্রাস ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রতিক্রিয়া মদীনায়ও দেখা দেয়। মদীনাবাসীগণ ইয়াযীদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইয়াযীদ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য তার বেতনভুক সিরীয় সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। হাররা নামক স্থানে ৬৩ হিজরী সনে মদীনাবাসী ও ইয়াযীদ বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। স্বল্পতার কারণে মদীনাবাসীগণ চরমভাবে পরাজয় বরণ করেন। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বহু আনসার ও মুহাজির সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। বিজয়োল্লাসে মত্ত ইয়াযীদ বাহিনী তিনদিন ধরে মদীনা শহর লুণ্ঠন করে, নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে। ইসলামের ইতিহাসে এটাই হাররার মর্মান্তিক ঘটনা নামে পরিচিত।

তৃতীয় গোলযোগ দেখা দিলে আর কোন সাহাবীই অবশিষ্ট থাকবেন না বলে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) আশংকা প্রকাশ করেছেন (অনুবাদক)।

٩٩٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ رَاعِيَةٌ عَلٰى مَالِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

৯৯৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক (পাহারাদার ও অভিভাবক) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ রক্ষণাবেক্ষণ (পাহারাদারি ও অভিভাবকত্ব) সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। জনগণের আমীর (নেতা) তাদের রক্ষক। তাদের সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের অভিভাবক। তাকেও তাদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ধন-সম্পদ ও সন্তানের রক্ষক। এদের সম্পর্কে তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। দাস তার মনিবের সম্পদের রক্ষক। এ সম্পর্কে তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। অতএব তোমরা সকলেই অভিভাবক (রক্ষক ও পাহারাদার) এবং তোমাদের সকলকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে (আল্লাহ্‌র কাছে) জবাবদিহি করতে হবে।

٩٩٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْغَادِرَ يَقُوْمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ فَيُقَالُ هٰذِهِ غُدْرَةُ فُلَانٍ .

৯৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক দাঁড়াবে। তার জন্য একটি পতাকা স্থাপন করা হবে এবং বলা হবে, এটা অমুক ব্যক্তির প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা।

٩٩٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৯৯৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও বরকত লিপিবদ্ধ থাকবে।

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা।

٩٩٧- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَاٰهُ يَبُوْلُ قَائِمًا .

৯৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখেছেন।[৩৪]

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দাঁড়িয়ে পেশাব করায় দোষ নেই। তবে বসে পেশাব করাই উত্তম।

٩٩٨–عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ .

৯৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমাকে ছেড়ে দাও যতোক্ষণ আমি তোমাদের ছেড়ে দেই (অর্থাৎ প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না)। কেননা তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহ এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা নিজেদের নবীদের প্রশ্ন করতো এবং তাঁদের সাথে মতভেদ করতো। অতএব আমি তোমাদের যা থেকে বিরত থাকতে বলি, তোমরা তা থেকে বিরত থাকো।

٩٩٩– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ ابْنَ اَبِىْ قُحَافَةَ نَزَعَ دَلْوًا اَوْ دَلْوَيْنِ فِىْ نَزْعِهِ ضُعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِّنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَهُ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ .

৯৯৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে আবু কুহাফার পুত্র (আবু বাক্র)-কে কূপ থেকে এক অথবা দুই বালতি পানি তুলতে দেখলাম। বালতি টেনে তুলতে তার মধ্যে দুর্বলতা লক্ষ্য করলাম। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে বালতি তুলতে দেখলাম। লোকদের মধ্যে তার মতো শক্তিশালী আর কাউকে দেখিনি। সে কূপ থেকে বালতি দিয়ে পানি তুলতে থাকলো। এমনকি লোকেরা নিজ নিজ পশুর পানি পান করার জলাধার পূর্ণ করে নিলো।[৩৫]

---

৩৪. বিধিবদ্ধ বিষয়, এমনকি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) কঠোরভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করতেন। তাই হয়তো কখনো কখনো তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে দাঁড়িয়ে পেশাব করে থাকবেন। হুযায়ফা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সম্প্রদায়ের ময়লা ফেলার স্থানে এলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন" (আবু দাউদ)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা ব্যথ্যার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন" (হাকেম, বায়হাকী)। সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) বলেন যে, "তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখেছেন" (তাবারানী)। দাঁড়িয়ে পেশাব করাও যে জায়েয তা দেখানোর উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। অন্যথায় তাঁর এবং তাঁর সাহাবীদের বসে বসে পেশাব করাই ছিলো সাধারণ অভ্যাস এবং এটাই তাঁর ইসলামী শিষ্টাচারের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি তোমাদের বলবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তার কথা বিশ্বাস করো না" (নাসাঈ, তিরমিযী) (অনুবাদক)।

৩৫. হাদীসে আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) ও উমার ফারূক (রা)-র খেলাফত লাভ, তাদের প্রশাসনিক দক্ষতা ও দুর্বলতা এবং সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে (অনুবাদক)।

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআনের কতিপয় আয়াতের তাফসীর।

মধ্যবর্তী নামায

١٠٠٠- عَنْ اَبِى يَرْبُوْعَ الْمَخْزُوْمِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُوْلُ الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الظُّهْرِ .

১০০০। আবু ইয়ারবূ আল-মাখযূমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-কে বলতে শুনেছেন, মধ্যবর্তী নামায হচ্ছে যুহরের নামায।

١٠٠١- عَنْ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ اَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَاٰذِنِّىْ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا اٰذَنْتُهَا فَقَالَتْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১০০১। আমর ইবনে রাফে (র) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসা (রা)-র জন্য কুরআন মজীদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করছিলাম। তিনি বলেন, তুমি অমুক আয়াতে পৌঁছে আমাকে জানাবে। আমি সেই আয়াতে পৌঁছে তাকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন, লেখোঃ "তোমরা নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হেফাজত করো, মধ্যবর্তী ওয়াক্তের নামায এবং আসর নামাযেরও। আর তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য অনুগত হয়ে দাঁড়াও"। আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শুনেছি।

١٠٠٢- عَنْ اَبِى يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ قَالَ اَمَرَتْنِىْ اَنْ اَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا قَالَتْ اِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَاٰذِنِّىْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১০০২। আয়েশা (রা)-র মুক্তদাস আবু ইউনুস (র) বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে তার জন্য কুরআন মজীদের একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও বলেন, তুমি যখন حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى আয়াতে পৌঁছবে তখন আমাকে অবহিত করবে। আমি তার নির্দেশিত আয়াতে পৌঁছে তাকে অবহিত করলাম। তিনি আমাকে আয়াতটি এভাবে লেখার নির্দেশ দিলেন ঃ (হাদীসের মূল পাঠে উল্লেখিত)। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আয়াতটি এরূপই শুনেছি।[৩৬]

---

৩৬. উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা ও হযরত আয়েশা (রা)-র বর্ণনায় আয়াতটি একইরূপ উল্লেখিত হয়েছে। বর্তমানে গোটা দুনিয়ায় প্রচলিত কুরআনের পাঠে وصلوة العصر কথাটুকু নেই (সূরা বাকারা, ২৩৮ নম্বর আয়াত দ্রষ্টব্য)। কুরআনের কোন কোন আয়াতের একাধিক বিকল্প পাঠ রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতটিও তার অন্তর্ভুক্ত। এসব পাঠ হাদীস ও তাফসীরের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে। কিন্তু হযরত উছমান (রা)-র আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মূল কুরআনের একটি মাত্র পাঠ প্রচলিত আছে এবং এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পাঠ হিসাবে গোটা মুসলিম উম্মাতের কাছে স্বীকৃত।

١٠٠٣- اَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ صَيَّادٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ فِى الْبَاقِيَاتِ الصّٰلِحٰتِ قَوْلُ الْعَبْدِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ .

১০০৩। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল-বাকিয়াতুস সালিহাতু" আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, বান্দা বলবে (মূল পাঠ হাদীসে দ্র.) ঃ "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান, মহামহিম আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া মন্দকে রোধ করার এবং কল্যাণ লাভ করার অন্য কোন উপায় নেই।"

আয়াতাংশের অর্থ ঃ "স্থায়ী সৎকর্ম" (সূরা কাহ্ফ ঃ ৪৬, সূরা মরিয়ম ঃ ৭৬)।

বিবাহিতা স্ত্রীলোক

١٠٠٤- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ وَسُئِلَ عَنِ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ هُنَّ ذَوَاتُ الاَزْوَاجِ وَيَرْجِعُ ذٰلِكَ اِلٰى اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الزِّنَا .

১০০৪। ইবনে শিহাব (র)-এর কাছে "ওয়াল মুহসানাতু মিনান-নিসা" আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছি, তা বিবাহিতা স্ত্রীলোক, যাদের স্বামী বেঁচে আছে। এ আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যেনা-ব্যভিচার হারাম করেছেন (সূরা নিসা ঃ ২৪ নম্বর আয়াত)।

বিবদমান দুই দলের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন

١٠٠٥- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ مِثْلَ مَا رَغِبَتْ هٰذِهِ الاُمَّةُ عَنْ هٰذِهِ الاٰيَةِ وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ

'সালাতুল উসতা' বা 'মধ্যবর্তী নামায' কোনটি এ নিয়ে সাহাবা, তাবিঈ এবং তৎপরবর্তী যুগের বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্নরূপ বর্ণনা এসেছে। (১) ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার (রা), ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়ায়হ, আতা, জাবের ইবনে যায়েদ, তাউস ও ইকরিমার মতে তা ফজরের নামায। আলী (রা) থেকেও অনুরূপ একটি মত বর্ণিত আছে। (২) যায়েদ ইবনে ছাবিত, ইবনে উমার (তাবারানীর বর্ণনায়), আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আলী (ইবনুল মুনযিরের বর্ণনা অনুযায়ী) (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মতে তা যুহরের নামায। (৩) আলী (পরিবর্তিত মত), ইবনে উমার (ইবনুল মুনযিরের বর্ণনায়), উম্মে সালামা, আয়েশা এবং হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মতে তা আসরের নামায। এই শেষোক্ত মতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ সাহাবী, তাবিঈ ও বিশেষজ্ঞ আলেমদের কাছে এই মতটিই গৃহীত হয়েছে। হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা এই মত গ্রহণ করেছে। শাফিঈ মাযহাবের অধিকাংশ এবং মালেকী মাযহাবের কিছু সংখ্যক লোকের মতে তা ফজরের নামায। (৪) ইবনে আব্বাস (রা)-র মতে (ইবনে আবু হাতিমের বর্ণনায়) তা মাগরিবের নামায (অনুবাদক)।

بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ .

১০০৫। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এই উম্মাতকে নিম্নোক্ত আয়াতের চেয়ে অন্য কোন আয়াত থেকে এতোটা বিমুখ হতে দেখিনি ঃ "ঈমানদার লোকদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লে তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দাও। যদি তাদের এক দল অপর দলের উপর সীমা লংঘনমূলক আচরণ করে, তবে এই সীমালংঘনকারী দলটির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করো, যতোক্ষণ তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে। অতঃপর এ দলটি যদি প্রত্যাবর্তন করে, তবে তাদের উভয় দলের মাঝে ইনসাফের ভিত্তিতে সন্ধি স্থাপন করে দাও" (সূরা হুজুরাত ঃ ৯)।

যেনাকারী যেনাকারিণীকে বিবাহ করবে

١٠٠٦- أَخْبَرَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَلزَّانِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ بِالَّتِىْ بَعْدَهَا ثُمَّ قَرَاَ وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ .

১০০৬। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (র) থেকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী (মূল পাঠ হাদীসে দ্র.) ঃ "যেনাকারী কেবল যেনাকারিণী অথবা মুশরিক স্ত্রীলোক বিবাহ করবে। আর যেনাকারী বা মুশরিক পুরুষলোক ছাড়া অন্য কেউ যেনাকারিণীকে বিবাহ করবে না। এটা ঈমানদার লোকদের জন্য হারাম করা হয়েছে" (সূরা নূর ঃ ৩)। উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ (র) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছেন, এই আয়াতকে পরবর্তী আয়াত মানসূখ করেছে। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন (মূল পাঠ হাদীসে দ্র.) ঃ "তোমাদের মধ্যকার স্বামীহীনা স্ত্রীলোক এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যকার চরিত্রবানদের বিবাহ দাও" (সূরা নূর ঃ ৩২)।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদদের এটাই সাধারণ মত। ব্যভিচারী নয় এমন ব্যক্তি যদি এমন কোন নারীকে বিবাহ করে যে ব্যভিচারিণী ছিলো তবে তাতে কোন দোষ নেই।

বিবাহের প্রস্তাব

١٠٠٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ

قَالَ اَنْ يَّقُوْلُ لِلْمَرْاَةِ وَهِيَ فِيْ عِدَّتِهَا مِنْ وَّفَاةِ زَوْجِهَا اِنَّكِ عَلَىَّ كَرِيْمَةٌ وَاِنِّيْ فِيْكِ الرَّاغِبُ وَاِنَّ اللّٰهَ سَائِقٌ اِلَيْكِ رِزْقًا وَّنَحْوَ ذٰلِكَ مِنَ الْقَوْلِ .

১০০৭। আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্র বাণী (মূল পাঠ হাদীসে দ্র.) ঃ "ইদ্দাত পালনকালে তোমরা যদি বিধবা স্ত্রীলোকদের বিবাহ করার ইচ্ছা ইশারা-ইংগিতে প্রকাশ করো অথবা তা নিজেদের মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখো, তবে তা কোন দোষের ব্যাপার নয়" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৫)। এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব বলতেন, যে স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দাত পালন করছে, তাকে বলো, তুমি আমার জন্য একটি নিআমত, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট এবং আল্লাহ তাআলা তোমাকে রিযিক দান করবেন। এ ধরনের কথাবার্তা বলা যেতে পারে (যা বিবাহের সরাসরি ও সুস্পষ্ট প্রস্তাব নয়)।

সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া

١٠٠٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دُلُوْكِ الشَّمْسِ مَيْلُهَا .

১০০৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। "দুলুকিশ-শাম্‌স", "সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া" (সূরা ইসরা ঃ ৬৮)-এর অর্থ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঝুঁকে পড়া।

١٠٠٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يَقُوْلُ دُلُوْكِ الشَّمْسِ مَيْلُهَا وَغَسَقَ الَّيْلِ اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتِهِ .

১০০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, "দুলুকিস শাম্‌স" অর্থ সূর্য পশ্চিম গগনে ঝুঁকে পড়া এবং "গাসাকিল লাইল" অর্থ রাত ও তার অন্ধকার একত্র হওয়া, ঘণিভূত হওয়া।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটা ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে উমার (রা)-র ব্যক্তিগত অভিমত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "দুলুকিশ শাম্‌স' অর্থ সূর্য অস্ত যাওয়া। তবে দু'টি ব্যাখ্যাই সুন্দর।

١٠١٠- اَخْبَرَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَجَلُكُمْ فِيْمَا خَلاَ مِنَ الْاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَاِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ اِسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِيْ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ قَالَ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِيْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلَى الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتْ

النَّصَارٰى عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِىْ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ اَلاَ فَاَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قَالَ فَغَضِبَ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلاً وَاَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوْا لاَ قَالَ فَاِنَّهُ فَضْلِىْ اُعْطِيْهِ مَنْ شِئْتُ .

১০১০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ অন্যান্য জাতির তুলনায় তোমাদের স্থায়িত্বকাল যেন আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তোমাদের এবং ইহূদী ও খৃস্টানদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এইরূপ—যেমন এক ব্যক্তি কোন কাজ সমাধা করার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করলো এবং বললো, দুপুর পর্যন্ত মাথাপিছু এক কীরাত মজুরীর বিনিময়ে কাজ করতে কে রাজী আছে? ইহূদীরা তাতে রাজী হয়ে অর্ধদিবস কাজ করলো। পুনরায় ঐ ব্যক্তি বললো, দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত মাথাপিছু এক কীরাত মজুরীর বিনিময়ে কাজ করতে কে রাজী আছে? খৃস্টানরা তাতে সম্মত হয়ে দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করলো। পুনরায় ঐ ব্যক্তি বললো, আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাথাপিছু দুই কীরাত মজুরীর বিনিময়ে কাজ করতে কে রাজী আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ জেনে রাখো! তোমরাই আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মাথাপিছু দুই কীরাত মজুরীর বিনিময়ে কাজ করছো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন ঃ এতে ইহূদী ও খৃস্টানরা নিয়োগকর্তার উপর ক্ষেপে গেলো এবং বললো, আমরা বেশী কাজ করেছি, অথচ মজুরী দেয়া হয়েছে কম। সে বললো, আমি কি তোমাদের উপর কোনরূপ যুলুম করেছি? তারা বললো, না। সে বললো, এটা হচ্ছে আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দান করি।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ হাদীস আমাদের দিকনির্দেশ দিচ্ছে যে, আসর নামায বিলম্বে পড়া প্রথম ওয়াক্তে পড়ার তুলনায় উত্তম। তোমরা কি লক্ষ্য করছো না যে, এ হাদীসে যুহর ও আসরের মাঝখানে যে সময় রয়েছে তা আসর ও মাগরিবের মাঝখানের সময়ের তুলনায় বেশী। যে ব্যক্তি আসরের নামায বিলম্বে না পড়ে প্রথম ওয়াক্তে পড়ে থাকে, তাতে আসর ও মাগরিবের মধ্যকার সময়ের তুলনায় যুহর ও আসরের মধ্যকার সময় কম হয়ে যায়। তাই এ হাদীস থেকে দিকনির্দেশ পাওয়া যায় যে, আসর নামায সত্বর পড়ার চেয়ে বিলম্বে পড়াই উত্তম, যতোক্ষণ সূর্য উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকে এবং হলুদ বর্ণ ধারণ না করে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং আমাদের ফিক্‌হবিদ সাধারণেরও এই মত।

আসমাউর রিজাল

(আ)

আইউব সুখতিয়ানী ঃ পিতা আবু তামীমা কায়সান। আনাস (রা)-কে তিনি দেখেছেন। তিনি আতা, ইকরিমা, আমর ইবনে দীনার, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম প্রমুখ রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে শোবা, হাম্মাদ, সুফিয়ান, মালেক, ইবনে উলাইয়্যা প্রমুখ রাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে সাদ (র) বলেন, তিনি একজন সিকাহ রাবী এবং হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, যুক্তিবাদী, আদেল ও ন্যায়নিষ্ঠ। আবু হাতিম (র) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী, তার কোন জুড়ি নেই। তিনি ১৩১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ৯৯)।

আইশা বিনতে তালহা ঃ হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-র কন্যা, মা উম্মে কুলছূম, আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-র নাতনী। চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানের সাথে তার বিবাহ হয়। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (তাবাকাত ইবনে সাদ, ৮খ, ৪৬৭)।

আকীল ইবনে আবু তালিব ঃ 'ওয়ারিসী সম্পত্তির বণ্টন' অধ্যায়ের ৪ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য। ডাকনাম আবু ইয়াযীদ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছিলেন, 'হে আবু ইয়াযীদ! আমি তোমাকে দ্বিগুণ ভালোবাসি—তুমি আমার আত্মীয় এবং আমার জানামতে আমার চাচা তোমাকে সর্বাধিক ভালোবাসতেন।' তিনি আমীর মুআবিয়ার রাজত্বকালে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ১১৮, ৩২০)।

আতা ইবনে আবু রাবাহ ঃ আবু মুহাম্মাদ আল-কারশী আল-মক্কী, আয়েশা, ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা (রা) প্রমুখ সাহাবীদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আওযাঈ, ইবনে জুরাইজ, আবু হানীফা, লাইছ প্রমুখ রাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সিকাহ রাবী, ফকীহ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তিনি ১১৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ৫২)।

আতা ইবনে ইয়াসার ঃ আবু মুহাম্মাদ আল-হিলালী আল-মাদানী, তাবিঈ, উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা)-র মুক্তদাস, সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী, ৯৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন, মতান্তরে আরো পরে মারা যান। তিনি যায়েদ ইবনে ছাবিত, আবু আইউব, ইবনে মাসউদ, আবু দারদা, আয়েশা, উসামা ইবনে যায়েদ ও আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে এবং যায়েদ ইবনে আসলাম, আমর ইবনে দীনার ও আরও অনেকে তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ৫৮; তাযকিরাতুল হুফফায, ১খ, ৯০-১)।

আনাস ইবনে মালেক ঃ বিখ্যাত সাহাবী, পিতা মালেক ইবনে আবুন নাদর কাফের অবস্থায় মারা যায়, মা উম্মে সুলাইম (দ্র.) বিখ্যাত মহিলা সাহাবী। তিনি একাধারে দশ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খাদেম ছিলেন। তিনি ১২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার কাছে হাদীসের একটি লিখিত সংকলন ছিল। সাঈদ ইবনে হিলাল বলেন, আনাস (রা) স্বহস্ত লেখা সংকলনটি আমাদের বের করে দেখাতেন এবং বলতেন, 'এগুলো আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে শুনেছি এবং তা লিখে নেবার পর তাকে পড়ে শুনিয়ে সত্যায়িত করে নিয়েছি।' আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাচ্ছিলেন এবং আমার মা তার কণ্ঠস্বর শুনতে

পেলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবানী হোক! এই উনাইস। অতএব তিনি আমার জন্য তিনটি দোয়া করলেন। এর দু'টির ফল আমি দুনিয়াতেই পেয়েছি এবং তৃতীয়টির ফল আখেরাতে পাওয়ার আশা রাখি (তিরমিযী)। উম্মে সুলাইম (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই আনাস ইবনে মালেক, আপনার খাদেম। তার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন। তিনি বলেন : 'হে আল্লাহ্! তার ধন-সম্পদ ও বংশ বৃদ্ধি করে দাও এবং তুমি তাকে যা দান করবে তাতে বরকত দাও' (তিরমিযী)। অপর বর্ণনায় আছে, 'তাকে বেহেশত দান করো।' আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক প্রকার শাক-এর নামানুসারে আমার ডাকনাম রাখেন—যা আমি তুলছিলাম। শাক-এর নাম ছিলো হামযা এবং আমার ডাকনাম রাখেন আবু হামযা (তিরমিযী)। তিনি আরও বলেন, নবী ﷺ কখনও কখনও আমাকে দুই কানধারী বলে ডাকতেন। আবু উসামা বলেন, তিনি কৌতুক করে তা বলতেন (তিরমিযী)। আবুল আলিয়া বলেন, আনাস (রা) দশ বছর নবী ﷺ -এর সেবা করেন এবং তিনি তার জন্য দোয়া করেন। তার একটি ফলের বাগান ছিলো। বছরে তাতে দু'বার ফল ধরতো। এই বাগানে একটি ফুলের গাছ ছিলো। তা থেকে মৃগনাভির ঘ্রাণ আসতো (তিরমিযী)। তিনি ১০৩ বছর বয়সে ১০২ হিজরীতে, মতান্তরে ৯০, ৯১, ৯২ অথবা ৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। যাহাবীর মতে, সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সবশেষে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৪৪; সহীহ বুখারী (বাংলা), ১ম খণ্ড; তিরমিযী, মানাকিব; তাযকিরাতুল হুফফায, ১খ, ৪৪-৭)।

আব্দ ইবনে যামআ : সাহাবী, উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রা)-র ভাই, আমের গোত্রীয়। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তার বোনের বিবাহে তিনি (কাফের অবস্থায়) বাধা দিয়েছিলেন এবং নিজের মাথায় মাটি তুলে রেখেছিলেন। পরবর্তী কালে এই ঘটনা স্মরণ করে তিনি লজ্জিত হতেন এবং কাঁদতেন (ইসাবা, ২খ, ৪৩৩)।

আবদুল আযীয ইবনে হাকীম : সিকাহ তাবিঈ, ডাকনাম আবু ইয়াহ্ইয়া, ইবনে উমারের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে সুফিয়ান সাওরী ও ইসরাঈল হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হাতিমের মতে, তিনি তেমন শক্তিশালী রাবী নন। তিনি ১৩০ হিজরীর পরে মৃত্যুবরণ করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ৯৩)।

আবদুল মালেক ইবনে আবু বাক্র : সাহাবী। তিনি বলেন, আমি তামীমুদ দারী (রা)-র সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসেছিলাম। আমি ছিলাম তার (তামীম) বন্ধু (ইসাবা, ২খ, ৪৩১)।

আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান : বনু উমাইয়্যার একজন রাজা, প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ৬৫ হিজরীতে দামেশকের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৮৬ হিজরীতে (৬২ বছর বয়সে) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ৩১১)।

আবান ইবনে উছমান : তাবিঈ, তৃতীয় খলীফার পুত্র, ডাকনাম আবু আবদুল্লাহ আল-মাদানী, সিকাহ রাবী, বহু সংখ্যক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, মৃত্যু ১০৫ হিজরীতে (মুওয়াত্তা)।

আব্বাদ ইবনে তামীম : ইবনে গাযিয়া আল-মাযিনী এবং পিতা ও চাচা আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল-মাযিনীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ তাকে সিকাহ রাবী বলে উল্লেখ করেছেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ১৬১)।

আব্বাদ ইবনে যিয়াদ ঃ মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র মুক্তদাস। ইমাম শাফিঈ, আবু হাতিম, দারু কুতনী, ইবনে আবদুল বার প্রমুখ একথা বলেছেন। তারা বলেন, তিনি মুগীরার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কেননা তিনি মুগীরাকে কখনো দেখেননি এবং তার কাছে শুনেনওনি (মুওয়াত্তা, পৃ. ৬৮)।

আব্বাদ ইবনুল মুতাওয়াক্কিল ঃ পরিচয় পাওয়া যায়নি।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ ঃ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "আবু বাক্‌র জান্নাতে আছে, উমার জান্নাতে আছে, উছমান জান্নাতে আছে, আলী জান্নাতে আছে, তালহা জান্নাতে আছে, যুবাইর জান্নাতে আছে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতে আছে, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতে আছে, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতে আছে এবং আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ জান্নাতে আছে" (তিরমিযী)। এই হাদীসটি সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকেও বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের জন্য নিজের চার লাখ দিরহামের একটি বাগান ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় নিজ সম্পদের অর্ধেক দান করেন, অতঃপর চল্লিশ হাজার দীনার দান করেন, যুদ্ধের জন্য পাঁচশো ঘোড়া ও পাঁচশো উট দান করেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী চারশো সৈনিকের প্রত্যেককে চারশো দীনার করে দান করার ওসিয়াত করে যান। তিনি ছিলেন বিরাট সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি তিরিশ হাজার দাস-দাসীকে দাসত্বমুক্ত করেন। তার নাম ছিলো আবদুল কাবা অথবা আবদে উমার। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম পরিবর্তন করে উপরোক্ত নাম রাখেন। তিনি হাতীর বছরের দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথমে হাবশা ও পরে মদীনায় হিজরত করেন, বদর যুদ্ধসহ সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পিছনে ফজরের এক রাক্‌আত নামায পড়েন। তিনি বলেন ঃ "আবদুর রহমান আসমান-জমীনে বিশ্বস্ত ব্যক্তি।" তিনি ৩১ অথবা ৩২ হিজরীতে ৭২ অথবা ৭৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। উছমান (রা) তার জানাযা পড়ান। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয় (ইসাবা, ৩খ, ৪৫৫)।

আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারীঃ তিনি সাহাবী কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। আল-ইজলী তাকে সিকাহ তাবিঈ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ওয়াকিদী তাকে কখনো সাহাবী আবার কখনো তাবিঈ বলে উল্লেখ করেছেন। উমার (রা) তাকে বাইতুল মালের কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি ৮৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ১০৯, ৩৭৯)।

আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র ঃ হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র পুত্র, মায়ের নাম উম্মে রুমান, হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তার নাম ছিলো আবদুল কাবা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পরিবর্তন করে তার উপরোক্ত নাম রাখেন। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। মুআবিয়া (রা) তার কাছে ইয়াযীদের পক্ষে আনুগত্যের বাইআত দাবি করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর মুআবিয়া (রা) তাকে এক লাখ দিরহাম উপঢৌকন পাঠান। কিন্তু তিনি তা ফেরত দেন এবং বলেন, আমি পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে আমার দীনকে বিক্রি করতে প্রস্তুত নই। অতঃপর তিনি মক্কায় রওয়ানা হয়ে যান এবং পথিমধ্যে (মক্কার দশ মাইল দূরে) হুবশী নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে জান্নাতুল মুআল্লায় এনে দাফন করা হয়। এটা ৫৩ হিজরীর ঘটনা, মতান্তরে তিনি ৫৫ অথবা ৫২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ২৫৯)।

আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ : পিতার নাম আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা), সিকাহ রাবী, ইমাম মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার আরো চারজন ইমাম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১১২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ১৫২)।

আবদুর রহমান ইবনে আবু হুরায়রা : হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র পুত্র। মুওয়াত্তা গ্রন্থে তার সূত্রে একটিমাত্র হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ তাবিঈ বলে উল্লেখ করেছেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ২৮৬)।

আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর মামাতো ভাই। তিনি সাহাবী বলে কথিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন কিনা বা তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন কিনা তা প্রমাণিত নয়। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার ও মারওয়ান তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ৩৩৪)।

আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ : নিজ ভ্রাতা আসওয়াদ, চাচা আলকামা ইবনে কায়েস, হুযায়ফা, ইবনে মাসউদ, আবু মূসা আশআরী, আয়েশা (রা) প্রমুখ সাহাবীদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে তার পুত্র মুহাম্মাদ, ইবরাহীম নাখঈ, আবু ইসহাক প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে সাদ, ইবনে মুঈন ও দারু কুতনীর মতে, তিনি সিকাহ রাবী। তিনি ৭৩ হিজরীতে মতান্তরে ৮৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ১৫০)।

আবদুর রহমান ইবনে উছমান : সাহাবী এবং আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা)-র সাথে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন (৭৬ হি.)। তার পুত্র উছমান সিকাহ রাবী ছিলেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ৫০)।

আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম : হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র প্রপৌত্র, ইমাম আহমাদ প্রমুখের মতে তিনি সিকাহ রাবী। তিনি সিরিয়ায় ১২৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ৭৬)।

আবদুর রহমান ইবনুল মুজাব্বার : উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র প্রপৌত্র, সিকাহ রাবী, তিনি নিজ পিতা এবং সালিমের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে তার পুত্র মুহাম্মাদ, ইমাম মালেক প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ৬২)।

আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ : (আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী দ্র.)।

আবদুর রহমান ইবনুয যুবায়ের : সাহাবী, তার পিতা যুবারের বনু কুরায়যার যুদ্ধে ইহুদী অবস্থায় নিহত হয় (মুওয়াত্তা, ২৬৪)।

আবদুর রহমান ইবনে সাদ : সাদ ইবনে যুরারা (রা)-র পুত্র এবং বিখ্যাত মহিলা তাবিঈ আমরাহ (র)-এর পিতা।

আবদুর রহমান ইবনে সাহল : সাহাবী এবং সাহল ইবনে আবু হাইসামা (রা)-র পুত্র (মুওয়াত্তা, পৃ. ৯৯)।

আবদুর রহমান ইবনুল হাকাম : উমাইয়্যা-রাজ মারওয়ান ইবনুল হাকামের ভাই (মুওয়াত্তা, ২৬৭)।

আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয : ডাকনাম আবু দাউদ। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না, আবু হুরায়রা ও আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সিকাহ রাবী এবং অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইসকান্দারিয়ার বুগিতে বসতি স্থাপন করেন এবং ১১৭ হিজরীতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন (তাবাকাত, ৫খ, ২৮৩-৪)।

আবদুল্লাহ আস-সুনাবিহী ঃ অপর বর্ণনায় তার নাম আবু আবদুল্লাহ আস-সুনাবিহী উল্লেখ আছে, তাবিঈ এবং সিকাহ রাবী। তিনি সাহাবী ছিলেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে। ইবনুস সাকান বলেন, তিনি সাহাবী বলে কথিত আছে (মুওয়াত্তা, ১২৫)।

আবদুল মালেক ইবনে আবু বাক্‌র ঃ মাখযূম গোত্রীয়, সিকাহ রাবী, হিশামের রাজত্বকালে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ১৭, টীকা ৭)।

আবদুল্লাহ ইবনে আইয়াশ ঃ সাহাবী, তার পিতাও সাহাবী, আবিসিনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবী (স) -এর নিকট হাদীস মুখস্ত করেছেন, কিন্তু তার কাছ থেকে তা সরাসরি বর্ণনা করেননি। তিনি উমার (রা) প্রমুখের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ২০৪)।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ঃ সিকাহ রাবী, আবুত তুফায়েল ও আবু বাক্‌র ইবনে হাযম (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। অপরদিকে শোবা ও মালেকসহ একদল রাবী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ৩০১)।

আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়্যা ঃ সাহাবী, উম্মে সালামা (রা)-র ভাই, প্রথমদিকে মুসলমানদের ঘোর শত্রু ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বেই হিজরত করেন। তিনি মক্কা বিজয়, হুনায়েন ও তায়েফ বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং শেষোক্ত যুদ্ধে শহীদ হন। কাফের অবস্থায় তিনিই নবী (স)-কে বলেছিলেন ঃ "আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না যতোক্ষণ পর্যন্ত জমীনকে দীর্ণ করে আমাদের জন্য একটি ঝর্ণা প্রবাহিত না করবে" (সূরা ইসরা ঃ ৯০); (ইসাবা, ২খ, ২৭৭)।

আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র ঃ মাখযূম গোত্রীয়, সিকাহ রাবী। তিনি হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের রাজত্বকালে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ১৯৭, টীকা ৭)।

আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র ঃ ইবনে মুঈন, আবু হাতিম, নাসাঈ এবং ইবনে সাদ তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। তিনি মদীনার বিচারপতি ছিলেন এবং ১৩৫ হিজরীতে মতান্তরে ১৩৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৮২, ১৬৬)।

আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা, পিতার নাম উহ্য করে দাদার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। মতান্তরে তার নাম যুহাইর আত-তায়মী আল-মাদানী, সিকাহ তাবিঈ। তিনি ১১৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ৩০৯, টীকা ৫)।

আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাবীবা ঃ যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা)-র মুক্তদাস, আবু উমামা ও উছমান (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সূত্রে বুকাইর, আবু হানীফা এবং মালেক হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ৩২৫)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ঃ আলা ইবনুল হাদরামীর ভ্রাতুষ্পুত্র, তার পিতা ১ম হিজরী সনে কাফের অবস্থায় নিহত হয়। নবী (স) -এর ইন্তেকালের সময় তিনি নয়-দশ বছরের বালক ছিলেন (মুওয়াত্তা, ৩০০)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ঃ ডাকনাম আবু আবদুর রহমান অথবা আবু মুহাম্মাদ, সাহাবী, তার ও তার পিতার বয়সের মধ্যে মাত্র ১১ বছরের ব্যবধান দেখা যায়। তিনি পিতার আগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন, রাসূলুল্লাহ (স) -এর সাহচর্য লাভের কারণে মহাজ্ঞানী আলেম হিসাবে পরিগণিত হন। তিনি

৬৩, ৬৫, ৬৮, ৭৩ অথবা ৭৭ হিজরীতে মক্কা, তায়েফ, মিসর অথবা ফিলিস্তীনে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১০৭)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমের ঃ ডাকনাম আবু মুহাম্মাদ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের সময় তিনি চৌদ্দ-পনর বছরের যুবক। তিনি ৮৫ হিজরীতে, মতান্তরে ৭০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার পিতা প্রথমে আবিসিনিয়া ও পরে মদীনায় হিজরত করেন এবং বদর ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৩২ হিজরীতে মতান্তরে ৩৩ অথবা ৩৫ সনে মৃত্যুবরণ করেন (মুওয়াত্তা, ৫৯)।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাচাতো ভাই, তার উপাধি ছিলো জ্ঞানের সমুদ্র, তিনিই সর্বপ্রথম কুরআনের তাফসীর লেখেন। এজন্য তাকে রঈসুল মুফাসসিরীন (তাফসীরকারদের নেতা) বলা হয়। বর্তমানে তার তাফসীরগ্রন্থখানি "তানবীরুল কিবাস মিন তাফসীর ইবনে আব্বাস" নামে পরিচিত। তিনি মোট ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য দু'বার আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছেন যেন তিনি আমাকে জ্ঞান, হিকমত এবং প্রজ্ঞা দান করেন (তিরমিযী)। তিনি ৬৮ হিজরীতে, মতান্তরে ৬৯ অথবা ৭০ হিজরীতে ৭১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫২)।

আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রবীণ তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত, ৭০ হিজরীর পরে মৃত্যুবরণ করেন (মুওয়াত্তা, ১২৪)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার ঃ ডাকনাম আবু আবদুর রহমান, প্রাথমিক পর্যায়ে অল্প বয়সে পিতা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন কোন বর্ণনায় তিনিই ইসলামে প্রথম জন্মগ্রহণকারী শিশু বলে উল্লেখ আছে। অল্প বয়সের কারণে তিনি উহুদ যুদ্ধে যাওয়া থেকে বাছাই পর্বে বাদ পড়েন, খন্দক ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মোট ১৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তার থেকে তার সাত পুত্র সালিম, হামযা, আবদুল্লাহ, বিলাল, উবায়দুল্লাহ, উমার ও যায়েদ, পৌত্র মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ এবং আবু বাক্র ইবনে উবায়েদ, মুক্তদাস নাফে, যায়েদ ইবনে আসলাম, আতা প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৭৩ অথবা ৭৪ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৬১)।

আবদুল্লাহ ইবনে উসাইদ ঃ সাহাবী, ৫৬৪ নং হাদীসে উল্লেখ (ইসাবা, ৩খ, ২৭৫)।

আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ঃ ডাকনাম আবু আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র মুক্তদাস। ইমাম আহমাদ তাকে সিকাহ রাবী বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি ১২৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৬৯)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঃ ডাকনাম আবু আবদুর রহমান, নবী ﷺ -এর বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি তাঁর জুতা ও মিসওয়াক বহন করতেন। তিনি আবিসিনিয়া হিজরত করেন, বদর এবং তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন, উমার (রা)-র খিলাফতকাল থেকে উছমান (রা)-র খিলাফতের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কুফার প্রধান বিচারপতি ছিলেন, অতঃপর মদীনায় চলে আসেন এবং এখানে ৩২ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি মোট ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তা সংকলন আকারে লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে রেখেছিলেন। মাআন বলেন, তার পুত্র আবদুর রহমান আমার সামনে এই সংকলন বের করে দেখান এবং শপথ করে বলেন, এ হাদীসগুলো আমার পিতার নিজ হাতে লেখা (মুওয়াত্তা, ৫৪, সহীহ আল-বুখারী, বাংলা, ১ম খণ্ড)।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ঃ ডাকনাম আবু হাশেম। ইবনে সাদ এবং নাসাঈ তাকে সিকাহ রাবী বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি ৯৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২০৫)।

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ঃ সিকাহ তাবিঈ, ৬২ হিজরীতে হাররার হত্যাকাণ্ডে নিহত হন (মুওয়াত্তা, ২২৮)।

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ঃ আনসার সাহাবী। ইমাম বুখারী বলেন, ইনি হচ্ছেন স্বপ্নে আযানের শব্দ দেখা সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দে রব্বিহি (মুওয়াত্তা, ১৬১)।

আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের ঃ বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত (আবদুর রহমান ইবনে আওফ দ্রষ্টব্য)। ডাকনাম আবু হাবীব অথবা আবু বাক্‌র, দাদার নাম আওয়াম, প্রথম হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র নাতী এবং আসমা (রা)-র পুত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দোয়া করেছেন। ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার রাজত্বের শেষদিকে ৬৪ হিজরীতে হিজাজ, ইয়ামান, ইরাক ও খোরাসানের লোকেরা তার হাতে খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করেন। ৭২ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তিনি কাবা ঘরকে ভেংগে ইবরাহীম (আ)-র ভিতের উপর পুনর্নির্মাণ করেন (মুওয়াত্তা, ২১৮)।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঃ সাহাবী, আনাসর খাজরাজ গোত্রীয়, আকাবা, বদর এবং তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বীরে মাউনায় শহীদ হন। ইবনে আব্বাস, উসামা ইবনে যায়েদ এবং আনাস (রা) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (ইসাবা, ৩খ, ৩০৬-৭)।

আবদুল্লাহ ইবনে রাফে ঃ ডাকনাম আবু রাফে, উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা)-র মুক্তদাস, সিকাহ রাবী।

আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ঃ আবুল ওয়ালীদ আল-লাইছী আল-মাদানী, সাহাবী, নবী (স)-এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে সাদ খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের তালিকায় তার নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন, পরে কুফা চলে যান।

আবদুল্লাহ ইবনে ছাবিত ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ছাবিত আল-আনসারী, আবদুল্লাহ ইবনে ছাবিত ইবনে কায়েস আল-আনসারী, আবদুল্লাহ ইবনে ছাবিত ইবনে ফাকিহা আল-আনসারী এবং আবদুল্লাহ ইবনে ছাবিত ইবনে আতীক (রা) এই চারজনই নবী ﷺ -এর সাহাবী (ইসাবা, ২খ, ২৮৪)।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ঃ প্রখ্যাত ইহুদী আলেম ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ "আবদুল্লাহ ইবনে সালামাও বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত (তিরমিযী)। তার শানে কুরআন মজীদের সূরা রাদের ৪৩ নং আয়াত এবং সূরা আহ্‌কাফের ১০ নং আয়াত নাযিল হয় (তিরমিযী)।

আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ঃ খায়বার এলাকায় ঘাতকের হাতে নিহত হন (রক্তপণ অধ্যায়, 'সম্মিলিত শপথ' অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আবদুল্লাহ ইবনে হুনাইন ঃ সিকাহ তাবিঈ, ইয়াযীদের রাজত্বকালে মৃত্যুবরণ করেন (মুওয়াত্তা, ১৫৮)।

আবু আইউব আল-আনসারী ঃ নাম খালিদ, পিতার নাম যায়েদ, নবী ﷺ -এর সাথে বদর, উহুদ, খন্দক এবং অন্য সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুআবিয়া (রা)-র রাজত্বকালে কনস্টান্টিনোপলে ৫০ হিজরীতে, মতান্তরে ৫১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করে মদীনায় পৌঁছলে তাঁর উট আবু আইউব আনসারী (রা)-র বাড়ির সামনে বসে পড়ে। এজন্য তিনি প্রথমে তার বাড়িতে আশ্রয় নেন। তিনি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী সাহাবী ছিলেন (মুওয়াত্তা, ১৩৬)।

আবুল আওয়াম আল-বাসরী ঃ মূল নাম আবদুল আযীয ইবনুর রুবাই, সিকাহ রাবী। তিনি আবুয যুবায়ের আল-মাক্কী এবং আতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। অপরদিকে সুফিয়ান সাওরী, নাদর ইবনে শুমায়েল, ওয়াকী এবং রাওহ ইবনে উবাদা তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ৫৩)।

আবু আবদুর রহমান ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) দ্রষ্টব্য।

আবুল আস ঃ রাসূল-কন্যা যয়নব (রা)-র স্বামী, তার নাম লাকীত, মতান্তরে জুশাম, হাশীম অথবা মিহশাম। তিনি ১২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৫৮)।

আবু ইউসুফ ঃ সিকাহ তাবিঈ, মূল নাম অজ্ঞাত।

আবু ইউসুফ ঃ আসল নাম ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অন্যতম ছাত্র এবং হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম। কিতাবুল খারাজ গ্রন্থখানি তার অমর কীর্তি। তিনি হিশাম ইবনে উরওয়া, আবু ইসহাক আশ-শায়বানী, আতা ইবনুস সায়েব এবং সমসাময়িক রাবীদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম আহমাদ, বিশর ইবনুল ওয়ালীদ এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুঈন তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৮২ হিজরীর রবিউস ছানী মাসে ৬৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৯২)।

আবু ইয়ারবূ আল-মাখযূমী ঃ অপর পাঠে ইবনে ইয়ারবূ উল্লেখ আছে এবং এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ, আসল নাম আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ, সিকাহ তাবিঈ।

আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ঃ আমের ইবনে আবদুল্লাহ আল-ফিহরী, মুসলিম উম্মাতের আমীন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে বলেছেন, প্রত্যেক জাতির একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে। এই জাতির বিশ্বস্ত (আমীন) ব্যক্তি হচ্ছে আবু উবায়দা। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, এক সম্প্রদায়ের নেতা এবং তার সচিব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললো, আমাদের সাথে আপনার বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠান। তিনি বলেন ঃ অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে একজন সত্যিকারের বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাবো। লোকেরা এই মর্যাদা লাভ করার অপেক্ষা করছিলো। অতঃপর তিনি আবু উবায়দা (রা)-কে পাঠালেন (তিরমিযী)। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তার সাহাবীগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় কে ছিলেন? তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা)। তিনি বলেন, অতঃপর কে? তিনি বলেন, উমার (রা)। তিনি বলেন, অতঃপর কে? তিনি বলেন, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রা)। তিনি বলেন, অতঃপর কে? তিনি নীরব থাকলেন (তিরমিযী)। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আবু বাক্‌র কতো ভালো লোক, উমার কতো ভালো লোক, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ কতো ভালো লোক (তিরমিযী)। উমার (রা) তাকে সিরিয়ার শাসক নিয়োগ করেন। তিনি জাসারের যুদ্ধে পারসিক বাহিনীর হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে নিহত হন (১২ হি.) (মুওয়াত্তা, ১৭৭)।

আবু উবায়দা ইবনে আবদুল্লাহ ঃ বিখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পুত্র। তার নাম আমের বলে কথিত। প্রবীণ সিকাহ তাবিঈ, পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার থেকে আবু ইসহাক ও আমর ইবনে মুররা হাদীস বর্ণনা করেন। তবে প্রসিদ্ধ কথা হচ্ছে, তিনি তার পিতার কাছে হাদীস শুনেননি। তিনি ১৮০ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন (তাকরীব, জামিউল উসূল, মুওয়াত্তা, ১৫০)।

আবু উবায়েদ মাওলা ঃ তার নাম সাদ, পিতার নাম উবায়েদ, প্রবীণ তাবিঈ, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র ভ্রাতুষ্পুত্র। আবদুর রহমান ইবনে আযহারের মুক্তদাস (মুওয়াত্তা, ১৩৯)।

আবু উমামা ইবনে সাহল ঃ সাহাবী, নাম আসআদ অথবা সাদ, ১০০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার পিতা সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) মশহুর সাহাবী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন (মুওয়াত্তা, ১৫৭)।

আবু ওয়াকিদ আল-লাইছী ঃ সাহাবী, নাম হারিছ ইবনে আওফ, মতান্তরে হারিছ ইবনে মালেক। তিনি নবী ﷺ -এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে মতান্তরে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে প্রথমোক্ত মত অধিকতর সহীহ। তিনি ৬৮ হিজরীতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৪০)।

আবু ওয়ালা আল-মিসরী ঃ মুওয়াত্তায় (ইয়াহ্ইয়া) বর্ণনায় তার পিতার নাম ওয়ালা, অপর এক বর্ণনায় তার নাম আবদুর রহমান ইবনে ওয়ালা, মিসরের অধিবাসী, তাবিঈ, ইবনে উমার (রা) এবং ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ, ইবনে মুঈন এবং আল-ইজলী তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন (মুওয়াত্তা, ৩১৪)।

আবু ওয়াহ্ব ঃ সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা দ্রষ্টব্য।

আবু ওয়ায়েল ঃ নাম শাকীক ইবনে সালামা আল-আসাদী, সাহাবী, জাহিলী যুগ ও ইসলামী যুগ পেয়েছেন, নবী ﷺ -এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি উমার, উছমান, আলী, আয়েশা, ইবনে মাসউদ প্রমুখ সাহাবীগণের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আমাশ, মানসূর এবং হুসাইন তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৮২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৯৯)।

আবু কাতাদা ঃ নাম হারিছ, নুমান অথবা উমার ইবনে রাবাঈ, সুলাইম গোত্রীয়, সাহাবী, উহুদ এবং তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন, ৫৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৮৩)।

আবু কুহাফা ঃ আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র পিতা। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে ইসলামের বাইআত হন। আবু বাক্‌র (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে নিয়ে এলে তিনি বলেন ঃ আমিই তো তার কাছে যেতে পারতাম। তিনি মক্কায়ই থেকে যান এবং ১৪ হিজরীর মুহাররম মাসে ৯৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৫খ, ৪৫১-২)।

আবু গাতাফান ঃ নাম সাদ ইবনে তারীফ অথবা সাদ ইবনে মালেক আল-মুররী, মদীনার অধিবাসী এবং সিকাহ রাবী (মুওয়াত্তা, ২৯৩)।

আবু গাতাফান ইবনে তারীফ ঃ আবু গাতাফান দ্রষ্টব্য।

আবু জাফর আল-কারী ঃ ইয়াযীদ ইবনুল কাকা আল-মাদানী, মাখযূম গোত্রীয়। মতান্তরে তার নাম জুনদুব ইবনে ফীরুয অথবা পীরুস, সিকাহ রাবী, ১২৭ হিজরীতে মতান্তরে ১৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৯০)।

আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী ঃ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব, ইমাম বাকের নামে প্রসিদ্ধ। ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় তাকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি নিজ পিতা ইমাম যয়নুল আবেদীন এবং জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সূত্রে তার পুত্র জাফর সাদিক প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৫৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৭ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৪৯)।

আবুল জাল্লাস ইবনে মুনাইয়্যা ঃ অথবা আবুল জালাস, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী (মুওয়াত্তা, পৃ. ২৫১)।

আবু জুহাইম ঃ নাম আমের, মতান্তরে উবায়েদ ইবনে হুযায়ফা, কুরাইশ গোত্রের অন্যতম প্রবীণ ব্যক্তি, মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন, তার বাড়ি মসজিদে নববী ও বাজারের মধ্যখানে অবস্থিত বালাত নামক স্থানে ছিলো (মুওয়াত্তা, ১০৫)।

আবু তাইবা ঃ নাফে, মতান্তরে মাইসারা বা দীনার। তার পেশা ছিলো রক্তমোক্ষণ। তিনি সাহাবী মুহাইয়্যাসা ইবনে মাসউদ আল-আনসারী (রা)-র মুক্তদাস ছিলেন (মুওয়াত্তা, ৪০৪)।

আবু তালহা আল-আনসারীঃ নাম যায়েদ ইবনে সাহল, ডাকনামেই সমধিক পরিচিত, আনাস (রা)-র মা উম্মে সুলাইম (রা)-র স্বামী, প্রবীণ সাহাবী, বদর ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন, আকাবার গোপন শপথেও উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে বলেছেন, সেনাবাহিনীর মধ্যে তার আওয়াজ একশো লোকের চেয়েও উত্তম। তিনি ৩১ হিজরীতে, মতান্তরে ৩৪ অথবা ৫১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৩১৫, ৩৭৭)।

আবু দারদা ঃ উআয়মির ইবনে আমের, মতান্তরে আনসার খাযরাজ গোত্রীয়, ফকীহ সাহাবী, উহুদ যুদ্ধের পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি পরবর্তী কালে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করেন এবং দামিশক শহরে ৩২ হিজরীতে, মতান্তরে ৩১ অথবা ৩৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫৮)।

আবু নাদর ঃ নাম সালিম, উমার ইবনে উবায়দের মুক্তদাস, আনাস এবং সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রে ইমাম মালেক, লাইছ, সুফিয়ান সাওরী ও সুফিয়ান ইবনে উআয়না হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ প্রমুখ তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। তিনি ১২৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৬৫)।

আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান ঃ তার নাম মুহাম্মাদ অথবা আবু বাক্‌র এবং উপনাম আবু আবদুর রহমান বলে কথিত। সঠিক কথা হলো, আবু বাক্‌র তার নাম এবং ডাকনাম উভয়ই। তিনি অন্ধ ছিলেন এবং ৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আল-ইজলী প্রমুখ তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ৮৭, টীকা ১০)।

আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীক ঃ বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মের তিন বছর পর ৫৭৩ খৃষ্টাব্দে কুরাইশ বংশের তাইম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জাহিলী যুগে তার নাম ছিলো আবদুল কাবা, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পরিবর্তন করে তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। তার পিতার নাম উছমান (ডাকনাম আবু কুহাফা) এবং মায়ের নাম সালামা

(ডাকনাম উম্মুল খায়ের)। তারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সর্বপ্রথম নামায পড়েন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী যুবায়ের (রা), উছমান (রা), তালহা (রা) এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিজরতের কঠিন মুহূর্তে তিনি তার সহচর ছিলেন এবং পাহাড়ের গুহায় তিন দিন মতান্তরে দশ দিন অবস্থান করেন। কুরআন মজীদে এই ঘটনায় তাদের 'দুই সাথী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া, মক্কা বিজয়সহ সব ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ৪০,০০০ দিরহাম আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার জন্য নবী ﷺ -এর হাতে তুলে দেন। তিনি এমন সাতজন গোলামকে দাসত্বমুক্ত করেন, যাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার অপরাধে অমানুষিক নির্যাতন করা হচ্ছিল। তাবূক যুদ্ধের জন্য তিনি নিজের সর্বস্ব দান করেন। এই দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন ঃ আজ থেকে আবু বাক্‌র আর কোন কাজ না করলেও বেহেশতে যাবে। তিনি আরও বলেন ঃ আবু বাক্‌রের সম্পদ দ্বারা আমার যে উপকার হয়েছে—আর কারও সম্পদ দ্বারা তা হয়নি। হযরত উমার (রা) বলেন, ইসলামের খেদমতের ব্যাপারে আবু বাক্‌র (রা)-কে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি যদি কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বাক্‌রকেই গ্রহণ করতাম। তিনি আরও বলেন, কেউ যদি দোযখের আগুন থেকে মুক্ত মানুষ দেখে খুশি হতে চায়—সে যেন এই ব্যক্তির (আবু বাক্‌র) দিকে তাকায়। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ কিয়ামতের দিন বেহেশতের আটটি দরজাই এক ব্যক্তিকে নিজের মধ্যে দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করার আহ্বান জানাবে। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে? তিনি বলেন ঃ আমি আশা করি তুমিই সেই ব্যক্তি। একাদশ হিজরীর ১২ রবীউল আওয়াল (৮ জুন, ৬৩২ খৃ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তিনি মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচিত হন। অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দুই বছর তিন মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার পর তিনি ১৩ হিজরীর ২২ জুমাদাউস ছানী (২৩ আগস্ট, ৬৩৪ খৃ.) ইন্তেকাল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশেই তাকে দাফন করা হয় (আল-ইসতীআব, ইসাবার হাশিয়া, ২খ, ২৪৩-৫৮; ইসলামের ইতিহাস; তাযকিরাতুল হুফফায, ১খ, ১-৫)।

আবু বাক্‌র ইবনে সুলায়মান ঃ সিকাহ তাবিঈ, মূল নাম অজ্ঞাত (মুওয়াত্তা, ১৪৫)।

আবু বাকরা ঃ নুফাই ইবনুল হারিছ, ছাকীফ গোত্রীয়। কিন্তু আল-ইসতীআব গ্রন্থে তার পিতার নাম মাসরূহ উল্লেখ আছে। তায়েফ বিজিত হওয়ার দিন এখানকার যুবকদের সাথে একত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ৫১ অথবা ৫২ হিজরীতে বসরায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৫৭)।

আবু বারযা আল-আসলামী ঃ নাম নাদালা ইবনে উবায়েদ মতান্তরে সাদ ইবনে হুরাইছ, সাহাবী, প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খায়বার, মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নবী ﷺ ও আবু বাক্‌র (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৬৪ হিজরীতে খোরাসানে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৪১; ইসাবা, ৩খ, ৫৫৬-৭; তাবাকাত, ৬খ, ৯, ৩৬৬)।

আবু বুজাইদ ঃ বা ইবনে বুজাইদ এবং এটাই সঠিক। কেননা মুওয়াত্তা ইমাম মালেক-এ ইবনে বুজাইদ উল্লেখ আছে। আনসার খাযরাজ গোত্রের শাখা হারিছ গোত্রের

সদস্য। তার আসল নাম জানা যায়নি। তবে ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর তার নাম মুহাম্মাদ উল্লেখ করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় তার নাম আবদুর রহমান উল্লেখ আছে। তার দাদীর নাম হাওয়া বিনতে ইয়াযীদ ইবনুস সাকান (মুওয়াত্তা, পৃ. ৩৯১)।

আবু মাইয আবদুল্লাহ ইবনে সুফিয়ান ঃ প্রসিদ্ধ তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত (মুওয়াত্তা, পৃ. ২২৩)।

আবু মাশার ঃ নাম নাজীহ ইবনে আবদুর রহমান, মতান্তরে আবদুর রহমান ইবনুল ওয়ালীদ, হাশিম গোত্রের মুক্তদাস। ইমাম তিরমিযী বলেন, স্মরণশক্তির দিক থেকে তিনি সমালোচিত। ইমাম আহমাদের মতে তিনি সত্যবাদী। ইবনে আদী বলেন, স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে তিনি হাদীস লিখে রাখতেন (মুওয়াত্তা, ১৫৫)।

আবু মাসউদ আল-আনসারী ঃ উকবা ইবনে আমর, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী, ৪০ হিজরীর পূর্বে অথবা পরে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৬১)।

আবু মুররা ঃ আকীল ইবনে আবু তালিব অথবা তার বোন উম্মুল মুমিনীন উম্মে হানী (রা)-র মুক্তদাস (মুওয়াত্তা, ১১৮)।

আবু মূসা আল-আশআরী ঃ নাম আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস, মশহুর সাহাবী, তার মা তাইবা বিনতে ওয়াহব ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তিনি রামলার অধিবাসী ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করে আবিসিনিয়া হিজরত করেন, খায়বার বিজয়ের পর মদীনায় আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যুবায়েদ ও এডেনের, উমার (রা) বসরার এবং উছমান (রা) কুফার গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি আহওয়ায ও ইসফাহান জয় করেন। তিনি অতীব সুমধুর স্বরে কুরআন পাঠ করতেন। তিনি ৪২ হিজরীতে, মতান্তরে ৪৪ হিজরীতে ৬০ বছর বয়সে কুফায় ইন্তেকাল করেন (ইসাবা, ৩খ, ৩৫৯-৬০; তাযকিরাতুল হুফফায, ১খ, ২৩-৪)।

আবুল মুসান্না আল-জুহানী ঃ ইবনে মুঈন ও ইবনে হিব্বানের মতে সিকাহ রাবী, কিন্তু আলী ইবনুল মাদীনীর মতে অখ্যাত ব্যক্তি। তিনি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র সূত্রে এবং আইউব ইবনে হাবীব ও মুহাম্মাদ আবু ইয়াহইয়া তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (তাহযীবুত তাহযীব, ১২ খ, ২২১)।

আবু মুহাইরীয ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাইরীয, সিকাহ তাবিঈ, আবু মাহযূরা (রা)-র কাছে ইয়াতীম অবস্থায় লালিত-পালিত হন। তিনি আবু মাহযূরা, আবু সাঈদ আল-খুদরী, মুআবিয়া, উবাদা ইবনুস সামিত, উম্মে দারদা প্রমুখ সাহাবীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ৪০০)।

আবু যিনাদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান, তাবিঈ, ১৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৪৭)।

আবু যুবায়ের ঃ মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম, আসাদ গোত্রীয়। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনে মুঈন এবং নাসাঈর মতে, তিনি সিকাহ রাবী। তিনি জাবের, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, আয়েশা (রা) প্রমুখ সাহাবীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শোবা, সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ইবনে উআয়না প্রমুখ রাবীগণ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১২৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৪৬)।

আবু যুবায়ের আল-মাক্কী ঃ আবু যুবায়ের দ্রষ্টব্য।

আবু রাফে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুক্তদাস। তিনি প্রথমে আব্বাস (রা)-র দাস ছিলেন। পরে আব্বাস (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দান করেন এবং তিনি তাকে দাসত্বমুক্ত করেন। তার নাম আলী, কিন্তু আসলাম আল-কিবতী নামেই প্রসিদ্ধ। মতান্তরে তার নাম ছাবিত, ইবরাহীম, হুরমুয, সিনান, সালেহ, ইয়াসার, আবদুর রহমান, ইয়াযীদ অথবা কিরমান। তিনি উছমান (রা) অথবা আলী (রা)-র খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। শেষোক্ত মতই অধিকতর সঠিক (মুওয়াত্তা, ৩৫৫)।

আবুর রিজাল ঃ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান, সিকাহ রাবী, প্রসিদ্ধ মহিলা তাবিঈ আমরাহ বিনতে আবদুর রহমানের পুত্র। তিনি দশ পুত্রের জনক ছিলেন। তাই তার ডাকনাম হয়েছে আবুর রিজাল (পুরুষদের পিতা)। তিনি নিজ মাতা আমরাহ এবং আনাস ইবনে মালেক (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম মালেক তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ২২২)।

আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির ঃ ছাবিত ইবনুদ দাহ্‌দাহ্ (রা)-র বোনের ছেলে। ছাবিত ওয়ারিসহীন অবস্থায় মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ভাগ্নে আবু লুবাবাকে তার ওয়ারিস নিযুক্ত করেন। তার নাম বশীর, রিফাআ অথবা মারওয়ান। বদর যুদ্ধের সময় নবী ﷺ তাকে মদীনায় রেখে যান, কিন্তু তাকে যোদ্ধাদের মধ্যে গণ্য করেন এবং গনীমত প্রদান করেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন আমর ইবনে আওফ গোত্রের পতাকাবাহী ছিলেন। তিনি আলী (রা)-র খেলাফতকালে মতান্তরে ৫০ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন (ইসাবা, ৪খ, ১৬৮)।

আবু শুরায়হ আল-কানাবী ঃ সাহাবী, নাম খুয়ায়লিদ ইবনে আমর, আমর ইবনে খুয়ায়লিদ, হানী, কাব ইবনে আমর অথবা আবদুর রহমান। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ৬৮ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৩৯৭)।

আবু সাঈদ আল-খুদরী ঃ সাহাবী, নাম সাদ ইবনে মালেক, আনসার খাজরাজ গোত্রের শাখা বনূ খুদরা গোত্রের লোক, ১১৭০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার পিতা উহুদ যুদ্ধে শরীক হন। তিনি বয়সের স্বল্পতার কারণে এই যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। এর পরের যুদ্ধসমূহে তিনি যোগদান করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্‌র, উমার, উছমান, আলী এবং যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-এর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার, জাবের, মাহমূদ ইবনে লাবীদ, আবু উমামা, আবুত তুফাইল প্রমুখ সাহাবী এবং অনেক তাবিঈ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৭৪ হিজরীতে, মতান্তরে ৬৪, ৬৩ অথবা ৬৫ হিজরীতে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইসাবা, ২খ, ৩৫; তাযকিরাতুল হুফফায, ১খ, ৪৪)।

আবু সাঈদ ইবনে মুনাইয়্যা ঃ সাহাবী (মুওয়াত্তা, আরবী পৃ. ২৫১, টীকা ১)।

আবু সালাবা আল-খুশানী ঃ জুরহুম অথবা জুরসুম ইবনে নাশিব অথবা নাশিম, মতান্তরে আমর ইবনে খারবুম। তিনি বাইআতে রিদওয়ানে (হুদায়বিয়ায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠান এবং তারা তার দাওয়াত কবুল করে মুসলমান হন। তিনি সিরিয়ায় যান এবং আমীর মুআবিয়ার রাজত্বকালে, মতান্তরে ৭৫ হিজরীতে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের রাজত্বকালে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৮৪)।

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ঃ বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র পুত্র। তার নাম আবদুল্লাহ অথবা ইসরাঈল বলে কথিত। সিকাহ রাবী এবং ৯৪ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৭৯)।

আবু সালেহ ইবনে উবায়েদ ঃ আব্বাসী-রাজ আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফার মুক্তদাস, তাবিঈ, যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বুসর ইবনে সাঈদ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ৩৩৪)।

আবু সাহ্ল ঃ বা সুহায়ল ইবনে মালেক, নাম নাফে, ইমাম মালেক (র)-এর চাচা। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু হাতিম এবং ইমাম নাসাঈ তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন (মুওয়াত্তা, ৮৮)।

আবুস সায়েব ঃ তার নাম আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব বলে কথিত, আনসার সম্প্রদায়ভুক্ত, সিকাহ রাবী। তিনি হিশাম ইবনে যাহ্রা অথবা আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম ইবনে যাহরা অথবা যাহরা গোত্রের মুক্তদাস ছিলেন। সিহাহ সিত্তায় তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

আবু সুফিয়ান ঃ নাম ওয়াহ্ব অথবা কুযমান, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আহমাদের মুক্তদাস, ইবনে সাদের মতে সিকাহ রাবী। তিনি সামান্য সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। সিহাহ সিত্তায় তার হাদীস রয়েছে (মুওয়াত্তা, ১০৬)।

আবু হাযিম ঃ সালাম ইবনে দীনার, সিকাহ রাবী এবং অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৪০ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৬০)।

আবু হাসান তামীম ঃ সাহাবী, তার উপনামই আসল নাম অথবা তার নাম তামীম ইবনে আবদে আমর বলে কথিত। তিনি ইমাম মালেকের শিক্ষক আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়ার পিতা ইয়াহ্ইয়া ইবনে উমারার দাদা, বাইয়াতে আকাবা এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন (মুওয়াত্তা, ৪৬, ৩৫৮)।

আবু হুমায়েদ আস-সাইদী ঃ মুনযির ইবনে সাদ, মতান্তরে আবদুর রহমান অথবা উমার, উহুদ এবং তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৬০ হিজরীর প্রথমাংশেও জীবিত ছিলেন (মুওয়াত্তা, ১৬০)।

আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা ঃ নাম হাশিম, মতান্তরে হুশাম, প্রবীণ সাহাবী, হাবশা ও পরে মদীনায় হিজরত করেন, বদর, উহুদ, খন্দক ও হুদায়বিয়াসহ সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-র খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। তার স্ত্রীর নাম সাহ্লা বিনতে সুহায়েল। তার গর্ভে তার পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুযায়ফা জন্মগ্রহণ করেন (মুওয়াত্তা, ২৭৭)।

আবু হুরায়রা ঃ হাফেয সাহাবী, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫,৩৭৪। তার ও তার পিতার নাম নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে তার নাম আবদুর রহমান ইবনে সাখর। তার ডাকনাম সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমার একটি ছোট বিড়াল ছিলো। দিনের বেলা যেখানে যেতাম এটাকে সাথে নিতাম। এজন্য লোকেরা আমাকে আবু হুরায়রা (ছোট বিড়ালের বাপ) ডাকতো" (তিরমিযী, মানাকিব)।

তিনি আরো বলেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার কাছে অনেক কিছু শুনি কিন্তু তা মুখস্ত রাখতে পারি না। তিনি বলেন ঃ তোমার চাদর বিছাও। অতএব

আমি আমার চাদর বিছিয়ে দিলাম। তিনি তা জড়ো করে আমার কলবের উপর রেখে দিলেন। এরপর থেকে আমি তাঁর কাছে যা কিছু শুনেছি তা আর ভুলিনি (তিরমিযী)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, "হে আবু হুরায়রা! আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস আমার চেয়ে অধিক বেশী মুখস্ত করেছেন" (তিরমিযী)।

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী আবু তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) বলেন, "আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে অসংখ্য হাদীস শুনেছেন—যে পরিমাণ হাদীস আমরা তার কাছে শোনার সুযোগ পাইনি। তিনি ছিলেন দরিদ্র এবং সুফ্‌ফার বাসিন্দা। পানাহার, উঠাবসা, বাড়ি-ঘরে যাওয়া সব কিছুতেই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে থাকতেন। এক কথায় তিনি তার সংসারের একজন সদস্য ছিলেন। সকাল-সন্ধ্যা সব সময় তার দরবারে উপস্থিত থাকতেন। এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ নিঃসৃত অসংখ্য হাদীস শুনার সৌভাগ্য লাভ করেন (তিরমিযী)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কোন গোত্রের লোক? তিনি বলেন, দাওস গোত্রের লোক। নবী ﷺ বলেন ঃ আমার জানা ছিলো না যে, দাওস গোত্রে কোন নেক্কার লোকের জন্ম হবে (তিরমিযী)।

তিনি বলেন, আমি কিছু খেজুর নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই খেজুরের মধ্যে বরকত হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। তিনি তা একত্র করে আমার উদ্দেশ্যে তার মধ্যে বরকত হওয়ার জন্য দোয়া করেন। তিনি আমাকে বলেন ঃ 'এগুলো তুলে নিয়ে তোমার এই থলের মধ্যে রাখো। যখনই প্রয়োজন মনে করবে এর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খেজুর তুলে নিবে এবং তা কখনো ঝেড়ে ফেলবে না।' অতঃপর আমি এই থলে থেকে এতো এতো ওয়াসাক (এক ওয়াসাকে ৫ মন ১৩ সের ১০ ছটাক প্রায়) আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করেছি, নিজে খেয়েছি, অন্যদের খাইয়েছি, কিন্তু থলে কখনো আমার কোমর থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না। অবশেষে হযরত উছমান (রা) যেদিন নিহত হন, সেদিন থলেটি আমার কোমর থেকে পড়ে যায় (তিরমিযী)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র শ্রেষ্ঠ ছাত্র হাম্মাম ইবনে মুনাব্বেহ (মৃ. ১০১ হি.) তার রিওয়ায়াতগুলো লিখে নেন। এ গ্রন্থটির নাম সহীফায়ে সহীহা। এর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বর্তমানে দামেশ্‌ক ও বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) তার মুসনাদ গ্রন্থে "আবু হুরায়রার রিওয়ায়াত" শিরোনামের অধীনে এর সবগুলো উদ্ধৃত করেছেন। এর অধিকাংশ হাদীস বুখারী ও মুসলিমেও পাওয়া যাবে। আল্লামা হাফেজ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর হাতে লেখা 'মুসনাদে আবু হুরায়রার' একটি কপি জার্মানীর লাইব্রেরীতেও সংরক্ষিত আছে। আট শতেরও অধিক লোক তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৫৭, ৫৮ অথবা ৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (বাংলা বুখারী, ১ম খণ্ড; তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, ১খ, ৩২-৭)।

আমর ইবনুল আস ঃ সাহাবী, দুইবার মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হন, হুদায়বিয়ার বছর নাজ্জাসীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিই একমাত্র সাহাবী যিনি একজন তাবিঈর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মতান্তরে তিনি ৫ম হিজরীর সফর মাসে (মক্কা বিজয়ের পূর্বে) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কিনসিরীন জয় করেন এবং আলেপ্পো, এণ্টিওক প্রভৃতি এলাকার রাজাদের সাথে সন্ধি করেন। উমার (রা) তাকে ফিলিস্তীনের গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উমার (রা)-র সূত্রে এবং তার দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ, কায়েস

ইবনে আবু হাযিম, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান এবং আরও অনেকে তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র ইন্তেকালের পরও তিনি বিশ বছর জীবিত ছিলেন, মতান্তরে তিনি ৯৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। উমার (রা)-র জন্মের সময় তার বয়স হয়েছিলো সাত বছর (ইসাবা, ৩খ, ২, ৩)।

আমর ইবনে শারীদ ঃ ছাকীক গোত্রীয়, সিকাহ তাবিঈ (মুওয়াত্তা, ২৭৫)।

আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া ঃ ইমাম নাসাঈ তাকে সিকাহ রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার পিতা ইয়াহ্ইয়া ইবনে উমারার সূত্রে এবং ইমাম মালেক তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ৪৬)।

আমর ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-আনসারী ঃ খাযরাজ গোত্রীয়, মদীনার অধিবাসী, ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রে ইমাম মালেক ও সুলায়মান ইবনে বিলাল হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ২০৫)।

আমর ইবনে মুররা ঃ আবু আবদুল্লাহ, কুফার অধিবাসী। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা), আবু ওয়াইল, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা, আমর ইবনে মায়মূন, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, মুসআব ইবনে সাদ, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ রাবীগণের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তার সূত্রে তার পুত্র আবদুল্লাহ, আবু ইসহাক আস-সাবীঈ, আমাশ, মানসূর, হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান, সুফিয়ান সাওরী, শোবা প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনে মুঈনের মতে তিনি সিকাহ রাবী, আবু হাতিমের মতে সিকাহ এবং সত্যাবদী। তিনি ১১৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৯২)।

আমর ইবনে রাফে ঃ আল-আদাবী, এই গোত্রের মুক্তদাস এবং সিকাহ রাবী (তাকরীব, ২খ, ৬৯)।

আমর ইবনে সুলায়ম ঃ যুরাইক গোত্রীয়, প্রবীণ সিকাহ তাবিঈ, ১০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৫৩)।

আমর ইবনে হাযম ঃ আনসারী (রা), খন্দক ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নবী ﷺ -এর সময় নাজরান প্রদেশের গভর্নর ছিলেন এবং ৫০ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন (যুরকানী)।

আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান ঃ দাদা সাদ ইবনে যুরারা, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র কোলে লালিত-পালিত হন এবং তার থেকে বহু হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তার থেকে তার পুত্র আবুর রিজাল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী, আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম এবং আরো অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ মহিলা তাবিঈ এবং ১০৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৭৫, ২২২)।

আমরাহ বিনতে হাযম ঃ প্রবীণ মহিলা সাহাবী। সাহাবী জাবের (রা) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্রের দাদার ফুফু। তার সূত্রে আবদুল্লাহ্র রিওয়ায়াত সনদসূত্র কর্তিত। কেননা তার সাথে আবদুল্লাহ্র সাক্ষাত ঘটেনি (মুওয়াত্তা, ৮২, ৩২৫)।

আমের আশ-শাবী ঃ পিতা শারাহীল, কুন্য়া আবু আমর, প্রসিদ্ধ সিকাহ তাবিঈ ও ফিক্হবিদ। মাকহূল বলেন, আমি তার চেয়ে বড়ো ফকীহ দেখিনি। তিনি হামাদানের

অধিবাসী, পরে কুফায় স্থানান্তরিত হন। তিনি উমার (রা)-র খেলাফতকালে (১৭ হি.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলী, ইমরান ইবনে হুসাইন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, আয়েশা, ইবনে উমার, ইবনে আমর, আদী ইবনে হাতিম, মুগীরা ইবনে শোবা, ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা) ও আরও অনেকের সূত্রে এবং তার সূত্রে আবু হানীফাসহ অনেক রাবী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি পাঁচ শত সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি ১০০ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন (তাকরীব, ১খ, ৩৮৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১খ, ৭৯-৮৮)।

আমের ইবনে আবদুল্লাহ ঃ আবু উবায়দা দ্রষ্টব্য।

আমের ইবনে সাদ ঃ সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র পুত্র, যাহরা গোত্রীয়। ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। তিনি ৯৬ হিজরীতে মতান্তরে ১০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৫২, ৩২৩)।

আম্মার ইবনে ইয়াসির ঃ আবুল ইয়াকযান, কিনানা গোত্রীয়, প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রথমে হাবশা ও পরে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বদর যুদ্ধসহ সব যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। আলী (রা) বলেন, "আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) এসে নবী ﷺ -এর কাছে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। নবী ﷺ বলেন ঃ তাকে আসতে দাও, পূতপবিত্র চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারীকে স্বাগতম (তিরমিযী)। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবীদের বলেন ঃ তোমরা আম্মারের পথনির্দেশ অনুসরণ করো (তিরমিযী)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে আম্মার! সুসংবাদ গ্রহণ করো। বিদ্রোহীরা তোমাকে হত্যা করবে (তিরমিযী)। তিনি ৩৭ হিজরীতে সিফ্ফীনের যুদ্ধে আমীর মুআবিয়ার পক্ষের লোকদের দ্বারা নিহত হন। এ হাদীসের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, আলী (রা) হকপন্থী ছিলেন এবং আমীর মুআবিয়া (রা) বিদ্রোহী ছিলেন (ইবনুল আছীরের জামিউল উসূল গ্রন্থ থেকে মুওয়াত্তায়, পৃ. ৫৬)।

আরকাম ইবনে শুরাহবীল ঃ কুফার অধিবাসী, সিকাহ রাবী এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন ইবনে মাসউদের সর্বোত্তম সংগী। তার সূত্রে আবু ইসহাক এবং নিজ ভ্রাতা হুযাইল হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ৫৫)।

আরাজ ঃ তিনি এই নামেসই প্রসিদ্ধ, উপনাম আবু হাযিম আবদুর রহমান, মুহাম্মাদ ইবনে রবীআর মুক্তদাস। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে এবং যুহরী ও আবু যিনাদ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ৪৭)।

আলকামা ইবনে আবু আলকামা ঃ পিতার নাম বিলাল এবং মায়ের নাম মারজানা, কুফার অধিবাসী। আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মুঈন তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। তিনি ১৩০ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫৭, ৮১)।

আলকামা ইবনে ওয়াইল ঃ ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র আল-হাদরামী আল-কিন্দী (রা)-র পুত্র, তিনি কুফায় বসবাস করতেন। তিনি নিজ পিতা এবং মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তার সূত্রে তার ভাই আবদুল জাব্বার, ভ্রাতুষ্পুত্র সাঈদ, আবদুল মালেক ইবনে উমায়ের, আমর ইবনে মুররা, সিমাক ইবনে হারব, সালামা ইবনে কুহায়েল প্রমুখ রাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সিকাহ রাবী, কিন্তু কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ৫৭)।

আলকামা ইবনে কায়েস ঃ আবু শুবাইল আন-নাখঈ আল-কূফী, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উমার, উছমান, আলী, সাদ, হুযায়ফা, আবু দারদা, ইবনে মাসউদ, আবু মূসা, খালিদ ইবনে ওয়ালীদ, সালামা ইবনে ইয়াযীদ, আয়েশা (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তার সূত্রে তার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ, ভাগ্নে ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ ও ইবরাহীম ইবনে সুওয়াইদ, আমের শাবী, আবু ওয়াইল শাকীক ইবনে সালামা, আবু ইসহাক আস-সাবীঈ প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সিকাহ তাবিঈ এবং ইবনে মাসউদের শ্রেষ্ঠ সাথী। তিনি ১৬১ হিজরীতে, মতান্তরে ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৭২ হিজরী অথবা এরপরে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫৭)।

আলা ইবনুল হারিছ ঃ আবু ওয়াহ্‌ব অথবা আবু মুহাম্মাদ আদ-দামেশকী, সিকাহ রাবী, ১৩৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি মাকহূল, যুহরী এবং আমর ইবনে শুআইবের সূত্রে এবং আওযাঈ, আবদুর রহমান ইবনে ছাবিত ইবনে সাওবান তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ১৩২)।

আলা ইবনে আবদুর রহমান ঃ আবু শিবল আল-মাদানী, সত্যবাদী এবং তাবিঈ (মুওয়াত্তা, ৮৬)।

আলা ইবনে আবদুর রহমান ঃ বনূ মুআবিয়ার লোক, মদীনার অধিবাসী। আবু যুরআ এবং নাসাঈ তাকে সিকাহ তাবিঈ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ১০৮)।

আলী ইবনে আবু তালিব ঃ বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত, ডাকনাম আবুল হাসান। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর পরিবারে লালিল-পালিত হন। তিনি একাধারে নবী ﷺ -এর চাচাতো ভাই, জামাতা এবং সহচর। তাবুক যুদ্ধ ছাড়া আর সব যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজধানীতে তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে যান। অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি ছিলেন পতাকাবাহী। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাসান, হুসাইন, ইবনে মাসউদ, আবু মূসা, ইবনে আব্বাস, আবু রাফে, ইবনে উমার, আবু সাঈদ, সুহাইব, যায়েদ ইবনে আরকাম, জারীর, আবু জুহাইফা, বারাআ, আবুত তুফাইল (রা) এবং অনেক তাবিঈ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি উমার (রা)-র পরামর্শ পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং পাঁচ বছর সাড়ে তিনমাস দায়িত্ব পালন করার পর ৪০ হিজরীর রমযান মাসের ২৭তম রজনীতে শহীদ হন। তিনি "আহলে বাইত"-এর সদস্য এবং হাদীস শরীফে তার অনেক মর্যাদার কথা বর্ণিত আছে। কিছু সংখ্যক লোক আলী (রা)-র বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করলে এতে তিনি তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, তোমরা আলী সম্পর্কে কি বলতে চাও, তোমরা আলী সম্পর্কে কি বলতে চাও? আলী আমার থেকে এবং আমি আলী থেকে। আমার মৃত্যুর পর আলী প্রতিটি মুমিনের বন্ধু (তিরমিযী)। নবী ﷺ বলেন ঃ "আল্লাহ তাআলা আলীকে রহম করুন। হে আল্লাহ! আলী যেখানেই থাক—সত্যকে তার সংগী করো (তিরমিযী)। ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। আলী (রা) কাঁদতে কাঁদতে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আপনার সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন, অথচ আমার সাথে কারো ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দেননি। নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি

আমার ভাই-—দুনিয়ায়ও আখেরাতেও (তিরমিযী)। তিনি আরো বলেন ঃ আমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শহর, আর আলী হচ্ছে তার দরজা (তিরমিযী)। কুরআন মজীদের মুবাহিলা সম্পর্কিত আয়াত (আল ইমরান ঃ ৬১) নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা)-কে ডাকলেন। তাদেরকে একটি চাদরে ঢেকে দিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবারের সদস্য (তিরমিযী)। (মুওয়াত্তা, ৮৪, ইসাবা, ২খ, ৫০৭-১০; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১খ, ১০-৩)।

আলী ইবনে হুসাইন ঃ আবুল হুসাইন ইমাম যয়নুল আবেদীন, বিশ্বস্ত সিকাহ রাবী, অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৫২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৯০; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১খ, ৭৪-৫)।

আশইয়াম আদ-দিবাবী ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় মুসলমান অবস্থায় নিহত হন (ভুলবশত)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীর হাতে তার রক্তপণ প্রদানের নির্দেশ দেন (মুওয়াত্তা, ২৯৫; ইসাবা, ১খ, ৫২)।

আস ইবনে হিশাম ঃ কাফের অবস্থায় মৃত্যু হয়, মতান্তরে বদর যুদ্ধে কাফের অবস্থায় নিহত হয় (মুওয়াত্তা, ৩২০)।

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ ঃ কুফার নাখঈ গোত্রের লোক। তিনি আবু বাক্‌র, উমার, হুযায়ফা, বিলাল, আয়েশা, আবু মাহযুরা, আবু মূসা এবং ইবনে মাসউদ (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ফকীহ, মুত্তাকী এবং যাহেদ ব্যক্তি ছিলেন। আবু ইসহাক আস-সাবীঈ, ভাগ্নে ইবরাহীম নাখঈ, আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা ও আরও অনেকে তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আহমাদ, ইয়াহ্ইয়া, ইবনে সাদ এবং আল-ইজলী তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। তিনি কুফায় ৭৫ হিজরীতে মতান্তরে ৭৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৭২)।

আসমা বিনতে উমাইস ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রা)-র বোন এবং জাফর ইবনে আবু তালিবের স্ত্রী, স্বামীর সাথে হাবশা হিজরত করেন এবং সেখানে মুহাম্মাদ, আবদুল্লাহ ও আওন নামে তিন সন্তান তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন। জাফর (রা) নিহত হলে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) তাকে বিবাহ করেন এবং তার এখানে মুহাম্মাদ নামে একটি সন্তান প্রসব করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলে আলী (রা) তাকে বিবাহ করেন এবং এখানে তার গর্ভে ইয়াহইয়া নামে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় (আল-ইস্তীআব-এর হাওয়ালায় মুওয়াত্তা, ১৬৬)।

আসলাম ঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র মুক্তদাস, সিকাহ রাবী, ৮০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (মুওয়াত্তা, ৬৫)।

আসিম ইবনে আদী ঃ সাহাবী, উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১১৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৩৩)।

আসিম ইবনে আবদুল্লাহ ঃ পিতামহের নাম সাদ, ৬২৫ নং হাদীসে উল্লেখিত।

আসিম ইবনে কুলাইব ঃ কুফার অধিবাসী, তিনি নিজ পিতা, আবু বিরওয়া, আলকামা ইবনে ওয়াইল প্রমুখ রাবীদের সূত্রে এবং শোবা, সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ইবনে উআইনা প্রমুখ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ও তার পিতা কুলাইব উভয়ই সিকাহ রাবী। তিনি ১৩৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা)।

আয়েশা ঃ উম্মুল মুমিনীন, ডাক নাম হুমায়রা। মা উম্মে রুমান (রা) স্বামীর সংগে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ৬ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। নবুয়াতের দশম বর্ষে শাওয়াল মাসে ৬ কি ৭ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তার বিবাহ হয় এবং হিজরতের ৭/৮ মাস পর স্বামীর ঘরে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিলো ১৮ বছর। এরপর তিনি আরো ৪৮ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি ৫৭ হিজরীতে মতান্তরে ৫৮ হিজরীর ১৭ই রমযান ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আবু হুরায়রা (রা) তার জানাযা পড়ান এবং জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ এবং মুহাদ্দিস। তিনি ২১১০টি হাদীস বর্ণনা করেন। যে আটজন সাহাবী সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) তাদের মধ্যে দ্বিতীয়। বলা হতো, শরীআতের আহকামের এক-চতুর্থাংশ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, "সাহাবাগণ কোন মাসআলায় ঠেকে গেলে তার কাছে গিয়ে এর সমাধান পেতেন" (তিরমিযী)। কুরআন মাজীদের সূরা নূর-এ তার প্রশংসা করে দীর্ঘ আয়াত নাযিল হয়েছে (মুওয়াত্তা, ৫৬; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ, ৪৫৪, ৫৫ ও ৫৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১খ, ২৭-৯)।

আয়েশা বিনতে কুদামা ঃ মহিলা সাহাবী, তার পিতা কুদামা এবং দুই চাচা উছমান ও আবদুল্লাহ ইবনে মাযউনও সাহাবী ছিলেন (মুওয়াত্তা, ১৭৪)।

আহওয়াস ঃ পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়্যা, তিনি মুআবিয়া (রা)-র পক্ষ থেকে বাহরাইনের শাসক ছিলেন। তিনি সাহাবী ছিলেন এবং তার পিতা কাফের অবস্থায় মারা যায় (মুওয়াত্তা, ২২৬)।

(ই)

ইবনে আবু যেব ঃ অথবা ইবনে আবু যুওয়াইব, ইবনে হিব্বানের মতে সিকাহ তাবিঈ, এক নাম ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু যুওয়াইব আল-আসাদী আল-হিজাযী, ইবনে উমার ও যুহরী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাহাবীর মতে ইবনে আবু যেব মাদানী, ইকরামা ও নাফে থেকে এবং মামার, ইবনুল মুবারক ও ইয়াহইয়া আল-কাত্তান তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ৩৪৬)।

ইবনে আবু মুলাইকা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ, সিকাহ রাবী এবং ফকীহ। তিনি ১১৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২১৬)।

ইবনে উম্মে মাকতুম ঃ তার নাম ছিলো আমর, মতান্তরে আল-হুসাইন। নবী ﷺ তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা)-র ফুফাতো ভাই ছিলেন। তার মা এবং খাদীজা (রা)-র পিতা খুয়ায়লিদ সহোদর ভাই-বোন ছিলেন। তিনি ছিলেন জন্মান্ধ সাহাবী। সূরা আবাসার প্রাথমিক আয়াতগুলো তার শানে নাযিল হয়। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন (মুওয়াত্তা, ১৮১; তাফহীমুল কুরআন, ১৯খ, ৩৩, ৩৭)।

ইবনে খাত্তাল ঃ হজ্জ অধ্যায়ের ২৩ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

ইবনে জুরাইজ ঃ আবদুল মালেক ইবনে আবদুল আযীয, ফকীহ, সিকাহ রাবী, প্রভাবশালী ব্যক্তি, ১৫০ হিজরীতে অথবা আরো পরে মারা যান (মুওয়াত্তা, ৭০)।

ইবনে ফাহ্দ ঃ কায়েস ইবনে ফাহ্দ, সাহাবী, ইয়ামানের অধিবাসী (মুওয়াত্তা, ২৫৩)।

ইবনে বুহায়না : সাহাবী, বুহায়না তার মায়ের নাম, উপনামেই তিনি পরিচিত। তার নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম মালেক, তিনি ৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১০৬)।

ইবনে মুতী : আবদুল্লাহ আল-মাদানী, সাহাবী, ৭৩ হিজরীতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সংগে নিহত হন (মুওয়াত্তা, ৩৬৩)।

ইবনে শিহাব : মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিহাব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ ইবনে যাহরা। ইমাম যুহরী নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। মদীনার অধিবাসী, পরে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করেন। অল্প বয়স্ক তাবিঈ, আনাস, সাহল ইবনে সাদ, সায়েব ইবনে ইয়াযীদ, আবু উমামা, আবু তুফাইল প্রমুখ সাহাবাগণের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন এবং অনেক প্রখ্যাত তাবিঈ তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। লাইস ইবনে সাদ বলেন, তার চেয়ে বড়ো এবং ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী আলেম আমি কখনো দেখিনি। ইমাম শাফিঈ বলেন, তার আবির্ভাব না হলে মদীনার হাদীস ভাণ্ডার বিলুপ্ত হয়ে যেতো। তিনি ১২৪ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তেকাল করেন। সিরিয়ার শাগাব নামক গ্রামে তাকে দাফন করা হয় (মুওয়াত্তা, ৪৪)।

ইবনে সীরীন : আসল নাম মুহাম্মাদ। তার পিতা আনাস ইবনে মালেক (রা)-র মুক্তদাস ছিলেন। তার উপনাম আবু বাক্র আল-বসরী, ফিক্হ, হাদীস এবং তাফসীরের ইমাম। তারা মোট ছয় ভাই-বোন ছিলেন এবং সবাই সিকাহ তাবিঈ। তাদের নাম মাবাদ, আনাস, ইয়াহইয়া, হাফসা ও কারীমা। তিনি ইবনে উমার, আবু হুরায়রা, ইবনে যুবায়ের প্রমুখ সাহাবাগণের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ইবনে আব্বাসের কাছে তিনি কোন হাদীস শুনেননি। অতএব ইবনে আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত তার হাদীস মুরসাল পর্যায়ভুক্ত। অসংখ্য ইমাম তার প্রশংসা করেছেন। তিনি ১১০ হিজরীতে বসরায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২২৯)।

ইবনুল মুকাম্মিল : আবদুল্লাহ, সাহাবী, কেউ কেউ তার নাম আবদুর রহমান বলেছেন। কিন্তু এটা ধারণা মাত্র (মুওয়াত্তা, ২৬১)।

ইবনুল মুনকাদির : মুহাম্মাদ, তামীম গোত্রের লোক, সিকাহ রাবী, ১২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫১)।

ইবনুস সাওয়াফ : পরিচয় পাওয়া যায়নি।

ইবনুস সাবাক : উবায়েদ, মদীনার সিকাহ তাবিঈ (মুওয়াত্তা, ৭৩)।

ইবনে মীরসী : কুরাইশ গোত্রের বয়বৃদ্ধ কৃতদাস, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ৩১৯)।

ইবরাহীম ইবনে উকবা : ইমাম আহমাদ, ইয়াহ্ইয়া এবং ইমাম নাসাঈ তাকে সিকাহ রাবী বলে উল্লেখ করেছেন (মুওয়াত্তা, ২৭৫)।

ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান : নবী ﷺ -এর ইন্তেকালের পর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম স্তরের তাবিঈ এবং ৭৫ অথবা ৭৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (ইসাবা, ১খ, ৯৫-৬)।

ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ : সিকাহ তাবিঈ, অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ১০০ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৫৮)।

ইবরাহীম ইবনে কুলায়ব : হারিছ ইবনুল খাযরাজ গোত্রের লোক (মুওয়াত্তা, পৃ. ৩২১)।

ইবরাহীম নাখঈ : পিতার নাম ইয়াযীদ ইবনে কায়েস, কুফার মুফতী, প্রসিদ্ধ ফকীহ। আমাশ বলেন, হাদীস সম্পর্কে ভালো জ্ঞানের অধিকারী। শাবীর মতে, তার চেয়ে বড়ো জ্ঞানী সমসাময়িক যুগে ছিলো না। আবু সাঈদ আলাইর মতে তার বর্ণনাগুলো মুরসাল পর্যায়ের। আবু হাতিম বলেন, তিনি আয়েশা (রা) ছাড়া আর কোন সাহাবীর সাক্ষাত পাননি, কিন্তু তার কাছে কোন হাদীস শুনেননি। তিনি আনাস (রা)-র যুগ পেয়েছেন, কিন্তু তার কাছে হাদীস শুনেননি। তিনি ৫৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫৪; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১খ, ৭৩-৪)।

ইরাক ইবনে মালেক : গিফার গোত্রের লোক, প্রসিদ্ধ সিকাহ রাবী, আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পুত্র কুশাইম এবং ইবনে শিহাব তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সারা বছর রোযা রাখতেন। তিনি ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মালেকের রাজত্বকালে মদীনায় ইন্তেকাল করেন (তাবাকাত, ৫খ, ২৪৩; মীযানুল ইতিদাল, ৩খ, ৬৩)।

ইসমাঈল ইবনে আবু বাক্র : ইবনে হিব্বানের মতে সিকাহ রাবী, আবু হাতিমের মতে অপরিচিত ব্যক্তি এবং আবু যুরআর মতে মাকহুলের সহচর। তিনি উমার ইবনে আবদুল আযীযকে দেখেছেন। তিনি মাকহুল ও আবদা ইবনে আবু লুবাবা থেকে এবং দামরাহ ইবনে রবীআ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (তাহযীবুত তাহযীব, ১খ, ২৮৫)।

ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ : সিকাহ রাবী, ১৩৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৪৫)।

ইসহাক ইবনে রাশেদ : আবু সুলায়মান, বনূ উমাইয়া অথবা উমারের মুক্তদাস বলে কথিত আছে। তিনি যুহরী, আবদুল্লাহ ইবনে হাসান, ইমাম যয়নুল আবেদীন, আবু জাফর (ইমাম বাকের) প্রমুখ রাবীদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ, ইবনে মুঈন, আবু হাতিম, ইবনে হিব্বান ও ইবনে শাহীন তাকে সিকাহ রাবী বলে উল্লেখ করেছেন (মুওয়াত্তা, ১৯৫)।

ইয়াকূব আল-মাদানী : হামদান-এর উপশাখা হুরাকার মাওলা, নির্ভরযোগ্য রাবী। ইবনে হিব্বানের মতে তিনি ও তার পুত্র আবুশ শিবল আল-আলা উভয়ে সিকাহ রাবী। মতান্তরে তিনি জুহায়না গোত্রের লোক এবং এটাই সঠিক (মুওয়াত্তা, পৃ. ৩৪৭)।

ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম : ইমাম আবু ইউসুফ নামেই সমধিক পরিচিতি। ইমাম আবু হানীফা (র)-র অন্যতম ছাত্র এবং সাথী, ইরাকের ফকীহ। তিনি হিশাম ইবনে উরওয়া, আবু ইসহাক আস-শায়বানী, আতা ইবনুস সায়েব এবং সমসাময়িক রাবীদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। অপরদিকে ইমাম মুহাম্মাদ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, বিশর ইবনুল ওয়ালীদ এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তার পিতা ছিলেন অত্যন্ত গরীব। তাই ইমাম আবু হানীফা (র) তার ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব নেন। তিনি ৮২ হিজরীর রবীউস সানী মাসে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৯২)।

ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ : আবু আবদুল্লাহ আল-মাদানী, সিকাহ রাবী, ১২২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৬২)।

ইয়াযীদ ইবনে তালহা আর-রুকানী : ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ তাবিঈ হিসাবে বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ৩৯৬, টীকা ৮)।

ইয়াযীদ ইবনে নুআয়ম : সিকাহ তাবিঈ, তার দাদা সাহাবী ছিলেন এবং তার পিতা সাহাবী ছিলেন কিনা তাতে মতভেদ আছে (মুওয়াত্তা, ৩১১)।

ইয়ারফা : উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র মুক্তদাস এবং তার দ্বাররক্ষী। তিনি জাহিলী যুগও পেয়েছেন, কিন্তু তিনি সাহাবী ছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। তিনি আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র খেলাফতকালে উমার (রা)-র সংগে হজ্জ করেন (মুওয়াত্তা, ৩১৯)।

ইয়ালা ইবনে মুনাইয়্যা : মুনাইয়্যা তার মায়ের নাম, পিতার নাম উমাইয়্যা ইবনে আবু উবায়দা। তিনি সাহাবী ছিলেন এবং ৪০ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২০৮)।

ইয়াসার ইবনে নুমায়র : আল-মাদানী, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র মুক্তদাস, সিকাহ রাবী (মুওয়াত্তা, ৩২৫)।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুর রহমান : হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রা)-র পৌত্র, সিকাহ তাবিঈ, ১০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সহীহ মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার আরো চারটি গ্রন্থে তার হাদীস আছে (মুওয়াত্তা, ৬৬)।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে উমারা : ইবনে আবুল হাসান আল-আনসারী আল-মাযিনী আল-মাদানী, সিকাহ রাবী।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ : সিকাহ তাবিঈ, ১৮০ হিজরীর মধ্যে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৬৭)।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ : আবু সাঈদ আল-মাদানী, মদীনার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি আনাস, আদী ইবনে ছাবিত এবং আলী ইবনুল হুসাইনের সূত্রে এবং আবু হানীফা, মালেক, শোবা তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সিকাহ রাবী, বহু হাদীস বর্ণনা করেন এবং ১৪৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৬৬)।

(ঈ)

ঈসা ইবনে আবু ঈসা : নিজ পিতা এবং ইমাম শাবীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার সূত্রে ওয়াকী, ইবনে আবু ফুদায়ক প্রমুখ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে উল্লেখ আছে। তিনি কুফার বাসিন্দা, কিন্তু মদীনায় বসবাস করেন এবং ১৫১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ঈসা ইবনে আবু ঈসা নামে আরও একজন রাবী আছেন। তিনিও কুফার অধিবাসী, তার পিতার নাম মায়সারা এবং ৫১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৭২)।

(উ)

উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস : সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র ভাই, কাফির অবস্থায় মারা যায়। এই ব্যক্তির আঘাতেই উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাঁত ভেংগে গিয়েছিলো। নবী ﷺ তাকে এই বলে বদদোয়া করেন যে, তার যেন ঐ বছর না ঘুরে। অতএব ঐ বছরই সে মারা যায়। সাদ (রা) বলেন, আমি তাকে হত্যা করার জন্য সর্বাধিক লালায়িত ছিলাম (মুওয়াত্তা, ৩৬২)।

উতারিদ : সাহাবী, তামীম গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন (মুওয়াত্তা, ৩৭)।

উনায়েস আল-আসলামী : মতান্তরে তার পিতার নাম মারসাদ, সাহাবী (মুওয়াত্তা, ৩০৯)।

উবাই ইবনে কাব : প্রভাবশালী সাহাবী, ডাকনাম আবুল মুনযির, আনসার নাজ্জার গোত্রীয়, কিরাআত বিশেষজ্ঞ, উমার (রা) সর্বপ্রথম তাকে তারাবীহ নামাযের

জামাআতের ইমাম নিয়োগ করেন। ১৯ হিজরীতে মতান্তরে ৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৩১৫)।

উবায়দ ইবনে জুরাইজ ঃ মদীনার অধিবাসী এবং সিকাহ তাবিঈ (মুওয়াত্তা, ২২৭)।

উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ঃ আবু আবদুল্লাহ, হুযায়ল গোত্রের লোক, মদীনার অন্যতম ফিক্হবিদ। তিনি নিজ পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উতবা, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার এবং নুমান (রা)-র সূত্রে এবং ইমাম যুহরী ও সালেম আবুন নাদরসহ একদল রাবী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সিকাহ তাবিঈ এবং ৯৪ অথবা ৯৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৬৪)।

উবাদা ইবনুস সামিত ঃ আবুল ওয়ালীদ আল-আনসারী, খাযরাজ গোত্রীয়, প্রখ্যাত সাহাবী। তিনি উভয় আকাবা, বদর, উহুদ এবং বাইআতে রিদওয়ানসহ সব যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমীর মুআবিয়ার রাজত্বকালে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৪১)।

উমায়মা বিনতে রুকায়কা ঃ মহিলা সাহাবী, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা)-র ভাগ্নী, পিতা নাজাদ ইবনে আবদুল্লাহ, মতান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে নাজাদ (মুওয়াত্তা, ৩৯৪)।

উমায়্যা ইবনে সাদ ঃ আবু ইয়াহ্ইয়া, মতান্তরে পিতার নাম সাঈদ, সিকাহ রাবী, ১০৭ অথবা ১১৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫৬)।

উমামা বিনতে যয়নব ঃ আবুল আস (রা)-র কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাতনী। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি কখনো কখনো নামাযরত অবস্থায় তাকে কাঁধে তুলে নিতেন। ফাতিমা (রা)-র পরে আলী (র) তাকে বিবাহ করেন। তিনি আততায়ীর হাতে শহীদ হওয়ার পর মুগীরা ইবনে নওফাল তাকে বিবাহ করেন এবং এই স্বামীর ঘরে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তার নাম ছিলো ইয়াহ্ইয়া। শেষোক্ত স্বামীর ঘরে তিনি ইন্তেকাল করেন। মতান্তরে তার গর্ভে কোন সন্তান হয়নি (মুওয়াত্তা, ২৫৮)।

উমার ইবনুল খাত্তাব ঃ ডাকনাম আবু হাফ্স, মায়ের নাম হানতামা বিনতে হাশিম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুওয়াত প্রাপ্তির ৩০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন, মতান্তরে হাতীর বছরের ১৩ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমদিকে তিনি ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। নবুয়াতের ৬ষ্ঠ বর্ষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতিপূর্বে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! উমার ইবনুল খাত্তাব অথবা উমার (আবু জাহল) ইবনে হিশামকে হেদায়াত দান করে ইসলামকে শক্তিশালী করুন (তিরমিযী)। তার ইসলাম গ্রহণে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায় এবং কাফেরদের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। অতঃপর মুসলমানগণ প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে তিনি বিশজন মুসলমানসহ মদীনায় হিজরত করেন। তার প্রস্তাবে আযান ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। তিনি বদর, উহুদ, হুনাইন, খন্দক, খায়বারসহ সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হুদায়বিয়ার চুক্তির বিরোধিতা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বুঝিয়ে বললে তিনি আশ্বস্ত হন। তাবুক যুদ্ধে তিনি নিজের সম্পদের অর্ধেক দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনি এতো অধিক ভালোবাসতেন যে, তার ইন্তেকালে তিনি পাগলপ্রায় হয়ে যান। তিনি আবু বাক্র (রা)-র প্রধান উপদেষ্টা এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১৩ হিজরীর ২২ জুমাদাস সানী (২৩ আগস্ট, ৬৩৪ খৃ.) হযরত আবু বাক্র (রা)-র ইন্তেকালের পর তিনি মুসলিম জাহানের খলীফা মনোনীত হন। তার সময়ে পারস্য, সিরিয়া, মিসর এবং রোমান সাম্রাজ্যসহ এশিয়া ও

আফ্রিকার বিস্তৃত এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি দশ বছর দুই মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার পর ২৪ হিজরীর পহেলা মুহাররম (৬৪৪ খৃ.) শাহাদাত বরণ করেন। হাদীসে তার বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ আছে। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তাআলা উমারের মুখে এবং অন্তরে সত্যকে স্থাপন করে দিয়েছেন (তিরমিযী)। আমার পরে কেউ নবী হলে উমারই নবী হতো (তিরমিযী)। আগেকার উম্মাতদের মধ্যে মুহাদ্দাসের (আল্লাহ্র তরফ থেকে ইলহামের অধিকারী) আবির্ভাব হতো। আমার উম্মাতের মধ্যে মুহাদ্দাসের আগমনের সুযোগ থাকলে উমারই হতো সেই মুহাদ্দাস (তিরমিযী)। তার নিকট হতে ষাটের অধিক রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন (ইসলামের ইতিহাস; ইসাবা, ২খ, ৫১৮-৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫-৮)।

উমার ইবনে আবদুল আযীয : ইসলামের ইতিহাসে তিনি দ্বিতীয় উমার নামে প্রসিদ্ধ। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থাকে পুনরায় "খিলাফাত আলা মিনহাযিন নুবুওয়াত"-এর উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এজন্য তার শাসনামলকে খিলাফতের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি ৯৯ হিজরীতে উমাইয়্যা সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার অনেক গুণাবলী ও মর্যাদার কথা বর্ণিত আছে। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তাকে ইসলামের প্রথম মুজাদ্দিদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম সরকারী উদ্যোগে হাদীস সংগ্রহ ও তা পুস্তকাকারে বিন্যস্ত করার ব্যবস্থা করেন। তাকে প্রথম শ্রেণীর মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য করা হয় এবং তিনি ফিক্হ শাস্ত্রে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখতেন। তিনি ৬১ হিজরীতে (নবী ﷺ -এর ইন্তেকালের ৫০ বছর পর) জন্মগ্রহণ করেন। তার মা ছিলেন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র পৌত্রী। তার যুগে অসংখ্য সাহাবা ও তাবিঈ জীবিত ছিলেন। তিনি মাত্র ৩৯ বছর বয়সে (১০১ হি.) ইন্তেকাল করেন। ইসলামের এই প্রথম মুজাদ্দিদ মাত্র আড়াই বছর সংস্কারমূলক কাজ করার সুযোগ পান। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করেন (মুওয়াত্তা, ৩১২; ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ৩৫, ৩৯)।

উমার ইবনে আবদুল্লাহ : অথবা আমর ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে কাব ইবনে মালেক আল-আনসারী, সালামা গোত্রের লোক। তিনি নাফে ও ইবনে যুবায়েরের সূত্রে এবং ইয়াযীদ ইবনে খাসীফা তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ তাকে সিকাহ্ রাবী বলেছেন (মুওয়াত্তা, ৩৭৪)।

উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ : ইবনে মামার ইবনে উছমান ইবনে আমর ইবনে সাদ তামীম আল-কারশী, কুরাইশ-নেতা, ৮২ হিজরীতে দামেশকে ইন্তিকাল করেন। তার দাদা মামার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী ছিলেন। অথবা তার নাম আমর ইবনে উবায়দুল্লাহ (দ্র.) হতে পারে।

উম্মুল ফযল : মহিলা সাহাবী, নাম লুবাবা বিনতুল হারিছ, উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা (রা)-র বোন, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-র স্ত্রী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র মা। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা)-র পর মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন (মুওয়াত্তা, ১৪৬)।

উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান : মহিলা সাহাবী, প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। তার থেকে তার মুক্তদাস আদী ইবনে দীনার, ওয়াবিসা ইবনে মাবাদ ও অন্যরা হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ৬৪০)।

উম্মে কুলছুম ঃ যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-র কন্যা এবং সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমারের স্ত্রী। অর্থাৎ হযরত উমার (রা)-র পৌত্রবধূ। কোন কোন ভাষ্যকার তাকে উম্মে সাদ বলে অভিহিত করেছেন এবং তাকে সাহাবী বলেছেন (মুওয়াত্তা, ৮২)।

উম্মে কুলছুম ঃ আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-র কন্যা, তাবিঈ, একটি হাদীস মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে ইবনে মান্দা ও ইবনুস সাকান তাকে সাহাবী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা ধারণা মাত্র। তিনি পিতার ইন্তেকালের পরে মারা যান (মুওয়াত্তা, ২৭৬)।

উম্মে কুলছুম ঃ হযরত ফাতিমা (রা)-র কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাতনী। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে বিবাহ করেন। তার ঘরে তিনি যায়েদ এবং রুকাইয়্যা নামে দু'টি সন্তান প্রসব করেন। তার মৃত্যুর পর আওন ইবনে জাফর তাকে বিবাহ করেন। অতঃপর তার মৃত্যুর পর তার ভাই মুহাম্মাদ তাকে বিবাহ করেন। মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর তার অপর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাফর তাকে বিবাহ করেন। উম্মে কুলছুম (রা) তার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন (মুওয়াত্তা, ২৯১)।

উম্মে বাক্র ঃ আসলাম গোত্রের স্ত্রীলোক, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র স্ত্রী। তিনি স্বামীকে খোলা তালাক দিয়েছিলেন (মুওয়াত্তা, ২৫৭)।

উম্মে সালামা ঃ হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়্যা (হুযায়ফা), মাখযূম গোত্রের কন্যা। ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করেন। তিনি ৬২ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ৪১)।

উম্মে সুলাইম ঃ তার কয়েকটি নাম পাওয়া যায়। যেমন সাহলা, রুমাইশা, মুলাইকা, গুমাইদাআ ও রামীসা। পিতার নাম মিলহান ইবনে খালিদ, আনসার নাজ্জার গোত্রের কন্যা, মালেক ইবনে আবুন নাদর-এর স্ত্রী (জাহিলী যুগে) এবং আনাস (রা)-র মা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাধ্যমে ইসলামের আগমন হলে তিনি তার গোত্রের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের স্বামীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। এতে সে তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং পরে কাফের অবস্থায় মারা যায়। অতঃপর আবু তালহা (যায়েদ ইবনে সাহল) আনসারী (রা) তাকে বিবাহ করেন। এই স্বামীর ঘরে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহাকে প্রসব করেন। উম্মে সুলাইম, স্বামী আবু তালহা এবং পুত্র আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন (মুওয়াত্তা, ১২৪, ৩৭৭)।

উম্মে হাকীম ঃ হারিছ ইবনে হিশামের কন্যা, ইকরামা ইবনে আবু জাহলের স্ত্রী। মক্কা বিজয়ের পর ইকরামা ইয়ামন পালিয়ে যায়। তার স্ত্রী সেখানে গিয়ে তাকে নিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তার জীবনের নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলেন ঃ 'ইকরামার পিতাকে গালি দিও না। কেননা মৃতদের গালি দিলে জীবিতরা কষ্ট পায়।' ইকরামা (রা) আজনাদাইনের যুদ্ধে (১২ হি.) শহীদ হলে উম্মে হাকীম (রা) ইদ্দাত পালনের পর খালিদ ইবনে সাঈদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (মুওয়াত্তা, ২৭০)।

উম্মে হানী ঃ নাম হিন্দ অথবা ফাখতা, হযরত আলী (রা)-র বৈপিত্রেয় বোন, মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ, তিনি (ফাতিমা), তালিব, আকীল ও জাফরের মা। তিনি মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। পরে নবী ﷺ তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেন, কিন্তু বিবাহ হয়নি। তিনি নবী ﷺ-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সিহাহ সিত্তাসহ বিভিন্ন গ্রন্থে তার বর্ণিত হাদীস বর্তমান রয়েছে। ইবনে আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা, মুজাহিদ, উরওয়া এবং আরও অনেকে তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীর মতে তিনি হযরত আলী (রা)-র ইন্তেকালের পরও জীবিত ছিলেন (তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৮খ, ১৫১-৩; ইসাবা, ৪খ, ৫০৩)।

উম্মে হাবীবা ঃ নাম রামলা, পিতা আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, মা সাফিয়্যা বিনতে আবুল আস, হযরত উছমান (রা)-র ফুফাতো বোন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়াত প্রাপ্তির ১৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও তার স্বামী উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশ প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। কিছু দিন পর উবায়দুল্লাহ খৃস্টান হয়ে যায় এবং এই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজ্জাশীর কাছে তার বিবাহের প্রস্তাব পাঠান এবং তিনি কন্যা পক্ষের প্রতিনিধি এবং খালিদ ইবনে সাঈফ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতিনিধি হিসাবে বিবাহকার্য সম্পন্ন করেন, অতঃপর তাকে মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি ৪৪ হিজরীতে ৩৭ বছর বয়সে মদীনায়, মতান্তরে দামেশকে ইন্তেকাল করেন। তার পূর্ব-স্বামীর ঔরসজাত কন্যা হাবীবাও সাহাবী ছিলেন (সিরাতুল মুস্তাফা, ২খ, ৫০০-৩)।

উরওয়া ইবনে উযায়না ঃ সিকাহ রাবী, কবি, মুওয়াত্তায় তার সূত্রে একটি মাত্র হাদীস বর্ণিত হয়েছে (মুওয়াত্তা, ৩২৬)।

উরওয়া ইবনে যুবায়ের ঃ আবু আবদুল্লাহ আল-মাদানী। ইবনে উআয়না বলেন, আয়েশা (রা)-র হাদীস সম্পর্কে তিন ব্যক্তির সর্বাধিক জ্ঞান রয়েছে ঃ কাসিম, উরওয়া ও আমরাহ। তিনি ৯৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (মুওয়াত্তা, ৪৪, ৬৫)।

উছমান ইবনে আফ্ফান ঃ ডাকনাম আবু আবদুল্লাহ অথবা আবু উমার। মা আরওয়া বিনতে কুরাইয ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হস্তী বাহিনীর ঘটনার দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং আবু বাক্‌র (রা)-র মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দুই কন্যা বিবাহ করেন। প্রথমে রুকাইয়্যা (রা)-কে বিবাহ করেন। তিনি বদর যুদ্ধের সময় ইন্তেকাল করেন। অতঃপর উছমান (রা) উম্মে কুলছূম (রা)-কে বিবাহ করেন। এজন্য তার উপাধি হয় 'যুন-নূরাইন' বা দুই আলোর অধিকারী। তিনি নবী ﷺ, আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-র সূত্রে এবং তার সূত্রে নিজের তিন পুত্র উমার, আবান ও সাঈদ, চাচাতো ভাই মারওয়ান, ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, যায়েদ ইবনে ছাবিত, ইমরান ইবনে হুসাইন, আবু হুরায়রা (রা) এবং বহু সংখ্যক তাবিঈ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম স্ত্রী রুকাইয়্যা (রা)-সহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। বাইআতে রিদওয়ানের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পক্ষ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি ২৪ হিজরীর মুহাররম মাসে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ ১২ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করার পর ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে ৮২ বছর বয়সে বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। হাদীস শরীফে তার অনেক মর্যাদার কথা বর্ণিত আছে। তিনি বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ প্রত্যেক নবীর

একজন করে অন্তরংগ বন্ধু রয়েছে। বেহেশতে আমার অন্তরংগ বন্ধু হচ্ছে উছমান (তিরমিযী)। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ হে উছমান! আশা করি আল্লাহ তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। লোকেরা তা খুলে নিতে চাইবে। কিন্তু তুমি কখনও তা খুলবে না (তিরমিযী)। হাদীসের মানাকিব অধ্যায়ে তার মর্যাদা সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস রয়েছে (মুওয়াত্তা, ৫৫; ইসাবা, ২খ, ৪৬২-৩; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১খ, ৮-১০)।

উছমান ইবনে আবদুর রহমান ঃ সিকাহ রাবী, তার পিতা আবদুর রহমান ইবনে উছমান (রা) ইবনে যুবায়েরের সাথে নিহত হন (মুওয়াত্তা, ৫০)।

উছমান ইবনে আবুল আস ঃ সাহাবী, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তায়েফের শাসক নিযুক্ত করেন এবং আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা) তাকে এই পদে বহাল রাখেন। তিনি ৫১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৩৭৪)।

উছমান ইবনে তালহা ঃ সাহাবী, হুদায়বিয়ার সময় ইসলাম গ্রহণ করেন, খালিদ (রা)-র সাথে মদীনায় হিজরত করেন এবং মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাতে কাবা ঘরের চাবি অর্পণ করেন। তিনি ৪২ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন, মতান্তরে আজনাদাইন যুদ্ধে শহীদ হন (ইসাবা, ২খ, ৪৬০)। বর্তমান কাল পর্যন্ত কাবা শরীফের চাবি তার বংশধরদের নিকট রক্ষিত আছে।

উসাইদ ইবনে হুদাইর ঃ আবু ইয়াহ্ইয়া, প্রভাবশালী সাহাবী, আনসার সম্প্রদায়ের লোক, ২০ অথবা ২১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৭৭)।

উসামা ইবনে যায়েদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পালিত পুত্র যায়েদ ইবনে হারিছা (রা)-র পুত্র। পিতা-পুত্র উভয়ই সাহাবী। তার পিতার নাম (زيد) কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে। তিনি ৫৪ হিজরীতে মদীনায়, মতান্তরে ওয়াদিউল কুরায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৩২০)।

উয়াইমির ইবনে আশকার ঃ সাহাবী, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আব্বাদ ইবনে তামীম তার সূত্রে মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেন। কেননা তিনি তার যুগ পাননি (মুওয়াত্তা, ২৮২)।

(ও)

ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ ঃ হযরত উমার (রা)-র পৌত্র (তাবাকাত, ৫খ, ৩০৪)।

ওয়াসি ইবনে হিব্বান ঃ আনসার সম্প্রদায়ের লোক, আবু যুরআ তাকে সিকাহ রাবী বলে উল্লেখ করেছেন (মুওয়াত্তা, ১৫৪)।

ওয়াহ্ব ইবনে কায়সান ঃ আবু নুআইম আল-মাদানী, ইমাম নাসাঈ এবং ইবনে সাদ তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। তিনি ১২৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৮৯)।

ওয়াইল ইবনে হুদ্র ঃ আবু হানীদা, সাহাবী, ইয়ামন প্রদেশের হাদারামাওতের সামন্ত-রাজ ছিলেন, নবী ﷺ-এর আবির্ভাবের সংবাদ পেয়ে তার কাছে আসেন। নবী ﷺ তিন দিন পূর্বেই তার আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি এসে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের কাছে বসান। তিনি সাহাবাগণকে বলেন, "ওয়াইল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দূরদেশ থেকে এখানে এসেছে। আল্লাহ! তুমি তার সন্তান ও সম্পদে বরকত দান করো।" অতঃপর তিনি তাকে একটি জায়গীর দান করেন। তিনি আমীর

মুআবিয়ার রাজত্বকালে মৃত্যুবরণ করেন। আলকামা ও আবদুল জাব্বার তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ৯২)।

(ক)

কাকা ইবনে হাকীম ঃ আল-কিনানী, আল-মাদানী, ইমাম আহমাদ ও ইয়াহ্ইয়া তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন (মুওয়াত্তা, ৮১)।

কাছীর ইবনুস সাল্ত ঃ আল-কিন্দী আল-মাদানী, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন, প্রবীণ তাবিঈ। কেউ কেউ তাকে সাহাবী বলেছেন, কিন্তু এটা ধারণা মাত্র (মুওয়াত্তা, ২০৩)।

কাতাদা ইবনুন নুমান ঃ বিখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ আল-খুদরী (সাদ ইবনে মালেক) রাদিয়াল্লাহু আনহুর বৈপিত্রেয় ভাই, সাহাবী, বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি উমার (রা)-র খিলাফতকালে ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। উমার (রা) তার জানাযা পড়ান এবং তাকে কবরে রাখেন (মুওয়াত্তা, ১২৩; ইসাবা, ৩খ,২২৫-৬)।

কাব আল-আহবার ঃ আবু ইসহাক, পিতার নাম কানে, প্রবীণ তাবিঈ, আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১০৭)।

কাবশা বিনতে কাব ঃ তিনি সাহাবী বলে কথিত আছে। তার সূত্রে বর্ণিত একটি মাত্র হাদীস পাওয়া যায় (মুওয়াত্তা, ৮৩)।

কাবীসা ইবনে যুওয়াইব ঃ খুযাআ গোত্রের কন্যা, নবী ﷺ -এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সাহাবী ছিলেন। তিনি একদল সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। মাকহূল বলেন, "আমি সিরিয়ায় তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী মহিলা দেখিনি।" তিনি তাবিঈ ছিলেন এবং ৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৩১৭)।

কারীবা বিনতে আবু উমাইয়্যা ঃ সাহাবী এবং উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা)-র বোন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা ছিলেন। তার স্বামীর নাম আবদুর রহমান এবং পুত্র-কন্যাদের নাম আবদুল্লাহ, উম্মে হাকীম ও হাফসা (মুওয়াত্তা, ২৫৯)।

কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ঃ আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র পৌত্র, সিকাহ রাবী, বিশিষ্ট আলেম ও ফকীহ। তিনি ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৭৬)।

কায়সান ইবনে সাদ ঃ আবু সাঈদ, উম্মে শারীক (রা)-র মুক্তদাস এবং সিকাহ রাবী। তিনি ২০ হিজরীতে অথবা তার আগে বা পরে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৬৮)।

কায়েস ইবনে তলক ঃ বিশিষ্ট তাবিঈ, কেউ কেউ তাকে সাহাবী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (ইসাবা, ৩খ, ২৮৪)।

কুদামা ইবনে মাযউন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এবং উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা)-র মামা। তিনি নিজ ভ্রাতা উছমান ইবনে মাযউন (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাযউন (রা)-র সাথে হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করেন। তিনি বদর যুদ্ধসহ সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ৩৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৭৪)।

(খ)

খাওলা বিনতে হাকীম ঃ সাহাবী, উম্মে শারীক নামে সমধিক পরিচিত, সুলাইম গোত্রের কন্যা, স্বামী উছমান ইবনে মাযউন (রা) (মুওয়াত্তা, ২৬৫)।

খানাসাআ বিনতে খিযাম ঃ মহিলা সাহাবী, তার পিতা তার অনুমতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেন। তিনি এ ব্যাপারে নবী ﷺ -এর নিকট অভিযোগ করলে, তিনি বিবাহ ভেংগে দেন (ইসাবা, ৪খ, ২৮৬-৭; মুওয়াত্তা, ২৪৪)।

খারিজা ইবনে যায়েদ ঃ সিকাহ রাবী, ফকীহ, ১০০ হিজরীতে অথবা তার পূর্বে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৫৮)।

খালিদ ইবনে উকবা ঃ সাহাবী, মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন, মদীনার বাজারে তার ঘর ছিলো (মুওয়াত্তা, ৩৯৯)।

খালিদ ইবনে উসাইদ ঃ মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এখানেই থেকে যান। ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য যেসব লোককে আর্থিক সাহায্য দেয়া হতো তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধের দিন নিখোঁজ হন অথবা মারা যান (মুওয়াত্তা, ২৩৪)।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ঃ ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি, মূতার যুদ্ধে (৭ম হি.) অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে 'আল্লাহ্‌র তরবারি' (সাইফুল্লাহ) উপাধি লাভ করেন। তিনি বয়সে নবী ﷺ -এর সমসাময়িক ছিলেন এবং ৬ষ্ঠ হিজরী পর্যন্ত ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির পর এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। রিদ্দা, আজনাদাইন ও ইয়ারমুকের যুদ্ধে অসম বীরত্ব প্রদর্শন করে ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। হযরত উমার (রা) তাকে সিরিয়ার শাসক নিয়োগ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ছিলেন তার খালাতো ভাই। তিনি ২১ হিজরীতে মদীনা অথবা হিম্‌স-এ ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৮৪; ইসলামের ইতিহাস)।

খাল্লাদ ইবনুস সাইব ঃ সিকাহ তাবিঈ, কেউ কেউ তাকে সাহাবী বলে ধারণা করেন (মুওয়াত্তা, ১৯৭)।

খিযাম ঃ অথবা খিদাম, পিতা ওয়াদিআ অথবা খালিদ, বিশিষ্ট সাহাবী (মুওয়াত্তা, ২৪৪)।

(জ)

জাদাহ ইবনে হুবায়রা ঃ মা উম্মে হানী (রা), হুবায়রা অথবা আবু হুবায়রা মক্কা বিজয়ের পর কাফের অবস্থায় নিহত হয়। তিনি নবী ﷺ -এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহাবী কিনা তাতে মতভেদ আছে। বুখারীর মতে, তিনি সাহাবী এবং বাগাবীর মতে সাহাবী নন। তাবারানীতে তার একটি হাদীস উল্লেখ আছে, যা তিনি সরাসরি নবী ﷺ -এর কাছে শুনেছেন। তিনি খোরাসানে আলী (রা)-র প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি আমীর মুআবিয়ার রাজত্বকালে ইন্তেকাল করেন (ইসাবা, ১খ, ২৩৬, ২৫৮; মুওয়াত্তা, ১১৮)।

জাফর ঃ 'ওয়ারিসী সম্পত্তির বন্টন' অধ্যায়ের ৪ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ ঃ ইমাম আবু আবদুল্লাহ জাফর আস-সাদিক, ইমাম বাকের যয়নুল আবেদীন (রা)-র পুত্র এবং ইমাম হুসাইন (রা)-র পৌত্র, আহলে বাইত, তাবউ তাবিঈন, জন্ম ৮০ হিজরীতে, মৃত্যু ১৪৮ হিজরীতে মদীনায়। তিনি নিজ পিতা, আতা,

উরওয়া প্রমুখ রাবীদের সূত্রে এবং মালেক, আবু হানীফা, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারী, শোবা, সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ইবনে উআয়না প্রমুখ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সিকাহ্ এবং ত্রুটিমুক্ত রাবী (মুওয়াত্তা, ২৯০)।

জাফর ইবনে আতীক : বিশিষ্ট সাহাবী, ৬১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৬৪)।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ : ডাকনাম আবু আবদুল্লাহ, আবু আবদুর রহমান ও আবু মুহাম্মাদ। আনসার, বিশিষ্ট এবং প্রসিদ্ধ সাহাবী, বদর এবং তৎপরবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারামও সাহাবী ছিলেন। তিনি ১৫৪০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একদল সাহাবীও তার সূত্রে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বাইআতে আকাবায় উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে উনিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নিয়মিত মসজিদে নববীতে কুরআন-হাদীসের দরস দিতেন। তিনিই মদীনায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী (কিন্তু বাগাবীর মতে সাহল ইবনে সাদ (রা) মদীনায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী)। তিনি ৭৮ হিজরীতে মতান্তরে ৭৪, ৭৩ অথবা ৭৭ হিজরীতে ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ওসিয়াত করে যান যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যেন তার জানাযা না পড়ায় (মুওয়াত্তা, ৫৮; ইসাবা, ১খ, ২১৩; সহীহ বুখারী (বাংলা), ১ম খণ্ড; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১খ, ৪৩-৪)।

জামীল আল-মুয়াজ্জিন : পিতার নাম আবদুর রহমান আল-মুয়াজ্জিন আল-মাদানী তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও উমার ইবনে আবদুল আযীযের সূত্রে এবং ইমাম মালেক ও ইয়াহ্ইয়া তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ৩৫৪)।

জুবায়ের ইবনে মুতইম : সাহাবী, মা উম্মে হাবীব অথবা উম্মে জামীল, হুদায়বিয়া ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে, মতান্তরে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। সাহাবীদের মধ্যে সুলায়মান ইবনে সারদ ও আবদুর রহমান ইবনে আযহার (রা) এবং তাবিঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-র নিকট বংশবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি মুআবিয়া (রা)-র রাজত্বকালে ৫৭, ৫৮ অথবা ৫৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৪৬; ইসাবা, ১খ, ২২৫-৬)।

(ত)

তাউস : পিতার নাম কায়সান আল-ইয়ামানী। তার নাম যাকওয়ান এবং ডাকনাম তাউস বলে কথিত। তিনি সিকাহ্ তাবিঈ এবং ১০৬ হিজরী অথবা তার পরে মৃত্যুবরণ করেন (মুওয়াত্তা, ১৭৮)।

তামীমা বিনতে ওয়াহ্ব : অথবা তুমায়মা, মতান্তরে তার নাম উমায়মা, সুহায়মা অথবা আয়েশা (রা), সাহাবী, কুরায়যা গোত্রের কন্যা। তার পূর্বস্বামী রিফাআ ইবনে শিমওয়াল তাকে তালাক দিলে আবদুর রহমান ইবনে যুবায়ের (রা)-র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (মুওয়াত্তা, ২৬৪)।

তালহা ইবনে আবদুল্লাহ : আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র ভ্রাতুষ্পুত্র, ফকীহ্ এবং সিকাহ্ তাবিঈ। তিনি ৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৬১)।

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ : বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উহুদ ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে

অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নাম রাখেন উহুদ যুদ্ধের দিন তালহাতুল খায়র, খন্দক যুদ্ধের দিন তালহাতুল ফাইয়ায এবং হুনাইন যুদ্ধের দিন তালহাতুল জূদ। তিনি ৩৬ হিজরীতে উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন শহীদ হন (মুওয়াত্তা, ২০৯)।

তালহা ইবনে আমর ঃ আল-হাদরামী, অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল, ১৫২ হিজরীতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন (তাবাকাত, ৫খ, ৪৯৪)।

তালিব ঃ আকীল দ্রষ্টব্য।

তুফায়ল ইবনে উবাই ঃ তাবিঈ, আনসার খাযরাজ গোত্রের লোক, সিকাহ রাবী, পিতা উবাই ইবনে কাব (রা) বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন বলে কথিত (মুওয়াত্তা, ৩৮৫)।

দাউদ ইবনুল হুসাইন ঃ ইবনে মুঈনের মতে, তিনি সিকাহ রাবী, ১৩৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১০৫)।

(দ)

দাউদ ইবনে কায়েস ঃ আবু সুলায়মান, সিকাহ রাবী। তিনি সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা), যায়েদ ইবনে আসলাম, ইবনে উমারের মুক্তদাস নাফে, নাফে ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম প্রমুখ রাবীদের সূত্রে এবং দুই সুফিয়ান, ইবনুল মুবারক, ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান, ওয়াকী প্রমুখ রাবীগণ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে মুঈন, আবু যুরআ, আবু হাতিম, নাসাঈ, ইবনুল মাদীনী প্রমুখ তাকে সিকাহ রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আব্বাসী-রাজ আবু জাফর মানসূরের আমলে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১০১)।

দামীরা ইবনে আবু দামীরা ঃ সাদ অথবা সাঈদ অথবা রাওহ্ আল-হিময়ারী, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুক্তদাস (মুওয়াত্তা, ১২৪)।

আদ-দারদাআ ঃ হযরত আবু দারদাআ (উআয়মির ইবনে আমের) রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা (মুওয়াত্তা, ৫৪)।

দাহ্হাক ইবনে কায়েস ঃ আবু উনাইস, সাহাবী, ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা)-র ভাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের সময় তার বয়স হয়েছিল আট বছর। তিনি উমাইয়্যা রাজেত্বর কর্মচারী ছিলেন। তিনি ৬৪ হি. মতান্তরে ৫০ হিজরীতে নিহত হন (মুওয়াত্তা, ১৩৮; ইসাবা, ২খ, ২০৭-৮)।

দাহ্হাক ইবনে খলীফা ঃ সাহাবী, আশহাল গোত্রের লোক, বনূ নাযীরের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, তার সূত্রে কোন হাদীস বর্ণিত নেই। তিনি মুনাফিকদের দলভুক্ত হয়েছিলেন, পরে তওবা করেন এবং নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধ করেন (মুওয়াত্তা, ৩৫৮)।

দাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান ঃ সাহাবী, মদীনার অধিবাসী, পরে নজদে চলে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের আমীর নিযুক্ত করেন (মুওয়াত্তা, ২৯৫)।

(ন)

নাজ্জাশী ঃ জানাযা অধ্যায়ের ৮ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

নাফে ঃ শায়খুল ইসলাম আল্লামা যাহাবী তার 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায' গ্রন্থে লিখেছেন, নাফে আবু আবদুল্লাহ আল-আদাবী আল-মাদানী তার মনিব আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আয়েশা, আবু হুরায়রা, উম্মে সালামা, রাফে ইবনে খাদীজ রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ আরও অনেক সাহবীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে আইউব, উবায়দুল্লাহ, ইবনে জুরাইজ, আওযাঈ, মালেক, লাইছ এবং আরও অনেকে তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ফজরের পর মসজিদে হাদীসের দরস দিতেন। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে সাদের মতে তিনি ১১৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মতান্তরে ১২০ হি.)। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ তিরিশ বছর ইবনে উমারের খেদমত করেছি। একদিন তিনি আমাকে তিরিশ হাজার দিরহাম দান করেন। আমি বললাম, এই বিপুল অর্থ আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবে। অতঃপর তিনি আমাকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন। তিনি ছিলেন ইবনে উমার (রা)-র হাদীসের সর্বপ্রধান উৎস। ইমাম মালেক বলেন, আমি নাফের সূত্রে ইবনে উমারের হাদীস শুনার পর তা অন্য কারও কাছে শুনার আর প্রয়োজন বোধ করি না। কোন কোন বর্ণনায় তার নাম নাফে ইবনে সারজিস আদ-দায়লামী উল্লেখ আছে (মুওয়াত্তা, ৬১)।

নুআইম আল-মুজমার ঃ ডাকনাম আবু আবদুল্লাহ, পিতার নাম আবদুল্লাহ। ইবনে মুঈন, আবু হাতিম প্রমুখ তাকে সিকাহ রাবী বলে উল্লেখ করেছেন (মুওয়াত্তা, ৯০)।

নুখায়লা ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র বাঁদী (মুওয়াত্তা, ৩৯২)।

নুফাই ঃ উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা)-র মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ) গোলাম (মুওয়াত্তা)।

নুবাইহ্‌ ইবনে ওয়াহ্‌ব ঃ অল্প বয়স্ক তাবিঈ, ১২৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মামার (তাবিঈ) ছিলেন তার শিক্ষক (মুওয়াত্তা, ২১৪)।

নুমান ইবনে বশীর ঃ 'ব্যবসা-বাণিজ্য ও অগ্রীম ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়ের ১৩ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

(ফ)

ফযল ইবনে আব্বাস ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র জ্যেষ্ঠ সহোদর ভাই এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই। তার অনেক ফযীলাত বর্ণিত আছে। তিনি হুনাইন যুদ্ধে ও বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলেন এবং নবী ﷺ-এর ইন্তেকালের পর সিরিয়া চলে যান। তিনি জর্দানের সীমান্তে আমওয়াস নামক স্থানে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ১৮ হিজরীতে, মতান্তরে ১৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২২০)।

ফাতিমা বিনতে উমার ঃ হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কন্যা এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা)-র বোন (মুওয়াত্তা, ২৭৬)।

ফাতিমা বিনতে ওয়ালীদ ঃ বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুযায়ফা (রা)-র ভ্রাতুষ্পুত্রী। তার পিতা বদর যুদ্ধে কাফের অবস্থায় নিহত হয় (মুওয়াত্তা, ২৭৭, ইসাবা, ৪খ, ৩৮৫)।

ফাতিমা বিনতে কায়েস ঃ সাহাবী, ভাই দাহ্‌হাক ইবনে কায়েস (রা)-ও সাহাবী ছিলেন। তিনি হিজরতকারিণী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার স্বামী আবু আমর ইবনে হাফস (মতান্তরে তার নাম আবদুল মজীদ অথবা আহমাদ) হযরত আলী (রা)-র সাথে ইয়ামন যান

এবং সেখান থেকে তাকে তালাক দেন। অতঃপর মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, আবুল জাহম ও উসামা ইবনে যায়েদ (রা) তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পরামর্শ করলে তিনি উসামা ইবনে যায়েদকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করার ইংগিত দেন (মুওয়াত্তা ২৬৭)।

ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ ﷺ **:** রাসূল-কন্যা ফাতিমা (রা), নবুওয়াত প্রাপ্তির এক বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন (ইবনে আবদুল বার)। কিন্তু ইবনুল জাওযীর মতে, তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কন্যাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠা। প্রথমে যয়নব, অতঃপর রুকাইয়্যা, অতঃপর উম্মে কুলছূম, অতঃপর ফাতিমা (রা)। দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত আলী (রা)-র সাথে তার বিবাহ হয়। তার গর্ভে পাঁচটি সন্তানের জন্ম হয়—হাসান, হুসাইন, মুহসিন, উম্মে কুলছূম ও যয়নব (রা)। তিনি ১১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হযরত আব্বাস (রা) তার জানাযা পড়ান এবং তিনি, আলী ও ফযল ইবনে আব্বাস (রা) তাকে কবরে রাখেন (মুওয়াত্তা, সীরাতে মুস্তাফা, ২খ, ৫২৯-৩০)।

ফাদালা ইবনে উবায়েদ : আনসার সাহাবী, উহুদ এবং তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন, অতঃপর সিরিয়া চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করেন। তিনি আমীর মুআবিয়া (রা)-র বিচারপতি ছিলেন। তিনি ৫৩ হিজরীতে দামেশকে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২২৭)।

ফুরাইআ : সাহাবী এবং আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র বোন। তিনি বাইআতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। তার মায়ের নাম হাবীবা বিনতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে আবু সালূল (মুওয়াত্তা ২৬৮)।

(ব)

বশীর ইবনে সাদ : 'ব্যবসা-বাণিজ্য ও অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়ের ১৩ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

বারাআ ইবনে আযেব : আনসার সাহাবী, আওস গোত্রের লোক, সর্বপ্রথম উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, পরবর্তী কালে কুফা চলে যান এবং সেখানে ৭২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার পিতা (আযেব ইবনুল হারিছ)-ও সাহাবী ছিলেন। তিনি নবী ﷺ -এর সাথে ১৪ বা ১৫ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৮টি সফরে তার সফরসংগী ছিলেন। তিনি ২৪ হিজরীতে রায় এলাকা জয় করেন এবং হযরত আলী (রা)-র সাথে উষ্ট্রীর যুদ্ধে ও সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্র, উমার, আবু জুহায়ফা এবং আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ২৮০; ইসাবা, ১খ, ১৪২-৩)।

বারাআ ইবনে কায়েস : আবু কাবশা আল-কূফী, সিকাহ তাবিঈ, হুযায়ফা (রা) এবং সা'দ (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ৫৫)।

বিরওয়া বিনতে ওয়াশিক : স্বামীর নাম হিলাল ইবনে মুররা আল-আশজাঈ (রা)। তার মুহর নির্ধারিত ছিলো না। অতএব স্বামী মারা গেলে রাসূলুল্লাহর ﷺ স্ত্রী বংশের মেয়েদের সমপরিমাণ মুহর তাকে প্রদান করার নির্দেশ দেন (মুওয়াত্তা, ২৫০)।

বিলাল ইবনুল হারিছ : আবু আবদুর রহমান আল-মুযানী, সাহাবী, তিনি ৫ম হিজরীতে মুযায়না গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন। মক্কা বিজয়ের

দিন তিনি মুযায়না গোত্রের পতাকা বহন করেন। পরে বসরায় গিয়ে বসবাস করেন এবং আমীর মুআবিয়ার রাজত্বের শেষদিকে ৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৭৮)।

বিলাল ইবনে রাবাহ্ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়াজ্জিন এবং আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র মুক্তদাস, মায়ের নাম হুমামা। তিনি বদর যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তার পূর্বে-মনিব উমাইয়্যা ইবনে খালাফ ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করতো। প্রথমে রোদের মধ্যে গরম পাথরের উপর শুইয়ে বুকের উপর ভারী পাথর তুলে দেয়া হতো, কখনও গরুর কাঁচা চামড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হতো, আবার কখনও লৌহবর্ম পরিধান করিয়ে রোদের মধ্যে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে রাখা হতো। এই অবস্থায় উমাইয়্যা এসে বলতো, মুহাম্মাদ ও তাঁর খোদাকে অস্বীকার করো। কিন্তু সাথে সাথে তার মুখ দিয়ে বের হতো আহাদ, আহাদ (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক)। আবু বাক্‌র (রা) তার এই করুণ অবস্থা দেখে নিজের একটি মুশরিক গোলামের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। বিলাল (রা) তার পরিবারের যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তার ইন্তেকালের কিছুকাল পরে তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সিরিয়ার আলেপ্পো (হলব) শহরে চলে যান এবং সেখানে ১৭, ১৮ অথবা ২০ হিজরীতে ৬০ বা তদুর্ধ বয়সে মৃত্যুবরণ করেন (মুওয়াত্তা, ১২৭; সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ, ১২৪-৫)।

বুকাইর ইবনে আমের ঃ আবু ইসমাঈল আল-কুফী, তিনি কায়েস ইবনে হাযেম, আবু যুরআ ইবনে আমর ইবনে জারীর ও অন্যের সূত্রে এবং সুফিয়ান সাওরী, ওয়াকী ও অন্যরা তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ তাকে একবার বলছেন, হাদীস শাস্ত্রে তার ভালো জ্ঞান আছে এবং তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করায় কোন দোষ নেই। তিনি আবার বলেছেন, তিনি তেমন শক্তিশালী রাবী নন। ইমাম নাসাঈ, আবু যুরআ ও ইবনে মুঈন তাকে দুর্বল রাবী বলেছেন। ইবনে আদী বলেছেন, তিনি খুব বেশী হাদীস বর্ণনা করেননি। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অল্প এবং আমি তার বর্ণিত হাদীসের মূল পাঠে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করিনি। তবে তিনি হাদীস লিখে রাখতেন। ইবনে সা'দ, হাকেম, ইবনে হিব্বান তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন (মুওয়াত্তা, ১০০)।

বুশাইর ইবনে ইয়াসার ঃ ইবনে মুঈন ও নাসাঈ তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। ইবনে সাদ বলেছেন, বয়বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং সাহাবীগণের সাথে তার সাক্ষাত হয়েছে। তার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অল্প (মুওয়াত্তা, ৬০)।

বুসর ইবনে সাঈদ ঃ শায়েখ দেহলবীর নোসখায় বিশর, ইবাদতগুজার বান্দা, সিকাহ রাবী এবং হাফেযে হাদীস। তিনি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস, যায়েদ ইবনে ছাবিত, আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১০০ হিজরীতে ৭৮ বছর বয়সে কপর্দকহীন অবস্থায় মদীনায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১১৭, ১৫২; তাবাকাত, ৫খ, ১৮১-২)।

(ম)

মায়মূনা ঃ উম্মুল মুমিনীন, পিতার নাম হারিছ এবং মায়ের নাম হিন্দ। ৭ম হিজরীর যিলকাদ মাসে উমরাতুল কাযা আদায় করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মক্কায় বিবাহ করেন। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ বিবাহ। তার পূর্ব-স্বামীর নাম আবু রুহম ইবনে আবদুল উয্যা। তিনি তাকে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন না ইহরামমুক্ত অবস্থায়,

এ নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। তিনি মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করেছেন, ইমাম বুখারী এই মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায়, সারেফ নামক স্থানে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-র খালা। তিনি ৫১, ৬৬ অথবা ৬৩ হিজরীতে সারেফ-এ ইন্তেকাল করেন এবং এখানেই তাকে দাফন করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তার জানাযা পড়ান (মুওয়াত্তা, ১১৭; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ, ৫০৮-৯)।

মাকহুল ঃ আবু আবদুল্লাহ আল-হুযালী, দামেশকের ফকীহ, অনেক মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি উবাদা ইবনুস সামিত, আয়েশা, উবাই (রা) ও অপরাপর প্রবীণ সাহাবীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হাতিম বলেন, আমি মাকহুলের চেয়ে বড়ো ফিক্‌হবিদ দেখিনি। তিনি তার অনেক প্রশংসা করেছেন এবং তাকে একজন নির্ভরযোগ্য সমালোচক বলেছেন। তিনি ১১৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৩২)।

মাকিল ইবনে সিনান ঃ আবু আবদুর রহমান, আবু যায়েদ অথবা আবু সিনান। সাহাবী, যুবক অবস্থায় মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন, অতঃপর কুফা যান, পরে মদীনায় ফিরে আসেন এবং হাররার মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনায় নিহত হন (মুওয়াত্তা, ২৫০)।

মারওয়ান ইবনুল হাকাম ঃ উমাইয়া-রাজ, হযরত উছমান ও আমীর মুআবিয়ার চাচা। হিজরতের ঘটনার কয়েক বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খলীফা উছমান (রা)-র প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন এবং খলীফার নাম নিয়ে তার অজান্তে অনেক ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করেন। ফলে তার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়, যার পরিণতিতে তাকে বিদ্রোহীদের হাতে জীবন দিতে হয়। উষ্ট্রীর যুদ্ধে মারওয়ান তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-কে নিজের বর্শার আঘাতে হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ও তার পিতা হাকামকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। কারবালার হত্যাকাণ্ডের পর তিনিই ইয়াযীদকে মদীনা আক্রমণের পরামর্শ দেন। মাসউদীর মতে তিনিই সর্বপ্রথম তরবারির সাহায্যে সিংহাসন দখল করেন। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের বলেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মারওয়ানকে দোষারোপ করা যায় না। তিনি সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ১৮২; ইসলামের ইতিহাস)।

মারজানা ঃ আয়েশা (রা)-র মুক্তদাসী, সিকাহ রাবী এবং তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার পুত্র আলকামা ইবনে আবু আলকামাও সিকাহ রাবী (মুওয়াত্তা, ৮১)।

মালেক আল-আসবাহী ঃ প্রবীণ তাবিঈ ও সিকাহ রাবী এবং ইমাম মালেক (র)-এর দাদা। তিনি ৭৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৮৮)।

মালেক ইবনে আওস ঃ ব্যবসা -বাণিজ্য ও অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ের ১৫ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

মালেক ইবনে আবু আমের ঃ মালেক আল-আসবাহী দ্রষ্টব্য।

মালেক ইবনে আমের ঃ মালেক আল-আসবাহী দ্রষ্টব্য।

মালেক ইবনে সিনান ঃ বিখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) এবং মহিলা সাহাবী ফুরাইআ (র)-র পিতা।

মাসরূক ইবনুল আজদা ঃ আবু আয়েশা আল-হামদানী আল-কূফী, ফকীহ, আয়েশা (রা)-র মুখডাকা পুত্র। নামায পড়তে পড়তে তার পা ফুলে যেতো। তিনি উমার, আলী, মুআয, ইবনে মাসউদ ও উবাই (রা)-এর সূত্রে এবং ইবরাহীম নাখঈ ও শা'বীসহ একদল রাবী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৬৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (তাযকিরাতুল হুফফায, ১খ, ৪৯-৫০)।

মাহমূদ ইবনে লাবীদ ঃ আনসার, আবদুল আশহাল গোত্রীয়। তিনি নবী ﷺ-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম তাকে দ্বিতীয় স্তরে (তাবিঈ) উল্লেখ করেছেন। তিনি ৯৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৭৯)।

মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ঃ মিকদাদ ইবনে আমর ইবনে সালাবা আল-কিন্দী, সাহাবী, বদর ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৩৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৬৫)।

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ঃ সাহাবী, তার পিতা মাখরামা ইবনে নওফাল (রা)-ও সাহাবী ছিলেন (মুওয়াত্তা, ২৩৮)।

মুআবিয়া ঃ উমাইয়্যা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, ৬০৬ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে কাফের অবস্থায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর পিতা আবু সুফিয়ানের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ওহী লেখক নিযুক্ত করেন। উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা (রা) তার বোন। তাকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন ঃ "তুমি শাসন-ক্ষমতা লাভ করলে জনগণের কল্যাণ সাধন করিও।" এরপর থেকেই তার মনে সিংহাসন লাভের অভিলাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। হযরত উমার (রা) তাকে দামেশকের শাসক এবং হযরত উছমান (রা) সমগ্র সিরিয়ার শাসক নিয়োগ করেন। হযরত আলী (রা)-র শাহাদাত লাভের পর তিনি ৬৬১ খৃস্টাব্দে গোটা মুসলিম জাহানের রাজা হন। তার সময় সমগ্র উত্তর আফ্রিকা মুসলিম শাসনের অধীনে আসে এবং পূর্বদিকে বুখারা, সমরকন্দ ও সিন্ধুর সীমা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত হয়। তিনি ৬১ হিজরীর শাবান মাসে (এপ্রিল ৬৮০ খৃ.) ইন্তেকাল করেন (ইসলামের ইতিহাস)।

মুআয ইবনে জাবাল ঃ আবু আবদুর রহমান আল-মাদানী, আনসার খাযরাজ গোত্রীয়, আকাবার শপথ, বদর এবং তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় যে চারজন সাহাবী কুরআন সংকলন করেন, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। আনাস, আবুত তুফাইল (রা), উমার (রা)-র মুক্তদাস আসলাম, আসওয়াদ ইবনে হিলাল, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আবু মুসলিম খাওলানী, আবু ওয়াইল, আবদুর রহমান ইবনে সালাম ও আরও অনেকে তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসের গ্রন্থসমূহে তার অনেক মর্যাদার কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "আমার উম্মাতের মধ্যে মুআয হালাল-হারাম সম্পর্কিত বিষয়ে অধিক জ্ঞানী"। "হে মুআয, আল্লাহর শপথ! আমি তোমায় ভালোবাসি"। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "আমরা মুআযকে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তুলনা করতাম"। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন ঃ "আলেমগণ যখন আল্লাহর দরবারে হাযির হবে, মুআয তাদের সামনে থাকবে"। নবী ﷺ তাকে ইয়ামন পাঠানোর সময় তার বাহনের পাশে পাশে পায়ে হেঁটে তাকে বিদায় দিতে অগ্রসর হন এবং বলেন ঃ 'হে মুআয! হয়তো জীবনে আর তোমার সাথে দেখা হবে না। তুমি হয়তো আমার মসজিদ এবং কবরের কাছ দিয়ে

অতিক্রম করবে"। বিচ্ছেদ বেদনায় মুআয (রা) কেঁদে দিলেন। তিনি বলেন ঃ কেঁদো না। কান্না হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে"। তিনি ১৮ হিজরীতে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ৩৫ বছর বয়সে জর্দানে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১২৩; তাযকিরাতুল হুফফায, ১খ, ২২)।

মুআয ইবনে আমর ইবনে সাঈদ ঃ সিকাহ তাবিঈ, তার দাদী হাওয়া বিনতে ইয়াযীদ (রা) মহিলা সাহাবী এবং তার স্বামীর নাম সাঈদ (মুওয়াত্তা, ৩০৯)।

মুগীরা ইবনে শোবা ঃ সাহাবী, ডাকনাম আবু ঈসা, আবু মুহাম্মাদ অথবা আবু আবদুল্লাহ, ছাকীফ গোত্রীয়। তিনি উমরাতুল হুদায়বিয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুদায়বিয়ায় উপস্থিত হয়ে বাইআতে রিদওয়ানের শপথ গ্রহণ করেন। তার তিন পুত্র উরওয়া, গিফার ও হামযা, হাসান ইবনে হিব্বান, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা, কায়েস ইবনে আবু হাযিম, মাসরূক, কাবীসা ইবনে যুওয়াইব, নাফে ইবনে জুবায়ের, বুকাইর ইবনে আবদুল্লাহ, আসওয়াদ ইবনে হিলাল এবং আরও অনেকে তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। উমার (রা) তাকে কুফার শাসক নিয়োগ করেন এবং উছমান (রা)-ও তাকে এই পদে বহাল রাখেন। তিনি ৫০ হিজরীতে, মতান্তরে ৪৯ অথবা ৫১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (ইসাবা, ৩খ, ৪৫২-৩);

মুগীরা ইবনে হাকীম ঃ সিকাহ তাবিঈ, আবু হুরায়রা (রা) এবং ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। অপরদিকে নাফে, ইবনে জুরাইজ ও জারীর ইবনে হাযিম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ১১৩)।

মুজবির ইবনে আবদুর রহমান ঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র দৌহিত্র, সিকাহ রাবী। তার নাম আবদুর রহমান বলেও কথিত আছে। তিনি নিজ পিতা ও চাচা সালিমের সূত্রে এবং নিজ পুত্র মুহাম্মাদ ও ইমাম মালেক তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি মায়ের পেটে থাকতেই তার পিতা ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৬২, ২৩৮)।

মুজাহিদ ঃ আবুল হাজ্জাজ, মাখযূম গোত্রের মুক্তদাস, কিরাআত বিশেষজ্ঞ, তাফসীরকার, মুহাদ্দিস এবং ফিক্হবিদ। তিনি সাদ, আয়েশা, আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একটি উল্লেখযোগ্য সময় ইবনে আব্বাস (রা)-র সাহচর্যে কাটান এবং তাকে গোটা কুরআন পড়ে শুনান। আমাশ, মানসূর, ইবনে আওন, কাতাদা প্রমুখ রাবীগণ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। কাতাদা বলেন, তিনি সমকালীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাস্সির। ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি যেদিন তার বক্তব্য শুনেছি সেদিন থেকে আমি তাকে আমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদের চেয়ে অধিক ভালোবাসি। তিনি একজন প্রখ্যাত সিকাহ রাবী। তিনি ১০১, ১০২, ১০৩ অথবা ১০৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৭৫)।

মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ঃ আবুল হাকাম, মাখযূম গোত্রীয়, সিকাহ তাবিঈ (মুওয়াত্তা, ৩৯৮)।

মুনকাদির ইবনে আবদুল্লাহ ঃ আল-কারশী, আত-তায়মী, আল-মাদানী, তাবিঈ। ইমাম বুখারী তাকে যঈফ বলেছেন। তিনি তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৮০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৩৭; মীযানুল ইতিদাল, ৪খ, ১৯০)।

মুনযির ইবনুয যুবায়ের ঃ আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা)-র ছোট ভাই, সিকাহ তাবিঈ, ৬৪ হিজরীতে হাররার ঘটনার পর মক্কায় ইয়াযীদ বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় নিহত হন (মুওয়াত্তা, ২৫৯)।

মুলায়কা ঃ উম্মে সুলাইম (রা) দ্রষ্টব্য।

মুসআব ইবনে সাদ ঃ আবু যুরারা আল-মাদানী, সিকাহ রাবী। তিনি ১০৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫০)।

মুহাইয়্যাসা ঃ সাহাবী, খাযরাজ গোত্রীয়, সব যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। তিনি হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার বড়ো ভাই হুয়াইয়াসা (রা) তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন (মুওয়াত্তা, ২৯৯)।

মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির ঃ প্রভাবশালী সিকাহ রাবী, ১৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫৯)।

মুহাম্মাদ আল-বাকের ঃ ইমাম যয়নুল আবেদীন (আলী ইবনে হুসাইন) রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র, ইমাম বাকের নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ইমাম জাফর সাদিকের পিতা, সিকাহ রাবী, আহলে বাইতের সদস্য এবং ইল্‌ম ও জ্ঞানে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ১১৮ অথবা ১১৯ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৯০, ৩৬৩)।

মুহাম্মাদ ইবনে আজলান ঃ মদীনার নির্ভরযোগ্য ফিক্‌হবিদ, নিজ পিতা, আনাস (রা) এবং আরো অনেকের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। শোবা, মালেক, ইয়াহইয়া আল-কাত্তান প্রমুখ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইবনে মুঈন তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। কিন্তু অন্যরা তার স্মরণশক্তির দুর্বলতার সমালোচনা করেছেন। তিনি ১৪৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১০২)।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ঃ আবুর রিজাল দ্রষ্টব্য।

মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র ঃ তিনি আনাস (রা)-র সূত্রে একটি মাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপর কোন সাহাবীর সূত্রে তার বর্ণিত হাদীস নেই (মুওয়াত্তা, ১৯৬)।

মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্‌র ঃ আবুল কাসিম, পিতার মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা)-র তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন এবং তার সাথে উষ্ট্রীর যুদ্ধে ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উছমান (রা)-র হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। আলী (রা) তাকে মিসরের শাসক নিয়োগ করেন। আমীর মুআবিয়া (রা) আমর ইবনুল আস (রা)-কে মিসর দখলে পাঠালে যুদ্ধে মুহাম্মাদের বাহিনী পরাজিত হয় এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন। ৩৮ হিজরীর সফর মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় (মুওয়াত্তা, ২২৩)।

মুহাম্মাদ ইবনে আমর ঃ সিকাহ তাবিঈ, আবু হুমায়েদ, আবু কাতাদা ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ৩৮৫)।

মুহাম্মাদ ইবনে আমর ঃ ইবনে সাদের মতে নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় ১০ হিজরীতে নাজরানে জন্মগ্রহণ করেন, ৬৩ হিজরীতে হাররার ঘটনায় নিহত হন এবং আনসার বনু নাজ্জার-এর লোক। তিনি নিজ পিতা, উমার (রা) ও আমর ইবনুল আস (রা)-র সূত্রে এবং নিজ পুত্র আবু বাক্‌র এবং উমার ইবনে কাছীর ইবনে আফলাহ্ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সিকাহ রাবী, কিন্তু তার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম (তাহযীবুত তাহযীব, ৯খ, ৩৭০-১)।

মুহাম্মাদ ইবনে আলী ঃ "আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী" দ্রষ্টব্য।

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াস ঃ সিকাহ তাবিঈ, কোন কোনো বিশেষজ্ঞ তাকে সাহাবী বলেছেন। কিন্তু তা একটা ভিত্তিহীন ধারণা মাত্র (মুওয়াত্তা, ২৬৩)।

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ঃ আনসার সম্প্রদায়ের লোক, মদীনার অধিবাসী। ইমাম নাসাঈ, ইবনে মুঈন ও আবু হাতিম তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। তিনি ১২১ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৫৩)।

মুহাম্মাদ ইবনে উকবা ঃ যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা)-র মুক্তদাস, মূসা ইবনে উকবার ভাই, সিকাহ রাবী এবং মদীনার অধিবাসী (মুওয়াত্তা, ১৭৪)।

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ঃ অথবা মুহাম্মাদ ইবনে সালামা, সাহাবী এবং আনসার সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি ৪৬ অথবা ৪৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৬৫, ৩১৮)।

মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ আত-তায়মী ঃ সিকাহ রাবী, ইমাম মুসলিম ও সুনান আরবাআর ইমামগণ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ১১৮)।

আল-মুহাস্সার ঃ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতে মুহাস্সির। একটি স্থানের নাম, মুযদালিফা ও মিনার মাঝখানে অবস্থিত। এর অপর নাম ওয়াদিউন-নার (আগুনের মাঠ)। আবরাহার হস্তীবাহিনী এখানে পৌছে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং আর সামনে অগ্রসর হতে পারেনি। হাজ্জীদের এই স্থান দ্রুত অতিক্রম করার নির্দেশ রয়েছে (মুওয়াত্তা, ২৩০)।

মূসা ইবনে মায়সারা ঃ আবু উরওয়া আল-মাদানী, সিকাহ রাবী, ইমাম মালেক (র) তার প্রশংসা করেছেন। তিনি ১৩৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১১৮)।

(য)

যয়নব বিনতে আবদুল্লাহ ঃ মহিলা সাহাবী, ছাকীফ গোত্রের কন্যা এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র)-র স্ত্রী। তিনি সরাসরি নবী ﷺ-এর কাছে হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজের স্বামীর সূত্রেও হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার সূত্রে তার বোনপুত্র ও বুসর ইবনে সাঈদ হাদীস বর্ণনা করেছেন (মুওয়াত্তা, ৩৪৩)।

যয়নব বিনতে জাহ্শ ঃ উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফু উমাইমা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। নবী ﷺ -এর পালিত পুত্র যায়েদ ইবনে হারিছা (রা)-র সাথে সর্বপ্রথম বিবাহ হয়। বনিবনা না হওয়ার কারণে যায়েদ (রা) তাকে তালাক দেন। অতঃপর চার অথবা পাঁচ হিজরীর যিলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন তার ৫ম (জীবিত) স্ত্রী। তখন তার বয়স ৩৫ বছর। উম্মুহাতুল মুমিনীনের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করেন। তিনি ২০ অথবা ২১ হিজরীতে ৫৩ অথবা ৫৫ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। হযরত উমার (রা) তার জানাযা পড়ান (মুওয়াত্তা, ১৬৭; সীরাতুল মুস্তাফা, ৪৬৭, ৪৭৭ ও ৪৮৬, দ্বিতীয় খণ্ড)।

যয়নব বিনতে ফাতিমা ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাতনী এবং ফাতিমা ও আলী (রা)-র কন্যা। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র)-র সাথে তার বিবাহ হয়। আলী, উম্মে কুলছূম, আওন, আব্বাস ও মুহাম্মাদ তার গর্ভজাত সন্তান। তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মহিলা (মুওয়াত্তা, ২৯১)।

যয়নব বিনতে মুহাম্মাদ ﷺ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা এবং নবুয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বদর যুদ্ধের পর হিজরত করেন। খালাতো ভাই আবুল আসের সাথে তার বিবাহ হয়। তিনি ৮ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন এবং মৃত্যুর সময় আলী ও উমামা নামে একটি পুত্র ও

একটি কন্যা সন্তান রেখে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাতনী উমামাকে অপরিসীম স্নেহ করতেন (মুওয়াত্তা, ১৫৮, সীরাতুল মুস্তাফা, ২য় খণ্ড, ৫৩৫)।

যাবরাআ ঃ আদী ইবনে কাব গোত্রের মুক্তদাসী। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ২৬১)।

যামআ ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (র)-র পিতা, সাহাবী, মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন (মুওয়াত্তা, ২৬২)।

যায়েদ আবু আইয়্যাশ ঃ 'ব্যবসা-বণিজ্য ও অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়ের ২ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

যায়েদ ইবনে আসলাম ঃ আবু আবদুল্লাহ অথবা আবু উসামা, মদীনার অধিবাসী এবং হযরত উমার (রা)-র মুক্তদাস। ইয়াকূব ইবনে শাইবা বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) ফিক্হবিদ, আলেম ও তাফসীরকার। তাফসীরের উপর তার একটি কিতাব ছিল। তিনি ৩৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫৮, ৬৫)।

যায়েদ ইবনে খাত্তাব ঃ ডাকনাম আবু আবদুর রহমান, উমার (রা)-র বড়ো ভাই এবং তার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বদর, উহুদ, খন্দক ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন এবং তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহন করেন এবং এই যুদ্ধে (১২ হি.) শহীদ হন (তাবাকাত, ৩খ, ৩৭৭-৮; তাকরীব, ১খ, ২৭৪)।

যায়েদ ইবনে খালিদ ঃ আবু আবদুর রহমান, তালহা অথবা আবু যুরআ (ডাকনাম)। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন জুহায়না গোত্রের পতাকা বহন করেন। তিনি সাহাবী ছিলেন এবং ৭৮ হিজরীতে মদীনায়, মতান্তরে ৬৮ হিজরীতে অথবা ৫০ হিজরীতে মিসরে অথবা কূফায় আমীর মুআবিয়ার রাজত্বের শেষদিকে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১১৯)।

যায়েদ ইবনে ছাবিত ঃ ডাকনাম আবু সাঈদ অথবা খারিজা, ওহী লেখক এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় কুরআন সংকলনকারী চারজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি ৪৫, ৪৮ অথবা ৫১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৭৯; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১খ, ৩০-২)।

যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান ঃ খালিদ ইবনে আবিহি নামে পরিচিত ছিল। তার মা সুমাইয়্যা ছিল ছাকীফ গোত্রের হারিছ ইবনে কালদার মুক্তদাসী এবং উবায়েদের দাসী স্ত্রী। যিয়াদ তার ঘরেই জন্মগ্রহণ করে। জাহিলী যুগে আবু সুফিয়ান তার সাথে যেনা করে বলে কথিত আছে এবং তার ফলে যিয়াদের জন্ম। রাজনৈতিক কারণে আমীর মুআবিয়া তাকে ভাই বলে স্বীকৃতি দেন এবং এভাবে তাকে আলী (রা)-র দল থেকে নিজ দলে টেনে আনেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান-কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) তাকে ভাই হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং তার থেকে পর্দা করেন। আমীর মুআবিয়া তাকে ইরাক, বসরা ও কূফার শাসক নিয়োগ করেন। যিয়াদ ৫৩ হিজরীতে মারা যায় (ফাতহুল বারী থেকে মুওয়াত্তায়, ২০১)।

যিয়াদ ইবনে হুদাইর ঃ ডাকনাম আবুল মুগীরা, আসাদ গোত্রীয়, সিকাহ তাবিঈ, উমার এবং আলী (রা)-র কাছে হাদীস শুনেন। ইমাম শাবী ও অপরাপর রাবীগণ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ১৭৫)।

যুবায়ের ইবনুল আওয়াম ঃ প্রখ্যাত সাহাবী, ডাকনাম আবু আবদুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফু সাফিয়া (রা)-র পুত্র। তিনি আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র অল্পদিন পরেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রথমে হাবশা (ইথিওপিয়া) ও পরে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বদর, উহুদ ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন এবং ৩৬ হিজরীতে উষ্ট্রীর যুদ্ধে নিহত হন (মুওয়াত্তা, ২১৬)।

যুবায়ের ইবনে আবদুর রহমান ঃ বনু কুরায়যার লোক, আবদুর রহমান ইবনে যুবায়ের (রা) সাহাবী ছিলেন, কিন্তু দাদা যুবায়ের বনু কুরায়যার যুদ্ধে ইহুদী অবস্থায় নিহত হয় (মুওয়াত্তা, ২৬৪)।

যুল-ইয়াদায়ন ঃ "নামায" অধ্যায়ের ২১ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

(র)

রবীআ ইবনে আবদুল্লাহ ঃ নবী ﷺ-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন, সিকাহ তাবিঈ, কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি উমার, তলক ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-এর সূত্রে এবং তার সূত্রে ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ, আবু বুকাইর, মুনকাদিরের দুই পুত্র এবং ইবনে আবু মুলাইকা হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি মদীনার অধিবাসী এবং ৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু মুল্লা আলী কারী এখানে রবীআ ইবনে আবু আবদুর রহমানকে মনে করেছেন। তিনিও অতীব মর্যাদাবান তাবিঈ, ইমাম মালেকের শায়েখ এবং মদীনার বিখ্যাত ফিক্‌হবিদ। তিনি আনাস ইবনে মালেক এবং সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে এবং সুফিয়ান সাওরী ও মালেক তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৩৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫৯)।

রবীআ ইবনে আবদুর রহমান ঃ রবীআ আর-রাই নামে সুপ্রসিদ্ধ, পিতার নাম ফাররুখ আত-তাইমী, ডাকনাম আবু উছমান (মুওয়াত্তা, ১৭৮)। অতঃপর রবীআ ইবনে আবদুল্লাহ দ্রষ্টব্য।

রবীআ ইবনে উমাইয়্যা ঃ মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম করেন, বিদায় হজ্জে শরীক হন, অতঃপর উমার (রা) মদপানের অপরাধে খায়বার এলাকায় নির্বাসন দেন। সেখান থেকে খৃস্টান-রাজ হিরাক্লিয়াসের সাথে গিয়ে মিলিত হয়ে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং বলে, এরপর আমাকে কখনও নির্বাসিত হতে হবে না (মুওয়াত্তা, ২৬৫)।

রাফে ইবনে খাদীজ ঃ সাহাবী, আনসার আওস গোত্রীয়, ডাকনাম আবু আবদুল্লাহ অথবা আবু খাদীজ, মা হামীলা বিনতে মাসউদ। বয়সের স্বল্পতার কারণে বদর যুদ্ধে বাদ পড়েন কিন্তু উহুদ ও তৎপরবর্তী যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং চাচা যাহীর ইবনে রাফে (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। অপরদিকে নিজ পুত্র আবদুর রহমান, পৌত্র আবাইয়া ইবনে রিফাআ, সাইব ইবনে ইয়াযীদ, মাহমূদ ইবনে লাবীদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, ইবনে জুবায়ের, আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান এবং সুলায়মান ইবনে ইয়াসার তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৭৩ হিজরীতে অথবা ৭৪ হিজরীর প্রথমদিকে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তার জানাযা পড়ান, অতঃপর তিনিও ইন্তেকাল করেন। ইমাম বুখারীর মতে তিনি আমীর মুআবিয়ার রাজত্বকালে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৫৬; ইসাবা, ১খ, ৪৯৫-৬)।

রিফাআ ইবনে সিমওয়াল ঃ সাহাবী, কুরায়যা গোত্রীয়, স্ত্রী আয়েশা বিনতে আবদুর রহমান সাহাবী ছিলেন। তিনি তাকে তালাক দেন। মুকাতিল ইবনে হিব্বান বলেন, সূরা বাকারার ২৩০ নম্বর আয়াত তার শানে নাযিল হয় (মুওয়াত্তা, ২৬৪; ইসাবা, ১খ, ৫১৮)।

রুবাইয়্যা ঃ বিখ্যাত মহিলা তাবিঈ এবং হযরত আয়েশা (র)-র ছাত্রী আমরাহ বিনতে আবদুর রহমানের আযাদকৃত দাসী (মুওয়াত্তা)।

রুশাইদ আছ-ছাকাফী ঃ সাহাবী, তিনি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগ পেয়েছেন। তিনি তায়েফের ছাকীফ গোত্রের সদস্য ছিলেন, অতঃপর মদীনায় বসতি স্থাপন করেন (মুওয়াত্তা, পৃ. ২৫০, টীকা ৬)।

(শ)

শাবী ঃ আমের আশ-শা'বী দ্রষ্টব্য।

শারীদ ইবনে সুওয়াইদ ঃ সাহাবী, ছাকীফ গোত্রীয়, মক্কার অধিবাসী, মতান্তরে হাদরামাওতের অধিবাসী, বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন (ইসতীআব, ২খ, ৭০৮; তাবাকাত, ৫খ, ৫১৩; উসদুল গাবা, ২খ, ৩৮৬)।

শিফাআ ঃ সুলায়মান ইবনে আবু হাসমা (রা)-র মা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বাইআত গ্রহণকারিণী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত (মুওয়াত্তা, ১৪৫)।

শুরায়হ্ আল-কাযী ঃ আবু উমাইয়্যা আল-কিন্দী আল-কুফী, পিতার নাম কায়েস। উমার (রা), অতঃপর আলী (রা) তাকে কুফার প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন। হাজ্জাজের সময় মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তিনি এই পদে ইস্তফা দেন। তিনি ১২০ বছর বয়সে ৭৮ হিজরীতে মতান্তরে ৮০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি উমার, আলী ও ইবনে মাসউদ (রা)-এর সূত্রে এবং শা'বী, নাখঈ ও আরও অনেকে তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (তাযকিরাতুল হুফফায, ১খ, ৫৯)।

(স)

সাঈদ আল-জারী ইবনুল জার ঃ উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র মুক্তদাস। সামআনী তার নাম সাদ বলেছেন। জার একটি উপকূলীয় ক্ষুদ্র শহর, যা মদীনার নিকটতর। তার পিতার নাম নওফাল আল-জারী। উমার (রা) তাকে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন। তিনি আবু হুরায়রা ও ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে এবং যায়েদ ইবনে আসলাম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ২৮৬)।

সাঈদ আল-মাকবুরী ঃ ডাকনাম আবু সাঈদ, পিতা কায়সান ইবনে সাঈদ (দ্র.) আল-মাকবুরী আল-মাদানী। তিনি সিকাহ রাবী এবং ১২০ হিজরীর মধ্যে বা তার পূর্বে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৬৮)।

সাঈদ ইবনুল আস ঃ সাহাবী, আমীর মুআবিয়ার পক্ষ থেকে মদীনার গভর্নর। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের দিন তার বয়স ছিল নয় বছর এবং তিনি ৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (মুওয়াত্তা, ৩০৫)।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ঃ আবু মুহাম্মাদ আল-কারশী আল-মাদানী, প্রসিদ্ধ তাবিঈ। মাকহূল বলেন, "আমি গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করেছি কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কোন জ্ঞানীর সাক্ষাত পাইনি"। তিনি হযরত উমার (রা)-র খিলাফতের দ্বিতীয় বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫৩)।

সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ঃ ইবনে রুকাইশ, সিকাহ রাবী, অল্প বয়স্ক তাবিঈ মদীনার অধিবাসী। রিকাশ বা রুকাইশ এক মহিলার নাম। তার গর্ভে অকেগুলো সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং তাদের মাধ্যমেই একটি গোত্রের গোড়াপত্তন হয়। এই গোত্রের লোকদের গোত্রীয় পরিচয় হচ্ছে রুকাইশ। ইবনে আদীর মতে, তিনি সিকাহ রাবী কিনা এ ব্যাপারে ইবনুল কাত্তান নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তিনি ইবনে সীরীনের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, 'আল্লাহ্কে ভয় করো এবং মানুষকেও ভয় করো" (মুওয়াত্তা, ৭৪)।

সাঈদ ইবনে ইয়াসার ঃ সিকাহ তাবিঈ, মদীনার অধিবাসী, একদল রাবী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১১৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৩২)।

সাঈদ ইবনে জুবায়ের ঃ আবু আবদুল্লাহ আল-কুফী, কুফার প্রসিদ্ধ ইমাম। ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে কুফার লোকেরা ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে এলে তিনি বলতেন, "কেন, সাঈদ ইবনে জুবায়ের কি তোমাদের মধ্যে নেই"? স্বৈরাচারী হাজ্জাজ ৫৯ হিজরীর শাবান মাসে এই মহান আলেমকে হত্যা করে (মুওয়াত্তা, ১২০)।

সাঈদ ইবনে যায়েদ ঃ ডাকনাম আবুল আওয়ার, বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত (আবদুর রহমান ইবনে আওফ দ্রষ্টব্য)। সাঈদ (রা) বলেন, আমি নয় ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা জান্নাতের অধিবাসী। আমি যদি দশম ব্যক্তি সম্পর্কেও এই সাক্ষ্য দেই তবে তাতে গুনাহ হবে না। বলা হলো, তা কিভাবে? তিনি বলেন, আমরা হাররা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন ঃ "হে হাররা! স্থির থাকো। কেননা তোমার উপর অবশ্যই কোন নবী অথবা কোন সিদ্দীক (পরম সত্যবাদী) অথবা কোন শহীদ রয়েছে"। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কে কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আবু বাক্র, উমার, উছমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সাদ ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ"। সাঈদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, দশম ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, 'আমি' (তিরমিযী)। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে উমার (রা)-র আগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। তিনি উহুদ ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। উমার, আমর ইবনে হুরাইস, আবুত তুফাইল (রা), আবু উছমান আন-নাহদী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব এবং কায়েস ইবনে আবু হাযিম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি আল-আকীক নামক স্থানে ৫০, ৫১ অথবা ৫২ হিজরীতে ৭০ মতান্তরে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাকে মদীনায় এনে দাফন করা হয়। হায়সাম ইবনে আদীর মতে, তিনি কুফায় মৃত্যুবরণ করেন এবং মুগীরা ইবনে শোবা (রা) তার জানাযা পড়ান (ইসাবা, ২খ, ৪৬)।

সাওদা বিনতে যামআ ঃ উম্মুল মুমিনীন, পূর্ব স্বামীর নাম সুকরান ইবনে আমর, উভয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আবিসিনিয়া হিজরত করেন। সেখান থেকে মক্কা ফেরার পথে সুকরান (রা) ইন্তেকাল করেন। নবুওয়াতের দশম বর্ষে হযরত খাদীজা (রা)-র ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এবং হযরত আয়েশা (রা)–কে ঐ একই বছর বিবাহ করেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা)–কে আগে বিবাহ করেছেন না সাওদা (রা)-কে, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী লেখকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে অধিকতর সহীহ মত অনুযায়ী সাওদার সাথে আগে বিবাহ হয়েছে। একবার বার্ধক্যজনিত কারণে তাকে তিনি তালাক দেবার ইচ্ছা করলে সাওদা (রা) আরজ করেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে আপনার স্ত্রীদের মধ্যে থাকতে দিন। আমার একান্ত আশা, কিয়ামতের দিন আল্লাহ আমাকে আপনার স্ত্রী হিসেবে পুনরুত্থান করুন। আমি যেহেতু বৃদ্ধ হয়ে গেছি, তাই আমার পালার

দিনটি আয়েশাকে দিচ্ছি"। তিনি তার আবেদন মঞ্জুর করেন। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তালাক দিয়েছিলেন এবং পরে রুজু করেন (ইসাবা, ৪খ, ৪৩৮)। তিনি ২৩ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন (ইসাবা, ২খ, পৃ. ৩৩৯; মুওয়াত্তা, ৩৬৩; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ, ৪৫১-৫৪)।

সাওর ইবনে যায়েদ ঃ ইবনে মুঈম, আবু যুরআ ও নাসাঈ তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। তিনি ১৩৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৭৬)।

সাওয়াদ ইবনে গাযিয়া ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে খায়বার এলাকার প্রশাসক নিয়োগ করেন। তিনি আনসার সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে শরীক হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের মাঠে তার জন্য দোয়া করেন (ইসাবা, ২খ, ৯৫-৬; মুওয়াত্তা, ৩৫৪)।

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ঃ পিতা মালেক ইবনে ওয়াহ্‌ব, মাতা খাওলা, বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত (আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও সাঈদ ইবনে যায়েদ দ্রষ্টব্য)। এই দশজন সাহাবীর মধ্যে তিনি সবশেষে ইন্তেকাল করেন (৫৫ হি.)। তার পুত্র মুসআব (মৃ. ১০৩ হি.) এবং পৌত্র ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ (মৃ. ১৩৪ হি.) সিকাহ তাবিঈ ছিলেন। সাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "হে আল্লাহ! সাদ যখন তোমার কাছে দোয়া করে তুমি তার দোয়া কবুল করো" (তিরমিযী)। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, সাদ (রা) এলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ইনি আমার মামা। কেউ দেখাক তো আমার মামার মতো মামা! (তিরমিযী)।

আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সারা রাত জাগ্রত থেকে মদীনা পাহারা দেন। তিনি বলেন ঃ কোন নেক ব্যক্তি এসে অবশিষ্ট রাত যদি আমার পাহারা দিতো! আয়েশা (রা) বলেন, আমরা একথা বলাবলি করছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তির অস্ত্রের শব্দ শুনতে পেলাম। নবী ﷺ তাকে বলেন ঃ তুমি কেন এসেছো? সাদ (রা) বলেন, আমার মনে হঠাৎ করে আপনার নিরাপত্তার কথা জাগ্রত হয়েছে। তাই আমি আপনাকে পাহারা দিতে চলে এসেছি। আয়েশা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন, অতঃপর ঘুমিয়ে গেলেন" (তিরমিযী)।

তিনি ১৭ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ৫৫ হিজরীতে আল-আকীক নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। সেখান থেকে তাকে জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে নিয়ে এসে দাফন করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজের পশমী জুব্বা দিয়ে কাফন দেবার ওসিয়াত করে যান। এই জুব্বা পরে তিনি বদরের যুদ্ধ করেন। তার সূত্রে তার ছয় সন্তান আমের, মুহাম্মাদ, মুসআব, ইবরাহীম, উমার ও আয়েশা (রা) এবং কায়েস ইবনে আবু হাযেম, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, আলকামা, আবু উছমান আন-নাহদী, মুজাহিদ ও আরও অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ৫০; তাযকিরাতুল হুফফায, ১খ, ২২-৩)।

সাদ ইবনে উবাদা ঃ দাদার নাম ওয়ালীম ইবনে হারিছা, আনসার খাযরাজ গোত্রীয়, সাহাবী, ১৫ হিজরীতে সিরিয়ায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৬১)।

সাদ ইবনে খাওলা ঃ 'সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস' দ্রষ্টব্য।

সাদ ইবনে মালেক ঃ "আবু সাঈদ আল-খুদরী" দ্রষ্টব্য।

সাদাকা ইবনে ইয়াসার ঃ সিকাহ রাবী, জাজীরার লোক, মক্কায় বসবাস করতেন (মুওয়াত্তা, ১১৩)।

সাফওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ঃ আল-জুমাহী আল-মাক্কী সিকাহ তাবিঈ (মুওয়াত্তা, ৩০২)।

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা ঃ আল-কারশী, ডাকনাম আবু ওয়াহব, সাহাবী। তার পিতা বদর যুদ্ধে কাফের অবস্থায় নিহত হয়। তিনি মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। পুত্র আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান, উমাইয়্যা, আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, আতা, তাউস, ইকরিমা প্রমুখ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি উছমান (রা)-র হত্যাকাণ্ডের সময় মক্কায় মতান্তরে ৪১ অথবা ৪২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (ইসাবা, ২খ, ১৮৭-৮; মুওয়াত্তা, ৩০২)।

সাফওয়ান ইবনে সুলাইম ঃ আবু আবদুল্লাহ বা আবুল হারিছ আল-মাদানী। তিনি ইবনে উমার, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ , আনাস (রা), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব প্রমুখের সূত্রে এবং ইবনে জুরাইজ, মালেক, দুই সুফিয়ান ও আরও কতেকে তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (তাযকিরাতুল হুফফায, ১খ, ১৩৪)।

সাফিয়া বিনতে আবু উবায়দা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র স্ত্রী, হযরত উমার (রা)-র পুত্রবধূ। পিতার জীবদ্দশায় তিনি তাকে বিবাহ করেন। উমার (রা) পুত্রবধূকে পুত্রের পক্ষ থেকে চার শত দিরহাম মুহর প্রদান করেন। তার গর্ভে ওয়াকিদ, আবু বাক্র, আবু উবায়দা, উবায়দুল্লাহ, উমার, হাফসা ও সাওদা নামে সাতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইবনে মান্দার মতে, তিনি নবী ﷺ-এর সাক্ষাত লাভ করেন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোন হাদীস রিওয়ায়াত করেননি। কিন্তু ইমাম দারু কুতনী ইবনে মান্দার এই মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনে হিব্বান ও আল-ইজলী তাকে সিকাহ তাবিঈ বলে উল্লেখ করেছেন (মুওয়াত্তা, ৭০)।

সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ঃ উম্মুল মুমিনীন, হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। পিতা ইহুদী বনূ নাদীর গোত্রের নেতা ছিল। তার প্রথম বিবাহ নিজ গোত্রের সালাম ইবনে মিসকামের সাথে সম্পন্ন হয়। সে তাকে তালাক দিলে কিনানা ইবনে আবুল হুকাইকের সাথে তার বিবাহ হয়। ৭ম হিজরীতে খায়বারের যুদ্ধে কিনানা নিহত হয় এবং সাফিয়্যা (রা) মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে নিজের জন্য বেছে নেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী ﷺ তাকে আযাদ করার পর বিবাহ করেন। খায়বার থেকে এক মঞ্জিল দূরে আস-সাহ্বা নামক স্থানে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ৫২ মতান্তরে ৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয় (মুওয়াত্তা, ২২২; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ, ৫০৫ ও ৫০৮)।

সাব ইবনে জাস্সামা ঃ সাহাবী, দাদার নাম কায়েস ইবনে রবীআ, লাইছ গোত্রীয়। সর্বাধিক নির্ভুল মত অনুযায়ী তিনি উছমান (রা)-র খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২১৪)।

সাবিত ইবনে কায়েস ঃ সাহাবী, আনসারদের খতীব, উহুদ এবং তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১২ হিজরীতে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন (মুওয়াত্তা, ৩৯৫)।

সাবিত ইবনুদ দাহদাহ ঃ সাহাবী, উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন, নবী ﷺ তার জানাযা পড়ান। তিনি উহুদ যুদ্ধে বলেছিলেন, "হে আনসারগণ! মুহাম্মাদ ﷺ নিহত হলেও আল্লাহ চিরঞ্জীব। অতএব তোমরা নিজেদের দীনের জন্য জিহাদ করো" (মুওয়াত্তা, ৩১৮; ইসাবা, ১খ, ১৯১)।

সাবিত ইবনুদ দাহ্হাক ঃ প্রসিদ্ধ সাহাবী, আনসার বনূ আশহাল গোত্রীয়। তিনি ৬৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৩৬৫)।

সালত ইবনে যায়েদ ঃ কিন্দার অধিবাসী। ইজলী প্রমুখ তাকে সিকাহ রাবী বলে উল্লেখ করেছেন (মুওয়াত্তা, ৬৬)।

সালাবা ইবনে আবু মালেক ঃ তিনি সাহাবী কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ইবনে মুঈন বলেন, তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে সাদ বলেন, তিনি ও তার পিতা আবু মালেক (আবদুল্লাহ ইবনে সাম) ইয়ামনের কিন্দা থেকে মদীনা আসেন। তিনি বনূ কুরায়যার এক মহিলাকে বিবাহ করেন (মুওয়াত্তা, ১৩৮)।

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ঃ ডাকনাম আবু আবদুল্লাহ, হযরত উমার (রা)-র পৌত্র, মদীনার বিশিষ্ট ফকীহ এবং সিকাহ তাবিঈ। অধিকতর নির্ভুল মত অনুযায়ী তিনি ১০৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫০)।

সালেম মাওলা ঃ আবু হুযায়ফা (রা)-র মুক্তদাস। ইমাম বুখারী (র) বলেন, তিনি কোন এক আনসার মহিলার মুক্তদাস। ইবনে হিব্বান বলেন, ঐ মহিলার নাম লায়লা অথবা সুবায়তা বিনতে ইয়াআর ইবনে যায়েদ এবং আবু হুযায়ফা (রা)-র স্ত্রী। ইবনে শাহীন বলেন, আমি ইমাম আবু দাউদ (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি সালেম ইবনে মা'কিল, ফাতিমা বিনতে ইয়াআর আনসারিয়ার মুক্তদাস। আবু হুযায়ফা (রা) তাকে মুখডাকা পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি তার সাথে ইয়ামামার যুদ্ধে যোগদান করেন (মুওয়াত্তা, ২৭৭)।

সাহল ইবনে আবু হাসমা ঃ আবু আবদুর রহমান অথবা আবু ইয়াহ্ইয়া, আনসার, অল্প বয়স্ক সাহাবী, বাইআতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন এবং বদর যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইবনে আবু হাতিম এই মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ইবনুল কাত্তানের মতে এই তথ্য সঠিক নয়। ইবনে হিব্বান, ওয়াকিদী, আবু জাফর তাবারী, ইবনুস সাকান, হাকেম প্রমুখের মতে নবী ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল আট বছর। যাহাবীর মতে, তিনি আমীর মুআবিয়ার রাজত্বকালে মৃত্যুবরণ করেন। আর হাসমার নাম আবদুল্লাহ, মতান্তরে আমের ইবনে সায়েদা (মুওয়াত্তা, ২৯৯)।

সাহল ইবনে সাদ ঃ সাহাবী, আনসার খাযরাজ গোত্রীয়। মদীনায় বসবাসরত সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সবশেষে ইন্তেকাল করেন। তিনি ৮৮ হিজরীতে, মতান্তরে ৯১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মতান্তরে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) মদীনায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী (৭৩, ৭৪, ৭৭, অথবা ৭৮ হি.), (মুওয়াত্তা, ১৬০)

সাহল ইবনে হুনাইফ ঃ সুপ্রসিদ্ধ বদরী সাহাবী, পুত্র আবু উমামাও সাহাবীদের মধ্যে গণ্য, আনসার আওস গোত্রীয়। তিনি বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উষ্ট্রীর যুদ্ধের পর আলী (রা) তাকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তার সাথে সিফ্ফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৩৮ হিজরীতে কূফায় ইন্তেকাল করেন এবং আলী (রা) ছয় অথবা পাঁচ তাকবীরে তার জানাযা পড়ান। তিনি নবী ﷺ ও যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ১৫৭; ইসাবা, ২খ, ৭৮; তাবাকাত, ৩খ, ৪৭১-৩)।

সাহলা বিনতে সুহাইল ঃ আবু হুযায়ফা (রা)-র স্ত্রী থাকাকালীন মুহাম্মাদ ইবনে আবু হুযায়ফা, শাম্মাখ ইবনে সাঈদের ঘরে বুকাইর এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র ঘরে সালিম তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (মুওয়াত্তা, ২২৭)।

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ ঃ তিনি এবং পিতা ইয়াযীদ ইবনে সাঈদ (রা) সাহাবী, কিন্দার অধিবাসী, আল-আলা ইবনুল হাদরামী (রা) তার মামা। তার পিতা নবী ﷺ-এর সংগে হজ্জ করেন। এ সময় তার বয়স হয়েছিল ছয় বছর। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ, উমার, উছমান, তালহা, সাদ (রা) এবং পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। অপরদিকে একদল তাবিঈ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৮২ হিজরীতে, মতান্তরে ৯০ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন। ইবনে আবু দাউদের মতে তিনি মদীনায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী (ইসাবা, ২খ, ১২-৩)।

সায়েব ইবনে খাল্লাদ ঃ সাহাবী, আনসার খাযরাজ গোত্রের উপগোত্র বনু হারিছ-এর লোক, দাদার নাম সুওয়াইদ। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুআবিয়া (রা) তাকে ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করেন। পুত্র খাল্লাদ, সালেহ ইবনে হাইওয়ান এবং আতা ইবনে ইয়াসার তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৭১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৯৭; ইসাবা, ২খ, ১০)।

সিলা ইবনে যুফার ঃ ডাকনাম আবুল আলাআ আল-আবেসী আল-কুফী। তিনি আম্মার, হুযায়ফা, ইবনে মাসউদ, আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে এবং আবু ওয়াইল, আবু ইসহাক আস-সাবীঈ, আইউব সুখতিয়ানী প্রমুখ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সিকাহ রাবী ছিলেন এবং মুসআব ইবনে যুবায়েরের খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৩৯৩)।

সুওয়াইদ ইবনুন নুমান ঃ সাহাবী, আনসার আওস গোত্রীয়, বাইআতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উহুদ এবং তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন বলে কথিত আছে। তিনি মদীনার অধিবাসী এবং এখানকার রাবীগণ তার হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ৬০)।

সুফিয়ান ইবনে আবু যুহায়ের ঃ সাহাবী, পিতার নাম ফারদ, মতান্তরে নুমায়ের ইবনে আবদুল্লাহ, বনু আযদ গোত্রীয় (মুওয়াত্তা, ৩৯৭)।

সুমাই ঃ ডাকনাম আবু আবদুল্লাহ, আবু বাক্র ইবনে আবদুর রহমানের মুক্তদাস। ইমাম আহমাদ ও আবু হাতিম তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন (মুওয়াত্তা, ৮১)।

সুলায়মান ঃ সাহাবী। 'শিফাআ' দ্রষ্টব্য।

সুলায়মান ইবনে ইয়াসার ঃ সিকাহ তাবিঈ, গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী আলেম এবং ইমাম। তিনি ১০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৬৫)।

(হ)

হাওয়া বিনতে ইয়াযীদ ঃ "মুআয ইবনে আমর ইবনে সাঈদ" দ্রষ্টব্য।

হাকীম ইবনে হিযাম ঃ আসাদ গোত্রীয়, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা)-র ভ্রাতুষ্পুত্র, সাহাবী, মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ৭৪ বছর বয়স পেয়েছেন এবং ৫৪ হিজরী বা তার পরেও জীবিত ছিলেন (মুওয়াত্তা, ৩৩৩)।

হাজ্জাজ ইবনে আমর ইবনে গাযিয়া ঃ আনসার সাহাবী, হযরত আলী (রা)-র সাথে সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আসহাবুস সুনান তার একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন (হজ্জ সম্পর্কিত), যা প্রমাণ করে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাদীস শুনেছেন। দমরা ইবনে সাঈদ, আবদুল্লাহ ইবনে রাফে এবং আরও কতক তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল-ইজলী, ইবনুল বারকী ও ইবনে সাদ তাকে তাবিঈ বলে উল্লেখ করেছেন (মুওয়াত্তা, ২৫২; ইসাবা, ১খ, ৩১৩-৪)।

হাতিব ইবনে আবু বালতাআ ঃ সাহাবী, আসাদ গোত্রের মিত্র, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৩৪৩)।

হানযালা আল-আনসারী ঃ পিতা কায়েস ইবনে আমর আল-আনসারী, প্রবীণ তাবিঈ। কেউ কেউ তাকে সাহাবী বলেছেন (মুওয়াত্তা, ৩৫৬)।

হাফসা বিনতে উমার ঃ উম্মুল মুমিনীন, মায়ের নাম যয়নব বিনতে মাযউন (রা)। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। খুনাইস ইবনে হুযাফা (রা)-র সাথে তার প্রথম বিবাহ হয়। তিনি স্বামীর সাথে হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। খুনাইস (রা) বদর যুদ্ধের পরে মারা যান। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তৃতীয় হিজরীর শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করেন। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তালাক দিলে হযরত জিবরাঈল (আ) এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, "তাকে ফেরত নিন। কেননা তিনি রোযাদার ও ইবাদতগুজার মহিলা এবং জান্নাতে আপনার স্ত্রী (ইবনে সাদ, তাবারানী, ইসাবা, ৪খ, ২৫৩)। অতএব তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে নেন। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তিনি ৪৬ হিজরীর শাবান মাসে মদীনায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১১৪; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ, ৪৬২-৩)।

হাফসা বিনতে আবদুর রহমান ঃ আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-র পৌত্রী, সিকাহ তাবিঈ, সহীহ মুসলিমসহ আরো তিনটি গ্রন্থে তার হাদীস রয়েছে (মুওয়াত্তা, ২৫৯)।

হাবীবা বিনতে খারিজা ঃ আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-র স্ত্রী।

হাব্বান ইবনে মুনকিয ঃ আনসার সাহাবী, মুযায়না গোত্রীয়। তার পৌত্র মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (মৃ. ১২১ হি.) একজন সিকাহ রাবী (মুওয়াত্তা, ২৭৩)।

হাব্বার ইবনুল আসওয়াদ ঃ প্রসিদ্ধ সাহাবী, মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খাঁটি মুসলমান হন (মুওয়াত্তা, ২১১)।

হামযা আল-আসলামী ঃ ডাকমান আবু সালেহ, পিতা আমর ইবনে উআয়মির, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী। তিনি ৬১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৮৭)।

হামীদা ঃ আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র পুত্র ইবরাহীমের দাসী স্ত্রী (মুওয়াত্তা, ১৬৩)।

হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান ঃ ডাকমান আবু ইসমাঈল আল-কুফী, পিতার নাম মুসলিম আল-আশআরী, কুফার কাযী। মামার বলেন, যুহরী, হাম্মাদ ও কাতাদার চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি আমার নজরে পড়েনি। তিনি সিকাহ রাবী এবং ইবরাহীম নাখঈর সর্বাধিক জ্ঞানবান সংগী। ইমাম নাসাঈর মতে তিনি সিকাহ রাবী, কিন্তু মুরজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি ১২০ হিজরীতে, মতান্তরে ১১৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫৩)।

হাযযাল ইবনে যিহাব ঃ সাহাবী। তার এক বাঁদীর সাথে মায়েয ইবনে মালেক আসলামী (রা) যেনা করে বসেন এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। দণ্ড কার্যকর করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযা পড়েন এবং বলেন ঃ "তোমরা মায়েয ইবনে মালেকের জন্য মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করো। কেননা সে এমন তওবা করেছে যে, তা যদি আমার গোটা উম্মাতের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়, তবে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে" (মুসলিম)।

হায্‌যাল (রা)-র পুত্র নুআইমও সাহাবী ছিলেন বলে কথিত। তার পৌত্র ইয়াযীদ সিকাহ তাবিঈ ছিলেন (মুওয়াত্তা, ৩১১)।

হারিছ ইবনে আবু যুবাব ঃ পিতা আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ। মতান্তরে তার নাম মুগীরা ইবনে আবু যুবাব এবং দাওস গোত্রীয়। তিনি নিজ পিতা ও চাচা এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, মুজাহিদ প্রমুখ রাবীদের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন এবং ইবনে জুরাইজ, ইসমাঈল ইবনে উমাইয়্যা ও অপরাপর রাবীগণ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সিকাহ রাবী এবং ১২৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৫৩)।

হারিছ ইবনে হিশাম ঃ সাহাবী, মাখযূম গোত্রীয়, আবু জাহলের ভাই এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-র চাচাতো ভাই, মা ফাতিমা বিনতে ওয়ালীদ। তিনি উহুদ যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীর সাথে ছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। ওয়াকিদীর মতে, তিনি মহামারীতে মারা যান। আর মাদাইনীর মতে, তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে শহীদ হন (মুওয়াত্তা, ২৭০; ইসাবা, ১খ, ২৯৩-৪)।

হাসান ইবনে আলী ঃ তিনি ৩ হিজরীর মধ্য রমযানে অথবা শাবান মাসে, মতান্তরে ৪ অথবা ৫ হিজরীর প্রথমদিকে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। আলী (রা) তার নাম রাখেন “হারব” কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পরিবর্তন করে হাসান নাম রাখেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ, পিতা আলী এবং ভাই হুসাইন (রা)-র সূত্রে এবং পুত্র হাসান, আয়েশা (রা), ভ্রাতুষ্পুত্র আলী ইবনে সুনায়ন এবং তার দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও বাকের, ইকরিমা, ইবনে সীরীন, জুবাইর ইবনে নুফাইর এবং আরও অনেকে তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ইবনে মান্দা ও ওয়াকিদীর মতে ৪৯ হি., মাদাইনীর মতে ৫০ হি., হায়সাম ইবনে আদীর মতে ৪৪ হি. মতান্তরে ৫১ অথবা ৫৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকী নামক গোরস্তানে দাফন করা হয়। কথিত আছে যে, তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় (মুওয়াত্তা, ২৯১; ইসাবা, ১খ, ৩২৮-৩১)।

হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ঃ তার পিতা মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। হযরত আলী (রা)-র অপর স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান মুহাম্মাদ (তাবাকাত, ৫খ, ৯১-১১৬)-এর পুত্র। তার ডাকনাম মুহাম্মাদ, মায়ের নাম জামাল বিনতে কায়েস। তিনি জ্ঞান-গরিমা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে নিজ ভ্রাতা আবু হাশিমের অগ্রগণ্য ছিলেন। উনাইস আবুল উরিয়ান বলেন, আমি তার পরিধানে ফিনফিনে কাপড়ের জামা ও পাগড়ী দেখেছি। তিনি উমার ইবনে আবদুল আযীযের খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। তার কোনো উত্তরাধিকারী ছিলো না (তাবাকাত, ৫খ, ৩২৮)।

হাসান বসরী ঃ হাসান ইবনে আবুল হাসান সাইয়্যার। তার মা উম্মে সালামা (রা)-র মুক্তদাসী। তিনি উমার (রা)-র শাহাদাতের পর মদীনা থেকে বসরা চলে আসেন। তিনি একদল সাহাবীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন এবং একদল তাবিঈ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১১০ হিজরীর রজব মাসে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৭৪)।

হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়্যা ঃ “উম্মে সালামা” দ্রষ্টব্য।

হিযাম ইবনে সাঈদ ইবনে মুহাইয়্যাসা ঃ মতান্তরে হারাম ইবনে সাদ অথবা হারাম ইবনে সায়েদা, সিকাহ তাবিঈ। তার সূত্রে অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি ১১৩ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ২৯৭)।

হিশাম ইবনে আবদুল মালেক ঃ উমাইয়্যা রাজবংশের সর্বশেষ কর্মদক্ষ রাজা এবং উমাইয়া রাজবংশের সর্বশেষ গৌরব। তিনি ৭২৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন (ইসলামের ইতিহাস)।

হিশাম ইবনে ইসমাঈল ঃ মাখযূম গোত্রীয়, উমাইয়্যা-রাজ আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের পক্ষ থেকে মদীনায় গভর্ণর (মুওয়াত্তা, ৩৪৫)।

হিশাম ইবনে উরওয়া ঃ যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা)-র পৌত্র, নিজ পিতা ও চাচা আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক, আবু হানীফা এবং শোবা তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সিকাহ রাবী এবং ১৪৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৬৫)।

হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ঃ বনূ যাহ্‌রা গোত্রীয়, প্রবীণ সিকাহ তাবিঈ, মদীনার অধিবাসী। তিনি ১০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৬৭)।

হুমাইদ ইবনে কায়েস ঃ ডাকনাম আবু সাফওয়ান আল-আরাজ আল-কারী, সিকাহ রাবী, ৩০ হিজরীতে মতান্তরে তারও পরে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ১৭৮)।

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান ঃ আনসার বনূ আবদুল আশহাল গোত্রের মিত্র, মূলগতভাবে ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন। ইয়ামান তার পিতার উপাধি, তার নাম হিস্‌ল অথবা হুসাইল ইবনে জাবের এবং তিনি (পিতা) হত্যার অপরাধে অপরাধী হয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে মদীনায় আশ্রয় নেন। পিতা-পুত্র উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তার পিতা ভুলবশত মুসলমানদের হাতে নিহত হন। এজন্য তাকে পিতার রক্তমূল্য (দিয়াত) প্রদান করা হয়। হুযায়ফা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একান্ত সহচর। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একান্ত গোপন বিষয়ের সংরক্ষক। এজন্য তার উপাধি ছিল 'সাররি রাসূল' (রাসূলের গোপন তথ্য)। তিনি মুনাফিকদের একটি তালিকাও তাকে দিয়েছিলেন। হযরত উমার (রা) গোপনে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, দেখো তো হুযায়ফা! মুনাফিকদের তালিকায় আমার নামও আছে নাকি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "হুযায়ফা তোমাদের যা বলে তা বিশ্বাস করো" (তিরমিযী)। তিনি ৩৬ হিজরীতে আলী (রা)-র খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের ৪০ দিন পর মাদায়েন শহরে (ইরাক) ইন্তেকাল করেন।

ইরাকের বাদশা ফয়সালের রাজত্বকালে তার ও হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র কবর খোলা হলে, তাদের লাশ অবিকল অবস্থায় পাওয়া যায়। লাশ দু'টির কাফন, এমনকি মাথা ও দাড়ির চুল পর্যন্ত সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ছিল। দেখে মনে হয়নি যে, লাশ দুটো আজ থেকে সাড়ে তের শত বছর পূর্বেকার। বরং মনে হচ্ছিল এ যেন দুই-তিন ঘণ্টা পূর্বের লাশ। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, দু'টি লাশের চোখই খোলা ছিল এবং তা থেকে এমন তীব্র আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল যে, তাদের চোখের দিকে তাকানো যাচ্ছিলো না। এই দৃশ্য দেখে অনেক অমুসলমান ঘটনাস্থলেই ইসলাম গ্রহণ করে (মাসিক পৃথিবী, ১৯৮৫ সনের জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত "বিশ শতকের মুজিযা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দাবা এলাকার কর্মকর্তা নিয়োগ করেন এবং উমার (রা) তাকে মাদায়েনের গভর্ণর নিয়োগ করেন। তিনি ইরাক বিজয়ে বিশেষ অবধান রাখেন। "যা ঘটেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে" রাসূলুল্লাহ ﷺ তা তার কাছে বলে দিয়েছেন (মুসলিম)। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উমার (রা)-র নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবীদের

মধ্যে জাবের, জুনদুব, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ ও আবুত তুফাইল (রা), তাবিঈদের মধ্যে রিবঈ ইবনে খিরাশ, যায়েদ ইবনে ওয়াহ্হাব, যায়েদ ইবনে হুবায়েশ, আবু ওয়াইল, পুত্র বিলাল এবং আরও একদল রাবী তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন (মুওয়াত্তা, ৫৫; তাবাকাত, ৬খ, ১৫, ৭খ, ৫খ, ৫২৭; ইসাবা, ১খ, ৩১৭-৮; তাকরীব, ১খ, ১৫৬)।

হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান ঃ ডাকনাম হুযাইল, কুফার অধিবাসী। তিনি জাবের ইবনে সামুরা (রা), উমারা ইবনে রুইয়া, ইবনে আবু লায়লা ও আবু ওয়াইলের সূত্রে এবং শোবা, আবু আওয়ানা প্রমুখ তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সিকাহ রাবী, হাদীসের হাফেজ এবং হুজ্জাত। তিনি ১২৬ হিজরীতে ৯৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (মুওয়াত্তা, ৯২)।

হুসাইন ইবনে আলী ঃ তিনি ৪ হিজরীর শাবান মাসে, মতান্তরে ৬ অথবা ৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। হাসান (রা)-র জন্মের এক বছর পরেই তিনি মায়ের পেটে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নাম রাখেন হুসাইন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ, পিতা, মাতা, উমার এবং ভাই হাসান (রা)-র সূত্রে, অপরদিকে পুত্র-কন্যা যয়নুল আবেদীন, ফাতিমা ও সুকায়না, পৌত্র বাকের, ইমাম শাবী, ইকরিমা ও আরও অনেকে তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৬১ হিজরীর ১০ মুহাররম কারবালার প্রান্তরে শহীদ হন (মুওয়াত্তা, ২৯১; ইসাবা, ১খ, ৩৩২-৫)।

হুসাইন ইবনে ইবরাহীম ঃ মুওয়াত্তায় তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র সূত্রে (পৃ. ১৫০) হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু তাহ্যীবুত তাহযীব, তাকরীবুত তাহ্যীব, আল-কাশিফ ও জামিউল উসূল গ্রন্থে তার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়নি। ইবনে সা'দের তাবাকাত গ্রন্থে ইবনে মাসউদ (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনাকারীদের যে তালিকা দেয়া হয়েছে তাতেও তার নাম উল্লেখ নেই।

হুসাইন ইবনে মুহ্সিন ঃ দাদা নুমান, আনসার আশহাল গোত্রীয়, সাহাবী। একই বংশের হুসাইন ইবনে মুহসিন ইবনে আমের (রা)-ও সাহাবী। কিন্তু হুসাইন ইবনে মুহসিন আল-আনসারী আল-খাতমী সাহাবী কিনা তাতে মতভেদ আছে। ইমাম বুখারী ও ইবনে হিব্বান তাকে তাবিঈ বলেছেন এবং তাবারানী তাকে সাহাবী বলেছেন (ইসাবা, ১খ, ৩৩৮)।

হুয়াইয়্যাসা ঃ মুহাইয়্যাসা দ্রষ্টব্য।

সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী আটজন সাহাবী

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা)	৫,৩৭৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।	
২. হযরত আয়েশা (রা)	২,২১০	ঐ
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)	১,৬৬০	ঐ
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)	১,৬৩০	ঐ
৫. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)	১,৫৪০	ঐ
৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)	১,২৮৬	ঐ
৭. হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)	১,১৭০	ঐ
৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)	৮৪৮	ঐ

প্রধান চারটি মাযহাবের চার ইমাম

১. ইমাম আবু হানীফা (র), নুমান ইবনে ছাবিত, জন্ম ৮০ হিজরী (৬৯৯ খৃ.), মৃত্যু ১৫০ হিজরী (৭৬৭ খৃ.)। তার প্রধান গ্রন্থ ঃ আল-ফিক্হুল আকবার।

২. ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র), জন্ম ৯৫ হিজরী (৭১৪ খৃ.), মৃত্যু ১৭৯ হি. (৭৯৮ খৃ.)। তার প্রধান গ্রন্থ ঃ মুওয়াত্তা ইমাম মালেক।

৩. ইমাম শাফিঈ, আবু ইদরীস (র), জন্ম ১৫০ হি. (৭৬৭ খৃ.), মৃত্যু ২০৪ হি. (৮৫৪ খৃ.)। তার প্রধান গ্রন্থ ঃ কিতাবুল উম্ম।

৪. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র), জন্ম ১৬৪ হি. (৭৮০ খৃ.), মৃত্যু ২৪১ হি. (৮৫৫ খৃ.)। তার প্রধান গ্রন্থ ঃ মুসনাদে ইমাম আহমাদ।

হাদীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ছয়জন ইমাম

১. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, জন্ম ১৯৪ হি. (৮০৯ খৃ.), মৃত্যু ২৫৬ হি. (৮৬৯ খৃ.), প্রধান গ্রন্থ ঃ সহীহ আল-বুখারী।

২. আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কাশীরী, জন্ম ২০২ হি. (৮১৭ খৃ.), মৃ. ২৬১ হি. (৮৭৪ খৃ.), প্রধান গ্রন্থ ঃ সহীহ মুসলিম।

৩. সুলায়মান ইবনুল আশআছ আস-সিজিস্তানী, জন্ম ২০২ হি., মৃত্যু ২৭৫ হি. (৮৮৮ খৃ.), প্রধান গ্রন্থ ঃ সুনান আবু দাউদ।

৪. আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাহ (সূরাহ), জন্ম ২০৯ হি. (৮২৪ খৃ.), মৃত্যু ২৭৯ হি. (৮৯২ খৃ.), প্রধান গ্রন্থ ঃ জামে আত-তিরমিযী।

৫। হাফেয আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআইব আন-নাসাঈ, জন্ম ২১৫ হি. (৮৩০ খৃ.), মৃত্যু, ৩০৩ হি. (৯১৫ খৃ.), প্রধান গ্রন্থ ঃ সুনান আন-নাসাঈ।

৬. হাফেয আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ আল-কাযবীনী ইবনে মাজা, জন্ম ২০৭ হি. (৮২২ খৃ.), মৃত্যু ২৭৫ হি., প্রধান গ্রন্থ ঃ সুনান ইবনে মাজা।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلاَّ بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ .

Admin-Name:-Rasikul Islam
Address:- Murshidabad,westbengal(india)
PDF & Online:- https://rasikulindia.blogspot.com/ book শুধু
Website:- https://sarolpoth.blogspot.com/ Get the article/Get written or
http://sahih-akida.simplesite.com/ or https://jannaterpoth.wildapricot.org/
Contactc & WhatsApp:-https://web.whatsapp.com/send?phone=919775094205
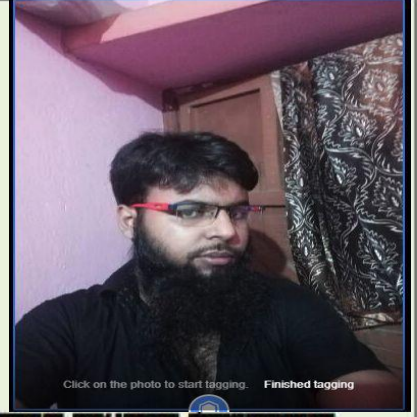
-: জানা ও অজানা ইসলামি জ্ঞান পেতেঃ-

আপনারা বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আর কোন রকম সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন সাধ্যমত ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব।এবং আমার সাইটের কপিরাইট সম্পূর্ণ-নিষিদ্ধ। তাছাড়া শেয়ার করতে পারেন।।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- আমার মেন সাইট আসিতেছে শুধু লিঙ্ক টা দেখে রাখেন, দেওয়া হল- http://esoislamerpothecholi.in/ এখানে সুন্দর ভাবে ভিডিও ও সকল কিছু পাবেন।আশা করি ভাল লাগবে। আমার জানা মতে এইরকম সাইট আর কোথাও পাবেননা। নিজস্ব সার্ভার। চালু ইনশাআল্লাহ ২০১৯এই হয়ে যাবে তবে আমাদের জন্য দুয়া করবেন ,যাতে তাড়াতাড়ি চালু করতে পারি।। বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। চালু হলে ব্লগার সাইটে নোটিফিকেশন দেওয়া হবে।

You will share more and if you have any problems, please let me know. Insha Allah will try. And the copyright of my site is completely banned. Moreover, you can share. .

Note:-- *My Mind Site Is Just Coming To See The Link, Given - Here You Will Find Beautiful Video And Everything. Hope You Enjoy It. According To My Knowledge, No Such Site Will Be Available Anywhere. Own Server Inshaallah 2015 Will Be Done, But Do The Dual For Us, So That We Can Start It Soon. Do More Share. Notification Will Be Issued To The Blogger Site When Launched.*